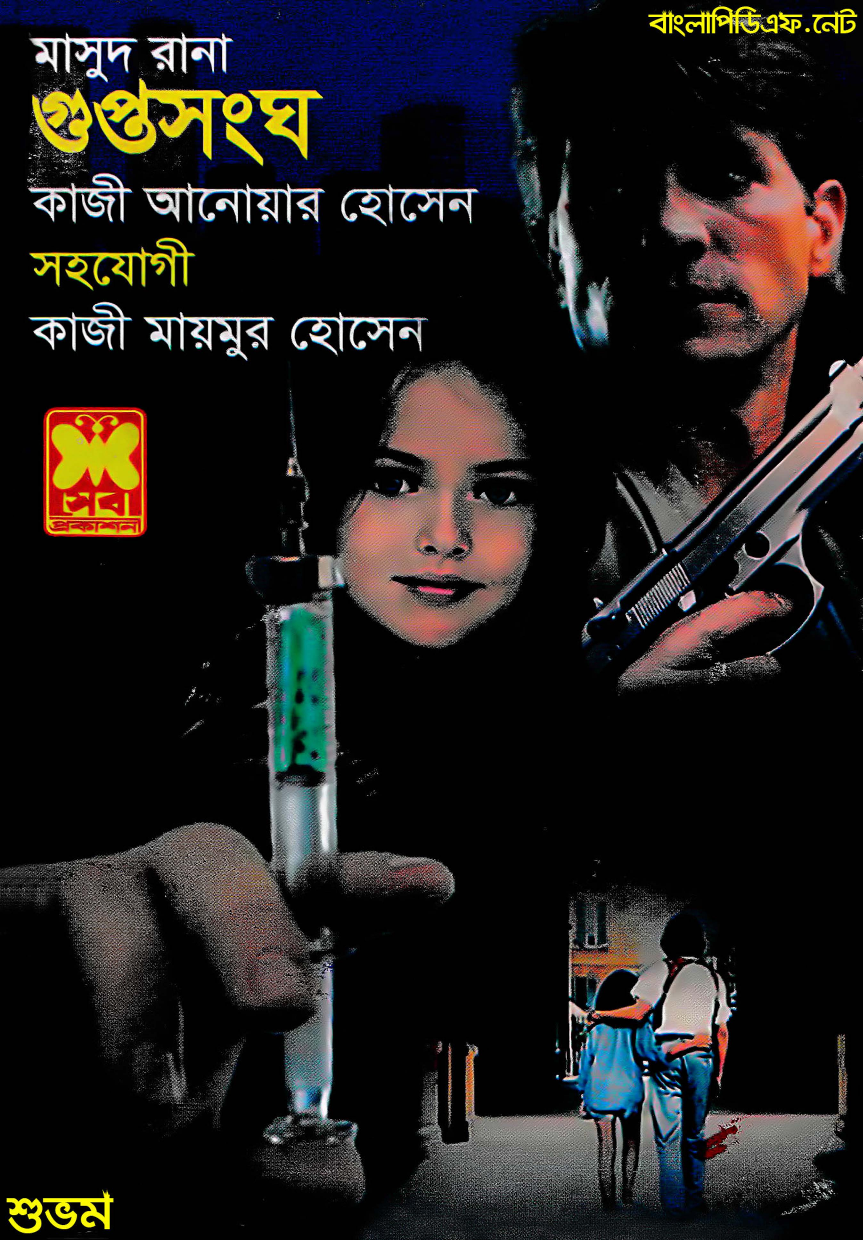
মাসুদ রানা

গুপ্তসংঘ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

কাজী মায়মুর হোসেন



সেবা প্রকাশনী

শুভম

মাসুদ রানা

গুপ্তসংঘ

কাজী আনোয়ার হোসেন
সহযোগীঃ কাজী মায়মুর হোসেন

এ-গল্প এতিম শিশু টম ও মিষ্টি মেয়ে জেনির। বা মাসুদ রানা ও রামিন রেযার। অথবা ইতালির কারাবিনিয়ারি, মাফিয়া এবং দ্য ডায়মণ্ড রিং-এর। সেই সঙ্গে বাংলাদেশেরও।
ভয়ঙ্কর এক নরখাদক দানব মেরে ফেলেছে বলে রানার ওপর খেপে গেছে সিআইএ-র চিফ। এজেন্টদের ওপর নির্দেশ এলঃ নির্মূল করো বিসিআই-এর ওই এম.আর.নাইনকে! চিফের আদেশে গোপনে আমেরিকা ছেড়ে, গোজো দ্বীপে লুকিয়ে পড়ল রানা।
জানত না, অনাথ টমের অনুরোধ আর লক্ষ্মী মেয়ে জেনির জন্যে নামতে হবে মাফিয়ার চেয়েও ক্ষমতাশালী, জটিল এক গুপ্তসংঘের বিরুদ্ধে। অশুভ ওই দলের নরপশুরা দেশে দেশে সুন্দরী মেয়েদেরকে ড্রাগ্‌-অ্যাডিক্ট করে বিক্রি করছে পতিতালয়ে
ক'জন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে লড়তে গিয়ে টের পেল রানা, চালে সামান্য ভুল হলেই দুনিয়া ত্যাগ করতে হবে সবাইকে!

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা ৪৪৪

গুপ্তসংঘ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

কাজী মায়মুর হোসেন



সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

ISBN 984-16-7444-0

একশ' সাতান্ন টাকা

প্রথম প্রকাশ: ২০১৫

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-444
GUPTASHANGHA
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain
With: Qazi Maimur Husain


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শু
ভ
ম
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউণ্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

Rana- 444

গুপ্তসংঘ

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় ◆ ভারতনাট্যম ◆ স্বর্ণমৃগ ◆ দুঃসাহসিক ◆ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ◆ দুর্গম দুর্গ ◆ শত্রু ভয়ঙ্কর ◆ সাগরসঙ্গম-১, ২ ◆ রানা! সাবধান!! ◆ বিস্মরণ ◆ রত্নদ্বীপ ◆ নীল আতঙ্ক-১, ২ ◆ কায়রো ◆ মৃত্যুপ্রহর ◆ গুপ্তচক্র ◆ মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ◆ রাত্রি অন্ধকার ◆ জাল ◆ অটল সিংহাসন ◆ মৃত্যুর ঠিকানা ◆ ক্ষ্যাপা নর্তক ◆ শয়তানের দূত ◆ এখনও ষড়যন্ত্র ◆ প্রমাণ কই? ◆ বিপদজনক-১, ২ ◆ রক্তের রঙ-১, ২ ◆ অদৃশ্য শত্রু ◆ পিশাচ দ্বীপ ◆ বিদেশী গুপ্তচর-১, ২ ◆ ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ ◆ গুপ্তহত্যা ◆ তিন শত্রু ◆ অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২ ◆ সতর্ক শয়তান ◆ নীল ছবি-১, ২ ◆ প্রবেশ নিষেধ-১, ২ ◆ পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ এসপিওনাজ-১, ২ ◆ লাল পাহাড় ◆ হৃৎকম্পন ◆ প্রতিহিংসা-১, ২ ◆ হংকং সম্রাট-১, ২ ◆ কুউউ! ◆ বিদায়, রানা-১, ২, ৩ ◆ প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ ◆ আক্রমণ-১, ২ ◆ গ্রাস-১, ২ ◆ স্বর্ণতরী-১, ২ ◆ পপি ◆ জিপসী-১, ২ ◆ আমিই রানা-১, ২ ◆ সেই উ সেন-১, ২ ◆ হ্যালো, সোহানা-১, ২ ◆ হাইজ্যাক-১, ২ ◆ আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩ ◆ সাগরকন্যা-১, ২ ◆ পালাবে কোথায়-১, ২ ◆ টার্গেট নাইন-১, ২ ◆ বিষ নিঃশ্বাস-১, ২ ◆ প্রেতাত্মা-১, ২ ◆ বন্দি গগল ◆ জিম্মি ◆ তুষার যাত্রা-১, ২ ◆ স্বর্ণসঙ্কট-১, ২ ◆ সন্ন্যাসিনী ◆ পাশের কামরা ◆ নিরাপদ কারাগার-১, ২ ◆ স্বর্গরাজ্য-১, ২ ◆ উদ্ধার-১, ২ ◆ হামলা-১, ২ ◆ প্রতিশোধ-১, ২ ◆ মেজর রাহাত-১, ২ ◆ লেনিনগ্রাদ-১, ২ ◆ অ্যামবুশ-১, ২ ◆ আরেক বারমুডা-১, ২ ◆ বেনামী বন্দর-১, ২ ◆ নকল রানা-১, ২ ◆ রিপোর্টার-১, ২ ◆ মরুযাত্রা-১, ২ ◆ বন্ধু ◆ সঙ্কেত-১, ২, ৩ ◆ স্পর্ধা-১, ২ ◆ চ্যালেঞ্জ ◆ শত্রুপক্ষ ◆ চারিদিকে শত্রু-১, ২ ◆ অগ্নিপুরুষ-১, ২ ◆ অন্ধকারে চিতা-১, ২ ◆ মরণকামড়-১, ২ ◆ মরণখেলা-১, ২ ◆ অপহরণ-১, ২ ◆ আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১, ২ ◆ বিপর্যয়-১, ২ ◆ শান্তিদূত-১, ২ ◆ শ্বেত সন্ত্রাস-১, ২ ◆ ছদ্মবেশী ◆ কালপ্রিট-১, ২ ◆ মৃত্যু আলিঙ্গন-১, ২ ◆ সময়সীমা মধ্যরাত ◆ আবার উ সেন-১, ২ ◆ বুমেরাং ◆ কে কেন কীভাবে ◆ মুক্ত বিহঙ্গ-১, ২ ◆ কুচক্র ◆ চাই সাম্রাজ্য-১, ২ ◆ অনুপ্রবেশ-১, ২ ◆ যাত্রা অশুভ-১, ২ ◆ জুয়াড়ী-১, ২ ◆ কালো টাকা-১, ২ ◆ কোকেন সম্রাট-১, ২ ◆ বিষকন্যা-১, ২ ◆ সত্যবাবা-১, ২ ◆ যাত্রীরা হুঁশিয়ার ◆ অপারেশন চিতা ◆ আক্রমণ '৮৯-১, ২ ◆ অশান্ত সাগর-১, ২ ◆ শ্বাপদসঙ্কুল-১, ২, ৩ ◆ দংশন-১, ২ ◆ প্রলয়সঙ্কেত-১, ২ ◆ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১, ২ ◆ তিক্ত অবকাশ-১, ২ ◆ ডাবল এজেন্ট-১, ২ ◆ আমি সোহানা-১, ২ ◆ অগ্নিশপথ-১, ২ ◆ জাপানি ফ্যানাটিক-১, ২, ৩ ◆ সাক্ষাৎ শয়তান-১, ২ ◆ গুপ্তঘাতক-১, ২ ◆ নরপিশাচ-১, ২, ৩ ◆ শত্রু বিভীষণ-১, ২ ◆ অন্ধ শিকারী-১, ২ ◆ দুই নম্বর-১, ২ ◆ কৃষ্ণপক্ষ-১, ২ ◆ কালো ছায়া-১, ২ ◆ নকল বিজ্ঞানী-১, ২ ◆ বড় ক্ষুধা-১, ২ ◆ স্বর্ণদ্বীপ-১, ২ ◆ রক্তপিপাসা-১, ২, ৩ ◆ অপচ্ছায়া-১, ২ ◆ ব্যর্থ মিশন-১, ২ ◆ নীল দংশন-১, ২ ◆ সাউদিয়া ১০৩-১, ২ ◆ কালপুরুষ-১, ২, ৩ ◆ নীল বজ্র-১, ২ ◆ মৃত্যুর প্রতিনিধি-১, ২ ◆ কালকূট-১, ২, ৩ ◆ অমানিশা-১, ২ ◆ সবাই চলে গেছে-১, ২ ◆ অনন্ত

যাত্রা-১, ২ ◆ রক্তচোষা ◆ কালো ফাইল-১, ২, ৩ ◆ মাফিয়া ◆ হীরকসম্রাট-১, ২ ◆ সাত রাজার ধন ◆ শেষ চাল-১, ২, ৩ ◆ বিগ ব্যাঙ ◆ অপারেশন বসনিয়া ◆ টার্গেট বাংলাদেশ ◆ মহাপ্রলয় ◆ যুদ্ধবাজ ◆ প্রিন্সেস হিয়া-১, ২ ◆ মৃত্যুফাঁদ ◆ শয়তানের ঘাঁটি ◆ ধ্বংসের নকশা ◆ মায়ান ট্রেজার ◆ ঝড়ের পূর্বাভাস ◆ আক্রান্ত দূতাবাস ◆ জন্মভূমি ◆ দুর্গম গিরি ◆ মরণযাত্রা ◆ মাদকচক্র ◆ শকুনের ছায়া-১, ২ ◆ তুরুপের তাস ◆ কালসাপ ◆ গুডবাই, রানা ◆ সীমা লঙ্ঘন ◆ রুদ্রঝড় ◆ কান্তার মরু ◆ কর্কটের বিষ ◆ বোস্টন জ্বলছে ◆ শয়তানের দোসর ◆ নরকের ঠিকানা ◆ অগ্নিবাণ ◆ কুহেলি রাত ◆ বিষাক্ত থাবা ◆ জন্মশত্রু ◆ মৃত্যুর হাতছানি ◆ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ সার্বিয়া চক্রান্ত ◆ দুরভিসন্ধি ◆ কিলার কোবরা ◆ মৃত্যুপথের যাত্রী ◆ পালাও, রানা! ◆ দেশপ্রেম ◆ রক্তলালসা ◆ বাঘের খাঁচা ◆ সিক্রেট এজেন্ট ◆ ভাইরাস X-99 ◆ মুক্তিপণ ◆ চীনে সঙ্কট ◆ গোপন শত্রু ◆ মোসাদ চক্রান্ত ◆ চরসদ্বীপ ◆ বিপদসীমা ◆ মৃত্যুবীজ ◆ জাতগোক্ষুর ◆ আবার ষড়যন্ত্র ◆ অন্ধ আক্রোশ ◆ অশুভ প্রহর ◆ কনকতরী ◆ স্বর্ণখনি-১, ২ ◆ অপারেশন ইজরাইল ◆ শয়তানের উপাসক ◆ হারানো মিগ ◆ ব্লাইণ্ড মিশন ◆ টপ সিক্রেট-১, ২ ◆ মহাবিপদ সঙ্কেত ◆ সবুজ সঙ্কেত ◆ অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা ◆ গহীন অরণ্য ◆ প্রজেক্ট X-15 ◆ অন্ধকারের বন্ধু ◆ আবার সোহানা ◆ আরেক গডফাদার ◆ অন্ধপ্রেম ◆ মিশন তেল আবিব ◆ ক্রাইম বস ◆ সুমেরুর ডাক-১, ২ ◆ ইশকাপনের টেক্কা ◆ কালো নকশা ◆ কালনাগিনী ◆ বেঈমান ◆ দুর্গে অন্তরীণ ◆ মরুকন্যা ◆ রেড ড্রাগন ◆ বিষচক্র ◆ শয়তানের দ্বীপ ◆ মাফিয়া ডন ◆ হারানো আটলান্টিস-১, ২ ◆ মৃত্যুবাণ ◆ কমাণ্ডো মিশন ◆ শেষ হাসি-১, ২ ◆ স্মাগলার ◆ বন্দি রানা ◆ নাটের গুরু ◆ আসছে সাইক্লোন ◆ সহযোদ্ধা ◆ গুপ্ত সঙ্কেত-১, ২ ◆ ক্রিমিনাল ◆ বেদুঈন কন্যা ◆ অরক্ষিত জলসীমা ◆ দুরন্ত ঈগল-১, ২ ◆ সর্পলতা ◆ অমানুষ ◆ অখণ্ড অবসর ◆ স্নাইপার-১, ২ ◆ ক্যাসিনো আন্দামান ◆ জলরাক্ষস ◆ মৃত্যুশীতল স্পর্শ-১, ২ ◆ স্বপ্নের ভালবাসা ◆ হ্যাকার-১, ২ ◆ খুনে মাফিয়া ◆ নিখোঁজ ◆ বুশ পাইলট ◆ অচেনা বন্দর-১, ২ ◆ ব্ল্যাকমেইলার ◆ অন্তর্ধান-১, ২ ◆ ড্রাগ লর্ড ◆ দ্বীপান্তর ◆ গুপ্ত আততায়ী-১, ২ ◆ বিপদে সোহানা ◆ চাই ঐশ্বর্য-১, ২ ◆ স্বর্ণ বিপর্যয়-১, ২ ◆ কিল-মাস্টার ◆ মৃত্যুর টিকেট ◆ কুরুক্ষেত্র-১, ২ ◆ ক্লাইম্বার ◆ আগুন নিয়ে খেলা-১, ২ ◆ মরুস্বর্গ ◆ সেই কুয়াশা-১, ২ ◆ টেরোরিস্ট ◆ সর্বনাশের দূত-১, ২ ◆ শুভ্র পিঞ্জর-১, ২ ◆ সূর্য-সৈনিক-১, ২ ◆ ট্রেজার হান্টার-১, ২ ◆ লাইমলাইট-১, ২ ◆ ডেথ ট্র্যাপ-১, ২ ◆ কিলার ভাইরাস-১, ২ ◆ টাইম বম ◆ আদিম আতঙ্ক ◆ পার্শিয়ান ট্রেজার-১, ২ ◆ বাউন্টি হান্টার্স-১, ২ ◆ মৃত্যুদ্বীপ ◆ জাপানি টাইকুন-১, ২ ◆ পাতকিনী ◆ নরকের কীট-১, ২ ◆ শার্প শুটার ◆ পাশবিক-১, ২ ◆ গুপ্তসংঘ।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

—লেখক

এক

চোখ মেলে কোথায় আছে বুঝল না লিলি ওলসেন। খুব দপ-দপ করছে মাথার তালু, অসহ্য ব্যথা। মরা কাঠের মত শুকিয়ে গেছে জিভ ও গলা। ওপরে চোখ যেতেই দেখল, ছ্যাতলা পড়া সবুজ, ফাটল ধরা নোংরা ছাত।

উহ্, এত ব্যথা কেন সারা শরীরে!

মাথা কাত করল লিলি, তারপর চাইল আরেক দিকে। ওকে রাখা হয়েছে ম্যাচবাক্সের মত ছোট একটা ঘরে। কোথাও কোনও জানালা নেই। একপাশে ধূসর রঙের ভারী, ধাতব দরজা। খাটের চার স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে চার হাত-পা। গত রাতে পছন্দের যে লাল পোশাক গায়ে পরে বেড়াতে বেরিয়েছিল, ওটা এখনও আছে। মনে করতে চাইল কী হয়েছিল, আর তখনই ভীষণ ভয়ে বিবশ হয়ে এল ওর অন্তর।

হ্যাঁ, হোটেল থেকে ওকে নিয়ে ব্যস্ত এক রেস্তোরাঁয় গিয়েছিল বুটেন। একের পর এক ড্রিঙ্ক এসেছে টেবিলে। ওয়াইন থেকে শুরু করে বাড়তে বাড়তে টাকিলা। কখন যেন ঝাপসা হয়ে গেল সব। তারপরও বেশ কয়েকটা বার ও শেষে রু সেইন্ট স্যানের নোংরা একটা নাইট ক্লাবে গেছে ওরা। খুব হাসছিল, অনেক কথা বলেছে বুটেনকে। খুব হাসি-খুশি ছিল বুটেনও। আরও অনেকের সঙ্গে বসে দু'জন মিলে দেখেছে সেক্স-শো। মনে আছে, তখন

জেগে উঠেছিল শারীরিক চাহিদা।

তারপর কী যে হলো, কিছুই মনে নেই।

ভীষণ ভয় লাগছে এখন!

এ কোথায় নিয়ে এল ওকে বুটেন?

কেন বেঁধে রাখা হয়েছে ওর হাত-পা?

কিছুক্ষণ দড়ি খুলবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল লিলি। নিথর হয়ে পড়ে রইল বিছানায়, অসহায়।

আন্দাজ একঘণ্টা পর শুনল মৃদু খুট্ আওয়াজ। ধূসর দরজার লক-এ চাবি দিয়েছে কেউ। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে খুলে গেল দরজা, বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল বুটেন। একটু ঝুঁকে দেখল লিলিকে। তার পরনে গতকালকের সেই কালো সুট, সাদা সিল্কের শার্ট ও গাঢ় নীল টাই। অবশ্য এখন পুরোপুরি কুঁচকে গেছে সুট। খুলে ফেলেছে টাই-এর গিঁঠ। সুদর্শন ও পৌরুষদীপ্ত মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।

কথা বলতে গিয়ে কর্কশ আওয়াজ বেরোল লিলির কণ্ঠ চিরে, 'আমি কোথায়, বুটেন? আমাকে বেঁধে রাখা হয়েছে কেন?'

যুবকের চোখে-মুখে হাসির সেই ছটা এখন নেই। সেখানে টিটকারির প্রবল ভাব। চোখ দিয়ে চাটছে লিলির দেহ। আঙুল বাঁকা করে বুকের কাছে লাল পোশাক ওপরে তুলল বুটেন। নিচে সাদা লেস নিকার্স। ওদিকে চেয়ে বিড়বিড় করে ফ্রেঞ্চ ভাষায় কী যেন বলল বুটেন। বেশিরভাগ শব্দ বুঝল না লিলি। মাত্র এক মাস হলো ওই ভাষা শিখছে।

'দুঃখজনক... খুবই দুঃখজনক... কিন্তু আদেশ তো আদেশই,' বাঁকা হাসল বুটেন। 'কিন্তু একটু মজা করলে ক্ষতি কী?'

লিলির ওয়েস্ট ব্যাণ্ডের নিকার্সের নিচে বামহাত ভরল বুটেন। ঊরুসন্ধির নরম অংশে সাপের মত কিলবিল করছে লোলুপ আঙুল। একইসঙ্গে রাগ, ঘৃণা ও ভীষণ কান্না এল লিলির। গায়ের

জোরে চেপে রাখতে চাইল, কিন্তু হ্যাঁচকা টানে ফাঁক করে নেয়া হলো দুই উরু। প্রবল আপত্তি নিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার ছাড়ল লিলি।

'যত খুশি চেঁচাও, সোনা, শুনবে না কেউ,' মুচকি হাসল বুটেন, পরক্ষণে মেয়েটার যৌনাঙ্গে ঢুকল তার বামহাতের মধ্যমা। ভীষণ ভয়ে ঝটকা খেল লিলি, নোংরা, সবুজ চাদর ভাসিয়ে দিল হলদে, কটুগন্ধী প্রস্রাবে।

এতে বিরক্ত হয়ে চট্ করে হাত সরিয়ে নিল বুটেন, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। পাঁচ মিনিট পর আবারও ফিরল ঘরে, হাতে ছোট, ধাতব ট্রে। ওটার ওপর সিরিঞ্জ, সামান্য তুলা ও একটা বোতল। বোতলের ভেতরে পানির মত স্বচ্ছ তরল। লিলির মাথার পাশে ট্রে নামিয়ে রেখে বসে পড়ল বুটেন। মেয়েটার পোশাকের আস্তিন গুটিয়ে তুলা ব্যবহার করে বোতল থেকে নিল তরল। ভেজা তুলা ভাল করে ডলতে লাগল ত্বকে। কাজটা শেষ করে নিল সিরিঞ্জ। 'এটা দেখো,' কর্কশ কণ্ঠে বলল সে, 'এ জিনিস তোমার বন্ধু। খুশি করে দেবে তোমাকে। খুব ভাল লাগবে তোমার। ভুলে যাবে সব ভয়, ব্যথা-বেদনা। আগামী কিছু দিন পাবে এই জিনিস।'

শিরায় সুচ ঢুকতেই ঝাঁকি খেল লিলি। গলা ফাটিয়ে কাঁদতে লাগল। জবাবে বিদ্রূপের হাসি হাসল বুটেন। মাত্র কয়েক মিনিট পর দারুণ স্ফূর্তি লাগল লিলির। কোথায় হারিয়ে গেছে মাথা-ব্যথা আর ভয়। শুনতে পেল বুটেনের কথা। মনে হলো ওই কণ্ঠ আসছে ছাতের কাছ থেকে।

'একটু পর এসে তোমার শরীর ধোলাই করবে এক মহিলা। সুপ দেবে। পরে তোমার এই বন্ধুকে নিয়ে আবারও আসব...'

পিটার লারসেনের অফিস-ঘরটা খুবই ছোট, কোনও জানালাও

নেই। জরুরি হয়ে উঠেছে নোংরা দেয়াল ও ছাত চুনকাম করা। কোপেনহেগেন পুলিশ ফোর্সের গোয়েন্দা হিসাবে কাজ করছে লারসেন, এমন দারুণ কোনও কাজ করে ফেলেনি যে খ্যাতি বা পদোন্নতি হবে। বেঁটেমত, ফর্সা এবং মোটা। পুলিশ অফিসার, কিন্তু দেখলে যে-কেউ বলবে, এ লোক ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার। অফিসে সবসময় পরে কনযার্ভেটিভ ধূসর সুট, ক্রিম শার্ট ও নীল টাই। পায়ে ঘড়িয়ালের চামড়ার কালো শু।

কাগজটা পড়া শেষ করে বড় করে শ্বাস ফেলল পিটার। আজ সকালেই মার্সেইল্‌স্ পুলিশ থেকে এসেছে এই রিপোর্ট। বুকে টের পাচ্ছে গনগনে রাগ। ফোল্ডার বন্ধ করে ওটা হাতে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল সে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে হনহন করে হাঁটতে লাগল করিডোর ধরে।

চিফ ফিলিপ অ্যাবসলনের অফিসটা বড়সড়, মেঝেতে দামি কার্পেট, জানালা দিয়ে দেখা যায় ট্রিভোলি গার্ডেনের দারুণ সবুজ দৃশ্য। পাতলা হয়ে গেছে মানুষটার ধূসর চুল, কুঠারের মত মুখ দেখে মনে হয়, এই লোক জন্ম নিয়েছেন শুধু পুলিশ হওয়ার জন্য। ঘরে পিটার লারসেন ঢুকতেই মুখ তুলে চাইলেন তিনি। এক নজরেই বুঝে গেলেন, রেগে কাঁই হয়ে আছে সহকর্মী।

‘এবার আবার কী?’ জানতে চাইলেন তিনি।

একটা কথাও না বলে চিফের সামনে ফোল্ডার রাখল পিটার। চলে গেল জানালার সামনে। দূরে চাইল।

মাত্র কয়েক দিন আগে স্পিড রিডিঙের কোর্স করেছেন চিফ ফিলিপ অ্যাবসলন। ফাইলের বক্তব্য পড়তে সময় নিলেন মাত্র চার মিনিট। চোখ তুলে বললেন, ‘তো কী?’

জানালা পিছনে রেখে চিফের দিকে ফিরল পিটার। ‘এ বছরের একাশিতম। চব্বিশজন গেছে স্পেন, উনিশজন ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা আর অন্যরা রোম থেকে। অথচ জুলাই থেকে এই তিন

মাসে সুইডিশরা হারিয়েছে তেরোজন, নরওয়েজিয়ানরা বত্রিশজন... সবাই হারিয়ে গেছে দক্ষিণ ভূমধ্যসাগরের তীরে ছুটি কাটাতে গিয়ে। একজনও ফেরেনি। ইউরোপ-আমেরিকায় তা-ও তো কম। অন্তত এক শ' গুণ বেশি কিশোরী ও তরুণী কিডন্যাপ হয়েছে আফ্রিকা ও এশিয়ায়। তাতে আমাদের আনন্দিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।' পিটারের কণ্ঠ থেকে ঝরল অসহায় রাগ।

'ইন্টারপোল কোনও তথ্য দিতে পারছে না। আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসি, ইউরোপে একই প্যাটার্ন ধরে কিডন্যাপ করা হচ্ছে স্ক্যানডিনেভিয়ান মেয়েদেরকে। হয় ছুটিতে ছিল তারা, অথবা অন্য দেশে লেখাপড়া করতে এসেছে।' আঙুল তুলে চিফের সামনের ফোল্ডার দেখাল পিটার। 'লিলি ওলসেন, উনিশ বছর, অত্যন্ত সুন্দরী তরুণী, ফ্রান্সের মার্সেইল্স্-এ পড়াশোনা করত এক নামকরা প্রাইভেট ইন্সটিটিউটে। শেষ দেখা গেছে ছোট এক হোটেল থেকে বেরোতে। রাত তখন দশটা। কালো একটা রেনোঁ গাড়িতে ওঠে। ড্রাইভিং সিটে ছিল এক যুবক। মনে হয়েছে সে ফ্রেঞ্চ। ব্যস, আর কোনও তথ্য নেই।'

চিফ অ্যাবসলন নিচু স্বরে বললেন, 'প্রত্যেকে আকর্ষণীয় এবং সুন্দরী? সুইডিশ আর নরওয়েজিয়ানরাও?'

'হ্যাঁ, প্রত্যেকে। অপ্সরার মত,' বলল পিটার। 'আপনি আমার রিপোর্ট পড়েছেন। ছবিগুলোও দেখেছেন। সংক্ষিপ্ত নোটে লিখে দিয়েছি এই অবস্থায় কী করা উচিত।'

বড় করে দম নিয়ে সামনে থেকে ফোল্ডার সরিয়ে ফেললেন চিফ অ্যাবসলন, মনে হলো এই বিষয়ে আর কিছু করবার নেই তাঁর। 'হ্যাঁ, পড়েছি,' কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, 'তুমি একটা স্পেশাল ইউনিট গড়তে চাও। তাদের কাজ হবে এসব গুপ্তসংঘের বিরুদ্ধে লড়াই করা। তোমার এই থিয়োরি...'

পিটার লারসেনের বয়স বত্রিশ বছর, রাগ সামলে রাখলে

এবং উচ্চপদস্থ অফিসারকে তেল মালিশ করলে এতদিনে অনেক উন্নতি করত পুলিশ ফোর্সে, কিন্তু তা হয়নি। কড়া বিয়ার তার প্রিয় পানীয়, সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়ে সাগরের ফেরিতে চেপে ঘুরে বেড়াতে। এই মুহূর্তে প্রায় বিস্ফোরিত হলো সে, 'আপনি বলছেন এটা একটা সাধারণ থিয়োরি?' রাগে বাঁকা হয়ে গেল তার নাক। 'চার বছর হলো মিসিং পার্সন্স ডিভিশনে কাজ করছি। সবসময় লিয়াযোঁ রেখেছি স্টকহোম আর অসলো পুলিশের সঙ্গে। এ ছাড়া যেতে হয়েছে প্যারিস, রোম ও মাদ্রিদে। আর তখন ট্র্যাভেল এক্সপেন্স হিসাবে এতই কম পয়সা দেয়া হয়েছে, কোনও চুতিয়া শালার বাপেরও সাধ্য নেই যে পেট ভরে খেতে পাবে!' চিফের ডেস্কের সামনে থেমে আরও রেগে গেল পিটার। 'আর শালার কী কপাল, আমাকেই জানাতে হচ্ছে অভিভাবকদেরকে, "সরি, আসলে আমাদের কিছুই করার নেই!"' ফোল্ডারের ওপর চড়াৎ করে হাতের তালু নামিয়ে আনল সে। 'আজ দুপুরের পর মিস্টার আর মিসেস ওলসেন এসেছিলেন আমার ইঁদুরের খাঁচার মত অফিসে। পঞ্চাশ বছর আগের ভাঙা ডেস্কের ওপাশে বসে শুনলেন: হারিয়ে গেছে তাঁদের মেয়ে, সম্ভবত আর কখনও পাওয়া যাবে না তাকে। তাঁদের মেয়ের শরীর বেচে নিজের পেট ভরাবে কোনও পতিতালয়ের দালাল।'

আবারও বড় করে দম নিলেন চিফ অ্যাবসলন, তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'পিটার, তুমি তো মূল সমস্যা জানো। পয়সা না পেলে কাজে নামতে পারব না আমরা। কোপেনহেগেনে প্রতি বছর চার শ' মেয়ে হারিয়ে যায়। কিন্তু প্রতি বছর কমিয়ে দেয়া হচ্ছে আমাদের বাজেট। তুমি যে স্পেশাল ইউনিট গড়তে চাইছ, সে জন্য চাই প্রতি বছর কমপক্ষে এক শ' মিলিয়ন ক্রোনার। কিন্তু ফিন্যান্স কমিটি চারআনা পয়সাও দেবে না। এতে অনেক বেশি খরচ, অথচ যথেষ্ট কাজ হবে না। প্রতি বছর তিন শ' বা চার শ'

তরুণী হারিয়ে গেলে তাদের কী? কাজেই ভুলে যাও বাজেট পাওয়ার কথা।'

ঘুরে দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল পিটার লারসেন, কাঁধের ওপর দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস ওলসেনকে পাঠিয়ে দেব ফিন্যান্স কমিটির সঙ্গে দেখা করতে।'

দরজার সামনে থেমে ঘুরে চাইল পিটার। 'তারা হয়তো বুঝিয়ে বলতে পারবে, কেন বাজেট দেয়া হবে না, বা কেন ডায়মণ্ড রিঙের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না পুলিশ।'

ধুপধাপ পা ফেলে চলে গেল ইন্সপেক্টর।

দুই

ভূমধ্যসাগরের ছোট্ট একটা দ্বীপ গোজো। সেপ্টেম্বরের উত্তপ্ত দুপুরে তোবড়ানো ফোর্ড গাড়ি নিয়ে পাহাড়ি এক প্রাচীন খামারবাড়ির সামনে পৌঁছে গেলেন ফাদার পিয়েত্রো অ্যাব্রাটা। অবশ্য, বেশ কয়েক বছর আগে একেবারেই বদলে ফেলা হয়েছে খামারবাড়িটা, ওটাকে এখন বলা যেতে পারে সুদৃশ্য এক বাগানবাড়ি। ওখান থেকে নিচে তাকালে চোখে পড়বে দ্বীপের নিচের অংশে পাহাড়ের ধাপে সবুজ খেত, বনাঞ্চল ও দূরে নীল সাগরের অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য। একটু দূরে আবছা, ছোট্ট দ্বীপ কোমিনো আর অনেক দূরে মস্ত দ্বীপ মাল্টা।

গাড়ি থেকে নেমে গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে পুরনো

কাঠের মজবুত দরজার বেল-হ্যাণ্ডেল নাড়লেন ফাদার অ্যাব্রাটা। আগেই জানেন, গোজো দ্বীপে নিজের বাগান-বাড়িতে ফিরে এসেছে মাসুদ রানা। এই দ্বীপে সবাই খোঁজ রাখে সবার। সবারই আছে একটা করে ডাকনাম, ওটার মাধ্যমেই প্রকাশ করা হয়, মানুষ হিসেবে সে কেমন। রানার নাম উমো বা পুরুষ। দ্বীপের অনেকে আবার ভালবেসে বলে, 'পুরুষ-সিংহ।'

পুরো একমিনিট পেরোবার পর খুলে গেল দরজার কবাট। দেখা দিল ভেজা, ক্রু-কাট চুলের এক যুবক, পরনে সুইম সুট। ভাল করেই তাকে চেনেন ফাদার অ্যাব্রাটা। এ দ্বীপের সবাই ভালবাসে ওই মানুষটাকে। মিষ্টি এক ছোট্ট মেয়েকে নিষ্ঠুরভাবে ধর্ষণ করে মেরে ফেলা হয়েছিল বলে, কী অসম্ভব ক্রোধ, জেদ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বুকে লালন করে ইতালির শক্তিশালী মাফিয়া সংগঠনের নামকরা সব নেতার জান কবজ করেছিল একা ওই বাঙালি যুবক। পানশালায় আজও উমোর কথা উঠলেই জমে ওঠে গল্প। দ্বীপে মাত্র একজনই উমো, সে মাসুদ রানা। প্রেমিকা ভায়োলা মারা যাওয়ার পরেও প্রতি বছর পা রাখে ও এই দ্বীপে। পানশালার মালিকের কাছ থেকে সবাই জেনে যায়, আবারও বাড়ি ফিরেছে পুরুষ।

'হ্যালো, রানা,' বললেন ফাদার। কম কথা বলেন। 'দুর্দান্ত গরম। ঠাণ্ডা বিয়ার দরকার।'

মাথা দুলিয়ে হাতের ইশারা করল রানা। 'আসুন, ফাদার।'

প্রথমবার এসেই এই গোজো দ্বীপের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল ও। এখানকার সমাজে ছোট-বড় ভেদ নেই, সবাই সমান। গরীব জেলে বা ভূমিহীন কৃষকও জানে, তার অধিকার ও স্বাধীনতা গোজোর সবচেয়ে ধনী লোকের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। গোজোর মানুষ হাসি-খুশি আর ফুর্তিবাজ, কাউকে ওদের পছন্দ হলেই বাড়িয়ে দেবে বন্ধুত্বের হাত। অন্যদের চেয়ে নিজেকে

কারও বড় মনে করার প্রবণতা থাকলে গোজো দ্বীপকে তার এড়িয়ে চলাই উচিত।

গোজোবাসীদের বিয়ার খাওয়ানোর এই রীতি মনে পড়ে গেল রানার। একবার পরস্পরকে বিয়ার খাওয়াতে শুরু করলে, ওরা পালা করে সবাই সবাইকে খাওয়াতে কখনও কখনও লেগে যায় দেড়-দু'দিন। বেয়াড়া কোনও প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে না কাউকে, কারও সঙ্গে ভুলেও বাধবে না ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ। গোজোবাসীদের বন্ধুত্বে কোনও কৃত্রিমতা নেই। গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে না এলে সবাই আপনজন বলে মেনে নেবে। শুধু নিজের পালা এলে চলবে না কিপটেমি। আর কেউ ডাঁট দেখালে সর্বনাশ। গর্ব করা গোজোয় মস্ত 'পাপ'। লম্পট, খুনি, ডাকাত বা পকেটমারকেও সহ্য করবে, তারা যদি নিজের পাপ স্বীকার করে ক্ষমা চায়, কিন্তু কেউ যদি কোনও ব্যাপারে ডাঁট দেখায়, এ দ্বীপে তার ঠাঁই হবে না।

লতাগাছ ও মিমোসা দিয়ে ঘেরা বাঁশের ছাউনির ভেতর বাগানে বসল রানা ও ফাদার অ্যাব্রাটা। সামান্য দূরেই নীল পানির শীতল সুইমিং পুল। যে-কারও লোভ হবে নেমে পড়তে। প্রাচীরের ওপাশে অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে সবুজ গাছে ভরা দ্বীপ ও নীল সাগর। ফাদার অ্যাব্রাটার মনে হলো, সারা জীবন এখানে বসে থাকতে পারবেন, কখনও ক্লান্ত হবেন না।

টেবিলের পাশে বেতের বাস্কেট থেকে ঠাণ্ডা দুটো বিয়ার নিল রানা, একটা ধরিয়ে দিল যাজকের হাতে। কয়েক বছর ধরেই ফাদার অ্যাব্রাটাকে চেনে। এই দ্বীপে এলে প্রয়োজন না পড়লেও একবার ওর এখান থেকে ঘুরে যান তিনি। কিছুক্ষণ গল্প করে গোটা দুয়েক বিয়ার শেষ করে বিদায় নেন। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর চোখে চিন্তার মেঘ দেখল রানা।

বিয়ারে একবার চুমুক দিয়ে শুরু করলেন ফাদার, 'ব্যাপারটা

আসলে টমের বিষয়ে।' আর কিছুই বলছেন না।

তাঁর গির্জার অনাথ আশ্রমে আরও শিশু রাখা সম্ভব নয় বলে অনুরোধ করেছিলেন, যেন ছেলেটার একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেয় রানা।

পাঁচ বছর আগে ভিটেলা রেমারিকের শাশুড়ি অনোরিয়া তাজার হাতে শিশু টমকে তুলে দিয়েছিল রানা। তখন থেকে ওর সমস্ত খরচ বহন করছে রানা ও রেমারিক মিলে। অনোরিয়া বা তাঁর স্বামী পাজেরো তাজা বার-বার আপত্তি তুলেছেন, তাঁরা যথেষ্ট সচ্ছল, টাকা পাঠাতে হবে না, কিন্তু ওরা এসব কথা কানেই তোলেনি।

'টমের বিষয়ে কী, ফাদার?' জানতে চাইল রানা।

আরেক চুমুক বিয়ার নিলেন ফাদার অ্যাব্রাটা। 'আজ তো বৃহস্পতিবার। তার মানে রামিনের সঙ্গে টম আছে মাল্টায়। কখন আসছে ওরা?'

চট্ করে হাতঘড়ি দেখল রানা। 'সাতটার ফেরিতে উঠেছে। যে-কোনও সময়ে পৌঁছে যাবে। কী হয়েছে, ফাদার?'

ম্লান হয়ে গেল ফাদারের মুখ। 'টমের সঙ্গে দেখা করতে চায় ওর মা।'

থমকে গেল রানা। 'টমের মা?'

মাথা দোলালেন ফাদার। 'হ্যাঁ, ওর মা। আসল। এড়াতে চেয়েছি, কিন্তু পরে ভাবলাম, এ হয়তো ঈশ্বরের আদেশ। ওই মেয়ে আছে এখন সেইন্ট লুকের হাসপাতালে। মারা যাচ্ছে ভয়ঙ্কর কোনও অসুখে। ফুরিয়ে এসেছে সময়। আর বড়জোর দুটো দিন। ...অবশ্য তুমি মানা করে দিলে ওকে বলে দেব, চাও না টমের সঙ্গে ওর দেখা হোক। সত্যি বলতে, আমিও চাই না টম জানুক ওর মা পতিতা ছিল।'

'তাই, ফাদার?' আরও গম্ভীর হয়ে গেল রানা।

'না, এজন্যে যদি পরে টমের মনে কোনও খারাপ ছাপ পড়ে...' চুপ হয়ে গেলেন ফাদার অ্যাব্রাটা।

'আজ পাঁচ বছর পর কেন খবর নিচ্ছে, বা টমকে দেখতে চাইছে কেন?' জানতে চাইল রানা।

কাঁধ ঝাঁকালেন ফাদার অ্যাব্রাটা। 'একটু আগে ফোন এসেছে ফাদার ফ্রেডারিকের কাছ থেকে। তিনি সেইন্ট লুক হাসপাতালের অসুস্থ ও মৃতপ্রায় রোগীদের পাপ মোচনের জন্যে স্বীকারোক্তি নেন। মেয়েটা তাঁর কাছে জানতে চেয়েছে, ওর ছেলেটা এখনও অনাথ আশ্রমে আছে কি না। আরও বলেছে, সম্ভব হলে একবার দেখতে চায় নাড়ি-ছেঁড়া ধনকে।'

'আপনি বলেছিলেন, গভীর রাতে টমকে গির্জার সিঁড়ির ধাপে ফেলে রেখে একটা গাড়িতে করে চলে যায় ওর মা,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, তাই করেছিল। মাল্টার সিস্টাররা ওকে দেখে তুলে নিয়ে আসেন। তার আগে একটা গাড়িতে এক যুবতী আর এক লোককে দেখেন তাঁরা। ...হয়তো টমের মা-র দালাল ছিল ওই লোক।'

'টমের মা মরতে বসেছে, মাত্র একবার দেখতে চায় তার সন্তানকে।' দূর নীল সাগরে চোখ রাখল রানা। চুপ করে ভাবছে। কয়েক সেকেণ্ড পর শুনল মৃদু পায়ের আওয়াজ। তারা দু'জন। একজনের পদক্ষেপ ভারী, অন্যজন হালকা।

'আপনি চাইলে ওকে নিয়ে যাব, মাসুদ ভাই,' রানার পিছনে এসে থেমে গেছে রামিন রেযা। বাগানে ঢুকে এদিকে পা বাড়িয়ে শেষ কিছু কথা শুনেছে। মা-হারা বাঙালি তরুণ সে, বাবা ছিল বাংলাদেশ আর্মির সার্জেন্ট। মারা গেছে ক্যানসারে। তার আগে ছেলেটাকে তুলে দিয়েছিল রানার হাতে। সার্জেন্ট আলতাফ রেযা বলেছিল, "স্যর, ওর বুদ্ধি আছে, যদি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর ওকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিতেন..."

কিছু দিন আগে রামিন রেযা ফিযিক্সে অনার্স পাশ করবার পর ওকে নিজ হাতে ট্রেনিং দিয়েছে রানা। আপাতত কাজ করছে সে রানা এজেন্সির এজেন্ট হিসাবে। রানার ইচ্ছে: মেজর জেনারেল রাহাত খানকে বলে ওকে সুযোগ করে দেবে বিসিআই-এ।

কিন্তু আপাতত বাংলাদেশে ফিরে চিফের সঙ্গে দেখা করা ওর পক্ষে অসম্ভব। ক'দিন আগেই আলাস্কায় সিআইএ-র এক জটিল ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেয়ায় ওকে খুন করবার হুকুম পেয়েছিল চারজন প্রথম শ্রেণীর এজেন্ট। ওরা এসেছিল রানাকে খুন করতে কিন্তু নিজেরাই মারা পড়ে রানার হাতে। সিআইএ-র রেড অ্যালার্টের কথা টের পেয়ে প্রথম সুযোগেই বেরিয়ে এসেছে ও আমেরিকা থেকে। এসপিয়োনাজ জগতে ছড়িয়ে পড়েছে কথাটা: ভয়ঙ্কর খেপে গেছে সিআইএ চিফ। আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার কিলার এজেন্টদেরকে নির্দেশ দিয়েছে— যেভাবে হোক যেখানে পাও সেখানেই শেষ করো ওই বেয়াদব লোকটাকে!

এই কারণে ইউরোপে এসেও দক্ষ কোনও ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা নিতে পারেনি রানা। বলতে গেলে প্রায় লুকিয়ে আছে গোজো দ্বীপে এসে।

'মাসুদ ভাই, আমি নিয়ে যাই টমকে?' আবারও বলল রামিন রেযা।

নীল সাগরের বুক থেকে চোখ সরিয়ে রামিন ও টমকে দেখল রানা, আস্তে করে মাথা দোলাল। 'যাও, যাওয়াই উচিত।'

তিন

'কেন... আম্মু... কেন?' ভীষণ অভিমানে বুজে গেল পাঁচ বছর বয়সী টমের কণ্ঠ, 'কেন... আমাকে তোমার কাছে নিয়ে গেলে না কেন?'

'পারিনি, আব্বু... তোমাকে দেখতাম ওই নিচু দেয়ালে বসে। এই তো, ক'দিন আগেও গেছি। প্রতি সপ্তাহের রোববার। তুমি গির্জায় যাওয়ার সময়।' অনেক কষ্টে হাসল টমের মা। হাসিটা যেন নরকঙ্কালের মুখে ঝুলে আছে।

চুপ করে আছে টম, চোখে টলটলে অশ্রু।

ওর একটু পিছনে রামিন রেযা। ভাবছে, মহিলার বয়স মাত্র তেইশ, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে তেষট্টি!

দীর্ঘদিন ভুগেছে মারাত্মক এইড্‌সে, তার সঙ্গে এসে জুটেছে ক্যানসার। কয়েক সপ্তাহ কেমো থেরাপির পর মাথায় একটা চুলও নেই। মুখের ত্বক হলদে। চোয়ালের গর্তে ঢুকে গেছে গাল।

অবাক চোখে মাকে দেখছে টম। হ্যাঁ, আগেও দেখেছে ওই মুখ। আগে খুবই সুন্দরী ছিল। হাঁটুর কাছে ঝুলত দীর্ঘ চুলের বেণী। তারপর কিছুদিন আগে কোথায় যেন চলে গেল!

'তুমি আন্টির দেয়ালে বসতে,' বলল টম, 'হ্যাঁ, প্রতি রোববার... আন্টির সঙ্গে গির্জায় যাওয়ার সময় দেখতাম। ...ভাবতাম তুমি কে। ...পিছু নিতে। ...আব্বুর চলে যেতে গির্জায়

আমরা ঢুকে গেলে।’

আবারও হাসল টমের মা। ‘হ্যাঁ, দুপুরের ফেরি ধরতে হতো।’

‘কেন, আম্মু? চলে যেতে কেন?’

চুপ করে থাকল ওর মা।

‘আমার সঙ্গে কথা বলতে না কেন?’ অভিমানে টপ-টপ করে অশ্রু নামল টমের চোখ থেকে গালে।

‘আমি যে তোকে দিয়ে দিয়েছি রে, আব্বু,’ চোখ বুজে ফেলল টমের মা। ‘আর তো ফিরিয়ে নিতে পারব না।’

‘দিলে কেন আমাকে, আম্মু?’

‘আমার কিছু করার ছিল না রে, আব্বু, কিচ্ছু করার ছিল না,’ ভেঙে গেল টমের মা-র গলা। দু’হাতে মুখ ঢেকে হু-হু করে কেঁদে ফেলল।

ঘুরে রামিনের দিকে চাইল টম, বিস্মিত। ‘আম্মু কেন কাঁদছে, রামিন ভাইয়া? আমি কি কষ্ট দিয়েছি আম্মুকে?’

‘আমার কিছুই করার ছিল না রে, সোনা আব্বু...’ ফুঁপিয়ে কাঁদছে টমের মা, বার-বার ফুলে উঠছে শীর্ণ পিঠ।

চেয়ার টেনে বেডের পাশে বসল রামিন রেযা, কোলে তুলে নিল টমকে। নিচু স্বরে বলল, ‘আপনি খুলে বলুন, কেন ছেড়ে চলে যেতে হলো টমকে।’

আধঘণ্টা পর গোজো দ্বীপে ফেরার জাহাজে উঠল রামিন রেযা ও টম তাজা। চুপ করে আছে ওরা। একটু পর ভোঁও-ভোঁও ভেঁপু বাজিয়ে জেটি ছাড়ল ফেরি।

সাগরের অসংখ্য নীল সব ঢেউ গুনছে রামিন। ভারী হয়ে আছে মন। একটা হাত ধরে রেখেছে টম। কী যেন ভাবছে ছেলেটা। হঠাৎ মুখ তুলে রামিনের দিকে চাইল। ‘ভাইয়া, আমার আব্বু ভাল না! একদম ভাল না! আমি বড় হয়ে ওকে মেরে

ফেলব! আমার আম্মুকে খুব কষ্ট দিয়েছে! দেখো, ভাইয়া, আমি ঠিকই মেরে ফেলব ওকে! কিছুতেই ছাড়ব না!'

'সত্যিই চাও তার শাস্তি হোক?' বহু দূরে চেয়ে আছে রামিন। 'তাই কি চাও, ভাইয়া?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ! ওকে মেরে ফেলো! আমার আম্মুকে এত কষ্ট দিয়েছে! আমার আম্মু ভাল! অনেক কষ্ট দিয়েছে লোকটা!'

'ঠিক আছে, তার খোঁজে বেরোব,' বুকের গভীর থেকে বলল রামিন রেযা, 'একটা পশু কমলে দুনিয়ার কোনও ক্ষতি হবে না!'

চার

ম্লান মুখে কবরের পাশে থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে দুই পতিতা, কুঁজো এক বুড়ো যাজক, তরুণ রামিন রেযা ও শিশু টম তাজা। ডেনিম শর্টস্ ও কাদা মাখা টি-শার্ট পরা দুই কবর-খোদক যুবক সাবধানে কবরে নামিয়ে দিল কফিন।

বুকে ক্রুশ আঁকল দুই পতিতা। নিচু স্বরে গুনগুন করে প্রার্থনা শুরু করলেন যাজক। রামিনের ইশারায় এক মুঠো মাটি তুলে মা-র কবরে ফেলল টম তাজা। দশ মিনিট পর যিইরার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল দুই পতিতা। গির্জায় ফিরে গেলেন বৃদ্ধ যাজক। জাহাজে করে টমকে নিয়ে গোজোর উদ্দেশে চলল রামিন রেযা।

'উচিত হবে না,' নিচু স্বরে বলল রানা।

একটু আগে পাজেরো ও অনোরিয়া তাজার বাড়িতে টমকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসেছে রামিন রেযা।

এখন বাগানে ছাউনির নিচে বসে আছে ওরা। 'কিন্তু, মাসুদ ভাই, আমি ওকে কথা দিয়েছি।'

'আবেগে ভেসে যাওয়া ঠিক কাজ নয়,' বলল রানা। 'টম যেদিন জন্ম নিল, সে রাতেই ওকে ফেলে চলে গিয়েছিল ওর মা। এটা আমার চোখে মস্ত এক অন্যায়।'

মাঝে মাঝে বড় ভাই মাসুদ রানার সঙ্গে দুষ্টুমি করলেও আজ পর্যন্ত কখনও কোনও বিষয়ে তর্ক করেনি রামিন, কিন্তু এ মুহূর্তে ঠিক করল, দরকার পড়লে অবাধ্য হবে। নরম সুরে বলল, 'তার তো কিছুই করার ছিল না, মাসুদ ভাই।'

চুপ করে আছে রানা।

'আপনি আমাকে সবসময় শিখিয়েছেন, প্রয়োজনে যেন প্রতিশোধ নিই। আপনার কাছ থেকেই শিখেছি, ন্যায় বিচার কী।'

কোনও জবাব দিল না রানা।

'কয়েক বছর আগে ড্রাগ ব্যবহার করে টমের মাকে জোর করে পতিতা বানানো হয়েছিল,' বলল রামিন, 'তখন বাধ্য হয়ে ছেলেটাকে রেখে আসতে হয়েছিল গির্জার সিঁড়িতে। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না।'

'বেশিরভাগ পতিতা ভয়ানক মিথ্যুক হয়, রামিন।' দূরের সাগরে চেয়ে আছে রানা।

'সুসি কি খুব মিথ্যুক, মাসুদ ভাই?' বলেই চুপ হয়ে গেল রামিন।

মাথা নাড়ল রানা। 'না, কখনও মিথ্যা বলে না ও। কিন্তু তুমি যা করতে চাইছ, সেটা সুসিকে বলে দেখো, সে কিন্তু এক কথায় তোমাকে মানা করে দেবে।'

'টমের বাবা ইতালিয়ান লোক। সে-ই ওর মাকে ড্রাগ অ্যাডিক্ট

করে তোলে। তারপর বিক্রি করে দেয় পতিতালয়ে।'

'টমের মা তা-ই বলেছে?'

'হ্যাঁ, মাসুদ ভাই। প্রতি রোববার আসত টমকে দেখতে। বসে থাকত তাজাদের দেয়ালে। টম গির্জায় ঢুকে গেলে তখন ফিরে যেত।' আবেগের কারণে আড়ষ্ট হয়ে গেল রামিনের কণ্ঠ, 'মানুষটার বুক ভেঙে যেত ছেলেকে কাছে না পেয়ে। কিন্তু কখনও সাহস করে কথা বলতে পারেনি।' রানার চোখে চোখ রেখেও দৃষ্টি সরিয়ে ফেলল রামিন। 'সুসির দেয়া প্রশিক্ষণের কারণে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এসে নাম করছে নতুন সব মডেল, কিন্তু আগে তো সে পতিতাই ছিল। আপনি তাকে খুব বিশ্বাসও করেন।'

'মানুষ হিসেবে একেবারেই আলাদা সুসি।'

'সুযোগ পেলে হয়তো তার মতই হয়ে উঠত টমের মা।'

'তুমি যাবেই যাবে, তা-ই না?' আবারও সাগরে চোখ রাখল রানা।

'আপনি আপত্তি না তুললে তা-ই চাই, মাসুদ ভাই। ব্রাসেলসে সুসির সঙ্গে দেখা করব। বহু বছর ধরে ওখানে আছে সে। তার কাছ থেকে দরকারী তথ্য পাব। হয়তো দেখিয়ে দেবে কোন্ পথে হাঁটতে হবে।'

'হয়তো। অথবা বলবে, বোকার মত মস্ত কোনও বিপদে গিয়ে পোড়ো না।' রানা ভাল করেই জানে, বাচ্চা কোনও ছেলের সঙ্গে কথা বলছে না ও। বেশিরভাগ মানুষের চেয়ে বুদ্ধিমান রামিন রেযা। টমের কান্না ও অনুরোধ শুনবার পর থেকেই রাগে পুড়ছে ওর অন্তর। সত্যিই টমের মা-র প্রতি ভয়ঙ্কর অন্যায় হয়ে থাকলে, প্রতিশোধ নেবে রামিন, অন্তত চেষ্টা তো করবেই। 'ঠিক আছে, রামিন,' বলল রানা, 'টমকে যখন কথা দিয়েছ, যাবেই তুমি ওই লোকের খোঁজে। আর সেক্ষেত্রে আমাকেও যেতে হবে তোমার সঙ্গে।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল রামিন। 'না, মাসুদ ভাই, আপনি এখনও সুস্থ নন। আমার সঙ্গে যেতে হবে না। আমাকে সব ধরনের ট্রেনিং দিয়েছেন। যা করার একাই করতে পারব।'

অপূর্ব নীল সাগর থেকে চোখ সরিয়ে গভীর দৃষ্টিতে রামিনকে দেখল রানা। নিচু স্বরে বলল, 'খানিকটা অপরাধ বোধ আছে আমার ভেতর। নানান দিক থেকে চল্লিশ বছরের পোক্ত লোকের মত হয়ে গেলে বটে, কিন্তু তারুণ্যের স্বাদ পেলে না। কোনও বন্ধু-বান্ধবও গড়ে উঠল না। সিরিয়াস ছেলে বলে পড়াশোনা শেষ করেই বেছে নিলে দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন সব সামরিক ট্রেনিং। তোমাকে গড়েও তুললাম দক্ষ কমাণ্ডো হিসেবে। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। আরও অনেক অভিজ্ঞতা চাই, যেগুলো তোমার নেই। তাই, তুমি যদি টমের মা-র কষ্টকর অভিজ্ঞতার জন্যে ওই লোককে খুঁজে বের করে প্রতিশোধ নিতে চাও, বাধ্য হয়েই তোমার পাশে থাকতে হবে আমাকে। ...তবে একটা কথা ঠিকই বলেছ। আগে যোগাযোগ করা উচিত ব্রাসেলসে সুসির সঙ্গে। এ ছাড়া, সাহায্যে আসবে সিম কর্নেলিস ও জ্যাকি।'

মাসুদ রানাকে নিজের বড় ভাইয়ের মত ভালবাসে রামিন রেযা। মৃদু হেসে ফেলল। 'মাসুদ ভাই, ভাবতে কেমন যেন লাগছে, আপনি হয়ে উঠবেন আমার পুরুষ আয়া!'

'চোপ্, ছেলে!' ধমক দিল রানা।

'যা করার কিন্তু আমিই করব, ঠিক আছে?'

আবারও রানার চোখ চলে গেল সাগরে। 'দেখা যাক।'

রাত আটটার সময় ব্রাসেল্স্ এয়ারপোর্টে বিমান ল্যাণ্ড করবার পনেরো মিনিট পর হ্যাণ্ড লাগেজ নিয়ে কাস্টম্স্ এরিয়া পেরিয়ে গেল মাসুদ রানা ও রামিন রেযা।

তেইশ বছরের যুবক রামিনকে দেখতে লাগছে আটাশ বছরের

রানার সমান। পুরো ছয় ফুটি হালকা-পাতলা শরীর, কুচকুচে কালো চুল, খাটো করে ছাঁটা। গম্ভীর মুখ। পরনে কালো জিন্স প্যান্ট ও বুক-খোলা খয়েরি শার্ট। তার ওপর বমার কালো লেদার জ্যাকেট। পাশে সতর্ক পায়ে হাঁটছে মাসুদ রানা। কুচকুচে কালো চুল ক্রু-কাট। নিষ্ঠুর চেহারা, কিন্তু খুব মায়াময় চোখদুটো— হতে পারে হাসি-খুশি, আবার প্রয়োজনে কঠোর। ওর পরনে গাঢ় নীল জিন্স ও হালকা রঙের অক্সফোর্ড কটন শার্ট। তার ওপর কাশ্মিরি কালো সোয়েটার ও ব্রিটিশ জ্যাকেট। যার চোখ আছে, সে বলবে উপমহাদেশীয় যুবক চাইলেই হয়ে উঠতে পারত সিনেমার নামকরা কোনও নায়ক।

ট্যাক্সির লাইনের দিকে পা বাড়িয়ে হঠাৎ করেই থমকে গেল রানা। চাপা আওয়াজ বেরোল মুখ থেকে। ঘুরেই রামিন দেখল, মাসুদ ভাইয়ের চোখে ব্যথার ছাপ। আগেও বার কয়েক এমন হয়েছে, তীক্ষ্ণ ব্যথা পেয়েছে রানা, তারপর কয়েক মিনিট পর আবারও মিলিয়ে গেছে যন্ত্রণা। প্রতিবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাইলে মৃদু হেসে কথাটা উড়িয়ে দিয়েছে রানা। শেষবার বলেছিল, বদহজম হয়েছে, আর কিছুই না।

'মাসুদ ভাই, ঠিক আছেন?' বলল রামিন। 'কোনও ব্যথা?'

'তেমন না। চলো, যাওয়া যাক।'

ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে জানাল রামিন, 'নিয়ে চলুন রু দ্য'আর্জেন্স-এ।'

ঝট্ করে ঘুরে ওকে দেখল ড্রাইভার। 'আপনি জানেন ওই জায়গা কোথায়?'

'হ্যাঁ, ওই এলাকা ধনী পতিতালয়। কিন্তু পতিতালয়ে যাচ্ছি না। আমরা যাব ফ্যাশন অ্যাণ্ড স্টাইল অভ মডেল্স্ নামের এক স্কুলে।'

গিয়ার ফেলে রওনা হয়ে গেল ড্রাইভার। কাঁধের ওপর দিয়ে

বলল, 'হতে পারে। আমি ভেবেছি বিমান থেকে নেমেই...' চুপ হয়ে গেল সে।

আড়চোখে রানাকে একবার দেখে নিয়ে আরও গম্ভীর হয়ে গেল রামিন। জানালা দিয়ে দেখছে দূরের দৃশ্য। ওর মনে পড়ল গত বছর মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে ব্রাসেলসে এসেছিল। তখনও এমনই এক ট্যাক্সি চেপে শহরে গেছে। সেই সময় ছুটিতে বেড়াতে এসেছিল ওরা, কিন্তু এবার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আধঘণ্টা পর ইসি হেডকোয়ার্টার থেকে সামান্য দূরে সাদা এক বড়সড় দোতলা বাড়ির সামনে নামল ওরা। দরজার পাশের কলিং বেল টিপল রামিন। টিং-টুং শব্দে কয়েকবার বেল বাজল ভিতরে। আর প্রায় তখনই দরজার বুকে খুলে গেল ছোট এক শাটার। ওদিকে দেখা গেল দুটো চোখ। কয়েক সেকেণ্ড পর খুলে গেল দরজা।

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার নাম টাফি। কালচে-নীল চেহারা, দেখলে মনে হবে আস্ত কঙ্কাল। ভয় লাগিয়ে দেয় বেশিরভাগ মানুষের বুকে। রানা ও রামিনকে পাশ কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল সে, রাস্তার এদিক ওদিক দেখে নিয়ে আবারও ফিরে এসে মাথা দোলাল। দামি কার্পেট মাড়িয়ে হলওয়েতে ঢুকে ওদের ব্যাগ রাখল রানা ও রামিন। একে একে হাত মেলাল টাফির সঙ্গে।

'কত দিন থাকছেন?' জানতে চাইল টাফি।

'কয়েক দিন,' জবাব দিল রামিন।

ওদের ব্যাগ তুলে নিল টাফি। 'সুসি বার-এ। আপনাদের ব্যাগ ওপরে নিয়ে গেলাম।'

দীর্ঘ করিডোর পেরিয়ে খোলা এক দরজার সামনে পৌঁছে গেল রানা ও রামিন, ঢুকে পড়ল ঘরে। অত্যন্ত বিলাসবহুল আসবাবপত্রে ভরা বিশাল ঘর। কার্পেট মেরুন রঙের, দেয়াল

ভেলভেট দিয়ে মোড়া, ছাতে ঝুলছে ক্রিস্টালের ঝাড়বাতি। এক পাশে মেহগনি কাঠের বার, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা চামড়ার দামি সব সেটি ও আর্ম-চেয়ার। আর্ম-চেয়ারে বসে আছে বেলজিয়ামের সুন্দরী চার হবু মডেল। বার-এ এক বুড়ি। পরনে গোড়ালি পর্যন্ত সোনালি গাউন। মাথাভরা কুচকুচে কালো চুল। মুখে কড়া মেকআপ। চওড়া ঠোঁটে পুরু করে মাখা লাল লিপস্টিক। দু'কানে নীল ও সাদা হীরার দুল। গলায় নেকলেস আর হাতে ব্রেসলেট, তাতে দুর্মূল্য সব হীরা। হাতের প্রতিটা আঙুলে হীরার দুটো করে আঙটি। দেখে মনে হবে, মহিলার বয়স সত্তর বা পঁচাত্তর। কিন্তু রানা ও রামিন জানে, সুসির বয়স পঁচাশি।

ওদের দু'জনকে দেখে চওড়া হলো লাল দু'ঠোঁট। হাসছে, বারের স্টুল ছেড়ে উঠে এল আঠারো বছর বয়সী তরুণীর মত চপল পায়ে। দু'দিকে মেলে দিয়েছে দু'হাত। প্রথমে রানাকে জড়িয়ে ধরল সুসি, তারপর রামিনকে। ওরা টের পেল, এখনও ব্রা ব্যবহার করে সুসি। এক ফুট দূরে রামিনকে সরিয়ে দেখল সে। হাত বোলাল ওর মুখে, তারপর ভারী ইতালীয় সুরে বলল, 'আরও সুন্দর হয়ে গেছ তুমি, ডার্লিং!'

মৃদু হাসল রানা। লজ্জা পেয়ে হাসছে রামিনও। ওদের দিকে বড় বড় চোখে দেখছে চার সুন্দরী।

'বিজ্ঞাপনী এজেন্সি থেকে কাজ দেয়া কমে গেছে?' জানতে চাইল রানা।

একটু ম্লান হলো সুসির হাসি। আস্তে করে মাথা দোলাল। 'আগের মত নেই। তোমাদের ড্রিঙ্ক দেব, রানা?'

বার স্টুলে গিয়ে বসল ওরা। রানার জন্যে ব্র্যাণ্ডি ও রামিনের জন্যে কোক দিল সুসি। ব্র্যাণ্ডির গ্লাস মুখের কাছে তুলেও একবার কেশে উঠল রানা, বামহাত চলে গেল বুকে।

চট্ করে চোখাচোখি হলো সুসি ও রামিনের।

‘কী হয়েছে, রানা?’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল সুসি।

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। যেন কিছুই হয়নি।

রামিনের দিকে চাইল সুসি।

কাঁধ ঝাঁকাল রামিন। ‘গত কয়েক দিন ধরেই এমন ব্যথা হচ্ছে মাসুদ ভাইয়ের বুকে। যতবার বলি ডাক্তারের কাছে চলুন, উনি এড়িয়ে যান। কিন্তু ক্রমেই বাড়ছে ব্যথা।’

হালকা পরিবেশ মুহূর্তে বদলে গেল, গম্ভীর হয়ে গেল সুসি। ফ্রেঞ্চ ভাষায় দ্রুত কী যেন বলতে লাগল মহিলা। বাধ্য হয়ে বার কয়েক মাথা দোলাল রানা। ওই ভাষা রামিন জানে না। কিন্তু পরিষ্কার দেখল ভীষণ রেগে গেছে সুসি। কয়েক সেকেণ্ড পর রামিনের দিকে ফিরল বুড়ি। এবার বলল ইংরেজিতে।

‘আগেও নিজের শরীর নিয়ে এভাবে অবহেলা করেছে এই গাধা ছেলেটা, যাকে তুমি বলো তোমার বড় ভাই। ওর শরীরে যতগুলো গুলি আছে, তাতে ওকে বিক্রি করে বড়লোক হয়ে যাবে সীসা-খনির মালিক। আর এতদিন বেঁচে থাকলেও এখন ওর গায়ে কয়েকটা গুলি বেকায়দা জায়গার দিকে সরে যাচ্ছে।’

রামিনকে কথাটা বলেই ব্যস্ত হয়ে উঠল সুসি গোল্ডা। একই সময়ে হয়ে উঠেছে মা, পরিচর্যাকারিণী ও ম্যানেজার। মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করল কোথায় যেন। ঝড়ের গতিতে কথা বলছে। বাধা দিতে চাইল রানা, কিন্তু হাতের ঝাপটা দিয়ে ওকে থামিয়ে দেয়া হলো। এমনভাবে রাঙানো হলো রাগী চোখ, রানা লোহার মূর্তি হলে গলে পড়ত কার্পেটে।

হতবাক হয়ে বুড়িকে দেখছে রামিন। আরও কয়েক সেকেণ্ড পর ফোন রেখে দিল সুসি। নির্দেশ দিল রামিনকে, ‘কয়েক মিনিট পর অ্যাম্বুলেন্স এসে তুলে নেবে রানাকে। আর তোমার কাজ হচ্ছে ওই ক্লিনিকে আস্ত শরীরে রানা পৌঁছাল কি না, সেটা দেখা। এ ছাড়া, দেখবে কী লাগবে ওর। যেমন পায়জামা, টুথ ব্রাশ, টুথ

পেস্ট এসব। একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে রানার জন্যে অপেক্ষা করছে এ দেশের সেরা সার্জন। মনে রানার দাগা পাওয়ার কিছুই নেই, ওখানকার নার্সরা দুনিয়ার সেরা সুন্দরীদের চেয়ে কম নয়। রানা গাধার বুকে যে শ্র্যাপনেল ধীরে ধীরে যাচ্ছে হৃৎপিণ্ডের দিকে, ওটা বের করবে ডাক্তার।' যে চোখে রানাকে দেখল সুসি, তাতে মনে হলো ক্ষুর দিয়ে চিরে দিচ্ছে বেচারার অন্তর। 'আমি ভাবতেও পারি না, বুঝতেও পারি না, ওর মত বুদ্ধিমান একটা ছেলে কেন জেনে শুনে নিজের জীবন নিয়ে এভাবে খেলা করবে।'

বিব্রত হয়ে মিনমিন করে বলল রানা, 'তুমি তো জানো, আমি হাসপাতালে যেতে...'

'ছিহ্!' ধমক দিল সুসি। 'আমি কি তোমাকে সাধারণ কোনও হাসপাতালে পাঠাচ্ছি? ওই ক্লিনিকের নার্সরা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী সেবিকা!'

রামিনের দিকে ফিরল সুসি গোল্ডা, কণ্ঠ থেকে ঝরল দায়িত্ববোধঃ 'রানাকে ওই ক্লিনিকে পৌঁছে দেবে তুমি, রামিন। ডাক্তারকে বলবে, রানার পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে মাথা পর্যন্ত যেন এক্স-রে করে। শরীর থেকে সীসা বের করতে হলে, সেই কাজ করবে সে নিজেই।'

মৃদু কেশে ফেলল রানা। আস্তে করে বলল, 'তুমি জানো তো ঠিক কী করতে হবে ডাক্তারকে?'

'সে ইউরোপের সেরা,' ধমকের সুরে বলল সুসি।

'লাখ লাখ টাকা খরচ হবে,' বিড়বিড় করল রানা।

হেসে ফেলল সুসি গোল্ডা, মাথা নাড়ল। 'পাঁচ বছর আগে ওর বউ মরেছে। তাই মন খারাপ করে আরও বেশি মনোযোগ দিয়েছে নিজের কাজে। ভুলতে পারেনি প্রিয় বউকে, কিন্তু পুরুষমানুষ, দু'চার দিন পর পর আসে আমার এক নব্য মডেলের কাছে। শুধু যে ওই মেয়ে তা-ও নয়, অন্যরাও ওকে খুব

ভালবাসে।' ইতালিয়ান স্টাইলে কাঁধ ঝাঁকাল সুসি। 'ওদেরকেও নিজের স্টাইলে ভালবাসে ডাক্তার। ওর নাম সার্জন লুকাস ডুপণ্ট।'

দক্ষ, নামকরা এবং পেশাদার সার্জন লুকাস ডুপণ্ট। দশ বছর চাকরি করেছেন ফ্রেঞ্চ আর্মিতে। রানাকে সামনে বসিয়ে জানতে চাইলেন, 'ঠিক কোথায় আপনার ব্যথা?'

'বুকে।'

চেয়ার ছেড়ে রানার পাশে পৌঁছে গেলেন তিনি, ওর শার্ট খুলে দু'হাতে টিপে দেখলেন বুক। এক মিনিট পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রামিনের দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি দুই পেগ উইস্কি খেয়ে আসুন। দেখা করবেন একঘণ্টা পর।'

রাস্তার ওদিকের ছোট এক ব্রিস্টোতে ঢুকে আধ বোতল লাল ওয়াইন নিল রামিন, মাঝে মাঝে চুমুক দিতে দিতে চোখ রাখল ক্লিনিকের ওপর। না চিনিয়ে দিলে কেউ বুঝবে না ওটা ক্লিনিক। একঘণ্টা পর আবারও ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করল ও।

'আপনার ভাই আরেকটু হলে মারা পড়তেন,' বললেন সার্জন ডুপণ্ট, 'বড়জোর এক সপ্তাহ, তারপর হার্টে পৌঁছে যেত শ্র্যাপনেল। বুঝি না হাসপাতাল বা ক্লিনিকের কথা শুনলে কেন ভয় পায় কঠিন মানুষগুলো।'

'অপারেশন করেছেন?' জানতে চাইল রামিন।

মাথা নাড়লেন সার্জন। 'না, দু'ঘণ্টা পর করব। আসুন, দেখাই কোথায় আছে শ্র্যাপনেল।'

দেয়ালে ঝুলন্ত ফ্রেমে কয়েকটা এক্স-রে ছবির সামনে চলে গেল ওরা। বাতি জ্বেলে দিলেন সার্জন। প্রথম নেগেটিভের নির্দিষ্ট জায়গায় আঙুল রাখলেন। 'এটা .৪৫ ক্যালিবারের বুলেটের চল্টা। গত কয়েক দিনে মাংসপেশির নড়াচড়ায় হৃৎপিণ্ডের খুব

কাছে সরে এসেছে। ...আর এটা আরেকটা শ্র্যাপনেল। চলে গেছে স্প্লিনের খুব কাছে। ওটাও বের করে নেব।' পরের নেগেটিভ দেখালেন। ওখানেও আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেন কালো একটা ছায়া। 'ওটা একটা স্টিলের পিন। কাঁধের হাড় মেরামত করতে ব্যবহার করে ইটালিয়ান ডাক্তাররা। ছয় মাস আগেই সরিয়ে নেয়ার কথা। ভুলে গেছেন মিস্টার রানা বা তাঁর ডাক্তার। এবার বের করে নিতে হবে ওই পিন। নইলে ঠিকমত জোড়া লাগবে না হাড়।'

'পিন না হয় পরে...'

বলতে শুরু করেছিল রামিন, কিন্তু মাথা নাড়লেন সার্জন। 'ওটার কারণে বয়সকালে ভয়ঙ্কর আরথ্রাইটিস হবে ওঁর। দেরি না করে বের করে নেয়াই উচিত।'

'সেক্ষেত্রে বার-বার অজ্ঞান না করে পরপর তিন অপারেশন করবেন,' বলল রামিন। 'কয়দিন থাকতে হবে মাসুদ ভাইকে?'

কয়েক সেকেণ্ড ভাবলেন সার্জন, তারপর বললেন, 'অন্তত দশ বা বারো দিন।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রামিন। 'ঠিক আছে।' ভাবছে, এই ক'দিনে বের করতে পারবে টমের বাবার খোঁজ। এরপর দেরি না করেই মিটিয়ে দেবে তার পাওনা।

নানান পরীক্ষার মধ্যে নাকাল হয়ে এইমাত্র ঘরে ঢুকেছে রানা, গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'রামিন, আমি ক্লিনিক থেকে বেরোবার আগে কিছুই করবে না! বুঝেছ?'

কাঁধ ঝাঁকাল রামিন। 'ঠিক আছে। তবে চুপ করে বসে থেকে লাভ নেই, তাই খবর জোগাড় করতে শুরু করব। আর এই দশ-বারো দিনে সুস্থ হয়ে উঠবেন আপনি।'

সরু হয়ে গেল রানার চোখ। কী যেন ভেবে নিয়ে বলল, 'আমি ক্লিনিক থেকে বেরোবার আগে ওই বিষয়ে কিছুই করার

দরকার নেই। তবে দেখতে পারো সুসিকে বিরক্ত করছে, কে বা কারা।'

'সুসি গোল্ডা?' জানতে চাইল রামিন।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'হ্যাঁ। ওকে বিরক্ত করছে কেউ। ভাল করেই চিনি। বিপদে আছে। কিন্তু কখনও সাহায্য চাইবে না। চারপাশে কান রাখলে বুঝতে পারবে কী হয়েছে।'

কিচেন টেবিলের ওদিক থেকে রামিনের দিকে চেয়ে হাসল সুসি গোল্ডা। 'যাক্, তা হলে ক্লিনিকে আটকা পড়েছে ব্যাটা? আগেই ওকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।' সামনে ঝুঁকে ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে বলল বুড়ি, 'বলো দেখি, এখন কী করতে চাও, রামিন ডার্লিং?'

কফির কাপে চুমুক দিল রামিন। 'আপনার পরামর্শ দরকার। আর সাহায্য।'

'বলো।'

শিশু টম তাজার বিষয়ে একেবারে প্রথম থেকেই সব খুলে বলল রামিন।

বেশিরভাগ হতভাগ্য মেয়ের জীবন কীভাবে কাটে, তা ভাল করেই জানে সুসি গোল্ডা।

আর অনিশ্চিত পতিতা-জীবনের কঠোর, রূঢ় বাস্তবতা ও অন্তরের কষ্ট নিজের অন্তর দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছে রামিন। শেষে বলেছে, কীভাবে অনুরোধ করেছে টম, যেন প্রতিশোধ নেয় ওর মায়ের মৃত্যুর। এবার সুসি গোল্ডাকে সহজ-সরল কথায় জানাল ও, কী করতে চাইছে, আর সে জন্য দরকার পরামর্শ এবং সহায়তা।

সব শুনে মাথা নিচু করে বসে রইল সুসি গোল্ডা। কী যেন ভাবছে। অনেকক্ষণ পর মুখ তুলে নিচু স্বরে বলল, 'রামিন, তুমি

যাদেরকে খুঁজছ, তারা পৃথিবীর সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও বর্বর মানুষ। বহু বছর ধরেই নারী কেনা-বেচার সঙ্গে জড়িত। পয়সাওয়ালা লোক, বাস করে সমাজের উঁচু মহলে। এরা যে শুধু বড়লোক তা-ই নয়, রাজনৈতিকভাবেও অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। পৃথিবীর প্রায় সব ক'টা দেশে জাল বিছিয়ে টাকা লুটছে।'

'আপনি ওদের কাউকে চেনেন, সুসি?'

'না, কিন্তু শুনেছি ওদের কথা। আগেও আমার সঙ্গে ব্যবসা করতে চেয়েছে, কিন্তু রাজি হইনি। আমার কাজ একদল মেয়েকে দেখিয়ে দেয়া, কীভাবে চলতে হবে ভদ্র সমাজে, বা কেমন হওয়া উচিত তাদের স্টাইল— কখনও তাদের শরীর বেচে নিজের পেট চালাই না। যেসব মেয়ে আমার স্কুলে ভর্তি হয়, তাদেরকে সব দিক থেকে আড়াল করে রাখি। কেউ কেউ হয়ে ওঠে মস্ত স্টার, আবার কেউ কেউ ঝরে পড়ে কিছুদিন মডেলিং করেই। তবে যারা হারিয়ে যায়, ততদিনে তাদের হাতে যে টাকা জমে, তাতে অনায়াসেই চালিয়ে নিতে পারে বাকি জীবন।'

'যেমন জ্যাকি রোজগার করেছে?' জানতে চাইল রামিন।

মাথা দোলাল বুড়ি। 'হ্যাঁ, যেমন জ্যাকি। এ শহরে এসেছ, দেখা করবে না সিম কর্নেলিস আর ওর বউয়ের সঙ্গে?'

মৃদু হাসল রামিন। 'নিশ্চয়ই দেখা করব। আগামীকাল রাতে। আমার সঙ্গে যাবেন?'

মাথা নাড়ল বুড়ি। 'না। এই মুহূর্তে স্কুল ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না।'

'কোনও সমস্যা?'

'ছোটখাটো সমস্যা। কিন্তু বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। যখন-তখন সমস্যা তৈরি হতে পারে।'

'আমি কোনও কাজে আসব?'

মাথা নাড়ল বৃদ্ধা। আলতো করে রামিনের চিবুকে হাত

বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার নিজেরই কত সমস্যা! যাদের খুঁজছ, তারা খুবই সাংঘাতিক লোক। স্বার্থে আঘাত লাগলে অকাতরে খুন করে মানুষ। খুবই বিত্তশালী, চতুর আর হিংস্র। খুব সাবধান থাকতে হবে তোমাকে।'

'এরা আসলে কারা, সুসি?'

'একজন বা দশজন নয়, ওরা মস্ত এক দলের সদস্য। বহু বছর আগে নেটওঅর্ক বিছিয়ে দিয়েছিল দক্ষিণ ইউরোপে। এরপর মিডল ইস্টে। আর এখন প্রায় প্রতিটি মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে তাদের জাল। ওই দলের নাম আগেও শুনেছি। ওটার নামের অর্থ কী বুঝতে পারিনি।'

'নামটা কী?'

'দ্য ডায়মণ্ড রিং।'

'মাফিয়া?'

মাথা নাড়ল সুসি। 'মাফিয়ার চেয়েও খারাপ।'

শেষ চুমুক দিয়ে কফির কাপ নামিয়ে রাখল রামিন। 'বলতে পারেন, ঠিক কোথা থেকে ওদেরকে খুঁজতে শুরু করব?'

চিন্তার ভিতর ডুবে অনেকক্ষণ পার করে দিল সুসি, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'একটু অপেক্ষা করো।'

ঘর ছেড়ে চলে গেল বৃদ্ধা, ফিরল পাঁচ মিনিট পর। হাতে সাদা একটা বিজনেস কার্ড। ওটা টেবিলের মাঝে রেখে বলল, 'আন্দাজ ছয় মাস আগে আমার এক মেয়েকে বিজ্ঞাপনের জন্য মডেল হিসাবে ভাড়া করেছিল এক লোক। প্রতিবার সেশনের জন্য দেবে বলেছিল পাঁচ শ' ডলার করে। মেয়েটার সঙ্গে যৌন মিলনের আগ্রহ প্রকাশ করে সে। মেয়েটা রাজিও হয়। কিন্তু পরে দেখল, সে একের পর এক প্রশ্ন করছে। তুমি হয়তো জানো না, কখনও কখনও তার জীবনের সব স্বপ্নের কথা বা মনের কষ্ট বলে পুরুষ।'

কার্ডে টোকা দিল সুসি। 'অবশ্য এ তা করেনি। মেয়েটার কাছে জানতে চেয়েছে, সাদা মেয়েদের ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করছে কারা। কীভাবে খোঁজ পাওয়া যাবে সেই চক্রের। লোকটা ছিল খুব ভদ্র আর বিনয়ী। বলেছিল, সে লেখক, রিসার্চ করছে বই লেখার জন্যে। একঘণ্টা পর তাকে বলেছিল মেয়েটা, আরও কিছু জানতে চাইলে তার আসা উচিত আমার কাছে। সব দ্বিধা ঝেড়ে এখানে আসে ওই লোক, বার-এ বসে কয়েক ঘণ্টা আলাপ করি। বলতে পারো বন্ধুত্ব হয়ে যায় দু'জনের মাঝে। সেই সময় তাকে জানাই দ্য ডায়মণ্ড রিঙের কথা। বিদায় নেয়ার আগে স্বীকার করেছিল, সে আসলে লেখক নয়।' কার্ডে আবারও টোকা দিল সুসি। 'এই লোকের সঙ্গে বোধহয় আলাপ করা উচিত রানা আর তোমার।'

কার্ড তুলে নিয়ে লেখায় চোখ বোলাল রামিন।

পিটার লারসেন,
সিআইডি (মিসিং পার্সন্স ব্যুরো)
কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক।

পাঁচ

দরজায় মৃদু টোকা পড়তেই মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেল, বিছানা ছেড়ে নিঃশব্দে দরজার পাশে চলে গেল রামিন, আস্তে করে খুলে দিল কবাট। সামনে দাঁড়িয়ে আছে টাফি, হাতে রুপালি ট্রে।

ওটার ওপর গ্যাঁট মেরে বসে আছে হেনেসি এক্সট্রা ব্র্যাণ্ডি ও দুটো খাটো গ্লাস।

'ভাবলাম দু'জন মিলে একটু ড্রিঙ্ক করি,' বলল টাফি। 'ঘুম থেকে তুললাম না তো?'

হাই তুলে মৃদু হেসে বলল রামিন, 'ঘুম থেকেই তুলেছ, কিন্তু দু'ঢোক গিলতে আপত্তি নেই।'

একটু অবাক হয়েছে রামিন। স্বল্পভাষী লোক টাফি, বাধ্য না হলে কথা বলে না। মোটেও সামাজিক নয়। হঠাৎ কী কারণে এত রাতে আসতে হলো তাকে?

ছোট্ট টেবিলে ট্রে রাখল টাফি। মুখোমুখি দুই চেয়ারে বসল ওরা। দুই গ্লাস প্রায় ভরে ফেলল নীলচে-কালো নরকঙ্কাল।

মনোযোগ দিয়ে ওকে দেখছে রামিন।

মাঝবয়সী লোক টাফি, এমনই চেহারা, যে-কোনও বাচ্চা আঁৎকে উঠবে ওকে দেখলে। বুড়ি মহিলারা স্বপ্নে এমনই যমদূত দেখে থাকেন। বিজ্ঞাপনী সংস্থার কোনও এজেন্ট বাড়াবাড়ি করলে তার আত্মা কাঁপিয়ে দেয় টাফি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে। দশ বছরেরও বেশি সুসি গোল্ডার হয়ে কাজ করছে। সবসময় মালকিনের বিপদে পাশে থাকে। অন্তর থেকে ভালবাসে বুড়িকে, দুনিয়ার আর কারও প্রতি টান নেই ওর।

'মিস্টার রানা কেমন আছেন?' আলাপ শুরু করল টাফি।

'ভাল,' বলল রামিন, 'ওই সার্জন সত্যিই খুব দক্ষ। মাসুদ ভাইয়ের শরীর থেকে অন্তত দশটা শ্র্যাপনেল বের করেছে।' মৃদু হাসল। 'অনেক মরফিন দেয়া হয়েছে। এখন খুব খুশি মনে শুয়ে আছেন মাসুদ ভাই। অবশ্য সীসা বের করে নেয়ায় ওজন কমে গেছে কেজি খানেক।'

'কয়দিন থাকতে হবে ওঁকে ওখানে?' জানতে চাইল টাফি।

কাঁধ ঝাঁকাল রামিন। 'ডাক্তার বলেছে পনেরো দিন। কিন্তু

আমার মনে হয়, হাঁটতে পারলেই ভেগে যাবেন মাসুদ ভাই। আন্দাজ দশ থেকে বারো দিনের মধ্যেই ঘটবে ওই ঘটনা।'

গম্ভীর মুখে মাথা দোলাল টাফি। 'তো পুরো সুস্থ হয়ে উঠতে আরও দুই সপ্তাহ। তার মানে অপেক্ষা করতে হবে।'

'কীসের অপেক্ষা?' অবাক হয়েছে রামিন।

'তুমি জানো না?'

'কী বিষয়ে?'

বিস্ময় ফুটে উঠল টাফির মুখে। কয়েক সেকেণ্ড পর জানতে চাইল, 'সুসির ডাক শুনে এখানে আসোনি তোমরা?'

মাথা নাড়ল রামিন।

দ্বিধায় ভুগে হাতের তালু দিয়ে চিবুক ডলছে টাফি। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'বেচারি মস্ত বিপদের ভেতর আছে। ভেবেছিলাম ফোন করেছে বলে মিস্টার রানা এসেছেন। আসলে সুসিকে আমিই বলেছি যোগাযোগ করতে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, ফোন করেনি ও।'

'না, তেমন কিছু শুনিনি। খুলে বলো তো কী হয়েছে।'

কিছুক্ষণ থম মেরে কী যেন ভাবল টাফি, তারপর বলল, 'বেলজিয়ামে মাফিয়া নেই, কিন্তু ওই ধরনের ভিন্ন সংগঠন আছে। তারাই ঝামেলা করছে। আমরা ওদের বলি: লে হোমিনেস দে লা নুইট। বেশ কয়েকটা দল, কিন্তু তাদের ভেতর একটা বেশ শক্তিশালী। ওটার নাম নেতার নামে: ম্যাথিস। ওই অপরাধী সংঘের কাজ ড্রাগ বিক্রি করা, পতিতালয় আর বেআইনী জুয়ার আড্ডাখানা চালানো। সুসি এসব কোনও দলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। কিছু দিন আগেও ওর মেয়েদেরকে এদের খপ্পর থেকে নিরাপদে রাখতে পেরেছে। কিন্তু...' চুপ হয়ে গেল টাফি।

'থামলে কেন?' জানতে চাইল রামিন।

আরও কালো হয়ে গেল টাফির মুখ। 'কিন্তু কিছু দিন হলো

ম্যাথিসের দলের চোখ পড়েছে সুসির মেয়েদের ওপর। ওদের রোজগারে ভাগ বসাতে চাইছে তারা। শুধু তা-ই নয়, মডেলদের স্কুল চালাবার জন্যে সুসির কাছে দাবি করেছে মোটা অঙ্কের টাকা। বলে দিয়েছে, নিয়মিত টাকা না পেলে নিরাপত্তা দিতে পারবে না তারা। আর সেক্ষেত্রে যখন-তখন হামলা হতে পারে স্কুলে। সব শুনে এককথায় তাদেরকে বলে দিয়েছে সুসি, তোমাদের দেয়া নিরাপত্তা লাগবে না আমার।'

'তারপর? তারা কী করেছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল টাফি। 'খুব চালাক লোক ওই ম্যাথিস। বোমা মারেনি স্কুলে, আগুনও দেয়নি। কিন্তু নিজের লোক রেখেছে রাস্তার দু'মাথায়। বিজ্ঞাপনী সংস্থার লোক এদিকে এলে ভয় দেখাচ্ছে। ফোনে হুমকি দিচ্ছে তাদের অফিসে, মানা করে দিচ্ছে, এই স্কুলের মডেলদেরকে কাজ দিলে মস্ত বিপদ হবে। গত ছয় মাস ধরে এ-ই চলছে। এভাবে কাজ না পেলে স্কুলই উঠে যাবে। মডেলিং শিখে কী হবে, যদি পেটে ভাত না জোটে!'

'সুসি কী ভাবছে?'

'খুব কম পয়সার কাজ পাইয়ে দিতে চেয়েছে মেয়েদেরকে, কিন্তু তাতেও বাধা দিচ্ছে ম্যাথিস দলের লোক। নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে স্কুল টিকিয়ে রেখেছে সুসি।'

চুপ হয়ে গেছে টাফি। একমিনিট পেরিয়ে গেল, কী যেন ভাবছে রামিন। কিছুক্ষণ পর বলল, 'আগেই মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত ছিল সুসির। তোমার কথা মেনে নিলেই ভাল করত।'

মাথা দোলাল টাফি। 'জানি। কিন্তু মানবে না। কারও কাছ থেকে সহায়তা নিলে মন ছোট হবে ওর।' করুণ হয়ে গেল ভয়ঙ্কর চেহারার লোকটার মুখ, নিচু স্বরে বলল, 'তোমাকে একটা কথা বুঝতে হবে, রামিন, সুসি আমার মায়ের মত। এ অবস্থায়

একটা কিছু করতে চাই। দেখতে যেমনই হই, আসলে মিস্টার রানার মত কঠোর আর শক্ত মানুষ নই আমি। ভয় দেখাতে পারি শুধু চেহারার গুণে।' কোটের বগলে টোকা দিল টাফি। 'হ্যাঁ, একটা পিস্তলও রাখি, কিন্তু ওটার চেম্বারে কখনও বুলেট থাকে না। পুলিশের সঙ্গে চুক্তিটাই এমন। তাজা বুলেট রাখতে পারব না। ছোটখাটো মস্তান এলে ভয় পাইয়ে দেয়ার জন্যে বুলেট ছাড়া পিস্তল দেখাই।' টাফি বিমর্ষ কণ্ঠে বলল, 'ম্যাথিস বা তার দলের কারও সঙ্গে লড়ে জিততে পারব না। তাই ভাবছি, মিস্টার রানা সুস্থ হয়ে ওঠার পর... যদি ততদিন স্কুল থাকে... উনি হয়তো কোনও ব্যবস্থা করতে পারবেন।'

'মাসুদ ভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না,' বলল রামিন। 'আমিই মিষ্টি ক'টা কথা বলব ম্যাথিসের কানে কানে। আশা করি তাতেই কাজ হবে।'

বিস্মিত চোখে রামিনকে দেখল টাফি। বিড়বিড় করে বলল, 'আমার মনে হয়, তোমার উচিত মিস্টার রানার জন্যে অপেক্ষা করা।'

মাথা নাড়ল রামিন। 'যা দরকার আমিই করতে পারব।'

বাঙালি তরুণের চোখে কী যেন খুঁজছে টাফি। শীতল দৃষ্টি অনেক কিছুই বলে দিল ওকে। 'তুমি চাইলে তোমার পিছন দিকে চোখ রাখব। মরুক শালার পুলিশ, জোগাড় করে নেব তাজা বুলেট।'

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল রামিন। 'আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছ বলে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু তোমার কাজ আসলে এখানে। পাহারা দিয়ে রাখো সুসিকে। আরেকটা কথা, দেরি না করে পিস্তলের জন্যে জোগাড় করো আসল বুলেট।'

'তোমার পিঠ বাঁচাবে কে?'

হাসিটা চওড়া হলো রামিনের। 'ওটা করবে সিম কর্নেলিস।

আগামীকাল রাতে তার রেস্টুরেন্টে ডিনার সারব। এই শহর ভাল করেই চেনে, জানা থাকার কথা ম্যাথিসের ব্যাপারে।'

টাফির মুখে এক ফালি হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। 'হ্যাঁ, ঝামেলা পেলে খুশি হবে সিম। অনেক দিন অ্যাকশনে নেই... আচ্ছা, সুসিকে কিছু বলবে না তো তুমি?'

'না, নিজেই বুঝে নেবে।'

মুচকি হাসল টাফি। 'নইলে বাকি জীবন সুসি জানতে চাইবে তোমার কাছে কথাটা লাগিয়েছে কে!'

'আমি স্বীকার করব না কিছুই।'

ছয়

সিম কর্নেলিসের স্ত্রী জ্যাকিউলিনের রান্না দারুণ। রাতের খাবার শেষ করে খুশি মনে বাড়িতে তৈরি আধ বোতল রেড ওয়াইন সাবড়ে দিল রামিন রেযা। আলাপের মাঝে কয়েকবার ফোন এল সিম কর্নেলিসের কাছে।

অনেক রাত, হালকা হয়ে গেছে খদ্দেরদের ভিড়। আছে মাত্র পরিচিত দু'একজন কাস্টোমার।

পুরনো, লেবেল ছাড়া এক কনিয়্যাকের বোতল ও দুটো খাটো গ্লাস নিয়ে এসে রামিনের টেবিলে রাখল সিম কর্নেলিস। মুখোমুখি চেয়ারে বসে বলল, 'আর্থার ম্যাথিস মাঝবয়েসী লোক। গত কয়েক বছরে বেলজিয়ামের আণ্ডারওঅর্ল্ডের অন্য সব দলের

শীর্ষে উঠে এসেছে তার দল। গায়ের জোর ও কূট বুদ্ধির অভাব নেই তার। বেপরোয়া সাহস এবং নিষ্ঠুরতার কারণে তাকে এখন ভয় পায় সবাই। সে একজন গে। ব্রাসেলসের গে সমাজে জনপ্রিয় তার কয়েকটা নাইট ক্লাব। শহরের বাইরের দিকে বড়লোকদের পশ এলাকায় বিশাল বাড়ি। ওটা পাহারা দেয়া হয় খুব সতর্কভাবে। কোথাও যেতে হলে সবসময় সশস্ত্র গার্ড সঙ্গে রাখে লোকটা।'

এসব তথ্য দেয়ার পর সিম কর্নেলিস বলল, রামিনের উচিত অপেক্ষা করা। রানা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ক্লিনিক থেকে বেরোবার পর ভেবেচিন্তে কাজে নামতে পারবে ওরা।

কর্নেলিসের কথা শুনবার পর মাথা নাড়ল রামিন। 'আপনি তো জানেন, মাসুদ ভাই খুব পছন্দ করে সুসিকে। সামান্য এক দালাল ওকে হুমকি দিচ্ছে শুনলে তিনি এত রেগে যাবেন যে মেরেই ফেলবেন লোকটাকে। তাতে দেখা দিতে পারে জটিলতা। তাই ঠিক করেছি, তাকে একটু ভয় দেখিয়ে দেব। আর এসব বিষয়ে কিছুই জানার দরকার নেই মাসুদ ভাইয়ের।'

তরুণ রামিনের চোখে চোখ রেখে বলল কর্নেলিস, 'তুমি কিন্তু বেশ বিরক্তিকর মানুষ, রামিন। আসলে চাইছ রানা ক্লিনিক থেকে বেরোবার আগেই সুসির সমস্যা দূর করতে। নিজেকে ভাবছ তরুণ এক মস্তান হিসেবে।'

কড়া কথা বলতে হাঁ করল রামিন, কিন্তু হাত তুলে ওকে বাধা দিল কর্নেলিস, 'ঠিক আছে। তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। আসলে সরে আসতে চাইছ রানার ছায়ার আড়াল থেকে। তাতে আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আমার ধারণা, নিজ দেখভাল ভালই বুঝবে তুমি।'

'অন্য কেউ চাইলেও মাসুদ ভাইয়ের ছায়া থেকে কখনও সরে যেতে চাইব না আমি,' বলল রামিন। কয়েক মুহূর্ত পর বলল,

‘বলতে পারেন ম্যাথিস আজ রাতে কোথায় থাকবে?’

‘বেশিরভাগ সময় হাজির থাকে তার এক নাইট ক্লাবে। ওটার নাম ব্ল্যাক প্যান্থার। রু লেফিট-এ ওই ক্লাব। ওখানে যায় তরুণ সঙ্গী জোগাড় করতে।’

‘তার মানে, আমাকে গে হয়ে যেতে হবে ওখানে।’ হাসল রামিন।

‘তোমার সঙ্গে আসব?’ জানতে চাইল কর্নেলিস।

মাথা নাড়ল রামিন। ‘না। লোকটা সতর্ক হয়ে যেতে পারে।’

‘কখন যেতে চাও ওখানে?’

‘এখান থেকে বেরিয়ে সুসির স্কুলে গিয়ে পোশাক পাল্টে নিয়ে সোজা ওই নাইট ক্লাবে যাব।’

‘গুড হান্টিং,’ বলল কর্নেলিস। ‘আমার পরিচিত ক’জন চোখ রাখবে তোমার ওপর। মস্ত কোনও বিপদ হলে সাহায্য করবে।’

বিপজ্জনক জায়গা ব্ল্যাক প্যান্থার নাইট ক্লাব। ভেতরের অংশে জায়গায় জায়গায় স্পট লাইট, আবার কোথাও প্রায় ঘুটঘুটে আঁধার। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ক্রোম ও কালো চামড়ার সেটি। সদর দরজার দুই বাউন্সার গে এবং নীচ মনের লোক। নাইট ক্লাবে ঢুকবার জন্য এক শ’ পঞ্চাশ ফ্র্যাঙ্ক দিতে হলো রামিনকে। সোজা গিয়ে দাঁড়াল বার-এ। কর্নেলিসের রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে একঘণ্টা পেরোবার আগেই সোজা চলে এসেছে এখানে। পরনে ছেঁড়া ও জীর্ণ ডেনিম জিন্সের প্যান্ট। কোমরে ধাতুর বল্টু ভরা বেল্ট। গায়ে সবুজ জলপাই রঙের সিল্কের শার্ট। বাম কানে সোনার দুল।

বারটেণ্ডারের কাছে চকলেট ব্র্যাণ্ডির অর্ডার দিল রামিন, চোখ সরিয়ে দেখল মস্ত ঘরের চারপাশে। সব মিলে ষাটজনের মত লোক ঘরে। বয়স পঞ্চাশ থেকে নামতে নামতে সতেরো পর্যন্ত।

একটা মেয়েও নেই। বারটেণ্ডারের চুল কমলা, এলিয়ে পড়েছে কাঁধে।

দুই লোক সঙ্গে নিয়ে কোনার এক টেবিলে বসে আছে আর্থার ম্যাথিস। কর্নেলিসের বর্ণনা থেকে তাকে চিনতে দেরি হয়নি রামিনের। মাঝবয়সী, রোদে পোড়া মুখ, যথেষ্ট হ্যাণ্ডসাম। পরনে বিজনেস সুট। চোখে চোখ রেখে হাসল রামিন, তারপর ঘুরে বসল বারটেণ্ডারের দিকে। বলল, 'আজ পরিবেশটা চমৎকার।'

তৃতীয় চকলেট ব্র্যাণ্ডি নেয়ার পর বারটেণ্ডারকে ড্রিঙ্কের জন্য টাকা বুঝিয়ে দিতে চাইল রামিন, কিন্তু হাত তুলে মানা করল বারটেণ্ডার। চোখ টিপল ওকে। 'এটা বসের তরফ থেকে।' হাত তুলে দেখিয়ে দিল ওদিকের টেবিল।

পাঁচ মিনিট পর অলস ভঙ্গিতে রামিনের পাশের স্টুলে চেপে বসল আর্থার ম্যাথিস। লোভ নিয়ে সুঠামদেহী তরুণের চোখে চেয়ে হাসল। খুব নরম সুরে বলল, 'আগে কখনও তোমাকে এই ক্লাবে দেখিনি।'

'আসিনি আগে কখনও,' হেরোইনের মত নেশা ভরা কণ্ঠে বলল রামিন।

একঘণ্টা পর ক্লাব থেকে বেরিয়ে তেষট্টি হাজার ডলারের ৪.৭১ লিটার ইঞ্জিনের মার্সিডিজ-বেন্য্ জিএল-ক্লাস গাড়িতে চেপে বসল ওরা। ম্যাথিসের অর্ডার করা গাড়িতে রয়েছে মিনি-বার, স্যাটালাইট ফোন এবং মিনি-টিভি। পিছনের সিটে বসল ম্যাথিস ও রামিন। ড্রাইভার হিসেবে কাজ করছে গ্যাংস্টারের এক বডিগার্ড। অন্যজন চুপ করে বসে আছে সামনে। মিনি-বারের ছোট্ট ফ্রিয থেকে এক বোতল ভিউভ ক্লিকোত বের করে কর্ক খুলল ম্যাথিস, সোনালি তরল ঢালল দুই গ্লাসে। মদ হাতে পরস্পরকে টোস্ট করল ওরা। বামহাতে রামিনের গোপনাঙ্গ স্পর্শ করে দেখল লোকটা।

খুশির হাসি হাসল রামিন। 'সময় লাগে সাড়া দিতে। কিন্তু যখন জেগে ওঠে, তখন আর সহজে ঘুমায় না।'

সন্তুষ্ট হয়ে মুচকি হাসল ম্যাথিস। প্রায় হামলে পড়ল রামিনের ওপর। জিভ ঢুকিয়ে দিতে চাইল ওর মুখে।

মুখ সরিয়ে নিল রামিন। চাপা স্বরে বলল, 'অত অধৈর্য হলে চলে?' একটু সরে বসল। 'সারারাতই তো মজা করব আমরা।'

মস্ত ওই বাড়িতে অপেক্ষা করছিল আরও দু'জন বডিগার্ড। সদর গেটে একজন, অন্যজন বাড়ির ভেতরে। তাদেরকে পেরোবার পর চওড়া সিঁড়ি বেয়ে সোজা ওপরতলার দিকে চলল আর্থার ম্যাথিস ও রামিন রেযা, হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস। ম্যাথিসের অন্য হাতে আধ বোতল শ্যাম্পেন।

বড়সড় বেডরুমে মস্ত বিছানা, ওপরে সিল্কের চাঁদোয়া। বদ তরুণ হিসেবে প্রথমেই পয়সা চেয়ে বসল রামিন। 'আগে টাকা ছাড়ো।'

হাসতে হাসতে ওয়ালেট বের করল আর্থার ম্যাথিস, গুনে বের করল এক হাজার ফ্র্যাঙ্ক।

টাকা বুঝে নিয়ে জিন্সের প্যান্টের পকেটে রেখে দিল রামিন। ততক্ষণে গায়ের পোশাক খুলতে লাগল ম্যাথিস। কাজটা শেষ হতেই মুখ নিয়ে গেল রামিনের মুখের খুব কাছে। আর তখনই নড়ে উঠল রানার সাগরেদ। ওর ডানহাতের কনুই ঝটকা খেয়ে খোঁচা দিল গ্যাংস্টারের পাঁজরের নির্দিষ্ট অংশে। প্রচণ্ড ব্যথা পেয়ে দু'ভাঁজ হয়ে নরম কার্পেটে হাঁটু গাড়ল ম্যাথিস। পরমুহূর্তে তার মুখের ওপর ঠাস্ করে লাগল রামিনের ডান হাঁটুর জোরালো গুঁতো। ভচ্ করে চ্যাপ্টা হয়ে গেল লোকটার নাক। সেইসঙ্গে হারিয়ে বসেছে সামনের পাঁচটা দাঁত— তিনটে উপরের, দুটো নিচের।

পাঁচ মিনিট পর জ্ঞান ফিরল আর্থার ম্যাথিসের। টের পেল,

মস্ত বিছানার মাঝে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় শুয়ে আছে সে। তীব্র ব্যথায় পাগল হওয়ার দশা। চোখ তুলে চাইল রামিনের চোখে। ওই কালো দু'চোখ অত্যন্ত শীতল। সেক্স করবার কোনও আগ্রহ নেই, যেন খুব বিরক্ত। কোনও চাচার সঙ্গে কথা বলছে তরুণ, এমন ভঙ্গিতে নিচু স্বরে বলে উঠল। কিন্তু সেই কণ্ঠে আছে ভীষণ বিপদ ও মারাত্মক ভয় লাগিয়ে দেয়া কী যেন।

'তুমি কোনও ধর্ম বিশ্বাস করো?' জানতে চাইল রামিন।

চেষ্টা করেও কথা বলতে পারল না আর্থার ম্যাথিস। সারা মুখে তীব্র ব্যথা। ভয়ে শিউরে উঠল শরীর।

'জানতে চাইছি, কারণ এত কাল যা করেছ, সে জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নাও। আর বেশিক্ষণ সময় পাবে না।'

বড় করে দম নিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার ছাড়তে চাইল ম্যাথিস। কিন্তু মুখ থেকে কোনও আওয়াজ বেরোল না। তার আগেই মুখে নেমে এসেছে রামিনের ডানহাতি ঘুষি। ঝরঝর করে ঝরে পড়ল ম্যাথিসের আরও তিনটে দাঁত। অকল্পনীয় ব্যথায় উন্মাদ হয়ে গেল সে। কিন্তু চিৎকার করবার উপায় নেই। চেপে ধরা হয়েছে মুখ। চোখ পড়ল শীতল দুই কালো চোখের মণিতে। আবারও শুনল যমের কণ্ঠ: 'ম্যাথিস, বডিগার্ডদের কথা ভুলে যাও। ওরা উঠে আসার আগেই খুন হয়ে যাবে। ভাবতে পছন্দ করো খুবই কঠিন লোক তুমি, কিন্তু আসলে দেখোনি দুনিয়ার কিছুই। প্যারাম্বুলেটারের বাচ্চার মতই তোমাকে তুলে এনেছি এখানে। যখন-তখন মেরে ফেলতে পারি। কিন্তু ঠিক করেছি, আপাতত বাঁচতে দেব। তবে এখন থেকে একটা কথা সবসময় মনে রাখবে, ওই মহিলার নাম সুসি গোল্ডা। তাকে হুমকি দিয়েছ তুমি। আমি তোমাকে সামান্য ভয় দেখালাম, এর বেশি কিছুই না। তোমার কপাল ভাল, খুবই ভাল। সুসি গোল্ডার আরেক বন্ধু আছে, সে তোমার কথা শুনলে এমনই খেপে যাবে, মরে যাওয়ার

জন্যে হাতে-পায়ে ধরবে তুমি। আমি নরম মনের মানুষ, কিছুই বলছি না বা করছি না। শুধু বুঝিয়ে দিচ্ছি, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই সোজা যাবে রু দ্য'আর্জেন্সে, হাত জোড় করে মাফ চাইবে সুসি গোল্ডার কাছে। আর তা না হলে, আবারও আসব আমি। সেই সময় কিন্তু এত দয়া করব না।'

সামনে বেড়ে বেলজিয়ানের মুখে বামহাত রাখল রামিন, ওর ডানহাত সাঁই করে নামল ম্যাথিসের ডান কনুইয়ের ওপর। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে হাড় ভাঙার বিশ্রী মড়-মড়াৎ আওয়াজ শুনল ম্যাথিস।

দু'দিন পর সন্ধ্যায় বেজে উঠল সুসি গোল্ডার ফ্যাশন অ্যাণ্ড স্টাইল অভ মডেল্স্ স্কুলের সদর দরজার কলিং বেল।

বার থেকে বেরিয়ে করিডোর পেরিয়ে দরজার পিপহোল-এ চোখ রেখে চমকে গেল টাফি। ওই লোক স্বয়ং আর্থার ম্যাথিস! কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে জ্যাকেট। ডানহাত পুরো সাদা প্লাস্টার করা।

সামান্য দ্বিধা নিয়ে দরজা খুলল টাফি।

দুর্বল, জড়ানো কণ্ঠে বলল গ্যাংস্টার, 'আমি মাদাম গোল্ডার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'অপেক্ষা করুন।'

ইলশে-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। তার ভেতর দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল লোকটা। আবারও বার-এ ফিরে সুসিকে বলল টাফি, 'বাইরে আর্থার ম্যাথিস। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

রাগের ছাপ পড়ল সুসির মুখে। তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'ওকে বলে দাও, ওর কোনও কথা শুনব না। আজ নয়, কাল নয়, বাকি জীবনের কোনদিন না।'

টাফির ভয়ঙ্কর মুখে মিষ্টি হাসি ফুটল।

'আপনাকে কিছু বলতে হবে না, ম্যাম। আমার মনে হয় লোকটা মাফ চাইতে এসেছে আপনার কাছে।'

সাত

পিটার লারসেন দক্ষ পুলিশম্যান। দুনিয়ার বিষয়ে রয়েছে সহজাত ধারণা। কেউ পিছু নিলেই বুঝতে পারে, কোথাও কোনও সমস্যা আছে। টের পেল, এখনও অনুসরণ করা হচ্ছে ওকে।

ঘাড় শিরশির করছে পিটারের। লাঞ্চ বক্স হাতে পার্কের এক বেঞ্চে বসে পড়ল সে। উজ্জ্বল রোদ চারপাশে। বক্স থেকে সালামি স্যাণ্ডউইচ বের করে কামড় বসাল পিটার, আর তখনই পাশ থেকে বলে উঠল এক তরুণ: 'আমাকে একটু সময় দিতে পারবেন?'

'কে তুমি?' জানতে চাইল পিটার।

'আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই দ্য ডায়মণ্ড রিঙের বিষয়ে।'

কোপেনহেগেনের ভেসটারব্রো ডিসট্রিক্টে রামিনকে নিয়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকতে গিয়ে লজ্জিত হয়ে বলল পিটার লারসেন, 'আমার বাড়িটা কিন্তু খুব ছোট। আসলে ডেনিশ পুলিশ থেকে খুব বেশি বেতন দেয়া হয় না কাউকে।'

সত্যি ছোট অ্যাপার্টমেন্ট, কিন্তু উষ্ণ। সাজানো গোছানো। আরামদায়ক। সাধারণ যে-কোনও লোক পছন্দ করবে। পিটারের

স্ত্রী মারগিটের সঙ্গে হাত মেলাল রামিন। মহিলা হালকা-পাতলা, সুন্দরী, বয়স আটাশ কি ত্রিশ। পিটার ও মারগিটের ছয় বছরের মেয়ে মিশেলের সঙ্গে খুব গম্ভীর মুখে করমর্দন করল রামিন।

সত্যিই খুব খুদে অ্যাপার্টমেন্ট, কিন্তু ডিনার যেটা দেয়া হলো টেবিলে, ওটা রাজকীয়। প্রথমে এল ধোঁয়া দিয়ে টোস্ট করা স্যামন। তার ওপর ভাজি করা ডিম, অ্যাসপারাগাস ও ক্রেস। এর পর এল প্রধান কোর্স— দুনিয়ার সেরা স্টেকের মত করে রাঁধা গরুর মাংস, নানান সবজি ও ভাজা আলু। প্রতিটি পদ দক্ষ হাতে তৈরি। সব শেষে এল মারগিটের সুস্বাদু হেযেলনাট ও চকলেট দেয়া শেরি মাউসে।

ব্রাসেল্স্ ত্যাগ করে এখানে আসবার সময় রামিনের পেটে তেমন কোনও খাবার পড়েনি, নীরবে গোগ্রাসে গিলল ও তৃপ্তির সঙ্গে। চুপচাপ শুনল পরিবারের সাধারণ সব আলাপ। বসের বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল পিটার। মারগিট স্কুল টিচার, তার নালিশ— ঠিকভাবে পড়াশোনা করছে না ছাত্র-ছাত্রীরা। মিশেল নালিশ করল, অনেক বেশি বাড়ির কাজ চাপিয়ে দিয়েছেন ওর টিচাররা। ওদের আলাপের মাঝে থাকল হাসি ও ঠাট্টা। রামিন বুঝে গেল, ছোট্ট এই পরিবারের মানুষগুলো সত্যিই সুখী।

খাবারের পালা শেষ হওয়ার পর নিজ ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল মিশেল। টেবিল পরিষ্কারের কাজে নেমে পড়ল মারগিট। নোংরা প্লেট নিয়ে রাখল কিচেনে। নতুন করে আবারও দ্য ডায়মণ্ড রিঙের বিষয়ে আলাপ শুরু করল পিটার ও রামিন। দু'জনই একমত হলো, ওই দলের বড় নেতারা থাকে মার্সেইল্স্, মিলান বা নেপলসে। তবে, ভুল না হয়ে থাকলে, এই তিন শহরের ভেতর মার্সেইল্স্কে নিজেদের রাজধানী হিসেবে বেছে নিয়েছে এরা।

'ওখান থেকেই কাজ শুরু করব,' বলল রামিন। 'রওনা হয়ে যাব আগামীকাল। ওখানে আপনার কোনও কণ্ট্যাক্ট আছে?'

মাথা দোলাল লারসেন। 'আছে। আমার কাউন্টারপার্ট। নাম অ্যালেকযেন্দ্রে ব্যারারে।'

এতক্ষণ কিচেনে কাজ করছিল মারগিট, এবার এসে বসল ওদের পাশের সোফায়। চুপ করে রামিনের বক্তব্য শুনল স্বামী-স্ত্রী। কথা বলতে বলতে এদের সামনে সহজ হয়ে গেল রামিন।

ও বলল, কীভাবে এইডস ও ক্যানসারে মারা গেছে টমের মা। আর কেন শিশু টমের হয়ে ওর বাবাকে খুঁজছে ও। আগ্রহী হয়ে শুনল স্বামী-স্ত্রী।

ওর কথা শেষ হলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নরম সুরে বলল মারগিট, 'বুঝতে পারছি কেমন লাগে বাচ্চা ছেলেটার।'

মাথা দোলাল পিটার। 'তার মানে, এই কারণেই দ্য ডায়মণ্ড রিংকে খুঁজে বের করতে চাইছ, রামিন। কিন্তু টমের মা-র পতিতা হয়ে যাওয়ার বিষয়টি পাঁচ বা ছয় বছর আগের কথা। আরেকটা ব্যাপার, টমের বাবা হয়তো অন্য কোনও দলের লোকও হতে পারে।'

'তাতে আমার সমস্যা নেই,' বলল রামিন। 'এরা একই নোংরা কর্দমাক্ত ডোবার কীট। আমি চাই এদের সবার শাস্তি হোক। একটার লেজ চেপে ধরতে পারলে পৌঁছে যাব গোড়ায়।'

কফি আনতে কিচেনে গিয়ে ঢুকল মারগিট। খুব নিচু স্বরে রামিনকে বলল পিটার, 'ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক লোক এরা। দয়া বলতে কিছুই নেই। তোমাকে খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে, রামিন। অভিজ্ঞতাও কম। তুমি তো বলেছিলে মাসুদ রানা নামের এক লোকের কথা। সে কি তোমাকে সাহায্য করবে না?'

'নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু আপাতত আছেন একটা ক্লিনিকে। শরীরের তিন জায়গায় সেলাই। অন্তত এক সপ্তাহ লাগবে উঠে দাঁড়াতে। এই সময়ে ঠিক করে নেব কী করব। পরে যোগ দেবেন তিনি।'

'তোমার কপাল ভাল হোক,' বলল লারসেন, 'তবে মনে রাখতে হবে, তুমি বয়সে তরুণ, লড়তে চাইছ ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর একদল পিশাচের বিরুদ্ধে।'

লারসেনের মুখোমুখি সোফায় চুপ করে বসে আছে রামিন। চোখদুটো শীতল। কয়েক মুহূর্ত পর জানতে চাইল, 'আপনি কি পুলিশের ট্রেনিং নিয়েছেন? ধরুন স্মল আর্মস্, আনআর্মড্ কমব্যাট ইত্যাদি?'

'অবশ্যই। দুটোতেই ভাল ছিলাম, এখনও খারাপ বলা যাবে না।' মোটা পেটে হাত বুলিয়ে হাসল লারসেন। 'আজকাল অবশ্য তেমন ফিট নই আর।'

কিচেন থেকে কফি আনতে গিয়ে থমকে গেছে মারগিট, আরেকটু হলে ছলকে পড়ত কাপের কফি। শুনতে পেয়েছে রামিনের কথা: 'জানতে চেয়েছেন বিপদে পড়ে দিশেহারা হব কি না। বেশি কিছু বলব না, যদি চাই, মাত্র তিন সেকেণ্ডে খুন হবেন আপনি। আপনার মত সম্পূর্ণ ওয়েল ট্রেইণ্ড তিনজন লোক টেবিলে বসে থাকলেও তাদেরকে শেষ করতে লাগবে আমার দশ সেকেণ্ড।'

খুব নিচু স্বরে বলল পিটার, 'তোমার কাছে পিস্তল আছে?'

'না।'

'ছোরা?'

'না।'

'কোনও অস্ত্র নেই?'

কথা না বলে দু'হাত তুলে দেখাল রামিন। নীরব হয়ে গেছে অ্যাপার্টমেন্ট। কয়েক সেকেণ্ড পর জানতে চাইল পিটার, 'আগে কখনও কাউকে খুন করেছ?'

রামিনের মনে পড়ল, বেশ কিছু দিন আগে গুয়াতেমালার দুর্গম এক এলাকায় ট্রাকে বোমা ফিট করে উড়িয়ে দিয়েছিল প্রায়

এক শ'জন নিষ্ঠুর মার্সেনারিকে। 'খুন করে থাকলেও মনে নেই,' মৃদু হাসল ও। কেটে গেল ঘরের জমাট উত্তেজনা।

ট্রে হাতে এসে টেবিলে কফির কাপ নামিয়ে রাখল মারগিট। রামিন ও পিটারকে কাপ দিয়ে নিজেরটা নিয়ে ফিরল কিচেনে। কাঁধের ওপর দিয়ে বলল, 'আলাপ করো তোমরা, আমার কাজ আছে। বেশ কিছু টেস্ট পেপার পড়তে হবে।'

পিছনে কিচেনের দরজা বন্ধ করে দিল মারগিট।

'রামিন, তোমার সঙ্গে যেতে পারলে খুশি হতাম,' বলল পিটার। 'অফিসে বসে একের পর এক রিপোর্ট পড়তে পড়তে বিরক্ত হয়ে গেছি। কিছুই করার নেই। প্রতিদিন আসছে মেয়েদের নতুন সব ছবি আর নাম। রাতে ঘুমাতে পারি না। হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের বাবা-মা-র সঙ্গে আমাকেই কথা বলতে হয়। দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ কাজ ওটা। ওরা জানতে চায়, এই অবস্থায় কী করবে। কিন্তু বাস্তব-সম্মত কোনও জবাব দিতে পারি না। এর চেয়ে ভাল হতো ওদেরকে বলতে পারলে: আপনাদের মেয়ে মারা গেছে। সেক্ষেত্রে অন্তত তারা বুঝত, এরপর কী করতে হবে। রামিন, যদি পারতাম তোমার সঙ্গে যেতে!'

'চলুন না, অসুবিধে কীসের?' বলল রামিন।

তিক্ত হাসল পিটার। 'তাই যদি পারতাম! কিন্তু আমাদের বাজেট খুব কম। টাকা-পয়সা নেই।'

'মাসুদ ভাইয়ের ডিটেকটিভ এজেন্সি থেকে যথেষ্ট বেতন দেয়া হয় আমাকে, আপনার খরচ সহজেই বহন করতে পারব,' বলল রামিন। 'ছুটি নিন না একমাস বা দু'মাসের জন্যে?'

সোফায় পিঠ হেলান দিয়ে বসল পিটার লারসেন, বিস্মিত ও চিন্তিত। কিছুক্ষণ পর বলল, 'তা হয়তো সম্ভব। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হবে কি না... ঠিক জানা নেই।'

'জিজ্ঞেস করে দেখুন ছুটি দেবে কি না,' বলল রামিন।

কিচেনের দিকে আঙুল তাক করল। 'আমার সঙ্গে যেতে দেবে মারগিট?'

মৃদু হেসে মাথা দোলাল লারসেন। 'ও আপত্তি তুলবে না। আমি যেভাবে চিন্তা করি মেয়েগুলোর ব্যাপারে, ঠিক একই অনুভূতি ওর। বুঝতে পারে আমার অসহায়ত্ব। তা ছাড়া...' দ্বিতীয় বেডরুম দেখাল লারসেন। 'দশ বা এগারো বছর পর আমাদের মেয়ে ছুটিতে যেতে চাইবে মেডিটারেনিয়ানে। স্বপ্নে আতঙ্কিত হই আমরা: পুলিশের মিসিং পার্সন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে কেউ এসে বলবে: আপনাদের মেয়ে হারিয়ে গেছে। ভবিষ্যতে এমন হতেই পারে, কিন্তু লোভী পিশাচদের বিরুদ্ধে লড়লে অন্তত জানব, সাধ্য মত করেছি। সেক্ষেত্রে রাতে একটু ভালভাবে ঘুমাতে পারব।'

কফিতে চুমুক দিয়ে চিন্তান্বিত হয়ে বলল রামিন, 'জরুরি কণ্ট্যাক্ট আছে বলে অনেক কাজে আসবেন আপনি।' মৃদু হাসল। 'আর এদিকে আমি কথা দেব, ঝামেলা থেকে দূরে সরিয়ে রাখব আপনাকে।'

'বাছা, বয়সে আমি তোমার প্রায় দ্বিগুণ,' হাসল লারসেন। 'তবুও নিজেকে মনে করি কমবয়সী লোক বলে। আমাকে বিপদ থেকে আড়াল করে রাখবে? যদি অফিস থেকে ছুটি পাই, আমার প্রথম কাজই হবে লম্বা ব্যারেলের পিস্তল বা রিভলভার জোগাড় করা। সঙ্গে লাগবে তোমার জন্যে এক বাক্স ডাইপার।'

পিটারের আন্তরিক হাসি দেখে হেসে ফেলল রামিনও। সহজ সুরে বলল, 'পিটার, আমি কিন্তু সত্যিই সিরিয়াস। আপনার বউ-বাচ্চা আছে। আপনার কাজ হবে অ্যালেকযেন্দ্রে ব্যারারের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া। এ ছাড়া, সাহায্য করতে পারবেন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। আর খুন-জখম করতে হলে, সেসব করব মাসুদ ভাই আর আমি।'

'ঠিক আছে, দেখা যাক কী হয়,' বলল লারসেন। 'কিছুই নিশ্চিত নয় এখনও। আগামীকাল সকালে দেখা করব আমার বসের সঙ্গে, প্রস্তাব দিলে হয়তো পোঁদে লাথ্ মেরে অফিস থেকে বের করে দেবে।'

'তাকে তাই করতে দেবেন?' অবাক হয়ে বলল রামিন। 'আমাকে কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছেন, যথেষ্ট শক্ত লোক আপনি।'

মৃদু হাসল পিটার। 'আমি আসলেই যথেষ্ট শক্ত। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, বসের সই না পেলে বেতনের টাকা পাব না।'

আট

বিলাসবহুল ক্লিনিকের সেরা কেবিনে ঢুকবার পর থেকে প্রায় না থেমেই কাজ করে চলেছে সুসি গোল্ডা, বিরাম নেই। আবারও ঠিক করল পর্দার ভাঁজ, গুছিয়ে রাখল ওর আনা ঝুড়ি ভরা এক গাদা নানা রঙের গোলাপ ফুল। আর এসব করতে করতেই ডিম পেড়ে পরিশ্রান্ত হয়ে যাওয়া মুরগির মত একটু ঝিমিয়ে গেল।

প্রিয় মানুষটাকে অপলক চোখে দেখছে রানা। একটু পর জিজ্ঞেস করল, 'বলো তো, সুসি, কী করে বেড়াচ্ছে রামিন? ওর দেখা নেই কেন?'

কথাটা শুনে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল সুসি। কী যেন ভাবছে। একটু পর জবাব দিল, 'ও বলেছে, যেন তোমাকে এসব না বলি। কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, একা কাজে নেমে পড়েছে। তোমার জন্যে অপেক্ষা করেনি।'

কুঁচকে গেল রানার ভুরু। 'বলে ফেলো কী করছে।'

বেডের পায়ের কাছে বসল সুসি। রানার বাম গোড়ালিতে হাত রেখে হালকা চাপ তৈরি করে বলল, 'রামিন খুব রেগে যাবে, কিন্তু মিথ্যা বলব না তোমার কাছে।'

সুসি বলল আর্থার ম্যাথিস এবং তার ক্ষমাপ্রার্থনার কথা।

চিন্তিত চেহারায় মাথা দোলাল রানা। 'এ-ই বোধহয় ভাল হলো। বোধহয় মেরেই ফেলতাম বদমাসটাকে। অসুস্থ হওয়ায় কমে গেছে ধৈর্য। ...এরপর থেকে কী করে বেড়াচ্ছে রামিন?'

'ওটা ভেবেই চিন্তিত হয়ে পড়েছি,' বলল সুসি। 'মনে হচ্ছে আর্থার ম্যাথিসকে কড়কে দিয়ে সাহস বেড়ে গেছে। ভুলেই গেছে ওর বয়স মাত্র তেইশ। নিজের কাছে কিছু প্রমাণ করতে চাইছে।'

'ও আছে কোথায়?'

'গতকাল চলে গেছে। জানায়নি কোথায় যাবে। শুধু বলেছে দু'চার দিনের ভেতর তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। ততদিনে নাকি কাজ গুছিয়ে ফেলবে।'

'বুঝলাম।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'ধরেই নিয়েছে দু'সপ্তাহের জন্যে আটকা পড়েছি ক্লিনিকে।' ঘরের কোণে সেগুন কাঠের কাবার্ড, ওটার দিকে আঙুল তুলল ও। 'ওটার ভেতর আমার জুতো আর কাপড়-চোপড়। ওগুলো নিয়ে এসো।'

রানার চোখে চোখ পড়তেই তর্ক করতে গিয়েও থেমে গেল সুসি গোল্ডা।

মৃদু হেসে রানা বলল, 'ভয় পেয়ো না, ওরা আমাকে আটকে রেখেছে, আর কিছু না, কয়েক দিন পর সেলাই কাটবে বলে। সার্জন ডুপন্ট দক্ষ ডাক্তার, কিন্তু দরকার পড়লে নিজেই সেলাই কেটে নেব। ...তোমার কী ধারণা, কোথায় গেছে রামিন?'

রানার পোশাক আনতে রওনা হয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে বলল সুসি, 'কোপেনহেগেন।'

নয়

পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে ভাল ফিলিপ অ্যাবসলন, কিন্তু বড় সমস্যা হচ্ছে, খুবই কম তাঁর কল্পনাশক্তি। কখনও পা রাখেন না আইনের ওপাশে। পুলিশ ফোর্সে তাঁকে সম্মান করা হয়, কারণ তিনি দক্ষ, জ্ঞানী ও কর্মঠ। কিন্তু চোখের সামনে সব ধরনের প্রমাণ হাজির না হলে কখনও সন্তুষ্ট হন না।

ডেস্কের ওদিকে বসে থাকা যুবককে গভীর মনোযোগে দেখছেন। যুবক প্রায় ছয় ফুট উঁচু, চুল কুচকুচে কালো। রোদে পোড়া মুখ। চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

আস্তে করে মাথা নাড়লেন ফিলিপ অ্যাবসলন। 'না, সরি, মিস্টার রানা, কোনও পুলিশ অফিসারের বিষয়ে তথ্য দেয়ার অনুমতি নেই। কিছু জানতে চাইলে, আগে ইন্টারপোল থেকে অফিশিয়াল অনুরোধ আসতে হবে। মনে করি না সেটা আপনি জোগাড় করে আনতে পারবেন।'

'ভুল না হয়ে থাকলে, আমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে আছে আপনার ওই অফিসার, এটাই যথেষ্ট নয়?' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা।

আবারও মাথা নাড়লেন অ্যাবসলন।

'গতকাল পিটার লারসেনকে দু'মাসের ছুটি দিয়েছি। সত্যি বলতে, জানি না সে এখন কোথায়। আরও পরিষ্কার করে বললে:

গত বহু দিন ধরেই মারাত্মক মানসিক চাপের ভেতর ছিল সে। ওর কাজ খুবই কঠিন। কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ছুটির ব্যবস্থা করি। আমার অধীনস্থদের ভেতর সেরা অফিসার সে। ওর অভাবে কাজে সমস্যা হবে, কিন্তু বিশ্রামেরও দরকার ছিল।'

'সে কি বিবাহিত?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি তার বাড়ির ঠিকানা আর ফোন নাম্বার দেবেন?'

আবারও মাথা নাড়লেন অ্যাবসলন। 'সরি, কিন্তু এসব তথ্য দেয়া নিয়মের বাইরে।'

মৃদু হাসল বাদামি ত্বকের যুবক। 'যদি আপনার কমিশনার সহায়তা করতে নির্দেশ দেন, সেক্ষেত্রে আপত্তি থাকবে না আপনার, এই তো?'

'ঠিক।' শীতল হয়ে গেছে ডেনিশ পুলিশ অফিসারের কণ্ঠ। 'কিন্তু মনে করি না ওই অনুমতি আদায় করতে পারবেন।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বাঙালি যুবক। চট্ করে একবার দেখে নিল হাতঘড়ি, তারপর বলল, 'ফিরব আধঘণ্টার মধ্যে।'

মোবাইল ফোনের রিং-টোনের শব্দে ঘুম ভেঙে জেগে গেলেন সিনেটর ফ্রান্সিস জেফ্রি। একবার দেখে নিলেন ঘড়ি। বিড়বিড় করে দোষ দিলেন কপালের। রিসিভিং বাটন টিপে কানে তুললেন ফোন। পরক্ষণে হুঙ্কার ছাড়লেন, 'জেফ্রি বলছি!' খেয়াল করেননি ফোন করেছে কে। অবশ্য কয়েক সেকেণ্ড পর বিছানায় সটান হয়ে উঠে বসলেন। কথা শুনছেন মনোযোগ দিয়ে। ওই কণ্ঠ আসছে আটলান্টিক মহাসাগরের ওপার থেকে। কথা না বলে পাশের টেবিল থেকে ডাইরি নিয়ে দ্রুত নোট নিলেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, মিস্টার রানা। চিন্তার কিছু নেই। এফবিআই-এর ডেপুটি চিফকে বলে দিলেই সে যোগাযোগ করবে ইন্টারপোলে।

তারা আবার ধরবে ডেনিশ পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে। আপনি একটু পর কোপেনহেগেনের ওই পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বললেই সব তথ্য জোগাড় করে দেবে সে।'

ফোন রাখবার পর পিঠের নিচে গোটা দুয়েক বালিশ গুঁজে আধ শোয়া হয়ে বসলেন তিনি। মনে পড়ে গেছে কষ্টকর অতীত-স্মৃতি। তখনও সিনেটর ছিলেন না, তাঁর স্ত্রী একমাত্র ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল বাবার বাড়িতে। কিন্তু প্রথম রাতেই কিডন্যাপ হয়ে গেল ওরা দু'জন। ওদের জন্য দাবি করা হলো বিশ মিলিয়ন ডলার। বলে দেয়া হয়েছিল, পুলিশ বা এফবিআই-এ যোগাযোগ করলে লাশ ফেলে দেয়া হবে।

গোপনে সাহায্য চান এফরিআই-এর চিফের কাছে।

ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'নিশ্চিন্তে থাকুন, এক দিনের ভেতর আপনার স্ত্রী ও ছেলেকে উদ্ধার করবে আমার ফোর্স।'

কিন্তু দু'দিন পর বাড়ির সামনে কে বা কারা ফেলে গেল তাঁর স্ত্রীর লাশ— ধর্ষিতা ও রক্তাক্ত। ভয়ঙ্কর নির্যাতন করা হয়েছিল বেচারিকে।

এরপর আর এফবিআই-এর ওপর আস্থা রাখতে পারলেন না জেফ্রি। তখনই তাঁর এক বন্ধু জানাল, লস অ্যাঞ্জেলেসের এক প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটিং সংস্থার কথা— রানা এজেন্সি। তারা নাকি অত্যন্ত দক্ষ গোয়েন্দা। পুলিশ যেসব তদন্তে সফল হয়নি, তেমনি বেশ কিছু কেস সমাধা করেছে তারা। সকালেই ছুটলেন রানা এজেন্সির শাখা অফিসে। ওখানেই মাসুদ রানার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হলো তাঁর। চুপচাপ সব শুনল বাঙালি যুবক। তারপর বেশ কিছু প্রশ্ন করে একটু পর বলল, 'পরে যোগাযোগ করব আপনার সঙ্গে।'

'আপনাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব?' জানতে চেয়েছিলেন জেফ্রি।

'আপাতত এর জবাব দিতে পারব না,' বলেছিল রানা। 'তবে আমাদের সাধ্যমত করব।'

পরদিন ভোরে তাঁর বাড়িতে এল বাঙালি যুবক, সঙ্গে তাঁর ছেলে!

মাসুদ রানা সংক্ষেপে জানাল, তাঁর এক ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বী এখন পুলিশ স্টেশনে। তিনি ওখানে গেলেই সব তথ্য পেয়ে যাবেন।

দুপুরে রানা এজেন্সিতে গেলেন জেফ্রি। তাঁর ধারণা ছিল, ছেলেকে উদ্ধার করে দেয়ার জন্য অন্তত এক লাখ ডলার দাবি করবে রানা এজেন্সির মালিক।

বাঙালি যুবকের অফিসে বসে কথাটা তুলতেই একটা রিসিট ধরিয়ে দেয়া হলো তাঁর হাতে। কাগজে চোখ রেখে চমকে গেলেন। সব মিলে চাওয়া হয়েছে মাত্র এক হাজার ডলার! কাগজে আবার লেখাও আছে কী কাজে কত খরচ করেছে! সব মিলে পারিশ্রমিক চার শ' ডলার!

এরপর ভক্ত হয়ে গেলেন তিনি মাসুদ রানার। পরবর্তী সময়ে সিনেটর নির্বাচিত হলেও যোগাযোগ রেখেছেন।

মাসুদ রানা এতদিন পর জীবনে প্রথমবারের মত তাঁকে একটা অনুরোধ জানিয়েছে। দেরি না করে মোবাইল ফোন তুলে নিয়ে এফবিআই ডেপুটি চিফের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

পঁচিশ মিনিট পর মাসুদ রানাকে আবারও অফিসে ঢুকতে দেখলেন পুলিশ অফিসার ফিলিপ অ্যাবসলন। এবার কথা বললেন সম্মানের সঙ্গে। এক কাপ কফিও দেয়া হলো রানার সামনে।

চল্লিশ মিনিট পর পিটার লারসেনের বাড়িতে বসে আরেক কাপ কফিতে চুমুক দিয়ে মারগিটের কাছে জানতে চাইল রানা, 'ওরা আসলে কোথায় গেছে?'

'মার্সেইল্‌স্,' বলল মারগিট, 'গতকাল সকালে প্যারিসে গেছে বিমানে, তারপর যাবে মার্সেইল্‌স্।'

'জানেন কোথায় উঠবে?'

মাথা নাড়ল মারগিট, চোখে দুশ্চিন্তা। 'না। পিটার শুধু বলেছে, জরুরি কোনও কারণ না থাকলে, আগামী চার বা পাঁচ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করবে। বাইরে থাকতে হবে এক মাস মত, তা-ও বলেছে।' চুপ হয়ে গেল মহিলা। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'আপনার সম্পর্কে বেশ কিছু কথা বলেছে রামিন, মিস্টার রানা। এ-ও জানি, কেন ওরা ওই নরকে গেছে। কিন্তু সত্যিই ভয়ঙ্কর কোনও বিপদে পড়বে না তো ওরা?'

'মনে হয় না,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা, 'তবে ওখানে যেতে হবে আমাকেও। আপনি জানেন, আপনার স্বামীর কোনও কন্ট্যাক্ট আছে কি না মার্সেইল্‌স্-এ?'

'হ্যাঁ, আছে। ওই শহরের মিসিং পার্সন্স ব্যুরোতে কাজ করে সে।'

'তার নাম জানেন?'

'না, কিন্তু কোপেনহেগেনের পুলিশ হেডকোয়ার্টারে তার নামে একটা ফাইল আছে।'

স্যাটালাইট ফোনে ফিলিপ অ্যাবসলনের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। মাত্র তিন মিনিট পর পেয়ে গেল দরকারী তথ্য। ফোন রেখে মারগিটকে বলল, 'আপনার স্বামীর কন্ট্যাক্টের নাম ইন্সপেক্টর অ্যালেকযেন্দ্রে ব্যারারে।'

'তাঁকে ফোন করবেন আপনি?' জানতে চাইল মারগিট।

মাথা নাড়ল রানা। 'আগে ওখানে যেতে চাই, পরে ঠিক করব তার সঙ্গে দেখা করব কি না। আগামীকাল সকালে পৌঁছে যাব মার্সেইল্‌স্-এ। আপনাকে জানিয়ে দেব কোন্ হোটেলে উঠছি। মোবাইল ফোনের নাম্বার তো আপনার কাছেই আছে। আপনার

স্বামী যোগাযোগ করলেই তাঁকে জানিয়ে দেবেন: রামিন এবং তিনি যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমি ওদিকের পরিবেশ না বুঝবার আগেই ওদের উচিত হবে না কিছু করা। আজ রাতে পিটার ফোন করলে আমার ফোন নাম্বার দেবেন তাঁকে।'

সোফা ছেড়ে দরজার কাছে চলে গেল রানা। কবাট খুলে বেরিয়ে যাবে, এমন সময় মারগিট বলল, 'আমার ভাল লাগছে যে আপনিও ওখানে যাচ্ছেন। ভরসা পাচ্ছি অনেকটা।'

ঘুরে দাঁড়াল রানা, প্রথমবারের মত হাসল। 'চিন্তা করবেন না। আপনার স্বামী নিরাপদেই থাকবেন।' পিছনে দরজা বন্ধ করে লিফটের দিকে পা বাড়িয়েও থমকে গেল রানা। আস্তে করে হেলান দিল দেয়ালে। অপারেশন হয়েছে মাত্র তিন দিন আগে। বের করে নেয়া হয়েছে শ্র্যাপনেল, কিন্তু রয়ে গেছে টনটনে ব্যথা। ধীরে ধীরে দম নিয়ে ভাবতে লাগল বর্তমান পরিস্থিতি। নির্দেশ দিলে আদেশ পালন করবে ওর শরীর। সবসময় তা-ই করেছে। হয়তো রক্তাক্ত এবং আহত, কিন্তু হাল ছেড়ে দেয়নি কখনও। আবারও মারগিটের কথা মনে এল ওর। শেষ যে কথা বলে এসেছে, তা আসলে সামান্য সান্ত্বনা ছাড়া কিছুই নয়। ওর মন বলছে, মহিলার স্বামী আছে মস্ত বিপদে। ভাল করেই মার্সেইল্স্ শহরটা চেনে ও। ওখানে বেশ কিছু কণ্ট্যাক্টও আছে ওর। লিফটের জন্য বাটন টিপে আরেকটা চিন্তা এল মনে, অস্ত্র লাগবে রামিনের। প্যারিস হয়ে মার্সেইল্স্-এ চলেছে ওরা। আর রামিন ভাল করেই জানে, কোথায় পাবে অস্ত্র। আপাতত মার্সেইল্স্-এর অফিসে আছে ভিনসেণ্ট গগল।

আবারও ফিরে গিয়ে অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় টোকা দিল রানা। মারগিট আবারও দরজা খুলতে বলল, 'সরি, আবারও বিরক্ত করতে হলো। একটা কল করব ল্যাণ্ড ফোনে।'

'নিশ্চয়ই,' অবাক হয়েছে মারগিট। ফ্রেঞ্চও ভাষা ভাল করেই জানে। রানা ফোনে যার সঙ্গে কথা বলল, তার বক্তব্য আবছা শুনল মারগিট। রানার কথাগুলোও কেমন যেন ধোঁয়াটে লাগল।

রানা শুধু বলল, 'গলার আওয়াজ চিনতে পেরেছ? ...গুড। রামিনকে দু'এক দিনের ভেতর দেখেছ? কিছু নিয়েছে তোমার কাছ থেকে?'

অন্যপ্রান্ত থেকে কিছু বলা হলো। মারগিট কান খাড়া করল। লাইনের ওদিকে পুরুষ কণ্ঠ। অস্পষ্ট সুরে বলা হলো, 'হ্যাঁ, নিয়েছে নীরব দুটো ছোট জিনিস। কোনও ভুল করে ফেললাম?'

'না। এরপর কোথায় যাবে বলেছে?'

'না। ফোন করেছিল যেন চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে লোক পাঠাই। শুনলাম, ওর সঙ্গে আরেক লোক ছিল। আমার লোকের ধারণা, পরের ফ্লাইটে উঠবে ওরা।'

'ঠিক আছে। শরীর কেমন?'

'আর কী, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।'

'এবার বিয়ে করে ফেলো।' মৃদু হাসল রানা।

'মরতে, রানা?'

'মার্সেইল্স্-এ দেখা হবে, রাখলাম।' কল কেটে মারগিটের দিকে তাকাল রানা। 'আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা হলেই জানাব, যেন যোগাযোগ করেন। চিন্তা করবেন না।'

দশ

মাত্র ছয় দিনে হেরোইন অ্যাডিক্ট হয়ে গেছে লিলি ওলসেন। কেন যেন আর দেখা করতে আসে না বুটেন। বদলে যে আসত, তার হাতে থাকত ট্রে, তার ওপর লিলির বন্ধু। ঠিক সময়ে যেত ওর শিরায়। যে লোক হেরোইন এনে দিত, সে লম্বা, খুব স্টাইল করে ছাঁটে চুল, বয়স পঁয়তাল্লিশ মত, আকর্ষণীয় চেহারা। গত পাঁচ দিন মিষ্টি আচরণ করেছে, কথা বলেছে মায়াময় কণ্ঠে; ভরসা দিয়েছে সবসময়। নিজ নাম বলেছে রবার্তো। প্রথমবার এসেই খুলে দিয়েছিল হাত-পায়ের দড়ি। তখন জানালাহীন ঘরে হেঁটে বেড়াতে পেরেছে লিলি। ওর জন্য এনেছিল নতুন লাল ট্র্যাক সুট ও তিনটে সাদা প্যান্টি। ইতালিয়ান সুরে ইংরেজি বলে মানুষটা। সে ছাড়া এ ঘরে আসে শুধু এক কুৎসিত বুড়ি। দিয়ে যায় খাবার। প্রকৃতির ডাক এলে পাহারা দিয়ে নিয়ে যায় করিডোরের শেষ প্রান্তে টয়লেটে। কিন্তু সবসময় নয়। হেরোইন দেয়ার পর পর ও যখন খুশি মনে থাকে, সেই সময় সুযোগ পায় বাথরুম ও টয়লেটে যেতে।

কিন্তু আজ ছয় দিনের দিন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ইঞ্জেকশন। এরা লিলির ঘড়িটা সরিয়ে নেয়নি। আঠারোতম জন্মদিনে ওর বাবা-মা দিয়েছিলেন রুপালি এই জর্জ জেনসেন ঘড়িটা। ওর সবচেয়ে দামি জিনিস। ওটা আছে বলেই জানে, গত পাঁচ দিন

প্রতি ছয় ঘণ্টা পর পর ওকে হেরোইন দেয়া হয়েছে। নেশার ঘোরে প্রতিবার শেষ দিকে বুকের ভিতর উঠত দারুণ কষ্টের হুতাশ। প্রথমে কমই থাকত ওই যন্ত্রণা। কিন্তু আজ নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে ক্রমেই আরও বাড়ছে চাহিদা।

এ কারণেই একটু পর পর ঘড়ি দেখছে লিলি। খুব ধীরে পেরিয়ে গেল আরও ছয় ঘণ্টা। তারপর নয় ঘণ্টা পেরোবার পর বিছানায় শুয়ে থরথর করে ভয়ঙ্করভাবে কাঁপতে লাগল বেচারি। আরও কিছুক্ষণ পর দরজায় চাবি লাগতেই বিছানা ছেড়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। সেই বুড়ি মহিলা, হাতে ট্রে। কিন্তু ট্রেতে লিলির বন্ধু নেই, আছে বউল ভরা সুপ ও এক বউল স্প্যাগেটি।

কাঁপা সুরে জানতে চাইল লিলি, 'রবার্তো কই?'

নীরবে ঘরে ঢুকে বিছানার পাশে ট্রে রাখল মহিলা, ঘুরে বেরিয়ে গেল দরজা খুলে।

'রবার্তো কই?' কাঁপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল লিলি। বার-বার ফ্রেঞ্চ ভাষায় জানতে চাইল একই কথা। চড়ছে ওর গলা। কিন্তু জবাব দিল না কেউ। বন্ধ হয়ে গেল ধাতব দরজা। ঘটাং আওয়াজ তুলে আটকে গেল বল্টু। চাবি ঘোরানোর আওয়াজ তুলে লেগে গেল তালা।

উঠে বসে চামচের দিকে হাত বাড়াল লিলি। খুব কাঁপছে হাত। কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝে গেল, ভদ্রতা বজায় রেখে চামচ ব্যবহার করে সুপ তুলতে পারবে না মুখে। আর ওই সুপের স্বাদ বলতে কিছুই নেই। হাত থেকে বউলের তরলে পড়ে ডুবে গেল চামচ। খাটে কাঁপতে কাঁপতে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকল লিলি, চেয়ে রইল দেয়ালের দিকে, তারপর চিত হয়ে শুয়ে গায়ে টেনে নিল কম্বল। সারারাত চলল ওর নিদারুণ যন্ত্রণা।

ধীরে ধীরে এল সপ্তম ভোর। দরজা খুলে গেল, ছোট ট্রে হাতে আবারও ঢুকল রবার্তো। ঘরের মাঝে চুপ করে বসে হি-হি

করে কাঁপছে লিলি। দু'হাতে দু'হাঁটু ধরে ভাঁজ করে রেখেছে বুকের কাছে। আধ বোজা চোখে দেখল রবার্তোকে।

জবাবে হাসল রবার্তো।

মেঝে ছেড়ে উঠে ঝগড়াটে সুরে জিজ্ঞেস করল লিলি, 'কোথায় ছিলে?' রবার্তোর চোখে নয়, ওর চোখ লোকটার হাতের ট্রের ওপর।

মিষ্টি হাসল রবার্তো। এমনভাবে হাত বাড়িয়ে ধরেছে ট্রে, যেন ছোট্ট বাচ্চার জন্য এনেছে দারুণ লোভনীয় উপহার।

'এই যে তোমার বন্ধু,' নরম সুরে বলল সে।

রবার্তোর দিকে পা বাড়িয়ে ট্র্যাক সুটের আস্তিন গুটিয়ে ফেলল লিলি।

খাটের পাশের টেবিলে ট্রে রাখল রবার্তো। ব্যস্ত হয়ে ওর দিকে আসছে লিলি, কিন্তু হাত তুলে মানা করল সে। 'এক মিনিট। আমি চাই আগে তুমি একটা কাজ করবে।'

'কী কাজ?'

নিরীহ মুখে হাসল রবার্তো। 'আগে আমাকে চুমু দিতে হবে।'

অবাক হলো লিলি। 'কেন?'

আবারও হাসল রবার্তো, দু'দিকে ছড়িয়ে দিল দু'হাত। লালসা নিয়ে বলল, 'বলো তো, আমাকে চুমু দেয়া কি এতই কঠিন কাজ? আমি কি এতই কুৎসিত?'

থমকে এক পা পিছিয়ে গেল লিলি। ভয় পেয়েছে। মাথা নাড়ল আস্তে করে, বিশ্বাস করতে পারছে না এত ভাল মানুষটা এমন নোংরা প্রস্তাব দেবে। কয়েক সেকেণ্ড পর পেয়ে বসল ড্রাগ্‌স্ পাওয়ার অদম্য তাগিদ। বিড়বিড় করল, 'না, তুমি কুৎসিত না। কিন্তু...'

কাঁধ ঝাঁকাল রবার্তো। ট্রে তুলে রওনা হয়ে গেল দরজার দিকে।

'না!' গলা চড়িয়ে তাকে ঠেকাতে চাইল লিলি। 'যেয়ো না! প্লিয, ওটা দাও!'

দরজার হাতলে হাত রেখে ঘুরে চাইল রবার্তো। 'তোমাকে এটা দেব, কিন্তু বদলে আমাকে দিতে হবে একটা চুমু।'

লোকটার চরম নিষ্ঠুরতা টের পেয়ে হতবাক হয়ে বার কয়েক মাথা দোলাল লিলি, তারপর করুণ সুরে বলল, 'না... কিন্তু... ওটা আমার খুব দরকার... খুব... খুব অসুস্থ লাগছে।'

বিরক্ত চেহারা করে বেরিয়ে গেল রবার্তো, কাঁধের ওপর দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, একঘণ্টা পর আবারও আসব। চুমু দেবে কি না ভেবে দেখো।'

একঘণ্টা পর রবার্তোর ঠোঁটে চুমু দিল লিলি। শক্ত হাতে ওর মাথার খোঁপা ধরল লোকটা, লিলির মুখে প্রবেশ করল তার জিভ। কোনও অনুভূতি হলো না বেচারির। মন পড়ে রইল বিছানার পাশে টেবিলে রাখা ট্রে-র সিরিঞ্জে।

কয়েক মিনিট পর নির্দেশ মত বিছানায় লিলি শুয়ে পড়লে ব্যস্ত হয়ে উঠল রবার্তো, ইঞ্জেকশন দিল।

লিলি টের পেল, শিথিল হয়ে আসছে ওর শরীরের সব গিঁঠ বা পেশি।

আট ঘণ্টা পর আবারও এল রবার্তো, হাতে সেই ট্রে। গত দু'ঘণ্টা ধরে রুপালি ঘড়ি দেখেছে লিলি এক মিনিট পর পর। গত ওই দু'ঘণ্টা মনে হয়েছে দশ বছর।

এবারও ইঞ্জেকশন পাওয়ার জন্য চুমু দিতে হলো রবার্তোকে, তা ছাড়া লোকটা এবার কামুক ভঙ্গিতে মর্দন করল ওর দুই স্তন ও নিতম্ব।

তৃতীয়বার নিজেই লিলি সারাশরীর হাতড়াতে দিল।

চতুর্থবার লাল একটা ড্রেসিং গাউন নিয়ে এল লোকটা। ওটা দেখিয়ে বলল, ড্রাগ পেতে হলে সঙ্গম করতে দিতে হবে তাকে।

এককথায় মানা করে দিল লিলি।

আর সত্যিই ট্রে নিয়ে চলে গেল রবার্তো।

দু'হাতে বার-বার লোহার দরজা পিটিয়ে চিৎকার করে মাতৃভাষায় ডেনিশ গালি দিল লিলি।

দু'ঘণ্টা পর আবারও এল রবার্তো।

তখন আর সঙ্গমে আপত্তি রইল না লিলির।

বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে কিছুই অনুভব করল না। চোখ পড়ে রইল পাশের ওই ধাতব ট্রের ওপর।

এ-ই চলতে লাগল রোজ। এবং এক সপ্তাহ পেরোবার আগেই শিখে গেল, কীভাবে কী কৌশলে বিলিয়ে দিতে হবে নিজ শরীর। কয়েক দিন পর অন্য এক পুরুষের সঙ্গে শুতে হলো ওকে। লম্বা, চিকন, কালো চুলের গোঁফওয়ালা এক লোক সে। রবার্তো এবং সে মিলে একইসঙ্গে ভোগ করল লিলিকে। কখনও তীব্র ব্যথা পেল ও। এরপর চিকন লোকটা পোশাক পরে হনহন করে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। লিলিকে ড্রাগ দেয়ার পর বিছানায় পাশাপাশি শুল রবার্তো। তার হাতে জ্বলছে সিগারেট। নির্বিকার চোখে দেখছে, কীভাবে দুঃসহ অত্যাচারিত হয়ে এবং ড্রাগসের প্রভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে সুন্দরী এক সম্ভাবনাময়ী মেয়ে।

কিছুক্ষণ পর বলল রবার্তো, 'আগামীকাল চলে যাবে তুমি নতুন এক শহরে।'

'কোথায়?' বেসুরো কণ্ঠে জানতে চাইল লিলি।

'তা বড় কথা নয়,' বলল রবার্তো। 'ওটা অন্য দেশ।' মিষ্টি করে হাসল লিলির উদ্দেশে। 'সুন্দর দেশ ওটা।'

ড্রাগ ভরা মনেও কথাটার অর্থ বুঝতে পেরেছে লিলি। ভয় পেয়ে জানতে চাইল, 'কোন্ দেশ? আমার সঙ্গে যাবে না তুমি?'

মাথা নাড়ল রবার্তো। 'নাহ্, আমার কাজ শেষ। তুমি এখন তৈরি।'

চক্কর দিয়ে উঠল লিলির মাথা। আঙুল তুলে সিরিঞ্জ দেখাল। 'ওটার কী হবে?'

হাসল রবার্তো। 'চিন্তা কোরো না। ঠিক সময়ে ওটা দেবে আর কেউ।'

জানতে চাইল লিলি, 'ওরাও কি ওটা দেয়ার আগে আমাকে ব্যবহার করবে?'

'তা তো করবেই,' নির্বিকার সুরে বলল রবার্তো। 'মাগনা দেবে না। ধীরে ধীরে লোকের সংখ্যা বাড়বে। বুঝে যাবে, এতে মনে কষ্ট পাওয়ার কিছুই নেই। মেয়েমানুষের আর কী কাজ!'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে শুল লিলি। বুঝে গেছে, আসলে ওকে এখন ব্যবহার করা হবে বারবণিতা হিসেবে।

এগারো

ধীরে ধীরে সাগরে ডুবছে পাকা কমলার মত মস্ত সূর্য। ওদের অ্যাপার্টমেন্টের ব্যালকনিতে চুপ করে বসে আছে পিটার লারসেন। আসছে-যাচ্ছে জেলে নৌকা। সাগরতীরের দৃশ্য সবসময় ভাল লাগে ওর। কখনও যদি সম্ভব হয়, কোপেনহেগেন থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে ছোট্ট কোনও শহরে বাড়ি বা অ্যাপার্টমেন্ট কিনবে, সামনেই থাকবে এমনই কোনও বন্দর।

তার জীবনে রামিন রেযা আসার পরের আটচল্লিশ ঘণ্টা আবারও পর্যালোচনা করে দেখছে লারসেন। সাহসী তরুণ এই

রামিন, অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। বছরের পর বছর পুলিশ অফিসার হিসেবে অনেক কিছুই দেখেছে লারসেন, বহু কিছুই করেছে, কখনও কাজ করেছে সিআইডি হিসেবে, বা ড্রাগস ডিপার্টমেন্টে; প্রায় দেড় গুণ বয়স ওর রামিনের তুলনায়; কিন্তু ওকে স্বীকার করতেই হবে, ওই ছেলেকে যে-মানুষ ট্রেনিং দিয়েছে, সে দুনিয়া-সেরা কেউ। অবশ্য, কোপেনহেগেনের কাস্ট্রাপ এয়ারপোর্টে পৌঁছেই বলে দিয়েছে পিটার, দলনেতা হিসেবে মেনে নেবে না রামিনকে। বিশেষ করে ওদের এ মিশনে। কিন্তু প্যারিসে চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে পৌঁছে মার্সেইল্‌স্‌ যাওয়ার দু'ঘণ্টার বিমান বিরতির সময়ে অবাক হতে হয়েছে ওকে। রামিন বলেছে, ওদেরকে অপেক্ষা করতে হবে না ট্র্যানসিট লাউঞ্জে। ইমিগ্রেশন পেরিয়ে এক কফি শপে ওকে নিয়ে গেছে ছেলেটা, বসেছে কোনার টেবিলে। অর্ডার দিয়েছে ক্যাপুচিনো কফির।

পাঁচ মিনিট পর এল এক লোক। বয়স চল্লিশ। বসল রামিনের উল্টো দিকের চেয়ারে। ওদের ভেতর তেমন কথাও হলো না। ছোট এক ব্রিফকেস রামিনের হাতে তুলে দিল সে। জানতে চাইল, 'মিস্টার রানা কেমন আছেন?'

'ভাল। আপনি?' বলল রামিন।

'বয়স বাড়ছে।'

'সঙ্গে অভিজ্ঞতাও,' হাসল রামিন।

মাথা দোলাল লোকটা, চাপা স্বরে জানাল, 'নাইন যিরো নাইন।' চেয়ার ছেড়ে উঠে চলে গেল সে।

'কী বলল লোকটা?' জানতে চাইল পিটার।

'উনি ভিনসেন্ট গগলের লোক,' মৃদু হেসে বলল রামিন। 'অনেক বছর ধরে ব্যবসা করছেন গগল।'

'কীসের ব্যবসা?'

পুরো একমিনিট কী যেন ভাবল রামিন, তারপর নিচু স্বরে

বলল, 'কয়েকটা শহরে সেফ হাউস ও ওয়্যারহাউসের ব্যবসা আছে ওঁর। তার মধ্যে একটা ব্রাসেলসে। মার্সেনারিদের নানা দেশ থেকে সরিয়ে আনা আর পাঠিয়ে দেয়া তাঁর অন্যতম ব্যবসা। এ ছাড়া, তিনি সংগ্রহ করেন সব ধরনের অস্ত্র। আমরা যে কাজে নেমেছি, তাতে তাঁর সেফ হাউস আর ইকুইপমেন্ট কাজে আসবে। কয়েক বছর আগে এমনই এক অপারেশনে লিবিয়ায় তাঁর সাহায্য নেন মাসুদ ভাই।'

আগ্রহী হয়ে উঠল পিটার। টেবিলে রাখা ব্রিফকেসে টোকা দিল। 'এটার ভেতরে কী?'

'মার্সেইল্‌স্‌ শহরে অনেক পুরনো এক জেলে বন্দরের কাছেই এক অ্যাপার্টমেন্টের চাবি,' বলল রামিন, 'এ ছাড়া, শহুরের প্রতিটি গলিঘুচি চেনার জন্য মানচিত্র।'

'আর কিছুই নেই ভেতরে?'

'আর তেমন কিছু নেই,' গম্ভীর মুখে বলল রামিন।

'সত্যি তো?'

'আর আছে একটা পিস্তল, নিখুঁতভাবে ওটা দিয়ে ছোঁড়া যায় ট্র্যাংকুইলাইযার ডার্ট। দুটো ফোল্ডিং ছোরা, দুটো পিস্তল ও সাইলেন্সার। সঙ্গে যথেষ্ট অ্যামিউনিশন ও স্পেয়ার ম্যাগাযিন।'

ছোট, কালো ব্রিফকেসের দিকে চেয়ে কথাটা শুনে ভীষণ চমকে রামিনের চোখে চাইল পিটার। হিসহিস করে বলল, 'তুমি পাগল? ওটা নিয়ে পেরোব কী করে সিকিউরিটি এরিয়া? তোমার জানা নেই সবই চেক করে কাস্টম্‌স্‌?'

মাথা দুলিয়ে ব্রিফকেসে টোকা দিল রামিন। 'এই ব্রিফকেস যাবে আমার লাগেজের সঙ্গে, দায়িত্বও আমার। এক্স-রে বা ইনফ্রা-রেড ব্যবহার করে কিছুই ধরতে পারবে না কেউ। খুলেও সহজে বুঝবে না। তলার দিকে দেখা যাবে দুটো মার্কার পেন। দেখতে সত্যিকারের পেনের মতই। অস্ত্র বা অ্যামিউনিশন দেখাবে

মাঝারি বইয়ের মত। অতি সতর্ক না হলে কাস্টম্‌স্ অফিসার বুঝবে না, এসব বই নকল। এ ঝুঁকিটা না নিয়ে উপায় নেই। এ ছাড়া, ব্রিফকেসে আছে ব্যবসার স্বাভাবিক বেশ কিছু ফাইল।'

দুশ্চিন্তা একটু কমলেও দ্বিধা এল পিটারের মনে। কাজেই বলল, 'কোপেনহেগেনের হোটেল থেকে যোগাযোগ করে এসব ব্যবস্থা করেছ তুমি?'

মৃদু মাথা দোলাল রামিন রেযা। 'হুঁ। পুরনো বন্ধুদের নাম বা যা চাই তা উল্লেখ না করেই আলাপ সেরেছি। ব্যবহার করেছি কিছু কোড। এসব পিস্তল কাজে আসবে কি না জানি না, কিন্তু এগুলো সেরা। নাইন মিলিমিটার, ট্রেস করতে পারবে না কেউ। আপনি হয়তো খেয়াল করেননি, মিস্টার গগলের লোকের হাতে গ্লাভস্ ছিল। ভেতরের কোনও কিছুতেই আঙুলের ছাপ নেই।'

সত্যিই, বিনা ঝামেলায় ওরা মার্সেইল্‌স্-এর ম্যারিগন্যান এয়ারপোর্টে পৌঁছল । লাগেজ বুঝে নিয়ে কাস্টম্‌স্ পেরিয়ে এল এয়ারপোর্টের কফি শপে। ব্যাগ থেকে ব্রিফকেস বের করে কমবিনেশন লক খুলল রামিন। ডালা খুলতেই ঝুঁকে ভেতরটা দেখল পিটার। যা বলেছে ছেলেটা, ভেতরে ঠিক তা-ই। তিনটে মাঝারি বই ও দুটো মার্কার পেন। মার্সেইল্‌স্-এর রঙিন এক মানচিত্র ও ছোট এক চাবির রিঙে দুটো চাবি। এ ছাড়া, এক ডজন ফাইল।

শহরের মানচিত্র বের করে খুলল রামিন, আঙুল তাক করে দেখাল, পুরনো জেলে-বন্দরের খুবই কাছে কালো কালিতে তৈরি এক বৃত্ত। 'এটা আমাদের বেস। চলুন এবার।'

বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে করে শহরের আধুনিক অংশে পৌঁছে গেল ওরা। এরপর আধ মাইল হাঁটবার পর উঠল নতুন ট্যাক্সিতে। ওটাতে চেপে হাজির হলো এই অ্যাপার্টমেন্টের আধ মাইল দূরে। তারপর হাঁটতে হয়েছে বাকি পথ। মাঝে বার-

বার থেমে ফুটপাথের পাশের দোকানের কাঁচে চোখ রেখেছে রামিন। ওরা যেন দু'জন টুরিস্ট।

মনে মনে রামিনের দক্ষতার প্রশংসা করেছে অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার পিটার। বিশেষ করে অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে যেতে যে টেকনিক ব্যবহার করেছে, তুলনা নেই তার।

চারতলা এক দালানে ওদের পুরনো, কিন্তু ভাল করে মেরামত করা অ্যাপার্টমেন্ট। এ বাড়িতে আর কেউ নেই। সদর দরজা খুলে চারতলায় উঠে অ্যাপার্টমেন্টের দরজার সামনে থেমেছে রামিন। ব্যাগ থেকে দু'জোড়া কালো, পাতলা সুতির গ্লাভস্ বের করেছে। পিটারের হাতে একজোড়া দিয়ে বলেছে, 'ভেতরে যতক্ষণ থাকব, আমাদের হাতে থাকবে এই গ্লাভস্।'

অ্যাপার্টমেন্টে তিনটে বেডরুম, তিনটে বাথরুম, ছোট এক কিচেন, মাঝে লাউঞ্জ ও ডাইনিং রুম। হালকাভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা আসবাবপত্র। নীল পর্দা সরিয়ে ওদিকের ব্যালকনি দেখেছে পিটার, একটু দূরেই জেলে-বন্দর। ওর মনে হয়েছে, কতকাল ধরেই না এখানে বাস করছে। আগামী কয়েক বছর পর হাতে কিছু টাকা এলে ডেনমার্কে এমনই কোনও বন্দরের কাছে ছোট কোনও অ্যাপার্টমেন্ট কিনতে চাইবে ও।

রামিন জানিয়ে দিয়েছে, পারতপক্ষে মোবাইল ফোন ব্যবহার করবে না ওরা। সরাসরি ল্যাণ্ড টেলিফোনের কাছে চলে গেছে, স্ক্রু খুলে দেখেছে ভেতরের অংশ। সন্তুষ্ট হয়ে যন্ত্রটা আবারও জোড়া দিয়েছে। তন্নতন্ন করে খুঁজেছে অ্যাপার্টমেন্ট। বাদ পড়েনি বাতির সব সকেট ও প্লাগ। কোথাও পাওয়া যায়নি লিসেনিং ডিভাইস।

'খুব সতর্ক তুমি,' মন্তব্য করেছে পিটার।

'কয়েক বছর ধরে শেখানো হয়েছে, কী করতে হবে আর কী করা চলবে না,' বলেছে রামিন। 'আশা করিনি এখানে ছারপোকা থাকবে। কিন্তু পুরো নিশ্চিত না হয়ে উপায়ও নেই। নাস্তা হিসেবে

কী খেতে চান?'

'ব্রেকফাস্ট?'

'হ্যাঁ। সামনের কোণে ছোট সুপারমার্কেট। কয়েক দিনের জন্যে দরকারী রসদ জড় করব। ততক্ষণ আপনি খানিক বিশ্রাম নিয়ে নিতে পারেন।'

মুচকি হেসে ভুঁড়িতে টোকা দিয়েছে পিটার। 'বাড়িতে চর্বি জাতীয় কোনও খাবার খেতে দেয় না মারগিট, আমিও আসছি তোমার সঙ্গে।'

হাত তুলে টেলিফোন দেখিয়ে দিয়েছে রামিন। 'ঠিক আছে, কিন্তু আগে আপনার কণ্ট্যাক্টের সঙ্গে মিটিঙের ব্যবস্থা করুন। ধরুন, আগামীকাল সকালে? আপনার কি মনে হয় তার ফাইল পড়তে দেবে আমাদেরকে?'

'দেবে বলেই মনে করি। নানান সেমিনারে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে। পরস্পরকে পছন্দ করি আমরা।'

'কতটুকু তথ্য ফাঁস করবেন?'

'কিছুই না,' বলেছে পিটার। 'ও বুঝবে। আমি শুধু বলব, প্রাইভেট এক কেস নিয়ে এখানে এসেছি। ছুটিতে কিছু টাকা রোজগার করতে চাই। টাকা খরচ করছে হারিয়ে যাওয়া এক মেয়ের বাবা-মা। বড়জোর জানাতে পারি, কাজ শেষ হলে এই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর সবই খুলে বলব।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রামিন।

নাস্তায় স্মোক্‌ড্‌ স্যামন, টোস্ট, অর্ধেক ক্যামেমবার্ট, স্মোক্‌ড্‌ বিফ, সালামি ও মস্ত এক টিন ভরা ফলের সালাদ সাবড়ে দিল পিটার লারসেন। মুখোমুখি বসে খেল রামিন এক কাপ চা ও এক স্লাইস টোস্ট।

পরদিন সকাল ঠিক নয়টায় ইন্সপেক্টর অ্যালেকযেন্দ্রে ব্যারারের

অফিসে গিয়ে হাজির হলো ওরা। লম্বা লোক ব্যারারে, চুল ধূসর, নাক বাজপাখির ঠোঁটের মত বাঁকা। পরনে অভিজাত কাটের ধূসর সুট। শার্ট ফ্যাকাসে নীল, টাই লালচে। অত্যন্ত অতিথি-পরায়ণ মনে হলো তাকে।

রামিনকে নিজের অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে পিটার। সংক্ষেপে বলেছে, মস্ত এক বড়লোক পরিবারের হয়ে তদন্ত করতে এসেছে এই শহরে। মাথা দুলিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে ব্যারারে, সে বুঝতে পেরেছে। মাঝে মাঝে এমন ধরনের কেস নিয়ে আসে অন্য দেশের অফিসাররাও। আলাপের জন্য খালি এক অফিসরুমে রামিন-পিটারকে নিল ব্যারারে। অ্যাসিস্ট্যান্টকে ডেকে বলে দিল, ওদের দরকারী সব ফাইল যেন দিয়ে যায়, সঙ্গে কফি ও কেক।

এবারের অভিযানে ছোট্ট এক অ্যাপল ল্যাপটপ কমপিউটার সঙ্গে এনেছে পিটার। পরবর্তী চার ঘণ্টা স্তূপ করে রাখা ফাইলের ভেতর নাক গুঁজে রাখল রামিন ও পিটার। প্রয়োজনে ল্যাপটপে তুলে নিল জরুরি তথ্য।

কাজ শেষ হলে সহায়তা করার জন্য ব্যারারেকে ধন্যবাদ দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ব্যারারেকে কথা দিয়েছে পিটার, দু'চার দিনের ভেতর যোগাযোগ করবে। তখন নতুন কোনও তথ্য পেলে লাঞ্চ বা ডিনারে বসে জানাবে।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে কয়েক ব্লক দূরে ভাল এক রেস্তোরাঁ দেখে ওখানে ঢুকল রামিন ও পিটার। কোনও ভিড় নেই। দূরের এক টেবিলে বসল ওরা। কেউ শুনতে পাবে না ওদের কথা। বিয়েব্যাস অর্ডার দিতে চাইল রামিন, কিন্তু আপত্তি তুলল পিটার। জানিয়ে দিল, মার্সেইল্‌স্‌-এ বেশ কয়েক বছর আগে এমনই এক নামকরা রেস্তোরাঁয় দারুণ ওই ডিশ খেয়েছিল। ওটার তুলনা ছিল না। পরে ওদের কাজ শেষ হলে ওখানে

একবার টুঁ দেবে। বিয়েব্যাসের বদলে স্টেক নিল ওরা। সকাল থেকে যা জানতে পেরেছে, তা নিয়ে আলাপ হলো ওদের ভেতর।

কথায় বার্তায় রামিন সম্পর্কে অনেক কিছু বুঝে গেছে পিটার। বাংলাদেশি তরুণ যেমন বুদ্ধিমান, তেমন দক্ষ, তেমনি কৌশলী; কিন্তু একটা ব্যাপার মেনে নিতে পারল না– একেবারে রুথলেস... প্রতিপক্ষের ব্যাপারে সাজ্ঘাতিক নির্দয়, নিষ্ঠুর। সহজ পরিকল্পনা করেছে সে। ব্যারারের ফাইল থেকে জানা গেছে, মার্সেইল্স্-এর টপ ক্রিমিনাল পওলো ক্যালভির অপরাধী সংগঠন কাজ করছে রেড লাইট ডিসট্রিক্টের অপেরা ও ভিয়াপোর্ট এলাকায়। তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে সমস্ত পতিতালয় ও ড্রাগ্স্ ব্যবসা।

ইতালিয়ান মাফিয়া, স্প্যানিশ আণ্ডারওঅর্ল্ড ও উত্তর আফ্রিকার অপরাধীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখেছে পওলো ক্যালভি। কয়েকবার গ্রেফতার হলেও কখনও দোষী সাব্যস্ত হয়নি। তার লম্বা হাত পৌঁছে গেছে এ শহরের রাজনৈতিক নেতাদের ঘাড়ে, তাকে ভুলেও ঘাঁটায় না পুলিশ হেডকোয়ার্টার। প্যারিসের ক্ষমতাশীলদের সঙ্গেও রয়েছে যোগাযোগ।

পিটারের ল্যাপটপের লিস্ট অনুযায়ী, এ এলাকার সমস্ত বার ও পতিতালয়ের মালিক সে। উপকূলে ব্যক্তিগত মস্ত এক ভিলা, আর শহরে বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেণ্ট। বিবাহিত লোক। ছেলে-মেয়ে দু'জন। বড়জন চোদ্দ বছরের– ছেলে। মেয়ের বয়স এগারো। ক্যালভির আছে ছোট দু'জন ভাই, তারা দেখভাল করছে ব্যবসা। ড্রাগসের দিক দেখছে অ্যামে ক্যালভি, পতিতালয়ের ব্যবসা দেখে ব্রাইস ক্যালভি। এদিকে আইনসম্মত সব ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত পওলো ক্যালভি। তার ভেতর রয়েছে কনস্ট্রাকশন কোম্পানি। পৌরসভা থেকে প্রচুর কণ্ট্রাক্ট পায় তার সংগঠন। পিটার আগেই জানিয়ে দিয়েছে, ফ্রান্সের সবচেয়ে দুর্নীতি-পরায়ণ শহর এই মার্সেইল্স্। পুলিশ হেডকোয়ার্টারে পওলো ক্যালভির

অসংখ্য ফোটোগ্রাফ দেখেছে ওরা। তার ভেতর আছে পুলিশ মাগ-শট। অন্যগুলো তোলা হয়েছে গোপনে।

চৌকো আকৃতির পঞ্চাশোর্ধ লোক পওলো, কোজাকের মত ন্যাড়া মাথা, নাকের নিচে কালো-বাদামি মস্ত শুঁয়োপোকার মত গোঁফ। তার দুই ভাইয়ের ছবিও স্টাডি করেছে ওরা। এ ছাড়া আছে পওলো ক্যালভির লেফটেন্যান্ট ও একদল ডাকাতের মত লোক। পওলোর ফাইল থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা বিষয়: তার কমবয়সী উপপত্নীকে অন্তর থেকে ভালবাসে সে। সোনালী চুলের ওই সুন্দরীর নাম অ্যাবেলিনো ল্যামন্টে। গত পাঁচ বছর ধরে তাকে শহরের একটা অ্যাপার্টমেন্টে রেখেছে, সপ্তাহের বেশিরভাগ রাত সে ওখানেই কাটায়। তার সেরা নাইট ক্লাব রেড চিতায় ম্যানেজারি করে মেয়েটি, যদিও বেতন দেয়া হয় খুবই কম। ওই নাইট ক্লাবে আরও কাজ করে অপরূপা চল্লিশজন মেয়ে। এ ছাড়া আছে ক'জন স্ট্রিপার। ওপর তলা অত্যন্ত দামি পতিতালয়।

লাঞ্চে বসে পওলো ক্যালভি সংক্রান্ত সবদিক খুঁটিয়ে দেখল পিটার ও রামিন। মস্ত এক টুকরো পাভলোভা মুখে পুরল পিটার, আর তখনই রামিনের পরিকল্পনা শুনে চমকে গিয়ে বুঝে গেল, সত্যিই দরকার পড়লে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হতে পারে এই ছেলে।

'আমি ওর দুই ছেলে-মেয়ের একজন বা উপপত্নীটাকে তুলে আনব,' বলল রামিন।

মুখ-ভরা পাভলোভা নিয়ে বিড়বিড় করল পিটার, 'কী বললে?'

'সহজ প্ল্যান,' বলল রামিন। 'মোসিউ ক্যালভির সঙ্গে জরুরি আলাপ আছে। গত কয়েক মাস বেশ খুনোখুনি হয়েছে কয়েকটা দলের ভেতর। কাজেই খুব সাবধানে তাকে আড়াল করে রাখবে তার গার্ডরা। চাইলেও তার কাছে পৌঁছতে পারব না। কিন্তু ওর প্রিয় কাউকে তুলে আনলে, বাধ্য হয়েই আমার কথা শুনবে। এখন

প্রশ্ন হচ্ছে: তার ছেলে-মেয়ের কাউকে, নাকি আনব ওর উপপত্নীকে!'

'অ্যাঁ? কিডন্যাপের কথা ভাবছ?'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু সেটা তো অপরাধ!'

'আপনি তো বেশ মজার লোক!' মৃদু হাসল রামিন। 'আপনি কি ভাবছেন এমনিতেই ও তথ্য দেবে?'

সাবধানে চামচ নামিয়ে রেখে গম্ভীর চোখে রামিনকে দেখল পিটার, তারপর বলল, 'রামিন, একটা কথা মাথায় রাখো, আমি একজন পুলিশ অফিসার। তুমি কাউকে কিডন্যাপ করে আনবে, আর আমি চুপ করে বসে থাকব? ওই গ্যাংস্টার দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ লোক হলেও আমি তার বাচ্চা বা উপপত্নীকে কিডন্যাপ করতে পারব না।'

'আপনি আসলে কিছুই করবেন না,' বলল রামিন। 'চুপচাপ বসে থাকবেন এই অ্যাপার্টমেন্টের ব্যালকনিতে, দামি ওয়াইনে একটা-দুটো চুমুক দেবেন, আর দেখবেন চারপাশের চমৎকার দৃশ্য।'

নীরব দীর্ঘ একটা মুহূর্ত পেরিয়ে গেল। রামিনের কথা শুনে অস্বস্তির ভেতর পড়ে গেছে লারসেন। চিন্তা করতে গিয়ে পাভলোভার শেষ অংশ আর মুখে দিতে পারল না।

'আপনার কাছে এর চেয়ে ভাল কোনও প্ল্যান আছে?' জানতে চাইল রামিন।

'না, নেই। কিন্তু আমার ধারণা হয়েছিল, চারপাশ ঘুরে পরিস্থিতি বুঝতে চাইব আমরা। পরে কাজে নামব।'

মাথা দুলিয়ে বলল রামিন, 'আমরা ঠিক তা-ই করব। সত্যি বলতে, আজ রাতেই শুরু করব কাজ। প্রথমে ঘুরতে যাব রেড চিতা নাইট ক্লাবে। তার আগে জেনে নেব, কোথায় স্কুলে যায়

লোকটার ছেলে-মেয়ে। এ ছাড়া, অন্য কোনও তথ্যও কাজে আসতে পারে। হয়তো সেসব জানে আপনার বন্ধু অ্যালেকযেন্দ্রে ব্যারারে। আজ আমরা জেনে নেব পওলোর উপপত্নী ঠিক কোন্ সময়ে ক্লাব ছেড়ে বাড়ি ফেরে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, পিটার, এ ছাড়া উপায় নেই। আমি যদি লোকটার লেফটেন্যান্ট বা তার দুই ভাইয়ের কাউকে তুলে আনি, তাতে কোনও কাজই হবে না। পওলো অত্যন্ত নির্দয়, নির্মম ও নিষ্ঠুর লোক।'

'তার মত তা হলে আরও কেউ আছে,' বিড়বিড় করে বলল পিটার।

শুনেও যেন শোনেনি রামিন। ওর মন ব্রাসেলসের ছোট ওই ক্লিনিকে। কিছুটা দ্বিধান্বিত। নিরাপদ নীড় থেকে নিচে পড়তে শুরু করা পাখির ছানার মত লাগছে। দুই ডানা ঝটকা দিয়েও উঠে যেতে পারছে না। যেন পড়েই যেতে হবে মাটিতে। কঠিন মনের ছেলে, কঠোর, পেরেকের মত শক্ত। নিখুঁত ট্রেনিং দেয়া হয়েছে ওকে। পিটারের দিকে তাকাল রামিন। ওর দিকে চেয়ে আছে লোকটা। চোখে সমীহ।

আগামীকাল, ভাবল রামিন, সুসি গোল্ডাকে ফোন করবে, জানিয়ে দেবে ওর পাওয়া তথ্য যেন জানিয়ে দেয় মাসুদ ভাইকে। আর এরপর ক্লিনিক থেকে ছাড়া পেয়ে প্রথমেই এখানে আসবেন ওর ওস্তাদ। চট্ করে বলে দিতে পারবেন, কী করা উচিত এ পরিস্থিতিতে। পাখা মেলে দিয়ে আড়াল করবেন ওকে। কিন্তু আগামীকাল যদি কাজে নেমে পড়ে ও...

বিকেল তিনটেয় ফোন পেল ইন্সপেক্টর ব্যারারে। মন দিয়ে শুনল পিটার লারসেনের কথা। এক পর্যায়ে বলল, 'একমিনিট।' কমপিউটারের কি-বোর্ডে টোকা দিল সে। স্ক্রিন দেখে নিয়ে জানাল, 'ওরা দু'জনই পড়ে এক প্রাইভেট স্কুলে। ওটার নাম

নিকোল সেইন্ট স্টেইন। সুইটযারল্যাণ্ডের জেনেভার সামান্য বাইরে ওটা। বোর্ডিং স্কুল। খুবই নামকরা আর ব্যয়বহুল। আরও কিছু জানতে চান?'

'না, এ-ই যথেষ্ট,' বলল পিটার, 'কয়েক দিন পর আবার যোগাযোগ করব।' ফোন রেখে রামিনের দিকে তাকাল পিটার। কিছুক্ষণ আগে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরেছে ওরা। 'সুইটযারল্যাণ্ডের নামকরা বোর্ডিং স্কুলে পড়ে ওই লোকের দুই ছেলে-মেয়ে। হয়তো সপ্তাহের ছুটিতে বেড়াতে আসে। প্রয়োজন পড়লে জোগাড় করতে পারব ওই তথ্য।'

মাথা নাড়ল রামিন। 'না। আজ মঙ্গলবার। ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না। উপপত্নীকেই টার্গেট করতে হবে। আজ রাতে ওই নাইট ক্লাবে গিয়ে মেয়েটাকে বাজিয়ে দেখব। একাই যেতে চাই। আপত্তি নেই তো?'

'তা উচিত হবে না,' জোর দিয়ে বলল পিটার। 'এ নিয়ে অনেক ভেবেছি। তোমার সঙ্গে যাব। আজ রাতে কিছুই হবে না।' ডাইনিং টেবিলের দিকে আঙুল তাক করল সে। 'আমরা কি সঙ্গে পিস্তল নেব?' টেবিলে পাশাপাশি পড়ে আছে নাইন মিলিমিটারের দুই বেরেটা পিস্তল।

'না, আজ নয়,' বলল রামিন, 'ওই ক্লাবে ঝামেলা করতে পারে বাউন্সার আর ডোরম্যান। এ ধরনের ক্লাবে গোলমাল করলে বেদম পিট্টি দেয়া হয় কাস্টোমারকে।'

'কোপেনহেগেনে এদের রাখা হয় না।'

'এটা কোপেনহেগেন নয়,' হাসল রামিন।

নিজ অফিসে পিটার লারসেনের সঙ্গে ফোনালাপের পর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল অ্যালেকযেন্দ্রে ব্যারারে। ভাবছে কী যেন। চোখ টেলিফোনের ওপর। আরও দুই মিনিট পর ক্রেডল থেকে

রিসিভার তুলে বাটন টিপে নির্দিষ্ট নাম্বারে যোগাযোগ করল। তিন মিনিট কথা বলল, তারপর নিখুঁত বর্ণনা দিল পিটার লারসেন ও রামিন রেযার।

বারো

হলুদ দালানের বিশেষ এই অফিস অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং চমৎকার করে সাজানো। একবার দেখলেই বোঝা যায়, খুবই ভাল ব্যবসা করছে এই প্রাইভেট কোম্পানি। রিসেপশনের দুই সুন্দরী সেক্রেটারি বসে আছে কমপিউটার সামনে নিয়ে।

দুই ডেস্কের ওদিকে তিনটে করে চামড়া-মোড়া দামি সোফা। দেয়ালে নামকরা চিত্রকরের আঁকা ছবি। প্রতিটি ছবি সাগর, সাগরের ঝড় ও ডুবন্ত জাহাজের। বেশ কয়েক মাস পর আবারও মার্সেইল্‌স্-এর এই অফিসে এসেছে মাসুদ রানা। ভেতরে ঢুকে সেক্রেটারিদের পাত্তা না দিয়ে হনহন করে হাঁটতে লাগল নির্দিষ্ট অফিসের দিকে। দুই সেক্রেটারির একজন পুরনো, সে প্রায় লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বেসুরো কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু, মিস্টার রানা, আপনি না মারা গেছেন?'

'হ্যাঁ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই!' নিশ্চিত কণ্ঠে জানিয়ে দিল রানা। 'কিন্তু আপাতত বেঁচে উঠতে হয়েছে।' ভেতরের অফিসের দিকে হাতের ইশারা করল ও। 'আছে?'

'জী, আছেন,' বিস্ময় সামলে নিতে চাইল মেয়েটা। টিপে দিল ডেস্কের নিচে রাখা গোপন সুইচ। অফ করে দেয়া হয়েছে

ভিডিয়ো ক্যামেরা।

'আর কেউ আছে ওর সঙ্গে?' জানতে চাইল রানা।

'না।' মাথা নাড়ল মেয়েটা।

খুলে গেছে বড় সাহেবের দরজা।

'দুই মগ কফি, অ্যাঞ্জেলিয়া,' বেরিয়ে এসেছে গগল। সোজা এসে দাঁড়াল রানার সামনে। অনেকটা কোলাকুলির মত করে আলিঙ্গন করল ওরা। গম্ভীর কণ্ঠে বলল ভিনসেণ্ট গগল, 'রানা, এসো, ভেতরে বসা যাক।'

ইউরোপের সবচেয়ে সফল অস্ত্র ব্যবসায়ী সে। পাকা অস্ত্র চোরাকারবারীও। ওর কাছ থেকে অস্ত্র নিয়েই ইতালির বড় সব মাফিয়া দলের নেতাদের শেষ করে দিয়েছিল রানা। সেসব অস্ত্রের জন্য এক পয়সাও দিতে পারেনি রানা তাকে। পরস্পরকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করে ওরা, পরস্পরের কাছ থেকে সাহায্য পেলে মুখে সামান্য ধন্যবাদ না জানিয়ে, বন্ধুর কোনও বিপদ উৎরে দিয়ে শোধ করে ঋণ।

ওরা অফিসে ঢুকে মুখোমুখি চেয়ারে বসবার পর কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে গেল, তারপর সেক্রেটারি এসে টেবিলে নামিয়ে দিয়ে গেল দুই মগ কালো কফি। সে দরজা বন্ধ করে চলে যাওয়ার পর বলল গগল, 'কিছু গুজব ভাসছে বাতাসে।'

'কী ধরনের?' জানতে চাইল রানা।

'তোমাকে খুন করতে চাইছে সিআইএ। কয়েকবার চেষ্টাও করেছে।'

'মিথ্যা নয়।'

'লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে?'

'আপাতত।'

'কিন্তু গুহা থেকে বেরোলেই চোখে পড়বে?'

'হুঁ।'

‘তবুও বেরোতে হবে।’ কাঁধ ঝাঁকাল গগল। ‘কী ধরনের অস্ত্র দরকার?’

‘হালকা,’ বলল রানা। ‘সমস্যা অন্যখানে। লাগবে আজই।’

‘আজ চাইলে আজই পাবে।’

‘কিছু তথ্যও চাই। তুমি তো খবর রাখো আণ্ডারওঅর্ল্ডের। পতিতালয় আর ড্রাগসের সেক্টরে কাজ করব। আগেই জেনে নিতে চাই, এ শহরে ক্রিমিনালদের সেরা কে।’

‘তুমি বোধহয় খুঁজছ পওলো ক্যালভিকে,’ বলল গগল। ‘পতিতালয় সে-ই চালায়। ড্রাগসের ফিল্ডেও সে টপ বস।’ লোকটার চেহারা ও দৈহিক গঠন জানাল গগল। বাদ পড়ল না তার পরিবার, দুই ভাই, উপপত্নী ও লেফটেন্যান্টদের কথা। এক এক করে বলল কোথায় আছে তার বাড়ি ও ক্লাব। শেষ করল এই বলে, ‘রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী। পুলিশ তাকে এড়িয়ে চলে।’

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে কী যেন ভাবল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘তোমার যোগাযোগ কেমন পুলিশে?’

‘খারাপ না,’ বলল গগল, ‘এই লাইনে ওটা খুবই জরুরি। এ শহরের পুলিশ দুর্নীতি করতে করতে একেবারে পচে গেছে বলেই সুবিধা পাই। আগামী এক শ’ বছরেও মানুষ হবে না এরা।’

একটু সামনে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল রানা, ‘অ্যালেকযেন্দ্রে ব্যারারে নামের কোনও ইন্সপেক্টরকে চেনো?’

‘হ্যাঁ। খুব ভাল করেই।’

‘দুর্নীতি-পরায়ণ?’

গম্ভীর লোক গগল, মৃদু হেসে ফেলল। ‘রানা, ও-ই তো সবচেয়ে নোংরা পুলিশ অফিসার! প্রতিদিন ঘুষ খেয়ে আরও বড়লোক হয়ে উঠছে। পওলো ক্যালভির ডানহাত। বলতে পারো পার্টনার।’ রানার চোখে চোখ রাখল গগল। ‘আরও কিছু জানতে

চাও?'

'পওলোর ব্যাপারে জানতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তথ্যটা তাকে জানিয়ে দেবে সে, তাই না?' জানতে চাইল রানা।

মাথা দোলাল গগল। 'অবশ্যই!'

'অন্য দেশের পুলিশ পওলোর বিষয়ে জানতে চাইলে?'

'তা হলে আরও তাড়াতাড়ি জানাবে।'

নীরবতা নামল রানা ও গগলের মাঝে। আরও কিছুক্ষণ পর বলল রানা, 'তা হলে ওই অস্ত্রগুলো আমার লাগবে।'

'কী ধরনের জিনিস দরকার?'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল রানার কণ্ঠ: 'প্রথমে কোল্ট ১৯১১। আছে?'

'সবসময় রাখি।'

'তিনটে বাড়তি ম্যাগাযিন।'

'হবে।' মাথা দোলাল গগল।

'ছোট আকারের এসএমজি। ইনগ্রাম ১০ বা ওই ধরনের, ফোল্ডিং।'

'ইনগ্রাম ১০ আছে,' বলল গগল, 'কিন্তু তার চেয়ে অনেক ভাল জিনিস পেয়েছি।' উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালের কাছে চলে গেল সে। ওদিকটা ওক কাঠ দিয়ে প্যানেল করা। প্যানেল ডান পাশে সরিয়ে দিল গগল, দেখা দিল পিছনের মস্ত ওয়াল সেফ। নির্দিষ্ট নাম্বার ব্যবহার করে খুলল কমবিনেশন লক। সরিয়ে দিল ভারী ডালা। ভেতর থেকে বের করল কয়েকটা ধাতব বাক্স। উঠে গগলের পাশে গেল রানা। একটা বাক্সের ভেতর আছে বেশ কয়েকটি কোল্ট ১৯১১। ওখান থেকে একটা তুলে ওজন যাচাই করল রানা। আগের জায়গায় রেখে দিল অস্ত্রটা। এবার দেখল অন্যান্য বাক্স। একটা অস্ত্রের ওপর চোখ রেখে জানতে চাইল, 'এটা কী?'

‘ফেব্রিক ন্যাশনাল কোম্পানির এসএমজি,’ বলল গগল, ‘এফএন পি-৯০। বডি আর ম্যাগাযিন প্লাস্টিকের। ধাতুর বডি থেকে আলাদা করা যায় কমপোনেন্ট।’ মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে অস্ত্রটা খুলে ফেলল সে। আবারও জোড়া দিয়ে ধরিয়ে দিল রানার হাতে। ‘কনুই থেকে মধ্যমা পর্যন্ত লম্বা। কিন্তু দেড় শ’ গজ দূর থেকেও ভেদ করবে বডি-আর্মার। ন্যাটোর ব্যবহৃত রাইফেল বা কমপ্যাক্ট এসএমজির চেয়ে অনেক ভাল।’

মাথা দোলাল রানা, সন্তুষ্ট। কাঁধের স্ট্র্যাপে ঝুলিয়ে জ্যাকেট বা কোটের নিচে লুকিয়ে রাখতে পারবে এই অস্ত্র।

রানার মনে হলো ওর মন পড়ছে গগল। ‘তোমার জন্য শোল্ডার-স্ট্র্যাপ ও সাপ্রেসর জোগাড় করে দেব। একটু ভারী ও মোটা, কিন্তু অন্য কাঁধেও থাকবে স্ট্র্যাপ।’

নড করল রানা। ‘কোল্টের জন্যে সাইলেন্সার লাগবে।’

‘সমস্যা নেই। আর কী?’

‘চারটে ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড, চারটে ফসফোরেসেন্ট আর ওগুলো ঝুলিয়ে রাখার ওয়েবিং। ফসফোরেসেন্ট গ্রেনেডের জন্য কালো সানগ্লাস। এ ছাড়া, তিনটে হ্যাণ্ডকাফ।’

‘আচ্ছা,’ প্যাড বের করে যা যা লাগবে খসখস করে লিখে নিল গগল। ‘এসএমজি প্র্যাকটিস করতে পারবে আমার ওয়্যারহাউসে। ওজনে হালকা বলে বেশ লাথি মারে কিন্তু ওটা।’

মাথা নাড়ল রানা। ‘প্র্যাকটিসের সময় নেই। আজ দুপুরে রেকি করব। রাতে নামব কাজে। আরেকটা জিনিস দরকার। ওটা তোমার কাছে আছে কি না জানি না। গতবার খুব ছোট বোমা তৈরির জন্যে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ আর ডেটোনেটর দিয়েছিলে। সঙ্গে ছোট রিমোট কন্ট্রোল। কয়েক শ’ গজ দূর থেকে বোমা ফাটিয়ে দেয়ার ওই জিনিস আছে তোমার কাছে?’

‘পত্রিকায় পড়েছিলাম কী করেছিলে ইটালিতে,’ বলল গগল।

'চমৎকারভাবে লোকটাকে নরকে পৌঁছে দিয়েছিলে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'মন্দ লোক ছিল। ওই জিনিস জোগাড় করতে পারবে?'

ডেস্কের তিন টেলিফোনের বামেরটার রিসিভার তুলে নিল গগল, নাম্বার টিপে কী যেন শুনল কিছুক্ষণ, তারপর কথা বলল ফ্রেঞ্চ ভাষায়। আবারও শুনল কী যেন। ওর প্রতিটা কথা শুনছে রানা। ওর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল গগল, 'তৈরি জিনিস, না পরে নিজেই জোড়া দিয়ে নেবে কমপোনেন্ট?'

'কয়েক টুকরো থাকুক,' বলল রানা। 'তৈরি করে নেব।'

আবারও ফোনে কথা বলল গগল। ওদিকের কথা শুনে নিয়ে ফোন রেখে জানাল, 'সব কিছুর সঙ্গে পাবে সন্ধ্যা ছয়টায়। আর কিছু?'

কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবল রানা, তারপর বলল, 'একটা সেফ হাউস লাগবে। দ্রুতগামী গাড়িও। হাতের কোনও ছাপ যেন না থাকে। এ ছাড়া, ইউরোপের যে-কোনও দেশের সীমান্ত পেরোবার জন্যে গ্রিন কার্ড আর অন্য সব ডকুমেন্ট। ভরা থাকতে হবে গাড়ির ট্যাঙ্ক। ট্রাঙ্কে কয়েক শ' লিটার বাড়তি অকটেনের ক্যান। ওই গাড়ি পরে ফেরত দিতে পারব না। সেফ হাউস আর গাড়িতে তিনজনের জন্যে তিন দিনের খাবার।'

প্যাডে সব লিখে নিল গগল, মুখ তুলে বলল, 'কোনও সমস্যা নেই। তোমাকে যে সেফ হাউস দেব, ওটার খুব কাছেই আমার পেন্টহাউস। পুরো ওই ব্লক কিনে নিয়েছি। কাজেই কেউ জানবে না তুমি ওখানে। স্থানীয় বিএমডাব্লিউ ডিলার আমার বন্ধু, ওর কাছ থেকে নেব ভাল কোনও সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি। সার্ভিসিং করে দেবে।'

রানা বসবার পর আবারও নিজ চেয়ারে বসল গগল। গম্ভীর হয়ে গেল মুখ। 'পওলো ক্যালভির বিরুদ্ধে নামছ। মনে রেখো,

ওর পেশাদার খুনির অভাব নেই। গার্ড দিয়ে রাখা হয় তাকে। তুমি চাইলে সঙ্গে নিতে পারো পেঁচা ব্রিয়াঁ ফুলজেন্সকে। খুশি হবে তোমার কাজে আসতে পারলে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আপাতত না।'

ওদের কথা শেষ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা।

কয়েক সেকেণ্ড বন্ধুকে দেখল গগল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সব পৌঁছবে সন্ধ্যা ছয়টায়। এ ছাড়া, কিছু তথ্য পাব অ্যালেকযেন্দ্রে ব্যারারের বিষয়ে। তারপর তোমার সেফ হাউস ও গাড়ি দেখব আমরা। আরও কিছু লাগলে ল্যাণ্ড ফোনে যোগাযোগ করবে। পেন্টহাউসের নাম্বার তো তোমার জানাই আছে।'

এসব জিনিসের জন্য টাকা দিতে চাইলে অপমানিত হবে গগল, কাজেই এ বিষয়ে একটা কথাও না বলে হাত বাড়িয়ে দিল রানা। আন্তরিকভাবে হ্যাণ্ডশেক করল ওরা।

রানা অফিস ছেড়ে চলে যেতে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল গগল। দেড় মিনিট পর ফুটপাথে রানাকে দেখল, রাস্তায় ট্যাক্সির অভাব নেই, কিন্তু ওর বন্ধু হেঁটে চলে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে। কোথাও মিটিং শেষ করে লাফিয়ে ট্যাক্সিতে ওঠে না রানা, আগে বুঝে নেয় কোনও লেজ জুটে গেছে কি না।

ঘুরে দরজার দিকে পা বাড়াল গগল। পুরনো সেক্রেটারিকে বলল, 'দেখো তো পওলো ক্যালভির কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে আমার কত শেয়ার আছে।'

কি-বোর্ড টিপে মনিটরে মন দিল মেয়েটি, কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'পঁচিশ হাজার। গত সপ্তাহে অনেক ওপরে উঠেছে। সহজে পড়বে না। আগামী মাসে নতুন ব্রিজ আর ফ্লাইওভারের কাজ ওরাই পাচ্ছে। বিশাল প্রজেক্ট।'

গম্ভীর গগল নিচু স্বরে বলল, 'আজই বিক্রি করে দাও সমস্ত শেয়ার।'

তেরো

ডেস্কে কোমর ঠেকিয়ে দীর্ঘ ওয়ান-ওয়ে আয়নায় চোখ রেখেছে সে। এমনই অকল্পনীয় রূপসী, অনায়াসেই তৈরি করবে দুনিয়ার যে-কোনও রাজধানীতে প্রচণ্ড ট্র্যাফিক জ্যাম। সুললিত দেহে উন্নত স্তন যেন পাহাড়-চূড়া। সরু কটির পর ঢেউ তোলা ভারী নিতম্ব। লোভনীয় ঊরু যেন কচি কলাগাছের কাণ্ড। গভীর রাতে গাঢ় নীল স্যাটিনের পোশাকে অদ্ভুত লাগছে ওর কাঁধে এলিয়ে থাকা ধূসর-সোনালি চুল। স্বর্গের ইন্দ্র নির্ঘাত বেহুঁশ হয়ে পড়বেন ওই মেয়ের রূপ দেখে।

ওয়ান-ওয়ে মিররের ওপাশ থেকে চোখ রেখেছে বার-এ। যে অফিসে আছে, ওখান থেকে দেখা যায় পুরো বেযমেণ্ট ক্লাব। ডানদিকে ছোট এক উঁচু মঞ্চ, পিছনে চার বাদ্যযন্ত্রের ব্যাণ্ড। চার দেয়াল ঢাকা টকটকে লাল ভেলভেটে, মাঝে চকচকে পাইন কাঠের ড্যান্স-ফ্লোর। কাস্টোমারদের বেশিরভাগই মধ্যবয়স্ক ব্যবসায়ী, সঙ্গে দীর্ঘ গাউন পরিহিত সুন্দরী মেয়ে। ওয়েট্রেসদের পরনে ক্রিম সিল্কের ছোট্ট ব্লাউজ, বুক সামান্য ঢেকে ইঙ্গিত দিচ্ছে— এই যে, দেখো, এখানে কী! কোমরে খাটো লিক্রা মিনি স্কার্ট। ঊরুতে কালো নেটিঙের স্বচ্ছ মোজা, নিচে হাঁটুতক কালো চামড়ার বুট।

দরজা পেরিয়ে ক্লাবে দু'জন লোক ঢুকতেই ওদিকে মন দিল

অপ্সরা। তাদের একজন সোনালি চুলের লোক। রোদে পোড়া মুখ। কিছুটা মোটা। অ্যাবে ল্যামন্টে ধারণা করল, ওই লোকের বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ। অন্যজন তরুণ। মাথা ভরা কুচকুচে কালো চুল। গায়ের ত্বক বাদামি। দেখতে দারুণ সুপুরুষ। ওই ছেলের বিছানায় উঠতে পারলে দারুণ হতো, কিন্তু উপায় নেই।

অ্যাবের সামনে বার-এ বসল ওরা দু'জন। কয়েক সেকেণ্ড দেখা গেল না। ঝুঁকে অর্ডার নিচ্ছে বারমেইড। কাত হয়ে ডেস্কের এক সারি সুইচের একটা অন করল অ্যাবে। শুনতে পেল তাদের দু'জনের কণ্ঠ। ইংরেজি বলছে তারা। সোনালি চুলের লোকটা শিভাস রিগাল উইস্কি ও সোডা চেয়েছে। লোভনীয় তরুণ চায় ক্যামপারি, সঙ্গে তাজা কমলার জুস। আগেই তাকে বলে রাখা হয়েছে, তাই ড্রিঙ্ক তৈরি করতে করতে তাদের সঙ্গে আলাপ জুড়েছে বারমেইড। নিয়ম মত প্রথমেই সে জানতে চেয়েছে, ওরা কোথা থেকে এসেছে। সোনালি চুলের লোকটা বলল, সে এসেছে স্টকহোম থেকে। আর পুরুষ-মডেলের মত সুন্দর তরুণ জানাল, সে বাস করে সাইপ্রাসে। বারমেইড জানাল, একটু পর শুরু হবে মাঝরাতের ফ্লোর শো। ওরা চাইলে টেবিল বুক করতে পাবে। মানা করে দিল তরুণ, আপাতত বারেই থাকতে চাইছে তারা।

ড্রিঙ্ক দিয়ে অন্য কাস্টোমারদের দিকে চলে গেল বারমেইড। আবারও লোক দু'জনকে গভীর মনোযোগে দেখল অ্যাবে। কয়েক সেকেণ্ড পর মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করল কার সঙ্গে যেন। 'ক্যাল, ওরা এখানে... হ্যাঁ, একদম মিলে গেছে চেহারা।' কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে ওদিকের কথা শুনে বলল, 'ঠিক আছে, ফ্লোর শো একটু পর শুরু হচ্ছে।' ফোন রেখে দিল অ্যাবে। ডেস্ক থেকে সরে রওনা হলো দরজার দিকে।

গুহার মত প্রবেশ-দ্বার খুলে অদ্ভুত সুন্দরী বেরিয়ে আসতেই তার

দিকে মাথা ঘুরে গেছে পিটার ও রামিনের। হাসতে হাসতে ওদের দিকেই আসছে নীল পরী। ভাল করেই জানে, তার চেহারা কেমন প্রভাব ফেলে মানুষের ওপর। পাগল বা গে ছাড়া কেউ চোখ সরাতে পারবে না তার ওপর থেকে।

থমকে দাঁড়িয়ে সোনালি চুলের লোকটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। মিষ্টি রিনরিনে কণ্ঠে বলল, 'ওয়েলকাম টু দ্য রেড চিতা। আমি অ্যাবে, ম্যানেজারেস।' পিটারের হাতে চাপ দিল সে। পাল্টা চাপ দিল পিটার, একটু বেশি লাল হয়ে গেছে দুই গাল। হাতটা ছাড়িয়ে নিল অ্যাবে, দু'পা সরে হ্যাণ্ডশেক করল রামিনের সঙ্গে। এবারও মাপা চাপ দিল হাতে। পাল্টা চাপ দিল না তরুণ, তার গাল লাল হতেও দেখল না অ্যাবে। এমন কী ওর উঁচু স্তনের দিকেও চোখ নেই তরুণের। স্বাভাবিক চোখে ওকে দেখছে রামিন। অতি আগ্রহী বা বেহুঁশ বা মুগ্ধ নয়।

এই তরুণ সত্যিই দুর্দান্ত আকর্ষণীয়, মনে মনে বলল অ্যাবে। আগ বাড়িয়ে কয়েক মিনিট গল্প করল। সাধারণ কিছু প্রশ্ন করল, তারপর জানিয়ে দিল, ওরা চাইলে বেছে নিতে পারে সঙ্গিনী। এ ক্লাবে অন্যান্য ব্যবস্থাও আছে। ওপর তলায় গেলেই পেয়ে যাবে শারীরিক সম্পর্কের জন্য রূপসী তরুণী।

'আমাদের ক্লাবে রাতে খুব ভাল ফ্লোর শো হয়,' বলল অ্যাবে, 'কিন্তু রাত একটার সময় আছে বিশেষ... কী বলা উচিত?... বিশেষ আদিম শো? ওপর তলায় হবে ওটা। সাধারণত কাস্টোমারদের রিযার্ভ করা থাকে ওই শো। কিন্তু প্রথমবারের মত এসেছ, আমি আমার গেস্ট হিসেবে তোমাদেরকে নিয়ে যেতে পারি ওই শো-তে।'

কিছু বলতে গিয়ে হাঁ করল পিটার, কিন্তু তার আগেই বলল রামিন, 'আপনার অনেক দয়া। খুব সম্মানিত বোধ করছি।'

মিষ্টি হাসল অ্যাবে, যে দৃষ্টিতে রামিনকে দেখল, তাতে তরুণ

বুঝে গেল, একান্তে পাওয়ার জন্যে ওকে বেছে নিয়েছে এই টাইম বম।

'রাত একটার আগে তোমাদের নিয়ে যাব।' ঘুরে আগের ওই গুহার মত দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল মেয়েটা।

অপ্সরার কটি ও নিতম্বের দোল দেখছিল পিটার ও রামিন। বিড়বিড় করল পিটার, 'তুমি সেক্স শো দেখবে? কোপেনহেগেনে ভাইস স্কোয়াডে তিন বছর ছিলাম, দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারি, আসলে এসব শো মোটেও মজার নয়।'

নিচু স্বরে বলল রামিন, 'না গিয়ে উপায় নেই। প্রথম সুযোগে ভাল করে দেখতে হবে এই দালান। তারপর প্রথম সুযোগে তুলে নিয়ে যাব ওই মেয়েকে।'

কয়েক সেকেণ্ড পর মৃদু মাথা দুলিয়ে বলল পিটার, 'সন্দেহ কী, ওই লোকের বাচ্চার বদলে ওই মেয়েকেই চাইবে তুমি!'

চোদ্দ

পিটার লারসেনকে যেভাবে আগাম বিপদ জানিয়ে দেয় ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, ঠিক সেইভাবে অ্যালেকযেন্দ্রে ব্যারারেকে সতর্ক করে না। সে জানেও না পিছু নেয়া হয়েছে। অফিস ত্যাগ করে সন্ধ্যা সাতটের সময় রেনোঁ গাড়ি নিয়ে বেযমেন্টের গ্যারাজ ছেড়ে রওনা হয়ে গেল সে। কখনও অফিসে আনে না নতুন চকচকে মার্সিডিজ বেন্‌য্‌টা।

ভিড়ের ভেতর খেয়াল করল না, পিছু নিয়েছে ভাড়া নেয়া এক সিত্রোঁ। রু দে ল'এভেশে পৌঁছে গাড়ি রাখল ও'বেরি বার-এর সামনে। ওখানে পার্ক করা নিষেধ। দ্বিধাহীনভাবে গাড়ি লক না করেই ঢুকে গেল বার-এ। মার্সেইল্স্-এর পাতি সব চোর ভাল করেই জানে, ওই গাড়ি কার। দু'মিনিট পেরোবার আগেই ব্যারারের সামনে পৌঁছে গেল প্রতিদিনের ভোদকা টনিক। কয়েক বছর আগে ভারী স্তনের এই বারমেইডের প্রতি দুর্বলতা তৈরি হয়েছিল। আজও গল্প করে সুযোগ পেলে। রাত নয়টা পর্যন্ত একের পর এক ড্রিঙ্ক করল ব্যারারে, তারপর কল করে স্ত্রীকে জানিয়ে দিল, জরুরি কাজে আটকা পড়েছে, বাইরে সেরে নেবে ডিনার।

বার থেকে বেরিয়ে চার ব্লক পেরিয়ে রু দে রোলেতের এক গলিতে রাখল গাড়ি। পাশেই চেয এতিয়েনে রেস্তোরাঁ। এবারও অরক্ষিত রয়ে গেল গাড়ি। রেস্তোরাঁয় ঢুকে অলস ভঙ্গিতে শেষ করল ভেজিটেবল সুপ, ফিলেট স্টেক, সঙ্গে ট্রাফলস ও সৌফল, তারপর ক্রেপ্স্ সুয়েযেত্স ফ্ল্যামবি, সঙ্গে এক বোতল শ্যাঁতো মাখগুঁয়ে। এরপর আয়েস করে গিলল কফি ও ভিনটেজ কনিয়্যাক। খুব দামি রেস্তোরাঁ, কিন্তু মাঝরাতে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার পর তার কাছে কেউ বিল চাইল না। রেস্তোরাঁর মালিক আগেই হাতের ইশারায় বেয়ারাদের জানিয়ে দিয়েছে, কেউ যেন দাবি না করে টাকা।

গলির ভেতর আবছা অন্ধকার। প্রচুর মদ্যপান করেও নিজেকে সামলে রাখতে পারে ইন্সপেক্টর ব্যারারে, কিন্তু আজ একটু একটু টলছে। রেনোঁর দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটে উঠল সে। ধপ্ করে হেলান দিল সিটে। দড়াম আওয়াজ তুলে বন্ধ করল দরজা। হাত বাড়িয়ে দিল ইগনিশন চাবির দিকে। আর তখনই টের পেল, খুব শীতল কিছু ঠেকেছে তার ঘাড়ে। ঠাণ্ডা এবং

নিস্পৃহ কণ্ঠ শুনল পিছনে। নিখুঁত ফ্রেঞ্চ বলছে লোকটা।

'এটা কোল্ট ১৯১১। ভেতরে নরম নাকের .৪৫ শেল। যা বলা হবে, ঠিক সেভাবে চলবে, নইলে ওই বুলেট ঢুকবে তোমার মগজে।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল ইন্সপেক্টর ব্যারারে। রক্তে অ্যাড্রেনালিন মিশছে বলেই ভয় পেল না। 'কে তুমি?' গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইল। 'গাধা, তুমি জানো আমি কে?'

পিছন থেকে শীতল কণ্ঠ বলল, 'তুমি ইন্সপেক্টর অ্যালেকযেন্দ্রে ব্যারারে। চুপচাপ থাকো, নইলে বেশিরভাগ মগজ ছিটকে গিয়ে নষ্ট করবে সামনের কাঁচ। এবার গাড়ি চালু করো। সোজা যাবে মাছের পুরনো বাজার এলাকায়। স্বাভাবিক গতি তুলে সাবধানে চলবে। তুমি বাঁচবে না মরবে, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। কাজেই চালাকি করলে ওটাই হবে তোমার জীবনের শেষ চেষ্টা।'

খুব সাবধানে গাড়ি চালাল অ্যালেকযেন্দ্রে ব্যারারে, ঝড়ের গতিতে খেলাচ্ছে মগজ। পিছনের সিটে কে এই লোক? গ্লাভ্ কমপার্টমেন্টে পিস্তল আছে, কিন্তু খুলতে পারবে না ওই লক। ইগনিশনের রিঙে আছে ওর চাবি। ওকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছে লোকটা, সেখানে পৌঁছে ঝুঁকি নিতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। ইঞ্জিন বন্ধ করলে গাড়ি থেকে নামতে হবে লোকটাকে, তখন এক বা দুই সেকেণ্ড সময় পাবে। চট্ করে গ্লাভ্ কমপার্টমেন্ট থেকে পিস্তল নিয়েই...

মাছের পুরনো মার্কেট এলাকায় পৌঁছে গেল গাড়ি, দু'চার কথায় গন্তব্যের দিক নির্দেশনা দিল লোকটা। কিছুক্ষণ পর এক সারি গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি পাশে রেখে আবছা আলো ভরা এক রাস্তায় পৌঁছল ওরা। পাশেই পরিত্যক্ত কিছু গ্যারাজ। একটু দূরে নতুন করে ভাড়া নেয়া হয়েছে কয়েকটা গ্যারাজ।

আধঘণ্টা আগেই পেরিয়ে গেছে মাঝরাত।

রাস্তা ফাঁকা।

পিছন থেকে গম্ভীর কণ্ঠ বলল, 'গাড়ি রেখে হ্যাণ্ডব্রেক ব্যবহার করো।'

হ্যাঁচকা টানে হ্যাণ্ডব্রেক তুলবার পর অ্যালেকযেন্দ্রে টের পেল, ঘাড়ের পেছন থেকে সরে গেছে চাপ। মানসিকভাবে তৈরি হয়ে গেল সে। এবার...

কিন্তু এক সেকেণ্ড পর মাথার তালুতে ঠাস্ করে নামল কী যেন। চোখের সামনে ঝিলমিলে উজ্জ্বল আলো দেখল ব্যারারে, পরক্ষণে জ্ঞান হারাল।

আবারও চেতনা ফিরল, জানে না কোথায় আছে। হ্যাঁ, কাত করে ফেলে রাখা হয়েছে তাকে। দু'হাত পিছনে হ্যাণ্ডকাফে আটকানো। ভীষণ ব্যথা মাথায়। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে কসরৎ করে উঠে বসল সে। চারপাশে চোখ বোলাল। আছে একটা গ্যারাজে। ছাতে জ্বলছে এক শ' ওয়াটের ন্যাংটো এক টাংস্টেন বাতি। একপাশে পুরনো কাঠের টেবিল ও দুটো চেয়ার। একটা চেয়ারে বসে আছে কালো পোশাক পরা এক যুবক। নিষ্ঠুর চোখে দেখছে তাকে। লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে টেবিল থেকে তুলে নিল কালো একটা ভারী পিস্তল। ওটার মাযলে সাইলেন্সার।

মনে হলো কোনও দিকে তাক না করেই ট্রিগার টিপল সে। অ্যালেকযেন্দ্রের মাথার দুই ইঞ্চি ওপরের দেয়ালে বিঁধল বুলেট। ঝরঝর করে প্লাস্টার ঝরল চোখে-মুখে। ভীষণ ভয় পেয়ে গুঙিয়ে উঠল ব্যারারে, হাঁটুতে ভর করে সরে গেল। তার মাথার একটু দূরে বিঁধল আরেকটা বুলেট। আতঙ্কে থরথর করে কাঁপতে লাগল পুলিশ ইন্সপেক্টর।

চেয়ারের দিকে ইশারা করল লোকটা। খুব শান্ত সুরে বলল,

'উঠে দাঁড়িয়ে ওখানে বসো।'

কয়েক সেকেণ্ড নড়তে পারল না অ্যালেকযেন্দ্রে। হামাগুড়ির ভঙ্গিতে বসে আছে। তেল্‌ভরা কংক্রিটের ওপর চোখ।

'যা বলছি করো, কোনও প্রশ্ন করবে না। আমি আদেশ না দিলে বন্ধ রাখবে মুখ।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ব্যারারে। তীব্র ব্যথায় দপ্‌-দপ্‌ করছে মাথা। টেবিলের উল্টো দিকের চেয়ারে গিয়ে বসল। দৃষ্টি ওদিকের লোকটার ওপর। কুচকুচে কালো মায়াময় চোখে চেয়ে আছে বিদেশি লোকটা ওরই দিকে। ব্যারারের চোখ পড়ল টেবিলে। ওখানে বেশ কিছু জিনিস। চিনল না। ডেবে যাওয়া দুটো গোল ধাতব ডিস্ক, ধারালো কিনারা। সাদাটে এক দলা ময়দার মত কিছু। ছোট একটা ধাতুর টিউব। ওটার সঙ্গে দুটো তার। ছোট একটা ধাতুর বাক্স, মাঝে দুটো বাটন।

'জানতে চাও ওগুলো কি?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'না,' বিড়বিড় করল ব্যারারে।

'এসব ছোট কিন্তু খুবই শক্তিশালী একটা বোমার টুকরো অংশ।' সামনে ঝুঁকে অপেক্ষাকৃত বড় ধাতব ডিস্কের দিকে আঙুল তাক করল। 'ওই ডিস্কের ব্যাস ছয় ইঞ্চি। ওটা পেছনের কেসিং।' ছোট ডিস্ক দেখাল। 'আর এটা চার ইঞ্চি ব্যাসের। সামনের কেসিং।' ধূসর ছোট দলা দেখাল। 'ওগুলো প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ।' এবার আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল কালো রঙের ছোট একটা ধাতব বাক্স। 'ওটা রিমোট কন্ট্রোল।' আলাপের সুর যুবকের কণ্ঠে: 'এত বড় বোমা নয় যে গুঁড়িয়ে দেবে গোটা দালান। কিন্তু তৈরি হয়ে গেলে আটকে দেব তোমার মেরুদণ্ডে। যখন বিস্ফোরিত হবে, উড়ে যাবে তোমার অর্ধেক শরীর।'

জিনিসগুলোর ওপর থেকে চোখ সরাতে পারল না ব্যারারে।

নিষ্ঠুর চেহারার যুবক বলল, 'আমরা কয়েক ঘণ্টা পাশাপাশি

থাকব। তুমি কিছু জরুরি প্রশ্নের জবাব দেবে, আর সেগুলো ঠিক হলে তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব দূরে। অবশ্য তোমার মেরুদণ্ডে সবসময় থাকবে ওই বোমা। আমার পকেটে থাকবে ডেটোনেটর। আঙুল থাকবে বাটনে। প্রার্থনা করবে, যেন হোঁচট না খাই বা কেউ ধাক্কা না দেয় আমাকে।'

মুখ তুলে আবারও শীতল চোখের যুবককে দেখল ব্যারারে। ব্যাঙের মত কর্কশ আওয়াজ বেরোল কণ্ঠ থেকে: 'তুমি কে?'

'তোমার জন্যে জীবন বা মৃত্যু। কোন্‌টা বেছে নেবে তা তোমার ব্যাপার।'

'কী চাও তুমি?'

সামনে ঝুঁকে বোমা তৈরি করতে লাগল যুবক। ভীত চোখে দেখছে ব্যারারে। বুকে ভীষণ ভয় অনুভব করল। শুনতে পেল যুবকের কণ্ঠ: 'পিটার লারসেন নামের এক ডেনিশ পুলিশ তোমার সঙ্গে দেখা করেছিল। তা বোধহয় আজ সকালের কথা। সে তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, এই শহরের দু'একজন ক্রিমিনালের বিষয়ে। দেখতে চেয়েছিল তোমার ফাইল।'

তার কাজ দেখছে ব্যারারে, কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'

বোমার কমপোনেন্ট টেবিলে রাখল যুবক, উঠে এসে মুঠো করে ধরল ব্যারারের চুল। হ্যাঁচকা টানে তাকে দাঁড় করিয়ে ঝড়ের গতিতে বামহাতের শক্ত করা আঙুল ব্যবহার করল পর পর তিনবার। প্রতিবার লাগল আলাদা আলাদা নার্ভ-এ।

তীব্র ব্যথায় পাগল হয়ে গেল ব্যারারে, মনে হলো দাউ-দাউ করে জ্বলছে মগজ। ধাক্কা খেয়ে আবারও ধপ্ করে বসল চেয়ারে।

টেবিলের ওদিকে চলে গেল যুবক, আবারও চেয়ারে বসে ব্যস্ত হয়ে উঠল বোমা তৈরির কাজে। নিচু স্বরে বলল, 'আমার প্রশ্নের জবাব না দিলে বার-বার ব্যথা পাবে। প্রতিবার আগের চেয়ে

বেশি। এরপরেও আপত্তি থাকলে একটা একটা করে উড়িয়ে দেব তোমার হাতের আঙুল। তারপর উড়বে তোমার পায়ের বুড়ো আঙুল।'

টেবিলে দু'হাত রেখে তার ওপর মাথা রাখল ব্যারারে। পাগল হয়ে গেছে ব্যথায়। কিছুক্ষণ পর চোখ তুলে দেখল যুবককে। বুঝে গেল, একটা কথাও মিথ্যে বলছে না এই লোক। অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল ব্যারারে, 'হ্যাঁ, এসেছিল লারসেন। সঙ্গে তরুণ এক ছেলে। লারসেন বলেছিল, ওই ছেলে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট। কিন্তু বিশ্বাস করিনি। অনেক কম বয়স। তা ছাড়া, সে ডেনিশ নয়।'

বড় ডিস্কে এক্সপ্লোসিভ ভরল যুবক। ধাতব ছোট টিউবের স্ক্রু খুলল। পরীক্ষা করে দেখল ক্যাডমিয়াম সেল ব্যাটারি। তারপর দুই তার সংযুক্ত করে সাবধানে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভে গেঁথে দিল ডেটোনেটর।

'কোনও ফাইল দেখিয়েছ ওদেরকে?' মুখ না তুলেই জানতে চাইল যুবক।

'হ্যাঁ।'

'কোন্ ফাইল?'

'ভাইস অ্যাণ্ড ড্রাগ্স্।'

'কোন্ দলের ওপর ফাইল?'

ঝিমুনি ও বমি আসছে ব্যারারের। ভয় লাগছে খুব। বড় করে কয়েকবার দম নিল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'জানি না। তখন ওখানে ছিলাম না। সত্যিই বলছি। ওদের জন্যে খুলে দিই একটা অফিস।'

বোমার সামনের কেসিং-এর স্ক্রু আটকে নিল যুবক। মুখ তুলে জানতে চাইল, 'এই শহরে ভাইস আর ড্রাগসের ব্যবসায় সেরা কোন্ গ্যাংস্টার?'

চুপ করে থাকল ব্যারারে, অবশ্য কয়েক সেকেণ্ড পর বলল,

‘এক আরব। নাম আহমেদ... লুক্কা আহমেদ।’

সাবধানে টেবিলে বোমা রেখে উঠে দাঁড়াল যুবক। চলে এল ব্যারারের সামনে। আবারও চুলের গোছা ধরে বামহাতে কয়েকটা মাপা ঘুষি দিল বুকে ও মুখে।

দু’মিনিট পর আবারও সোজা হয়ে বসতে পারল ব্যারারে। মুখে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার ছাপ। যেন তাকে আর মারা না হয়, সে জন্য কাতর অনুরোধ করল, ‘কেন... ভাই... মারছেন কেন? বিশ্বাস করুন, আপনার সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছি।’

‘মিথ্যা,’ সংক্ষেপে বলল রানা। ‘রক্ষা করতে চাইছ তোমার বন্ধু পওলো ক্যালভিকে। শহরের সবচেয়ে বড় গ্যাংস্টার সে। অনেক টাকা দেয় তোমাকে। আবারও মিথ্যা বললে কষ্ট বাড়বে। মগজে গেঁথে নাও, বেশিরভাগ জবাবই আমার জানা। মিথ্যা বললে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়বে। পওলো ক্যালভির সঙ্গে শেষ কখন কথা বলেছ?’

আবারও টেবিলে চোখ রাখল ব্যারারে। ভাবছে, লোকটা কতটুকু জানে? এটা বুঝতে পারছে, ভয়ঙ্কর ব্যথা দিতে পারে সে। সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেছে তার।

‘আজ দুপুরের পর কথা হয়েছে,’ বলল ব্যারারে। ‘তিনটের দিকে। টেলিফোনে।’

‘কী বলেছ ওকে?’

নীরব হয়ে গেছে গ্যারাজ।

কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে বলল ইন্সপেক্টর, ‘ওকে বলেছি, ডেনিশ মিসিং পার্সন্স ব্যুরো থেকে এসে তার ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছে এক পুলিশ অফিসার। জানতে চেয়েছে ক্যালভির ছেলে-মেয়েরা কোন্ স্কুলে পড়ে।’

‘কোথায় পড়ে ওরা?’

‘প্রাইভেট স্কুলে। সুইটযারল্যাণ্ডের নামকরা বোর্ডিং স্কুল।’

'ওরা এখন ওখানে?'

'হ্যাঁ।'

'স্ত্রীর সঙ্গে কেমন সম্পর্ক পওলো ক্যালভির?'

তথ্য জোগান দিল অ্যালেকযেন্দ্রে ব্যারারে। 'সম্পর্ক ভাল না। প্রেমিকা আছে ক্যালভির। ওই মেয়ের নাম অ্যাবে ল্যামণ্টে। শহরের এক অ্যাপার্টমেণ্টে ওকে রেখেছে। ওই মেয়ে ওর নামকরা ক্লাব রেড চিতার ম্যানেজারেস।'

আরও নীরবতা নামল গ্যারাজে। রামিনের জায়গায় নিজেকে ভাবছে রানা। কাজটা কঠিন নয়। সত্যি বলতে, নিজ হাতে গড়ে তুলেছে ওকে। রামিন চাইবে পওলো ক্যালভির কাছের কাউকে কিডন্যাপ করতে। যেহেতু বোর্ডিং স্কুলে ক্যালভির ছেলে-মেয়ে, কাজেই বেছে নেবে তার প্রেমিকাকে। রেকি করতে যাবে ওই ক্লাবে। চট্ করে হাতঘড়ি দেখল রানা।

রাত সোয়া একটা।

জানতে চাইল রানা, 'তার মানে পিটার লারসেন বা রামিন রেযার চেহারার বর্ণনা পেয়েছে পওলো?'

'হ্যাঁ। সংক্ষেপে।'

আবারও চুপ হয়ে গেল রানা, ভাবছে। কিছুক্ষণ পর আঙুল তাক করল গ্যারাজের মেঝের দিকে। 'হাঁটু গেড়ে বসো ওখানে।'

ভীষণ ভয়ে বিকৃত হয়ে গেল অ্যালেকযেন্দ্রে ব্যারারের চেহারা। 'কেন?'

উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওদিক থেকে বলল রানা, 'যা বলছি করো, নইলে অনেক বেশি ব্যথা পাবে।'

খুব ধীরে চেয়ার ছাড়ল ব্যারারে, গ্যারাজের মেঝেয় হাঁটু গেড়ে বসল। বোমা ও মাস্কিং টেপের রোল নিল রানা। ফ্রেঞ্চ লোকটার পিছনে পৌঁছে টেনে নামাল জ্যাকেট, আটকা পড়ল তার দু'হাত। ঘাড় ধরে মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিল আরও। মেঝে ছুঁই-ছুঁই

করছে ব্যারারের নাক।

চার ফুট লম্বা করে টেপ কেটে মেঝেতে বিছাল রানা, ওপর দিকে রাখল আঠালো অংশ। ওখানে আটকে দিল বড় ডিস্ক। ওপরদিকে রইল ছোট ডিস্কটা। সাবধানে ব্যারারের মেরুদণ্ডে বসিয়ে দিল ওটা। আরও টেপ ব্যবহার করে এবার পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পিঠে শক্তভাবে আটকে দিল বোমা।

ব্যারারের গলা থেকে বেরোল চাপা গোঙানি।

পাত্তা দিল না রানা, রোল থেকে টেপ নিয়ে আড়াআড়ি বসিয়ে আরও ভালভাবে সেঁটে দিল বোমা। কাজ শেষ করে ব্যারারের ঘাড় ধরে উঠিয়ে দাঁড় করাল। ঠিক করে দিল জ্যাকেট। লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'কেউ বুঝবে না কী সাজ্ঘাতিক লোক তুমি, বোমা নিয়ে ঘুরছ। এবার খুব সাবধানে বসো দেখি ওই চেয়ারের সামনের অংশে।'

নির্দেশ পালন করল ইন্সপেক্টর। দেখে মনে হলো যেন উত্তরমেরুর পাতলা বরফের ওপর বসেছে। একটু নড়লেই পড়বে শীতল পানিতে।

গ্যারাজের কোণ থেকে কালো এক চামড়ার ব্যাগ নিল রানা, ওটা থেকে বের করল মোবাইল ফোন। রাখল টেবিলে ব্যারারের সামনে। উল্টো দিকের চেয়ার টেনে এনে বসল ওর পাশে। নিজের সামনে রাখল ডেটোনেটর। ডান হাতের তর্জনী প্রায় ছুঁয়ে থাকল রিমোট কন্ট্রোলের লাল বোতাম। নিচু স্বরে বলল, 'তুমি অসহযোগিতা করলে দেরি না করে টিপে দেব এই বাটন।'

রিমোট কন্ট্রোলের বাটনে চোখ ব্যারারের। আধ ইঞ্চি ওপরে রানার তর্জনী।

'যা বলবেন তাই করব,' চাপা, কর্কশ স্বরে বলল ব্যারারে। 'শুধু ওই বাটন থেকে সরিয়ে রাখুন আঙুল।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'সাধারণত অসতর্ক হই

রেগে গেলে। যেখানে বসে আছি, একটুও বিপদ হবে না আমার। ওটা ফ্র্যাগমেন্টেশন বোমা নয়। যদি বাটন টিপি, তোমার পিঠের বাইরের দিকের ডিস্ক লাগবে পিছনের দেয়ালে।' ব্যারারেকে নোংরা দেয়াল দেখাল। 'আর ইনার কেসিং লাগবে সামনের দেয়ালে। তোমার রক্ত-মাংস লেগে আরও নোংরা হবে দেয়াল। কিন্তু মরতে সময় নেবে কয়েক মিনিট, খুব কষ্ট হবে।' মোবাইল ফোন তুলে বলল রানা, 'এবার কথা বলবে তুমি তোমার প্রাণের বন্ধু পওলো ক্যালভির সঙ্গে। ওর কাছে জানতে চাইবে, কী অবস্থা করেছে পিটার লারসেন আর রামিন রেযার। যদি বন্দি করে থাকে, কোথায় রেখেছে তা জিজ্ঞেস করবে। বলবে, ওদের মেরে ফেলার আগে নিজে ওদেরকে জিজ্ঞেসাবাদ করতে চাও। তোমাদের প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনব আমি। যদি দেখি তোমাদের কথা সন্দেহজনক, টিপে দেব বাটন।'

মোবাইল ফোনের স্পিকার অন করা, দেখল ব্যারারে।

দু'জনের মাঝে যন্ত্রটা রেখে জিজ্ঞেস করল রানা, 'ক্যালভির নাম্বার বলো।'

'৮৭৪৩৬১...' গড়গড় করে বলল ব্যারারে। 'বিছানাতেও ওটা সঙ্গে রাখে ও।'

স্ক্রিনে নাম্বার তুলে সেণ্ড বাটন টিপে দিল রানা। একটু ঝুঁকে বসল। আঙুল এণ্ড বাটনের ওপর। অন্য তর্জনী ডেটোনেটরের লাল বাটনে।

বড় করে দম নিল অ্যালেকযেন্দ্রে ব্যারারে।

কয়েক সেকেণ্ড পর স্পিকারে ভেসে এল পওলো ক্যালভির কর্কশ, শীতল কণ্ঠ: 'পওলো।'

স্পিকার দেখে বার কয়েক চোখের পাতা কাঁপল ব্যারারের 'অ্যালেকযেন্দ্রে বলছি,' গলা স্বাভাবিক রাখল। 'ওরা দু'জন গেছে ওখানে?'

স্পিকারে ভেসে এল হাসি। 'হ্যাঁ। গরম শো দেখাবে বলে ওদেরকে ওপরের তলায় নেবে অ্যাবে। কয়েক মিনিট পর খাঁচায় পুরব।'

'কোথায় রাখবে?' চাপা স্বরে জানতে চাইল ব্যারারে।

'সাধারণত যেখানে নিই।'

'আমি ওখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত কিছু কোরো না,' বলল ব্যারারে। 'নিজে ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করব। জরুরি।'

সামান্য বিস্ময়ের ছাপ পড়ল গ্যাংস্টারের কণ্ঠে, 'তুমি? উচিত হবে? চোখ বেঁধে রাখলেও গলার আওয়াজ চিনবে।'

'এখন তাতে কিছুই যায় আসে না,' বলল ব্যারারে। 'আমার কাজ শেষ হলে মাছের খাবার হিসেবে সাগরে ফেলে দিলেই হবে।'

মাছের খাবারের কথা শুনে মোবাইল ফোনের এণ্ড বাটন টিপল রানা। জানতে চাইল, 'সাধারণত কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় বন্দিদের?'

'উপকূলে, শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে বড় এক বাড়ি আছে ক্যালভির। ওখানে ছোট একটা জেটিও আছে। ওখানে দ্রুতগামী দুটো মোটরবোট রাখে সে।'

'বাড়িটা সম্পর্কে আরও জানতে চাই।'

'মস্ত জায়গা নিয়ে ওই বাগান-বাড়ি। চারপাশে উঁচু পাথরের দেয়াল।'

'গার্ড আছে?'

'আছে। সবসময় পাহারা দেয়া হয় ওই বাড়ি।'

'গার্ড ক'জন?'

'চারজনের কম নয়। কখনও আরও বেশি।'

'সশস্ত্র?'

'হ্যাঁ। প্রত্যেকের সঙ্গে পিস্তল থাকে।'

‘ওই বাড়ি কী কাজে ব্যবহার করে পওলো ক্যালভি?’

ক্লান্ত শ্বাস ফেলল ব্যারারে, আরও করুণ হয়ে গেল চেহারা। ‘ওখানে ড্রাগ রাখে, পিউরিফাইও করে।’

‘এ ছাড়া আর কী করে?’

রানার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল ব্যারারে। ‘কখনও মেয়েদেরও রাখে ওখানে।’

‘কী ধরনের মেয়ে তারা?’

নীরবতা নামল। টেবিলে চোখ রেখে মাথা নিচু করে ফেলল পুলিশ অফিসার। কয়েক সেকেণ্ড পর রানা উঠে দাঁড়াতে শুরু করছে দেখে ঝাঁকি খেয়ে মাথা তুলল। ‘হারিয়ে যাওয়া মেয়ে ওরা।’

‘ব্যাখ্যা করো।’

কয়েক সেকেণ্ড দ্বিধা করে মুখ খুলল ব্যারারে। সাধারণত উত্তর ইউরোপের মেয়েদের ধরে এনে হেরোইন-অ্যাডিক্ট করা হয়, তারপর বিক্রি করা হয় নানান দেশের শহরের পতিতালয়ে।

পুলিশ অফিসারের মগজে ঘাই দিল রানার কণ্ঠ: ‘তুমি বলতে চাইছ ড্রাগসের মতই ওই মেয়েদেরও বিক্রি করছে?’

চুপ করে থাকল ব্যারারে। একটু পর মাথা দোলাল। চোখ টেবিলে।

‘বাহ্, চমৎকার লোক তুমি, ইন্সপেক্টর ব্যারারে,’ বলল রানা, ‘এই শহরের মিসিং পার্সন্স ব্যুরোর চিফ, প্রতিজ্ঞা করেছ নিরপরাধ মানুষকে রক্ষা করবে, অথচ করছ তার উল্টোটা? আমার জানা নেই স্বর্গ-নরক আছে কি না, কিন্তু তোমার মত লোকের জন্যে পৃথিবীতেই দরকার ভয়ঙ্কর শাস্তি।’

পনেরো

সত্যিই ভুল ভেবেছিল পিটার লারসেন। ওই যৌন-মিলনের শো-র আয়োজন হতবাক করবার মত।

দীর্ঘ করিডোর পেরিয়ে দামি আসবাবপত্রে সাজানো এক ঘরে ওদের এনেছে অ্যাবে ল্যামণ্টে। ঘরের মাঝে সাদা কার্পেটে মোড়া গোল মঞ্চে উঠতে চাইলে ব্যবহার করতে হবে দু'ধাপ সিঁড়ি। মঞ্চে সাদা একটা চেয়ারে একজোড়া হাই-হিলের কালো জুতো। চেয়ারের পিঠে আগুন-লাল সিল্ক গাউন, একজোড়া কালো দীর্ঘ মোজা, সাসপেণ্ডার বেল্ট ও হাতির দাঁতের মত ঘিয়ে রঙের ফ্রেঞ্চ সিল্কের নিকার্স। পাশেই ছোট, সাদা একটি টেবিলে খোলা, সাদা বাক্স, একদিকে স্ট্যাণ্ডে বাসন আকৃতির আয়না।

গোল মঞ্চ ঘিরে এক ডজন এমবস করা চামড়ার কালো সেটি, যেন লণ্ডনের নামকরা কোনও ক্লাব এটা। বেশিরভাগ সেটি দখল করেছে মধ্যবয়সী ব্যবসায়ীরা। দু'চারজন এশিয়ানকেও দেখল রামিন। অন্যরা ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান। প্রত্যেকের পাশেই সুন্দরী অতিথি-সেবিকা।

প্রতিটি সেটির সামনে নিচু টেবিলে বরফভরা বাকেট-এ ভিণ্টেজ শ্যাম্পেন। এরই ভেতর নিজ সেবিকার গাউনের ভেতর হাত ভরে দিয়েছে এক জাপানি। তার কানে মৃদু কামড় দিচ্ছে অপরূপা মেয়েটি।

পথ দেখিয়ে এক সেটির সামনে পৌঁছে গেল অ্যাবে, হাসি-হাসি মুখে ফিসফিস করল, 'ভাল দৃশ্য দেখা যায় এখান থেকে।'

চার স্পিকার থেকে এল মৃদু বাজনা। অবাক হলো পিটার লারসেন। ওটা ভিভালডির 'ফোর সিযন্স'। তার সবচেয়ে প্রিয় সুরের একটি। নিজেকে অপরাধী মনে হলো ওর। মনে পড়ে গেছে, স্ত্রীর কাছে যাওয়ার সময় মাঝে মাঝে ওই সুর ডেক-এ বাজায়। বিশেষ করে 'সামার' মুভমেণ্ট।

রামিন ও পিটারের মাঝে বসল অ্যাবে। ওরা দু'জনই টের পেল, তার উরুর উষ্ণতা ও মাস্ক পারফিউম। সামনে ঝুঁকল অ্যাবে, তিনটে গ্লাসে ঢালল শ্যাম্পেন।

তখনই বামের দরজা খুলে এল এক মেয়ে। প্রায় ছয় ফুট উঁচু। বয়স ত্রিশ। স্তন ও পিঠে এলিয়ে আছে কোঁকড়া কালো চুল। শরীর হালকা-পাতলা। মুখে মেকআপ নেই। ঘাড় ও দু'পা এতই দীর্ঘ, মনে হচ্ছে অস্বাভাবিক। দীর্ঘকায়া হলেও মঞ্চে উঠল ব্যালেরিনার মত। পরনে কিছুই নেই।

ঘরের চারপাশে বিড়বিড় শব্দে প্রশংসা করল কেউ কেউ। মঞ্চের মাঝে সোজা হয়ে দাঁড়াল মেয়েটি। শুধু ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর করে খুব ধীরে এক পাক ঘুরে সবার ওপর বোলাল সবুজ দু'চোখ। প্রত্যেকের অন্তর বলে উঠল, শুধু তার দিকেই বেশি সময় ধরে তাকিয়েছে ওই মেয়ে। এক ইউরোপিয়ান ব্যবসায়ীর হাত থেমে গেল সঙ্গিনীর বুকে। মঞ্চের মেয়েটি অলস সুরে বলছে, 'তোমাদের যে-কোনও একজনের সঙ্গে মজা করব... কে হবে সেই রাজা আমার!'

ঘুরে ছোট্ট টেবিলের সামনে গেল, চোখ রেখেছে চামড়ার সাদা বাক্সে। ঘরে ভিভালডির সুর ছাড়া কোনও শব্দ নেই। বাজতে লাগল 'সামার' মুভমেণ্ট। অ্যাবের উষ্ণ উরুর ঘষা খেয়ে একটু সরে গেল পিটার লারসেন, বিব্রত। চট্ করে দেখল

রামিনকে। অপলক চোখে মঞ্চের উলঙ্গ মেয়েটিকে দেখছে তরুণ। ওর বাম উরুর ওপর হালকা চাপড় দিচ্ছে অ্যাবে।

আবারও মঞ্চে চোখ ফেরাল পিটার। চামড়ার বাক্স থেকে কসমেটিক্স বের করেছে উলঙ্গ মেয়ে। পরের পনেরো মিনিট মুখে হালকা মেকআপ নিল। বার-বার ঝুঁকে দেখল আয়নায়। দাঁড়িয়ে আছে দু'পা অনেকটা ফাঁক করে।

সবচেয়ে ভাল জায়গা থেকে দেখছে রামিন ও পিটার।

বিয়ের পর সবসময় স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত ছিল লারসেন, কিন্তু আজ মনে মনে স্বীকার করল, দশ ফুট দূরের ওই মেয়ের নিতম্ব আর উরুর তুলনা নেই।

আরও কিছুক্ষণ পর মেকআপ শেষ করল মেয়েটি, ঘুরে তুলে নিল চেয়ার থেকে সাসপেণ্ডার বেল্ট। ওটা পরল ক্ষীণ কটিতে। বসল চেয়ারে, পরতে লাগল কালো মোজা। প্রথমে বাম পায়ে, তারপর ডান পায়ে। উরু পর্যন্ত দুই মোজা তুলে ওগুলো আটকে দিল সাসপেণ্ডার বেল্টে। এতই স্বাভাবিক ভঙ্গি, পুরুষদের কাছে নিজেকে করে তুলল অত্যন্ত লোভনীয়। উঠে দাঁড়িয়ে তুলে নিল ফ্রেঞ্চ নিকার্স, পরল কোমরে। এক এক করে পরল জুতো। পাতলা গাউন পরে ওটা রাখল ছোট্ট দুই স্তনের একটু ওপরে। চকচক করা সাদা কাঁধ ও কুচকুচে কালো জুতোর জন্য তাকে অদ্ভুত আকর্ষণীয় মনে হলো।

এই প্রথম দ্বিতীয়বারের মত মুখ তুলে সবাইকে দেখল। চোখ পুরুষদের ওপর। নিচু ও বিষণ্ন সুরে বলল, 'আমি বুঝি নষ্ট করলাম সময়?' ম্লান হেসে দু'হাত তুলে ঢাকল মুখ। কাতর সুরে বলল, 'না, পুরো নষ্ট করিনি... নিজেকে সুন্দর করে তুলেছি শুধু নিজের জন্যেই।' দু'ঠোঁট গোল করে আবারও পুরুষদের দেখল। 'কখনও দেখেছ কোনও মেয়ে নিজেকে সন্তুষ্ট করছে? আমরা সবাই তা করি নানান ভঙ্গিতে। আমি ব্যবহার করি...'

খুব সাবধানে মঞ্চের কার্পেটে দু'হাঁটু ফাঁক করে বসল সে। দু'হাত চলে গেল ঊরুসন্ধিতে। আর তখনই ধীরে ধীরে ঘুরতে লাগল মঞ্চ। পুরুষদের চোখে চোখ রেখে মন্থর গতিতে ঘুরছে মেয়েটা, ঠোঁটে মৃদু হাসি। প্রত্যেক পুরুষ দেখছে তাকে।

'তোমাদের মধ্যে কেউ নেই যে একটু শান্ত করবে আমাকে?' করুণ সুরে জানতে চাইল মেয়েটা, 'আমি কি এভাবে কষ্ট পাব?'

এক আরব ব্যবসায়ী ছিল এক সেটিতে। সঙ্গিনীকে ফেলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, প্যান্ট খুলেই পা বাড়াল মঞ্চের দিকে।

'এসো, মহারাজা, এসো...' অদ্ভুত সুরে ডাকল মঞ্চের সুন্দরী। জিভ দিয়ে চেটে নিল দু'ঠোঁট।

প্রায় লাফ দিয়ে মঞ্চে উঠল আরব। এখন গায়ে কিছুই নেই!

বিস্মিত হয়ে দেখছে রামিন ও পিটার। ওদের মাঝ থেকে সামনে বেড়ে সেটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অ্যাবে। নিচু স্বরে বলল, 'এই শো আসলে কিছুই নয়। আরও দারুণ মজার শো একতলা ওপরে। দেখতে চাইলে চলো।'

পরস্পরকে একবার দেখল পিটার ও রামিন, তারপর সেটি ছেড়ে পিছু নিল অ্যাবে ল্যামণ্টের। পিছনে শুনল মঞ্চে মেয়েটির শীৎকারধ্বনি।

ওপর তলায় উঠে করিডোরের মাঝের এক দরজা খুলল অ্যাবে, হাতের ইশারা করল ভেতরে ঢুকতে। আবছা আলো ঘরে। দু'পা ঢুকেই পিটার ও রামিন দেখল, অন্ধকার থেকে এগিয়ে আসছে তিনজন লোক, হাতে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল!

তখনই পিছনে বন্ধ হলো দরজা। ওদিক থেকে শুনল ওরা অ্যাবে ল্যামণ্টের মধুর কণ্ঠ: 'এবার দেখবে নতুন শো! তোমরাই হচ্ছ সেই শো-র তারকা!'

ষোলো

'একটা চুক্তি করা যায় না?' শুকনো কণ্ঠে বলল পুলিশ ইন্সপেক্টর অ্যালেকযেন্দ্রে ব্যারারে।

গ্যারাজের কোণে ক্যানভাস ব্যাগ থেকে চোখ তুলে তাকে দেখল রানা। টেবিলের সামনে চেয়ারে সাবধানে বসে আছে পুলিশ অফিসার, এখনও কোমরের কাছে হ্যাণ্ডকাফে আটকানো দু'হাত।

'ভাল কোনও চুক্তি,' আবারও বলল ব্যারারে।

ক্যানভাস ব্যাগ তুলে নিল রানা, ওটা এনে রাখল টেবিলের ওপর। চেইন খুলল। 'কী ধরনের চুক্তি?' জানতে চাইল।

'আমি গ্যারান্টি দেব আপনার বন্ধুদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে। আমার ব্যক্তিগত গ্যারান্টি।'

ব্যাগ থেকে কিছু জিনিস নিয়ে টেবিলে রাখল রানা। অলস সুরে বলল, 'কুকুরের গুয়ের চেয়েও তোমার কথার দাম কম।'

জোর দিয়ে বলল ফ্রেঞ্চ লোকটা, 'আমার ক্ষমতা আছে। যদি বলি, ওদেরকে ছেড়ে দেবে পওলো। এ ছাড়া উপায় নেই। আমাকে খুবই দরকার ওর ।'

মৃদু হাসল রানা। ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর কণ্ঠে বলল, 'তোমাকে ওর দরকার নেই। তুমি ওর তৃতীয় বাম পায়ের মত। যা শুনেছি, মার্সেইল্‌স্‌-এর অর্ধেক পুলিশকেই ঘুষ দিচ্ছে সে। যদি ফোন করে

বলো, রামিন আর পিটারকে ছেড়ে দিতে হবে, সেক্ষেত্রে দেরি না করে মেরে ফেলবে ওদেরকে। পরে জিজ্ঞেস করলে বলবে, জীবনেও ওদের নাম শোনেনি। আর কয়েক দিনের ভেতর নিজেও খুন হবে তুমি। আসলে একেবারে পচে যাওয়া পুলিশ অফিসার তুমি, যার কোনও মূল্য নেই। তোমার চেয়ে অনেক উঁচু পর্যায়ে হাত আছে ক্যালভির। তোমার সম্পর্কে ওর ধারণা: তুমি এমন এক কুকুরের বাচ্চা, যাকে মাঝে মাঝে বিস্কিট দেয় সে।'

কথার ফাঁকে কাজে ব্যস্ত রানা। খুলে ফেলল কালো জ্যাকেট, পরল কালো ওয়েবিং ও দুটো স্লিং শোল্ডার হোলস্টার। বোবার মত চুপ করে দেখছে ব্যারারে। ওয়েবিঙে ঝুলছে আটটা গ্রেনেড। এবার সাবমেশিনগানের পার্টস্ জুড়ে অভ্যস্ত হাতে তৈরি করল রানা অস্ত্রটা। চেম্বারে আটকে নিল ম্যাগাযিন। বাম হোলস্টারে রেখে দিল অস্ত্রটা। কাঁধের নিচে ঝুলছে ওটা। পর পর তিনবার ঝড়ের গতিতে এসএমজি বের করেই তাক করেছে সামনে। প্র্যাকটিস শেষ। ডান বাহুর নিচে আটকে নিল কোল্ট। ঝট্ করে বের করল। সন্তুষ্ট হয়ে বাড়তি সব ম্যাগাযিন রেখে দিল কোমরের ওয়েবিঙের পকেটে। এক পা পিছিয়ে গিয়ে ঝটকা দিয়ে বের করল এসএমজি, বিদ্যুদ্বেগে ম্যাগাযিন ফেলে বদলে নিল নতুন ম্যাগাযিন। তাতে সময় লাগল তিন সেকেণ্ড। হতবাক হয়ে ওর বিদ্যুৎগতি দেখল অ্যালেকযেন্দ্রে ব্যারারে।

অন্যান্য আধুনিক ফোর্সের মতই মার্সেইল্স্-এর পুলিশ ফোর্সে রয়েছে রিজিয়োনাল স্পেশাল অ্যাসাইনমেণ্ট গ্রুপ। তাদেরকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে হাইজ্যাকিং, ক্রিমিনাল বা টেরোরিস্ট হামলা ঠেকাতে। তাদের ট্রেনিং দেখেছে অ্যালেকযেন্দ্রে ব্যারারে। ওই দলের সদস্যরা সত্যিই দক্ষ। কিন্তু এইমাত্র সে বুঝে গেল, ওই দলের কারও সাধ্য নেই এই লোকের পায়ের বুড়ো আঙুলের সমান যোগ্য হবার।

ব্যাগ থেকে কালো থ্রি-কোয়ার্টার ডেনিম কোট বের করে পরল রানা। ঢিলা জিনিস, নেমে এসেছে ঊরু পর্যন্ত। বোতাম খোলা থাকলেও আড়াল করে রেখেছে অস্ত্র। সামনে বেড়ে ছোট, কালো রিমোট কন্ট্রোল তুলে নিল রানা। চেয়ারে আড়ষ্ট হয়ে গেল অ্যালেকযেন্দ্রে ব্যারারে। ডানদিকের পকেটে রিমোট কন্ট্রোল রেখে চাপা স্বরে বলল রানা, 'এবার উঠে দাঁড়াও।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল পুলিশ ইন্সপেক্টর।

তার পিছনে চলে গেল রানা, হ্যাণ্ডকাফের তালা খুলে ওটা রেখে দিল কোটের বাম পকেটে। ওখানে আছে আরও দুটো একই জিনিস। বলল, 'ঠিক আছে, চলো তোমার দোস্তের সঙ্গে দেখা করা যাক।'

সতেরো

আগে কখনও এমন ভয়ঙ্কর পিটুনি খায়নি পিটার লারসেন। এমনই বেদম মার, মানসিক ও দৈহিকভাবে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে সে। হিংস্র পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে এরা। কেন মারছে, তা-ও বোঝা যাচ্ছে না। মেঝেতে পড়ে কুঁকড়ে ফাটা ফুটবলের মত হয়ে গেছে পিটার। লাথির পর লাথি মারছে দু'জন লোক। এ-ই চলল কমপক্ষে পাঁচ মিনিট ধরে। তাড়াহুড়ো নেই, একজন লাথি থামালে শুরু করছে আরেকজন। মেপে মেপে মারছে শরীরের নাজুক অংশে। একটু দূরে রামিনের মার খাওয়ার ঘোঁৎ-ঘোঁৎ

আওয়াজ। তাকেও একইভাবে পিটিয়ে চলেছে অন্য লোকটা।

একটা ভ্যান গাড়ির ভেতর তোলা হয়েছিল ওদেরকে। তার আগে মাথায় পিস্তল ধরে বড় একটা দালানের পিছনের দরজা দিয়ে বের করে এনেছে। আর গাড়িতে তুলবার পর চোখে কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে কোথায় যেন নিয়ে এসেছে। আবার কাপড় সরাবার পর দেখেছে সামনে বড় কিচেন। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নামিয়ে এনেছে বেযমেণ্টে। ওদের বলা হয়েছিল, মেঝেতে শুয়ে পড়তে হবে। সামনের দিকে রাখতে হবে দু'হাত। মানা করে দেয়া হয়েছিল মুখ তুলে চাইতে। আর ওরা শুয়ে পড়বার পর শুনতে পেয়েছে পায়ের আওয়াজ।

চোখের কোণে দু'জোড়া জুতো দেখেছে পিটার, পাশে থামল মানুষ দু'জন। একজোড়া বাদামি জুতো চকচক করছিল। চামড়া অ্যালিগেটরের। অন্য জুতোজোড়া হাই-হিল ও কালো। অ্যাবে ল্যামণ্টের জুতো। পিটার ধারণা করেছে, ওই মেয়ের পাশের লোকটা পওলো ক্যালভি। ফ্রেঞ্চ টানে ইংরেজি বলেছে সে।

'আগামী দশ মিনিট কিছু প্রশ্ন করব। তার মাঝে কখনও কখনও আমার লোক সামান্য স্যাম্পল দেবে, যাতে বুঝতে পারো, জবাব না দিলে কী আছে কপালে। ভুলেও মিথ্যা বলবে না।'

কয়েক পা সরে গেল পওলো ক্যালভি ও অ্যাবে ল্যামণ্টে। তারপর শুরু হলো একের পর এক লাথি। রামিনের চিৎকার শুনল পিটার, 'গোল হয়ে যান! বাধা দেবেন না!'

ভয়ানক মার খেতে খেতে অযৌক্তিকভাবে অনেক দিন আগের একটা কথা মনে পড়ল পিটারের। স্কুলে ফিযিক্স টিচার পড়া বোঝাতে গিয়ে আইনস্টাইনের থিয়োরি অভ রিলেটিভিটি সম্পর্কে বলেছিলেন: 'যদি তোমাকে দু'সেকেণ্ড বসতে হয় অসম্ভব গরম আভনে, মনে হবে ওই সময় কমপক্ষে দু'মিনিট; কিন্তু সুন্দরী কোনও মেয়েকে দু'মিনিট ধরে চুমু দিলেও মনে হবে মাত্র

দু'সেকেণ্ড সুযোগ পেয়েছ।'

দশ মিনিট ধরে পিট্টি খেয়ে পিটারের মনে হলো, দশ ঘণ্টা ধরে বেদম মার খাচ্ছে। আর তারপর যখন মারপিট থামল, চুপ করে পড়ে থাকল ও। আগের মতই কুঁকড়ে আছে। পাগল হয়ে যাওয়ার অবস্থা নিদারুণ ব্যথায়। একটু দূরের লোকদুটো অলস সুরে আলাপ জুড়ল, ফুটবলে মার্সেইল্স্ পারবে তো মনাকোর সঙ্গে!

তাদের একজন বলল, 'উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো তোমরা। হাত সামনের দিকে। দেরি করলে...'

শরীরের মারাত্মক ব্যথার জন্য উপুড় হতে দেরি করে ফেলল পিটার। এক লোক সামনে বেড়ে কষে লাথি দিল ওর কিডনির ওপর। আর্তনাদ ছেড়ে উপুড় হলো পিটার। ওর হাতের দুই ইঞ্চি দূরে থামল অ্যালিগেটরের জুতো। কয়েক ফুট দূরে অ্যাবে ল্যামন্টের কোমর থেকে নীচের অংশ দেখল পিটার।

'তোমার নাম কী?' জানতে চাইল অ্যালিগেটর জুতো।

ভয়ের শিহরন ছাপিয়ে রাগ হলো পিটারের। কর্কশ সুরে বলল, 'আমি কুকুরের বাচ্চা এক পুলিশ! যা করলে, সে জন্য পস্তাতে হবে তোমাদেরকে!'

অ্যালিগেটরের একটা জুতো সরে গেল, পরক্ষণে নেমে এল পিটারের ডান পাঞ্জার পিঠে। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল পিটার। শুনতে পেল রামিনের সতর্কবাণী: 'সব প্রশ্নের জবাব দিন! দেরি করবেন না! মিথ্যা বলবেন না!'

ভোঁতা শব্দ শুনল পিটার। ওটা এসেছে রামিনের তরফ থেকে। লাথি মারা হয়েছে তার বুকে। এক লোক ধমক দিল, 'অনুমতি ছাড়া আবারও মুখ খুললে তোর হাঁটুতে গুলি করব!'

নীরবতা নামল। তারপর আবারও আগের লোকটা জানতে চাইল, 'তোমার নাম কী?'

ব্যথার স্রোতের মাঝে জবাব দিল পিটার, 'নাম পিটার লারসেন।'

'এখানে কী করছ তুমি?'

'অস্ত্রের মুখে এখানে আনা হয়েছে আমাকে।'

লোকটা বলল, 'বেশি চালাকি করলে কষ্ট বাড়বে। মার্সেইল্স্ শহরে কী করছ তুমি?'

'এক কলিগের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি।'

'কী বিষয়ে আলাপ?'

'হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের বিষয়ে।'

অ্যাবে ল্যামন্টের মিষ্টি হাসি শুনল পিটার।

কঠোর সুরে মেয়েটাকে থামিয়ে দিল ক্যালভি, 'চুপ করো!' এবার পিটারকে বলল, 'কী কারণে আমার বিষয়ে প্রশ্ন? এবং কেন এসেছ আমার ক্লাবে?'

'কারণ, আমরা জানি তুমি ড্রাগ্স্ আর মেয়েদের ব্যবসায় জড়িত। ওই দুটো ব্যাপার হাতে হাত রেখে চলে।'

পিটার লারসেন আর রামিন রেযাকে যে সময় নির্যাতন করছে পওলো ক্যালভি, ওই একই সময়ে রাস্তার উঁচু একাংশ থেকে তিন শ' গজ দূরের মস্ত বাড়িটা দেখছে রানা। অ্যালেকযেন্দ্রে ব্যারারের রেনোঁ গাড়ির প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছে। স্টিয়ারিং হুইলে দুর্নীতি-পরায়ণ পুলিশ। আবারও মুখ খুলল সে, 'মেইন গেটে এক বা দু'জন গার্ড। তৃতীয়জন বাগানের কোথাও। মেইন গেটের গার্ড আমাকে ঢুকতে দেবে।'

'কিন্তু আটকে দেবে আমাকে,' বলল রানা।

'আমি বলব আপনি আমার কলিগ,' বলল ব্যারারে। 'গেটে কোনও সমস্যা হবে না। আগেও সহকর্মীদেরকে নিয়ে এসেছি।'

'কী কাজে এসেছে তারা?'

দীর্ঘক্ষণ পর জবাব দিল ব্যারারে, 'মৌজ করতে।'

লোকটার পাশ থেকে বলল রানা, 'একেবারে সাচ্চা লোক তুমি, আগাগোড়া সত্যিকারের শুয়োরের বাচ্চা! আর বাড়ির ভেতর ঢোকার পর কী হবে?'

'সামনের দরজার ওদিকে থাকবে এক বা দু'জন গার্ড। তারা দেরি না করে সার্চ করবে। কোনও অস্ত্র থাকলে সরিয়ে নেবে।'

'চমৎকারভাবে পেয়ে যাবে অস্ত্র,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা। 'ওদের হাতে অস্ত্র থাকবে, না জ্যাকেটের নীচে?'

'জ্যাকেটের নীচে।'

'চলো, রওনা হওয়া যাক।'

যা ভেবেছে অ্যালেকযেন্দ্রে ব্যারারে, ঠিক সেভাবেই খুলে গেল মস্ত গেট। গাড়ির পাশে থামল এক লোক। ভেতরে টর্চের আলো ফেলল সে। প্রথমে দেখল ব্যারারেকে, তারপর রানাকে।

'আমার কলিগ,' বলল পুলিশ অফিসার।

মাথা দুলিয়ে সামনে যেতে হাতের ইশারা করল গার্ড। নুড়ি-পাথরের রাস্তা ধরে রওনা হয়ে গেল গাড়ি। বাড়ির সামনে লাল রঙের একটা মার্সিডিয বাসপোর্টস্ কার-এর পাশে থামল।

'ওটা কি ক্যালভির?' জানতে চাইল রানা।

'না, ওর প্রেমিকার।'

গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হওয়ার পর হাতের ইশারা করল রানা, বেরিয়ে এসো। একই সময়ে দরজা খুলে বেরোল ওরা।

সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে দরজার পাশের কলিং বেলের বাটন টিপল ব্যারারে। ওরা শুনল ভেতরে টুং-টাং আওয়াজ। কয়েক সেকেণ্ড পর খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল ওরা।

সামনেই দু'জন লোক। কঠোর চেহারা। একজন লম্বা এবং অত্যন্ত চিকন। তাকে কঙ্কাল বললেও ভুল হবে না। অন্যজন বেঁটে এবং মোটা। তাদের পরনে ঢিলা সুট। ব্যারারের দিকে

চেয়ে সম্মানের সঙ্গে মাথা দোলাল তারা। কিন্তু রানাকে দেখল সন্দেহ নিয়ে।

'আমার কলিগ,' বলল ব্যারারে। 'তোমাদের বস আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'উনি আছেন বেযমেন্টে,' বলল বেঁটে। রানার দিকে ইশারা করল। 'এঁকে সঙ্গে নিতে চান?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে আগে সার্চ করতে হবে।'

'সার্চ করো,' বলল রানা, অলস ভঙ্গিতে খুলতে লাগল কোটের বোতাম।

সামনে বাড়ল গার্ড, দু'হাত তুলেছে সার্চ করতে। রানার চেয়ে কমপক্ষে দশ ইঞ্চি খাটো। সে এবং ব্যারারে বুঝলও না কোত্থেকে এল রানার আপারকাট। ঝাপসা দেখল হাতের নড়াচড়া। শুধু তীক্ষ্ণ কড়াৎ আওয়াজ উঠল, খটাং শব্দে বন্ধ হলো লোকটার চোয়াল। প্রচণ্ড ঘুষি খেয়ে মেঝে থেকে তিন ইঞ্চি ওপরে উঠল তার দু'পা।

দীর্ঘদেহী গার্ড অত্যন্ত ক্ষিপ্র, কিন্তু যথেষ্ট নয়। তার ডানহাত ঢুকল কোটের ভেতর, আর ওই একই সময়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ল অচেতন সঙ্গী। পিস্তল বেরিয়ে আসতে না আসতেই বুঝে গেল লম্বু, দেরি করে ফেলেছে অনেক। দেখল নাকের কাছে কোল্টের পেটমোটা সাইলেন্সার। এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে তার হৃৎপিণ্ডে বিঁধল প্রথম বুলেট। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে পেছনের দেয়ালে বাড়ি খেল সে। দ্বিতীয় বুলেট ঢুকল নাক বরাবর কপালে, ছেতরে দিল হলদেটে মগজ। নোংরা হলো পেছনের দেয়াল। পিস্তলের সেফটি ক্যাচ অফ করে ফেলেছিল সে, ফ্ল্যাগ-স্টোনের মেঝেতে পড়ে 'বুম্!' শব্দে বেরিয়ে গেল গুলি। আরেকটু হলে ফুটো করত ব্যারারের হাঁটু। ওই পিস্তলে সাইলেন্সার নেই

বলে ঘরের ভেতর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গুলির বিকট আওয়াজ।

এক সেকেণ্ড পর ঘুরেই পর পর দু'বার অচেতন গার্ডের হৃৎপিণ্ডে গুলি করল রানা। তৃতীয়বার মগজে। পরের সেকেণ্ডে খুলে ফেলল সাইলেন্সার, পাল্টে নিল ম্যাগাযিন। বরফের মূর্তি হয়ে গেছে ব্যারারে। হোলস্টারে পিস্তল রেখে ওয়েবিং হোলস্টার থেকে এসএমজি নিল রানা। ধমক দিল ব্যারারেকে, 'মুভ! তোমার পিছু নিয়ে বেযমেন্টে নামব! রিমোট কন্ট্রোলের বাটনে থাকবে বুড়ো আঙুল! কোনও চালাকি নয়!'

ওপরে গুলির শব্দ শুনে বেযমেন্টে ঝট্ করে মুখ তুলে চাইল পওলো ক্যালভি। ঘরের দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে পাথরের সিঁড়ি উঠেছে কিচেনে।

'ওপরে যাও!' গার্ডদের একজনকে নির্দেশ দিল ক্যালভি। অন্যজনকে বলল, 'সিঁড়ি কাভার করো!'

পিস্তল হাতে একেকবারে তিন ধাপ সিঁড়ি পেরোচ্ছে প্রথম গার্ড। ঘরের দরজা থেকে তাকে কাভার দিল দ্বিতীয় গার্ড।

মেঝে থেকে থুতনি তুলে চারপাশ দেখল রামিন। সুন্দরী মেয়েলোকটার চোখে-মুখে ভীষণ ভয়। খপ্ করে বাহু ধরে তাকে লাইন অভ ফায়ার থেকে ঘরের কোণে সরিয়ে নিল পওলো ক্যালভি, হাতে পিস্তল। পিটার লারসেনের পিস্তলটা তারই মাথায় তাক করে রেখেছে তৃতীয় গার্ড।

রামিন বুঝল, ওই লোকের মতই পিছন থেকে ওর ওপরও চোখ রেখেছে অবশিষ্ট গার্ড। ঝুঁকি নেয়ার আগে অপেক্ষা করা উচিত। ওপরে এসএমজি থেকে দু'সেকেণ্ডের গুলিবর্ষণের আওয়াজে বুঝে গেল, এ বাড়িতে পৌঁছে গেছেন মাসুদ ভাই। ঝড়ের গতি তুলে মগজ খাটাতে লাগল ও। মাসুদ ভাইয়ের হাতে এসএমজি, তার মানেই থাকবে আরও অস্ত্র। যথেষ্ট আড়াল না

পেলে গুলি করতে করতে নেমে আসবেন না সিঁড়ি বেয়ে, নইলে যখন-তখন রামিন বা পিটারের গায়ে গুলি লাগবে। তাঁর প্রথম কাজই হবে নীচের সবাইকে হতভম্ব করে দেয়া।

উত্তেজিত হয়ে উঠেছে রামিন।

ওপরে বড়সড় কিচেনে গার্ডের লাশ টপকে এগোল রানা। এইমাত্র গুলি করে মেরেছে লোকটাকে। একটু আগেই বিরাট আভনের স্টিলের পাইপের সঙ্গে অ্যালেকযেন্দ্রে ব্যারারের দু'হাত আটকে দিয়েছে হ্যাণ্ডকাফে। এখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রানাকে দেখছে সে, ভেজা ছাইয়ের মত কালচে মুখ।

চোখে কালো গগল্‌স্ পরে নিয়ে সিঁড়ির প্রথম ধাপের আগে থামল রানা, নতুন করে পাল্টে নিল এসএমজির ম্যাগাযিন। হার্নেস থেকে খুলল ফসফরেসেন্ট গ্রেনেড। দরজার পাশ থেকে উঁকি দিল নীচে। ওই এক মুহূর্তে দেখে নিল নীচের ঘর, তারপর গ্রেনেডের পিন খুলেই ছেড়ে দিল লিভার। দু'সেকেণ্ড অপেক্ষা করে গায়ের জোরে ধাতব আনারস ছুঁড়ল নীচের ধাপে।

সিঁড়ির ধাপে গোত্তা মেরেই রামিন ও পিটারের মাঝে গিয়ে পড়ল ওটা। ওখান থেকে লাফিয়ে উঠে ঠোকর খেল পেছনের দেয়ালে। আর তখনই অস্বাভাবিক উজ্জ্বল সাদা আলো তৈরি করে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড।

ওই একই সময়ে চেঁচিয়ে উঠল রামিন, 'পিটার, নড়বেন না!' সিঁড়ির উদ্দেশে চেঁচাল, 'তিনজন! সশস্ত্র! একজন নিরস্ত্র!'

ফ্রেঞ্চ ভাষায় হাঁক ছেড়ে কী যেন বলছে পওলো ক্যালভি, কিছুই বুঝতে পারল না রামিন। তখনই শুনল একটা 'ধুপ্!' আওয়াজ, পরক্ষণে এসএমজি থেকে এল সংক্ষিপ্ত দু'দফা গুলি। আবারও গুলি হলো মাত্র একবার। ভীষণ আতঙ্কে তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়ছে অ্যাবে ল্যামন্টে। রামিন জানে, ওই ধুপ আওয়াজ মানেই

গড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে ঘরে নেমে এসেছেন মাসুদ ভাই! দু'পশলা গুলি দু'গার্ডের উদ্দেশে। তখনই এসএমজির সিলেক্টর সুইচ টিপে সিঙ্গেল শট্ মোডে অস্ত্রটা নিয়েছেন ওর ওস্তাদ, পরক্ষণে গেঁথে ফেলেছেন পওলোকে।

চোখের পাতার ওদিকের উজ্জ্বল সাদা আলো মিলিয়ে যেতেই সাবধানে চোখ মেলল রামিন। যা ভেবেছে, ঠিক তা-ই হয়েছে নীচে। ওদের ঘরের দরজার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন মাসুদ ভাই, হাতে এসএমজি। কোটের নিচে ওয়েবিঙে গ্রেনেড ও বাড়তি ম্যাগাযিন।

ঝড়ের গতিতে মাসুদ রানার হাত নড়তে দেখল রামিন। বদলে নেয়া হলো এসএমজির ম্যাগাযিন। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে দরজার সামনের গার্ড। মাথা ঘুরিয়ে পিছনের গার্ডকে খুঁজল রামিন। ঘরের কোণে ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে তার লাশ।

হাঁটু গেড়ে বসেছে পওলো ক্যালভি, ডান বাহু দিয়ে ঢেকে রেখেছে চোখ, বাম হাতে খামচে ধরেছে কাঁধ। কয়েক ফুট দূরে তার অস্ত্র। দেয়ালে পিঠ হেলান দিয়ে মেঝেতে বসে আছে ক্যালভির সুন্দরী উপপত্নী। দু'হাতে ঢেকে রেখেছে দু'চোখ।

কর্কশ শোনাল রানার কণ্ঠ: 'পিটার! নড়বে না! রামিন! মুভ! ক্যালভির অস্ত্রটা নাও!'

ধড়মড় করে উঠে পওলোর অস্ত্রটা দখলে নিল রামিন। স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ঘরের আলো। উঠে দাঁড়িয়ে চোখ থেকে গগল্স্ খুলল রানা, রেখে দিল পকেটে। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'রামিন, বাড়ির ভেতরে গার্ডরা নেই।' হাতের ইশারায় দেখাল পওলো ক্যালভি ও অ্যাবে ল্যামন্টেকে। 'দরজা থেকে চোখ রাখো এদের ওপর। আরও গার্ড থাকতে পারে বাগানে। সেক্ষেত্রে রওনা হয়ে গেছে।' সিঁড়ি বেয়ে আবারও ওপরে উঠে গেল রানা।

চোখ মেলেছে পওলো ক্যালভি, দেখে নিল রামিনকে, তারপর

তার দুই মৃত বডিগার্ডকে। প্রিয় প্রেমিকা দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে টয়লেট সারবার ভঙ্গিতে দু'পায়ে ভর করে বসে আছে। ভীষণ ঘৃণা এল পওলোর মনে। কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে দেখল পাঞ্জা ভিজে গেছে তাজা রক্তে। কিছু বলতে মুখ খুলেছিল, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিল রামিন। 'মুখ বন্ধ, নইলে গলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেব বুলেট।'

ওপরে আবারও হলো এসএমজির দু'পশলা গুলি। তারপর আর কোনও আওয়াজ নেই।

হতভম্ব সুরে মেঝে থেকে জিজ্ঞেস করল পিটার, 'এই লোক কে?'

মুচকি হাসল রামিন। 'আমার ওস্তাদ!'

'জিযাস ক্রাইস্ট,' জানতে চাইল ডেনিশ পুলিশ, 'এবার উঠে বসতে পারি?'

'না। মাসুদ ভাই শুয়ে থাকতে বলেছে। অপেক্ষা করুন। একটু পর উঠতে পারবেন।'

একমিনিট পর ওপর থেকে এল রানার কণ্ঠ, 'রামিন?'

'জী, মাসুদ ভাই? এখানে সব ঠিক আছে।'

'গুড। পিটার লারসেন অস্ত্র চালাতে পারে?'

অপমানিত কণ্ঠে জবাব দিল পিটার, 'হ্যাঁ! লারসেন অস্ত্র চালাতে পারে, আর বেচারা শুয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গেছে!'

মৃদু হাসির আওয়াজ শুনল পিটার।

'তা হলে গার্ডদের কারও অস্ত্র নিয়ে আসুন,' বলল রানা।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল পিটার, দরজার কাছে পা দিয়ে চিত করল সামনের মৃত গার্ডের লাশ। দেহের নিচে চাপা পড়েছিল তার পিস্তল। রক্তে ভিজে গেছে ব্যারেল। ওই ব্যারেল ধরে অস্ত্রটা তুলল পিটার, গার্ডের কোটে রক্ত মুছে নিয়ে দেখল অফ আছে কি না সেফটি ক্যাচ। ম্যাগাযিন পুরো ভরা। দেরি না করে দৌড়ে

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল সে। দরজা পেরিয়ে দেখল কিচেনে কঠোর চেহারার এক যুবক। সামনেই অ্যালেকযেন্দ্রে ব্যারারে!

'কী ব্যাপার?' অবাক হয়ে জানতে চাইল পিটার।

'পরে!' চাপা স্বরে বলল রানা। 'হাতে সময় নেই। বাইরের গার্ডরা শেষ, ওপরেও বোধহয় নেই। নইলে এতক্ষণে নেমে আসত। অথবা লুকিয়ে আছে। আমি সামনে সামনে যাব, পনেরো ফুট পেছন থেকে কাভার দেবেন।'

দোতলায় গার্ড নেই। করিডোরের শেষ মাথায় পিঠ কুঁজো করে বসে আছে এক বুড়ি মহিলা। জেলের সেলের মত ছোট দুটো ঘরে পাওয়া গেল ড্রাগ্স্ দেয়া দুই মেয়েকে।

তাদের একজনকে চট্ করে চিনে ফেলল পিটার লারসেন। বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'লিলি ওলসেন! মাত্র ক'দিন আগে ওর ফাইল দেখেছি!'

বিছানায় বসে আছে মেয়েটা, চোখে ভোঁতা দৃষ্টি। ডেনিশ ভাষায় সংক্ষেপে কথা বলল পিটার। মনে করিয়ে দিল, ও লিলি ওলসেন। নামও জানাল ওর বাবা-মা-র। তাতে এক সেকেণ্ডের জন্য চোখের মেঘ কাটল মেয়েটির। মাথা দোলাল।

'পরে কথা হবে,' তাড়া দিল রানা, 'অন্য ঘর দেখতে হবে।'

পরের ঘরের কোণে দু'হাতে দু'হাঁটু জড়িয়ে ধরে বসে আছে এক কিশোরী। হাত ও মুখে আঘাতের চিহ্ন। অদ্ভুত সুন্দরী। সোনালি চুল হাঁটু পর্যন্ত। নীল চোখে ভীষণ আতঙ্ক।

রানা ও পিটারকে দেখে ঘরের কোণে গেঁথে যেতে চাইল। বিড়বিড় করে ইংরেজিতে বলল, 'না... না... মাফ করুন... না... আর মারবেন না...'

সামনে বেড়ে নরম সুরে কথা বলল পিটার লারসেন। কিন্তু তাতে আরও বেশি ভয় পেল মেয়েটা। চোখে জন্মের আতঙ্ক।

পিটারের উদ্দেশে বলল রানা, 'আসুন, এখান থেকে বেরোতে

হবে। প্রথমে গাড়িতে তুলবেন ওদের দু'জনকে, দায়িত্বে থাকবেন। আমি নিয়ে আসব রামিনকে। এ ছাড়া, ব্যবস্থা করতে হবে বুড়ির।'

বিস্মিত পিটার জানতে চাইল, 'আপনি মেরে ফেলবেন ওই মহিলাকে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না। কিন্তু পারলে খারাপ হতো না। ওই বেটি এই নোংরা নর্দমার ঘৃণিত আবর্জনা।' ঘর থেকে বেরিয়ে করিডোরে চলে এল ও। তার দিকে আসছে দেখে ঝড়ের গতিতে ফ্রেঞ্চ বলতে লাগল বুড়ি।

একটা কথারও জবাব দিল না রানা, খপ্ করে ধরল বুড়ির চুলের মুঠি, অন্য হাতে প্রচণ্ড এক থাবড়া মেরে ভেঙে দিল তার চোয়াল।

জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল বুড়ি।

ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা হয়ে গেল রানা।

ওদিকে বেযমেন্টে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে অ্যাবে ল্যামন্টে। অনুনয়-বিনয় করছে রামিনকে— এসব কিছুর সঙ্গে কোনওভাবেই জড়িত নয় সে। সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল রামিন।

কী ভয়ানক বিপদে পড়েছে বুঝতে পেরে পাগল হয়ে উঠেছে রূপসী, হঠাৎ উঠেই দৌড় দিল দরজা লক্ষ্য করে। জীবনটা কেটেছে তার ফুর্তিতে, যা চেয়েছে, তাই পেয়েছে পুরুষদের কাছ থেকে। ভাবতেও পারেনি কোনও লোক সত্যি তার ক্ষতি করতে পারে। আর সে জন্যই উড়ে চলল দরজা পেরিয়ে। কিন্তু আরও দু'পা যাওয়ার পর ঠাণ্ডা মাথায় তার গোড়ালিতে গুলি করল রামিন। ঝড়ের গতিতে ছুটতে ছুটতে হোঁচট খেল মেয়েটা, মনে হলো ডাইভ দিয়ে মেঝেতে কপাল ঠুকল। জোর একটা ঠাস্

আওয়াজ হলো।

দ্বিতীয়বার ওদিকে ঘুরেও চাইল না রামিন, অস্ত্র তাক করল পওলো ক্যালভির বুকে। অক্ষত হাত বুকে রেখেছে লোকটা। যেন এতেই ঠেকাতে পারবে গুলি।

'প্লিয... না... প্লিয...' থতমত খেয়ে বলল। চোখের কোণে দেখেছে অ্যাবে ল্যামন্টে আর মেঝে ছেড়ে উঠতে পারেনি। দরদর করে ঘামছে পওলোর মুখ।

'মুখ বন্ধ,' কড়া গলায় বলল রামিন। 'কপাল ভাল থাকলে বেঁচেও যেতে পারো।'

একমিনিট পর সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রানা। একবার থামল অ্যাবে ল্যামন্টের পাশে। পরীক্ষা করল পাল্স্। নেই। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে। শুকনো সুইমিং পুলের পাড় থেকে নিচে লাফিয়ে পড়বার মত করে আছাড় খেয়ে মরেছে মেয়েটা। মুখ তুলে রামিনকে দেখল রানা।

'পালাতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছে,' নির্বিকার সুরে মন্তব্য করল রামিন।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। খেয়াল করেছে মেয়েটার গোড়ালিতে বুলেটের ক্ষত।

পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে রামিনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল রানা, 'রেনোঁ নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে পিটার।' ক্যালভিকে ইশারা করল। 'তার সঙ্গে আছে এই নোংরা শুয়োরের দুই শিকার, অসহায় মেয়ে। রেনোঁ নিয়ে গেটের বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করবে আমার জন্যে। কিচেনের জানালা থেকে রাস্তা দেখা যায়। যদি পুলিশের সাইরেন শোনো, একটা বুলেট পাঠিয়ে দেবে জানালার কাঁচ ভেদ করে। একই কাজ করবে ওই গেট দিয়ে কোনও গাড়ি ঢুকলে বা বেরোলে। ড্রাইভারের সিটে মোবাইল ফোন, যোগাযোগ করবে কাগজের সংখ্যা অনুযায়ী।

ওদিক থেকে যে ধরবে, সে জানিয়ে দেবে কোথায় যেতে হবে। অপেক্ষা করবে আমার জন্যে। আর এসব না-ও লাগতে পারে। মাত্র পাঁচ মিনিটে কাজ শেষ হবে। সেক্ষেত্রে গাড়িতেই দেখা হবে।'

মৃদু নড করল রামিন। দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

নিস্পৃহ চেহারায় পওলো ক্যালভিকে দেখল রানা। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'কিচেনে গিয়ে কিছু কথা জানতে চাই তোমার কাছ থেকে। তথ্যগুলো আমার দরকার।' হাতের অস্ত্র নাড়ল। 'সিঁড়ির দিকে রওনা হও।'

একবার ব্যথায় গুঙিয়ে উঠে রওনা হলো পওলো ক্যালভি।

বাড়ির বাইরে রেনোঁ গাড়ির পেছনের সিটে দুই মেয়েসহ পিটার লারসেনকে পেল রামিন। দুই মেয়ের একজন কাত হয়ে পড়ে আছে জানালার কাঁচে, মনে হলো অজ্ঞান। অন্যজন শক্ত হাতে ধরে আছে লারসেনের হাত। নিচু স্বরে তাকে কী সব বলছে পুলিশ অফিসার। রামিন ধারণা করল, ডেনিশ ভাষায় কথা চলছে। ড্রাইভিং সিটে উঠে একটা কথাও না বলে ইগনিশনের চাবির কান মুচড়ে দিল রামিন। ড্রাইভওয়ে ধরে গেট পেরিয়ে থামল পঞ্চাশ গজ দূরে। পিস্তল বের করে নজর রাখল কিচেনের জানালার কাঁচে। ওই ঘর গাড়ি থেকে অন্তত দেড় শ' গজ দূরে।

'এবার কী?' জানতে চাইল পিটার।

'অপেক্ষা করব,' বলল রামিন। সংক্ষেপে জানাল, কী করতে বলেছে রানা। এবার জানতে চাইল, 'মেয়েদের কী অবস্থা?'

'খুব খারাপ,' তিক্ত সুরে বলল পিটার। 'ওদের কপাল খুব ভাল যে মুক্ত হতে পেরেছে। আজ রাতেই ওদের একজনকে পাচার করে দেয়া হচ্ছিল। অন্যজন এখনও পুরোপুরি তৈরি না। সত্যিকারের শুয়োরের বাচ্চা এরা!'

‘শুয়োরের বাচ্চা এত খারাপ হয় না,’ বলল রামিন। নিচু স্বরে জানাল, ‘আমাদের কপালও ভাল। মস্ত বোকামি করলাম। আর তারপর পেয়ে গেলাম দৈব সাহায্য।’

‘ভাবছি ওখানে কী করছে ব্যারারে। ওকে হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে, তাই না?’

‘একটু পরেই বুঝতে পারব কী করা হবে,’ বলল রামিন।

ছয় মিনিট পর এল রানা, উঠে পড়ল সামনের সিটে।

‘কোথাও কোনও নড়াচড়া নেই,’ বলল রামিন, ‘মাসুদ ভাই, ওদের ছেড়ে দেবেন?’

‘পওলো আর ব্যারারের হাত হ্যাণ্ডকাফে আটকে রেখে এসেছি,’ বলল রানা। ‘হয়তো ওদের খুঁজে নেবে কেউ।’

চরম তিক্ত সুরে পেছনের সিট থেকে বলল পিটার, ‘আমি একজন পুলিশ। তা-ও বলব, ওই লোকগুলোর বাঁচার কোনও অধিকার নেই। মার্সেইল্স্-এর পুলিশ যে ধরনের অপরাধে জড়িত, এদের কারও কোনও শাস্তি হবে না কোনদিন।’

ঘুরে পিটারকে দেখল রানা। তারপর দেখাল হাতের ছোট্ট, কালো বাক্স। নিচু স্বরে বলল, ‘না, এবার ওদের শাস্তি হবে।’

পিটার দেখল ছোট বাক্সের বাটন টিপে দিল রানা। ওই বাড়ি থেকে এল ভোঁতা বিস্ফোরণের আওয়াজ।

‘পুলিশ আর ফায়ারম্যান মাংস-হাড়ের টুকরো পাবে,’ বলল রানা, ‘এমন এক নরকে গেছে, যেখানে ওদের মত জানোয়াররাই থাকে।’

আঠারো

আসবাবপত্র চমৎকার করে সাজানো অ্যাপার্টমেন্টে। তিনটে বেডরুম, প্রতিটির সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড্‌ তিনটে বাথরুম। ডাইনিং রুমের টেবিলে বসে কফি পান করছে পিটার লারসেন ও রামিন রেযা। ডানদিকের বেডরুম থেকে বেরিয়ে সাবধানে পিছনে দরজা ভিড়িয়ে দিল রানা, মুখে রাগ ও ক্ষোভের অনুভূতি। পিটার আর রামিনের বুঝতে দেরি হলো না, ভয়ঙ্কর খেপে গেছে মানুষটা। সারাশরীর থেকে যেন বেরোচ্ছে ভাপের মত ক্রোধ।

ওদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল রানা, তারপর নিচু স্বরে বলল, 'আগেও মানুষ খুন করেছি। মনে হয়েছে, পালাবার সুযোগ দেয়া উচিত ছিল কাউকে কাউকে। কিন্তু যে দুই নরকের কীটকে ওই বাড়িতে উড়িয়ে দিয়ে এলাম, তাদের জন্যে আমার মনে সামান্যতম করুণা নেই। জন্তু কখনও পারবে না, শুধু মানুষই পারে কারও ওপর এত অত্যাচার করতে।'

কোনও মন্তব্য করল না পিটার বা রামিন। সাইডবোর্ড থেকে ল্যাণ্ড ফোন নিয়ে বাটন টিপতে লাগল রানা।

এখন ভোর পাঁচটা, কিন্তু প্রথম রিং হতেই ওদিক থেকে তোলা হলো রিসিভার। ঝড়ের গতিতে ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলে চলল রানা। রামিন কিছুই না বুঝলেও, কী নিয়ে আলাপ চলছে বুঝল পিটার।

রানা জানাল, সেরে আসতে পেরেছে সব। এরপর বলল, কী ধরনের মেডিকেল ড্রাগ্‌স্‌ চাই।

পিটার শুধু চিনতে পারল একটা: মেথাডন।

'এবার সাহায্য লাগবে একজনের,' বলল রানা, 'তাকে হতে হবে কঠিন লোক, কিন্তু বাচ্চাদের প্রতি নরম। এখনও ঠিক করিনি কাকে চাই। সকালে আবারও কথা বলব তোমার সঙ্গে। তবে যত দ্রুত সম্ভব ড্রাগ্‌গুলো পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করো। যে আনবে, তাকে বলে দিয়ো কোড ওঅর্ড হবে: ''লাল বউ''। জবাব হবে: ''ভাল বর''। ঠিক আছে। পরে কথা হবে।'

ফোন ছেড়ে টেবিলের পাশে চেয়ার টেনে বসল রানা।

ওর জন্য মগে কড়া কফি ঢালল রামিন।

রানা বলল, 'গগল। আগেও তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে ওর।'

মাথা দোলাল রামিন। 'জী, মাসুদ ভাই। ওঁর কাছ থেকেই নিয়েছেন অস্ত্র।' চেপে গেল গগলের সাহায্য নিয়েই পিস্তল ও ছোরা জোগাড় করেছিল নিজেও।

'যত দ্রুত সম্ভব ক্লিনিকে ভর্তি করতে হবে মেয়েদুটোকে,' হঠাৎ বলে উঠল পিটার লারসেন।

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'মিস্টার লারসেন...'

আবারও বাধা দিল পিটার, 'আজ রাতে যা হলো, এরপর আমাকে মিস্টার লারসেন বললে মনে খুবই কষ্ট পাব।'

গম্ভীর মুখে মাথা দোলাল রানা। খেই ধরল কথার, 'পিটার, তুমি তো পুলিশের লোক, তেমন করেই ভাববে। কিন্তু একেবারেই অস্বাভাবিক এই পরিস্থিতি। ভাবছ ফোন তুলে যোগাযোগ করবে মার্সেই বা প্যারিসের পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে কী বলবে? রাতে লড়াই করে মেয়েদুটোকে কেড়ে এনেছ একদল বদমাসের কাছ থেকে? ওই যুদ্ধে ব্যবহার করেছ

পিস্তল, গ্রেনেড, এসএমজি আর বোমা? খুন করেছ বড় এক শহরের নামকরা কয়েকজন ক্রিমিনালকে? বাধ্য হয়ে খুন করতে হয়েছে মিসিং পার্সন্স ব্যুরোর চিফকে? বলবে, এ ছাড়া উপায় ছিল না? পুলিশের কাছে গেলে কী ব্যাখ্যা দেবে নিজের অবস্থান বা রামিনের? আমি মেরে এসেছি সাতজনকে। রামিনের কারণে মরেছে এক মহিলা। বছরের পর বছর আটকে দেবে পুলিশ। তুমি নিজেও রক্ষা পাবে না। রামিন বা আমাকে জেলে রাখবে ওরা, এবং জেলখানায় পচে যাওয়া অফিসাররা ছাড়বে না আমাদেরকে। মেরেও ফেলতে পারে। কাজেই পুলিশের কাছে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।'

ভাবছে পিটার লারসেন। একটু পর বলল, 'ফোন করতে পারি কোপেনহেগেনে, আমার বসকে। উনি আবার যোগাযোগ করবেন প্যারিসের টপ...'

'তবুও জবাব দিতেই হবে,' বলল রামিন। 'অথচ কোনও জবাব দিতে পারব না আমরা।'

আবারও ভাবতে লাগল পিটার, কয়েক সেকেণ্ড পর মাথা দোলাল। 'তা হলে কী করব? এই মেয়েদুটোর কী হবে? ওদের চিকিৎসা দরকার। খুব জরুরি ভিত্তিতে।'

'সে চিকিৎসা দেয়া হবে,' বলল রানা। 'আগেও গেছি এমন পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে। প্রথম কথা, ওদের বুঝিয়ে বলতে হবে বর্তমান পরিস্থিতি। দু'জনের সঙ্গেই কথা হয়েছে, ইংরেজি ভালই জানে। লিলির অবস্থা অন্য মেয়েটার চেয়ে ভাল। বেচারি কিশোরী মেয়েটার নাম জেনি। বংশের নাম কোনওমতেই বলল না। লিলি ওলসেনের ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছে ডেনিশ পুলিশ অফিসার। আইডি দেখালে পুরোপুরি বিশ্বাস করবে তোমাকে। বড়লোক পরিবার থেকে এসেছে। ওকে ভালবাসে ওর বাবা-মা। ওকে পৌঁছে দেবে কোপেনহেগেনে।' পিটারের চোখে তাকাল রানা।

'এই অবস্থায় চাইলেই ওকে বিমানে করে নিতে পারবে না। আমার ভুল না হয়ে থাকলে, ওর পাসপোর্ট আর কাপড়চোপড় রেখে দিয়েছে মার্সেইল্‌স্ পুলিশ।'

'তাই করার কথা,' মাথা দোলাল পিটার।

'তা হলে নকল পাসপোর্ট লাগবে ওর,' বলল রানা।

'তা পাব কী করে?'

'তুমি পাবে না। আমি পাব।'

'ওকে কীভাবে সরিয়ে নেব কোপেনহেগেনে?'

'গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে দেবে তুমি,' বলল রানা, 'সঙ্গে যাবে আরেকজন। নীচের বেযমেন্টে তেলে ট্যাঙ্ক ভরা একটা গাড়ি পাবে। পেছনে জেরিক্যানে ভরা থাকবে ফিউয়েল। একটানা গাড়ি চালিয়ে দেশে ফিরবে। ওর পাসপোর্ট অনুযায়ী ও তোমার বোন। জঘন্য চরিত্রের এক ছোকরার প্রেমে পড়ে ছুটির সময়ে হারিয়ে গিয়েছিল। ওই ছোকরা ওকে খুব মারপিট করেছে। আর তুমি এখানে এসেছিলে ওকে বাড়ি ফিরিয়ে নিতে। পুরনো কাহিনি। এমন অনেক হয়। বিস্তারিত প্ল্যান পরে তৈরি করা যাবে।'

সামনে ঝুঁকে জানতে চাইল রামিন, 'আর অন্য মেয়েটা? জেনি?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'ওর অবস্থা একেবারেই অন্যরকম। আমেরিকান মেয়ে। ওর বাবা ছিল জার্মানির ওয়েইসব্যাডেন এয়ারবেসে। জিআই। তিন বছর আগে একটা ট্রেনিঙে মারা পড়ে। তখন জেনির বয়স মাত্র নয় বছর। এয়ারবেসে সেক্রেটারিয়াল জব করে ওর মা। ওখানেই রয়ে গেছে। এক বছর আগে আবার বিয়ে করেছে। কিন্তু জেনির সৎ-বাবা হারামি লোক। বিয়ের কয়েক দিনের ভেতর মানসিক আর শারীরিকভাবে জেনিকে নির্যাতন করতে লাগল। মেয়েটার মা বাধা দেয়নি, বা দিতে পারেনি।' কয়েক মুহূর্ত পর আবারও মুখ খুলল

রানা, ‘এক মাস আগে কিছু টাকা চুরি করে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় জেনি। যা শুনেছে, তাতে ভেবেছিল প্যারিস এত সুন্দর আর ভাল জায়গা যে ওখানে ওর কোনও সমস্যাই হবে না। কিন্তু মাত্র কয়েক দিনের ভেতর পওলোর এক লোকের নজর পড়ল ওর ওপর। খুব সহানুভূতি দেখাল সে। জেনিকে নিয়ে গেল এ শহরের ওই মস্ত ভিলায়। তারপর থেকে হেরোইন দিয়ে পুরো অ্যাডিক্ট করে ফেলা হয়েছে ওকে। জেনির কথা থেকে যা বুঝলাম, কয়েক দিনের ভেতর ওকে পাঠিয়ে দেয়া হতো মিডল ইস্টে।’

‘সত্যিকারের জানোয়ার ওরা,’ বিড়বিড় করল রামিন।

মাথা দোলাল পিটার লারসেন। ‘রানা ঠিকই বলেছেন, এরা জানোয়ারের চেয়েও অনেক নিচু জাতের প্রাণী।’ চট্ করে রানাকে দেখল সে। ‘ওর ব্যাপারে কী করবেন ভাবছেন?’

রানার কণ্ঠ শুনে মনে হলো আপন মনে কথা বলছে, ‘উপায় নেই যে ওকে বাড়িতে পৌঁছে দেব। আবার এই শহরের কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেব, তা-ও হবে না। সত্যি বলতে, কোথাও ঠাঁই নেই ওর। ওকে ডিটক্স সেন্টার বা সোশ্যাল সেন্টারে পাঠিয়ে দেবে যে-কোনও শহরের কর্তৃপক্ষ। অথবা, ফিরিয়ে দেবে ওর মা-র কাছে। ঘটনা যা-ই হোক, খুব খারাপ হবে সেটা জেনির জন্যে।’

‘তা হলে ওকে নিয়ে কী করবেন?’ জানতে চাইল পিটার।

‘সম্মান দিয়ে আমাকে “তুমি” করে বলার সুযোগ দিয়েছ, কাজেই চাই আমাকেও “তুমি” করেই বলবে,’ পিটারকে বলল রানা। রামিনের দিকে চাইল।

শূন্য চোখে কফির মগে চেয়ে আছে তরুণ। আরও কয়েক সেকেণ্ড পর উঠে কিচেনে চলে গেল, আবার পারকোলেটর থেকে কফি নিয়ে ফিরে এসে বসল আগের চেয়ারে। নিচু স্বরে বলল, ‘আমাদের আর কিছুই করার নেই। টম বড় বোন পাবে।’

‘আমিও একমত,’ বলল রানা।

অবাক চোখে রামিনকে দেখল পিটার, তারপর তাকাল রানার চোখে। দ্বিধা নিয়ে জানতে চাইল, ‘কী বিষয়ে একমত তোমরা?’

কয়েক সেকেণ্ড পর বলল রামিন, ‘উপায় নেই, ওকে নিজেদের কাছেই রাখব আমরা।’

‘রাখবে মানে?’ জানতে চাইল লারসেন।

‘আমাদের নিজেদের আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুদের কাছে থাকবে,’ বলল রানা, ‘ওকে সরিয়ে নেব গোজো দ্বীপে। প্রথমে হেরোইনের কারণে ঠাণ্ডা মেরে যাবে, তারপর ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া হবে ওর— অনেক কাউন্সেলিং লাগবে মন ফেরাতে। আর কাউকে কাউন্সেলিং দিতে হলে গোজো দ্বীপ উপযুক্ত জায়গা।’

হতবাক হয়ে গেছে পিটার লারসেন। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, ‘তোমরা দু’জনই বদ্ধ পাগল! এমনভাবে বলছ, যেন ওই মেয়ে রাস্তায় ফেলে দেয়া কোনও কুকুর বা বেড়ালের বাচ্চা!’

‘ওর অবস্থা কম-বেশি তেমনই,’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা। ‘ভুলে যেয়ো না, সামান্য কোনও রোগে ভুগছে না, ওর চাই হেরোইন, নইলে পাগল হয়ে উঠবে। এরপরও ড্রাগ্‌স্‌ না দেয়া হলে আত্মহত্যাও করতে পারে।’

বারকয়েক মাথা নেড়ে উঠে পড়ল পিটার লারসেন, কিচেনে গিয়ে কফি নিয়ে আবারও ফিরে এল। চেয়ারে বসে পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় নামল ভীষণ গম্ভীর ওর কণ্ঠ। বোঝাতে চাইল বারো বছরের মেয়েকে লালন করতে হলে কী করতে হবে। বলল, রানা বা রামিনের কোনও অধিকারই নেই এ ধরনের কাজ করার। বুঝিয়ে দিতে চাইল, এমন অবস্থা হলে কীভাবে কী করতে হবে, সে জন্য কঠোর সব নিয়ম ও আইন আছে সভ্য সব দেশে। উত্তেজিত হয়ে গলা চড়ে গেল লারসেনের, প্রতিটি যুক্তি বোঝাতে গিয়ে আঙুল ঠুকল টেবিলে। জানিয়ে দিল, কারও অধিকার নেই

অন্যের জীবন নিয়ে ঝুঁকি নেয়ার। প্রতিটি সভ্য দেশে আইন ও সমাজ এসব মোকাবিলায় দক্ষ। মেয়েটি যেহেতু ভারসাম্যহীন, কাজেই ও বুঝবে না কী করা উচিত। আর সেজন্যেই ওকে তুলে দেয়া উচিত পেশাদার কাউন্সেলারের হাতে। 'পেশাদার' কথাটায় জোর দিতে গিয়ে টেবিলে চড়াৎ আওয়াজে চাপড় দিল সে। অত্যন্ত কঠোর চোখে দেখল রানা আর রামিনকে।

খালি কফির মগে চোখ রেখে কী যেন ভাবছে রানা। একটু পর বলল, 'তা ঠিক, অসভ্য দু'জন লোকের সঙ্গে এই টেবিলে বসে আছি। তাদের মেজাজও চড়া।'

'আসলে কী বলতে চাও?' জানতে চাইল পিটার।

কফির মগ দেখাল রানা। 'গত পাঁচ মিনিটে তোমরা দু'জন কিচেনে গিয়ে নিজেদের জন্যে কফি নিয়ে এলে, কিন্তু কেউ আমাকে একবারও এক মগ কফি সাধলে না।'

মৃদু হেসে ফেলল রামিন, উঠে রানার মগ নিয়ে চলে গেল কিচেন কাউন্টারে।

পিটার লারসেনের দিকে তাকাল রানা। 'বলছ সভ্যতার বিষয়ে। হ্যাঁ, ফ্রেঞ্চরা নিজেদের নিয়ে গর্ব করে, তারা সত্যিই সভ্য।' বন্ধ বেডরুমের দরজা দেখাল রানা। 'ওই দুই ঘরে কী সভ্যতা দেখলে? সমাজের কাঠামো ওটা তৈরি করেনি? আমি অনেক সভ্যতা দেখেছি কাঁচা মাটির ঘরে বাংলাদেশে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী বা সিলেটে। বা কোলকাতায়। পরিত্যক্ত শিশু কোলে তুলে নিয়ে মানুষ করেছে ওসব গ্রাম বা বস্তির মানুষ। তাদের হয়তো টাকা নেই, কিন্তু মস্ত, খাঁটি অন্তর আছে।' সামনে ঝুঁকল রানা। কণ্ঠ হয়ে উঠল অত্যন্ত গম্ভীর। 'তুমি বলতে চেয়েছ, আমরা ওই বাচ্চা মেয়েটাকে কুকুরের ছানার মত করে আশ্রয় দিতে চাইছি। আর সেটা সত্যিই অন্যায়। তুমি তো জানো, ইউরোপ বা আমেরিকায় ভেটরা আশ্রয়হীন পশুর জন্যে বাড়ি খুঁজে

দেয়। কিন্তু তাদের চেষ্টা যথেষ্ট আন্তরিক নয়। আর তখনই কাজে নামে পেশাদার সমাজ-সেবকরা। এসব করেও যদি জন্তুটাকে স্থান দেয়া না যায় কোথাও, ওরা ইঞ্জেকশন দিয়ে চিরকালের জন্যে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।' দুই বেডরুমের দরজা দেখাল রানা। এবার সামান্য রাগ প্রকাশ পেল আঙুল তাক করায়। 'রামিন বা আমি বেশ কয়েকজনকে খুন করেছি ওই আশ্রয়হীন জন্তুর জন্যে। তুমি নিজেও জীবনের ঝুঁকি নিয়েছ।' পিটারের দিকে আরও ঝুঁকে এল রানা। 'কোনওভাবেই ওই আশ্রয়হীন জন্তুটাকে আমরা তুলে দেব না ভেটদের হাতে।'

কুচকুচে কালো দুই মণির দিকে চেয়ে কাঁধ ঝাঁকাল পিটার, নিচু স্বরে বলল, 'মস্ত বড় দায়িত্ব নিচ্ছ তুমি।'

টেবিলে ফিরেছে রামিন, রানার সামনে কফির মগ রেখে বসে পড়ল নিজের চেয়ারে। ওর ভাব দেখে মনে হলো, একটু আগের প্রসঙ্গে আর কিছুই বলার নেই কারও। রানার দিকে চেয়ে জানতে চাইল, 'মাসুদ ভাই, পরের মুভ কী হবে?'

এখনও লারসেনকে গম্ভীর চোখে দেখছে রানা, চোখে প্রশ্ন।

কোনও জবাব দিতে পারল না ডেনিশ পুলিশ অফিসার। বড় করে দম নিয়ে টেবিলে আরেকবার চাপড় দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, পরের মুভ কী?'

এক ঢোক কফি নিয়ে আবারও আঙুল তুলে বেডরুমের দরজা দেখাল রানা। 'পিটার, আপাতত ডেনিশ মেয়েটাকে সময় দাও। আগে রামিনের সঙ্গে আলাপ করব, তারপর জেনির পাশে গিয়ে বসবে ও। ...তোমরা সাহস জোগাবে ওদেরকে, কিন্তু এতক্ষণে পাগল হয়ে উঠেছে ড্রাগসের জন্যে।' চট্‌ করে হাতঘড়ি দেখল রানা। 'কয়েক ঘণ্টার ভেতর পৌঁছে যাবে মেথাডন।'

'ওসব পেতে হলে প্রেসক্রিপশন লাগবে তোমার বন্ধুর,' বলল পিটার।

মাথা দোলাল রানা। 'আমার বন্ধুর যা চাই, তা পাবে এই সভ্য সমাজে।'

কয়েক মুহূর্ত কথাটা ভাবল লারসেন, তারপর বারকয়েক মাথা দুলিয়ে গিয়ে ঢুকল ডানদিকের বেডরুমে। পিছনে বন্ধ করে দিল দরজা।

কৌতূহল নিয়ে রামিনের দিকে তাকাল রানা। 'তো বলো দেখি, রামিন, কী কারণে ওই বেযমেন্টের মেঝেতে শুয়ে পাঁজরে লাথি গুনছিলে?'

লজ্জায় লাল হয়ে গেল তরুণের দু'গাল। উঠে পায়চারি শুরু করল। রানা আর খোঁচাল না। কী যেন ভাবছে ছেলেটা। সঠিক সময়ে সবই বলবে। আরও কিছুক্ষণ পর মুখ নিচু করে বলল রামিন, 'মস্ত ভুল করেছি, মাসুদ ভাই। আমার তো আপনার মত অত অভিজ্ঞতা নেই। আপনি গত রাতে উদ্ধার না করলে খুন হয়ে যেতাম আমরা দু'জন। আরও অনেক কিছু শিখতে হবে আমাকে।'

সহজ সুরে বলল রানা, 'শুরু থেকে সব খুলে বলো।'

কী কারণে পওলো ক্যালভির প্রেমিকাকে কিডন্যাপ করতে চাইল, জানাল রামিন। প্রথমে গেল ওই লোকের ক্লাবে, আর তারপর পা দিল তার ফাঁদে।

কথা শেষ হলে আবারও রানার চোখে চোখ রাখল রামিন। 'আমার প্রথম ভুল, আগেই ধরে নিইনি অ্যালেকযেন্দ্রে ব্যারারে পচা আপেল। দ্বিতীয় কথা, উচিত ছিল একা রেকি করে আসা।'

মাথা দোলাল রানা। জানতে চাইল, 'কী পাবে ভেবেছিলে?'

হালকা শ্রাগ করে বলল রামিন, 'বিশ্বাস করি সত্যিই আছে দ্য ডায়মণ্ড রিং। একই বিশ্বাস পিটারেরও। একই কথা বলেছে সুসি। আমার ধারণা, পওলো ক্যালভি তাদের নিচু পর্যায়ের কর্মচারী। ওই গুপ্তসংঘের কাঠামো বুঝতে চেয়েছি। ধরতাম শেকলের ওপরের কোনও অংশ। কিন্তু বড় কয়েকটা ভুল করে ফেলি।'

চিন্তান্বিত সুরে বলল রানা, 'তোমার স্ট্র্যাটেজি ভাল ছিল। কিন্তু বড় বেশি তাড়াহুড়ো করেছ। উচিত ছিল না পিটারের সঙ্গে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে যাওয়া। ওরও উচিত হয়নি ওই ক্লাবে তোমার সঙ্গে গিয়ে হাজির হওয়া। দু'জন মিলে কাজ ভাগাভাগি করে নিলে সন্দেহ করত না কেউ। তুমি ভাল করতে ওই ক্লাবের কোনও হোস্টেসের সঙ্গে সময় কাটালে। একটু কৌতূহল দেখিয়ে জেনে নিতে পারতে, ক্লাবের ম্যানেজারেসের বিষয়ে। ওই ধরনের মহিলার ব্যাপারে গল্প করতে পছন্দ করে মেয়েরা। দরকারী সব তথ্য পাওয়ার পর প্ল্যান শেষে কিডন্যাপ করতে।' মৃদু হাসল রানা। 'তো দুটো ব্যাপারে জ্ঞান হলো তোমার। প্রথম কথা: কখনও পুলিশকে বিশ্বাস করবে না। আর দ্বিতীয়: চারপাশ ভালভাবে না দেখে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বিপদে পড়বে না।'

'মাসুদ ভাই, আপনি কখনও এমন বিপদে পড়েননি?'

'পড়েছি। প্রথমবার বড় ভুল করায়, বিসিআই থেকে কান ধরে বিদায় করে দেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। এক কথায় নির্বাসন। অনেকদিন থাকতে হয়েছিল আমাকে ভারত মহাসাগরের এক দ্বীপে।'

মুখোমুখি চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করল রামিন, 'আমাদেরকে কীভাবে খুঁজে পেলেন, মাসুদ ভাই?'

কীভাবে ওদের ট্র্যাক করেছে, জানাল রানা। প্রথমে সুসির পেট থেকে তথ্য বের করেছে, এরপর গেছে পিটারের বাড়িতে। গগলের মুখে শুনেছে পওলো ক্যালভির বিষয়ে। তারপর সবই ছিল ছকে বাঁধা কাজ।

'আমি লজ্জিত,' নিচু স্বরে বলল রামিন।

আরেক চুমুক কফি নিয়ে নরম সুরে বলল রানা, 'নিজেকে দোষ দিয়ো না। আমার নিজেরও দোষ কম নয়। প্রথম থেকেই তোমার পাশে থাকা উচিত ছিল। আশা করি, এরপর ভুল করব

না।'

ফিক করে হেসে ফেলল রামিন। 'কিন্তু, মাসুদ ভাই, আপনি তো ছিলেন ক্লিনিকে! কী করতেন? ভুল যা করার করেছি আমি, নইলে হয়তো...'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'টমের মা পতিতা বলে প্রথম থেকেই তার ব্যাপারে তোমাকে নিরুৎসাহী করতে চেয়েছি। যেটা উচিত হয়নি। যখন জেদ চাপল তোমার মনে, বাধ্য হয়েই সঙ্গে এলাম। তবে এরপর থেকে পাশে থাকব বিপদের সময়।' উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে চলে গেল রানা। ছয়তলা থেকে নীচের রাস্তায় চোখ বোলাল। ঝিরঝির করে পড়ছে হালকা বৃষ্টি। কখনও কখনও দু'একটা গাড়ি হেডলাইট জ্বেলে সাঁই করে চলে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর ঘুরে রামিনের চোখে তাকাল রানা, আবারও একবার দেখল বেডরুমের দরজা। আবেগ প্রকাশ পেল কথায়: 'রামিন, তোমাকে ওই বাড়ি থেকে বের করতে গিয়ে খুন করেছি লোকগুলোকে। আর পরে ওই দুই মেয়ের সঙ্গে কথা বললাম। তাতে বিশেষ করে ছোট মেয়েটার কথায় বুঝলাম একটা ব্যাপার। ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আবারও মনে হলো, যাই, নিশ্চিত করি কুকুরগুলো প্রত্যেকে মরেছে। ওই বুড়ি শয়তান মেয়েলোকটাকেও ছাড়া উচিত ছিল না। বাধ্য না হলে কখনও খুন করি না, কিন্তু তখন তেমনই লেগেছিল।' আবারও জানালা দিয়ে নীচের রাস্তা দেখল রানা। গতি তুলে এই বাড়ি পেরিয়ে গেল পুলিশের একটা গাড়ি। পিঠে লাল-নীল বাতি, সঙ্গে সাইরেন। 'রামিন, ওই বাচ্চা মেয়েটার চোখে ভীষণ ভয় দেখেছি। তার চেয়েও বেশি ছিল ওর চোখে অন্য জিনিস। ওটা অসহায়ত্ব।' আবারও রামিনের দিকে ঘুরল রানা। 'বলো তো, রামিন, হাসপাতালে টমের মা ঠিক কী বলেছিল?'

চেয়ার ছেড়ে জানালায় রানার পাশে থামল রামিন। নীচের

ভেজা রাস্তা দেখল। 'ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, নিজেও এতিম ছিল। এতিমখানা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল সতেরো বছর বয়সে। ওই এতিমখানা গোজোর এতিমখানা নয়। যখন-তখন ভয়ানক পেটাত মেয়েদেরকে। কম পয়সার ছোট এক হোটেলে ওঠার পর পরিচয় হয়েছিল ইতালিয়ান এক সুদর্শন যুবকের সঙ্গে, টাকার অভাব ছিল না তার। টমের মাকে লুকিয়ে রেখেছিল পুলিশের কাছ থেকে। কিছু দিন পর দিতে লাগল ড্রাগ্স্। হেরোইন অ্যাডিক্ট হয়ে গেল মহিলা। এরপর তাকে বড়লোক বন্ধুদের কাছে শুতে পাঠাতে চাইল যুবক। মানা করে দিল টমের মা। আর তখনই ড্রাগ্স্ দেয়া বন্ধ করল ওই লোক। টমের মা ভেবেছিল, ওকে ভালবাসে যুবক, তাই ঠিক করেছিল অন্তঃসত্ত্বা হবে। সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ওকে অন্য কারও কাছে পাঠাবে না সে? টমের মা গোপন রাখল সে অন্তঃসত্ত্বা। সবই যখন বুঝল যুবক, খুব কাকুতি-মিনতি করল টমের মা। বার-বার মাফ চাইল, যাতে ওর পেটের সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখতে দেয় সে। কিন্তু কোনও কথাই শুনল না যুবক, প্রচণ্ড মার মেরে অজ্ঞান করে দিল তাকে। এরপর নিয়ে গেল গর্ভপাত করাতে ডাক্তারের কাছে। কিন্তু ওই ডাক্তার বলে দিল, দেরি হয়ে গেছে অনেক। পাঁচ মাস পর টম জন্ম নিলে, বাধ্য হয়েই গির্জার সিঁড়িতে বাচ্চাটাকে রেখে আসতে হলো।'

'ওই যুবক কীভাবে বাধ্য করেছিল তাকে?' নিচু স্বরে জানতে চাইল রানা।

'সহজ পথে,' কণ্ঠে আবেগ রামিনের। 'বলে দিয়েছিল, গির্জার সিঁড়িতে ফেলে না এলে গলা টিপে মেরে ফেলবে টমকে। কোনও ডাক্তার ছাড়াই জন্ম নিয়েছিল টম। ওর মাকে সাহায্য করেছিল এক পতিতা। টমের মা-র কিছুই করার ছিল না। টমকে রেখে আসার কয়েক দিন পর এক পতিতালয়ে তাকে বিক্রি করে

দিল লোকটা। ওই পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার বেশ অনেকদিন পর ধীরে ধীরে তার ওপর বিশ্বাস এল মাসীর। তার অনুমতি নিয়ে প্রতি সপ্তাহে গোজো দ্বীপে ছেলেকে দেখতে যেতে পারত।'

'এসব আগেই বলতে পারতে,' বলল রানা।

'আপনি যদি রাগ করেন, তাই সব বলিনি,' ম্লান হাসল রামিন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল রানা, 'এর শেষ দেখতে চাই। সত্যি দ্য ডায়মণ্ড রিঙের অস্তিত্ব থাকলে ওটার বিরুদ্ধে লড়ব।'

'ওই যুদ্ধে পাশে আমাকে নেবেন না, মাসুদ ভাই?'

গম্ভীর মুখে মাথা দোলাল রানা। 'হ্যাঁ, দু'জনই আমরা লড়ব ওদের বিরুদ্ধে।'

'আমরা যাদের বিপক্ষে লড়ব, সমাজের কোন্ শ্রেণীর মানুষ তারা?' রানার দিকে চাইল রামিন। 'শুধু বুঝতে পারছি, এরা অত্যন্ত অশুভ মানুষ।'

পুরো একমিনিট চুপ করে কী যেন ভাবল রানা। বারকয়েক চুমুক দিল কফির মগে। তারপর আনমনে বলতে লাগল, 'নানান ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ পরিষ্কার করেই ভাগ করে নিয়েছে কোন্টা ভাল আর কোন্টা অশুভ। কিন্তু হাজারভাবে অশুভ হয়ে উঠতে পারে যে-কোনও মানুষ। এসবের ভেতর সবচেয়ে অশুভ দিক ধর্ষকাম। বেশিরভাগ মানুষের বুকেই আছে ধর্ষকাম ও মর্ষকাম। ধর্ষকাম বুঝে ওঠা কঠিন, কিন্তু আছে প্রতিটি মানুষের মনেই। চরম ক্ষমতা দেখাবার জন্যে করা হয়। যে ধর্ষকামী লোকের টাকার অভাব নেই, সে আরও অনেক অশুভ ও বিপজ্জনক। ধর্ষকামের সঙ্গে জড়িত দাপট। মগজের ওই রোগের কোনও চিকিৎসা নেই। এরা গায়ের জোরে একসময় সমাজের মই বেয়ে উঠে যেতে পারে যে-কোনও দেশের চূড়ান্ত ক্ষমতায়।'

মগ নামিয়ে রাখল রানা। রামিনকে বলল, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে

এসএস বাহিনীতে ছিল এসব স্যাডিস্ট। শত শত বছর আগে চেঙ্গিস খানও তা-ই ছিল। যুদ্ধে প্রায় প্রতিটি দেশের সেনাবাহিনীতে ধর্ষকামী ও মর্ষকামী হয়ে ওঠে একদল লোক। দুর্বল কাউকে পেলেই নিজের গায়ের জোর বোঝাতে তাকে নির্যাতন করে। টমের মা-র ওপরও তা-ই করা হয়েছে। জেনির সৎ-বাবাও ওই ধরনেরই লোক। হয়তো বুঝতে পেরেছ, কেমন প্রতিক্রিয়া হয়েছে ওই বাচ্চা মেয়েটার মনে?'

'আপনার কী ধারণা, কেমন লোক ছিল পওলো?' জানতে চাইল রামিন।

তিক্ত চেহারায় মাথা দোলাল রানা। 'সে একই সময়ে ধর্ষকামী এবং মর্ষকামী। মারা যাওয়ার আগে মুখ খুলেছে। যখন নিজের জান বাঁচাতে কাতর অনুরোধ করে অত্যাচারী লোক, তখন মিথ্যা বলে না। পওলো বলেছে, প্রতি গ্রীষ্মে বারো থেকে ষোলোজন মেয়েকে বিক্রি করত দ্য ডায়মণ্ড রিঙের কাছে। প্রতিজনের জন্যে পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার করে পেত। শুনলে মনে হবে অনেক টাকা, কিন্তু আসলে পওলোর অন্য সব বেআইনী ব্যবসা থেকে আসত শত শত কোটি টাকা। ধর্ষকামী অন্তরকে সন্তুষ্ট করতে খুলেছিল শাখা ব্যবসা। অসহায়, নিরীহ বাচ্চা মেয়েদের ওপর গায়ের জোর খাটাত। দ্য ডায়মণ্ড রিঙের ব্যাপারে আরও তথ্য জোগাড় করতে শুরু করলে আমরা পওলোর মত আরও অনেক লোকের দেখা পাব। তারা হয়তো আরও খারাপ জাতের।' একবার হাতঘড়ি দেখল রানা। 'বাচ্চা মেয়েটার পাশে গিয়ে বসো, রামিন। গগলের সঙ্গে কথা আছে। মেয়েদুটোর জন্যে তৈরি করতে হবে আইনী কাগজপত্র, তারপর গোজোতে যোগাযোগ করব জনি আবদুল্লার সঙ্গে।'

'জনি আবদুল্লা ভাই?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রামিন।

'হ্যাঁ। কয়েক দিন আগে পঞ্চাশ ফুটি একটা বোট কিনেছে।

গতি ত্রিশ নট। দু'এক দিনের ভেতর এখানে পৌঁছে যেতে পারবে। জেনি আর তোমাকে স্মাগল করে গোজোতে নিয়ে যাবে জনি। রাতে হয়তো দ্বীপে ওঠার আগে ব্যবহার করবে ওর জেলে-নৌকা। ড্রাগসের নেশা কেটে যাওয়া পর্যন্ত বাগানবাড়ির পেছনের ওয়াইন মজুদের গুহায় রাখবে জেনিকে। আশা করি, দশ দিনে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠবে। তার আগে নরক দেখবে ও, সেইসঙ্গে তুমি। আরও খারাপ কিছুও হতে পারে। কারও কাছ থেকে সাহায্য পাবে না। কেউ যেন না জানে ওই বাড়িতে মেয়েটা আছে। আগেই সেলার থেকে সবকিছু সরিয়ে ফেলবে। থাকবে শুধু ম্যাট্রেস। ভেতরে রাখবে কলের পানির পাইপ ও বড় একটা পিপে। পানি দিয়ে ভরে রেখো। আর চাই ডজন খানেক কম্বল। এসব ঠিকভাবে করার পর, শেষবারের মত জেনিকে মেথাডন দেবে। তারপর বারো ঘণ্টা পর নরকের কষ্ট শুরু হবে বেচারির। সেইসময় কী করতে হবে, আগেই বুঝিয়ে দেব তোমাকে। শেষবার মেথাডন দেয়ার পর গ্রামে গিয়ে গ্যাব্রিয়েলাকে বলবে, আগামী দু'সপ্তাহ ওকে আসতে হবে না বাড়ির কাজ করতে। এই ক'দিন বাড়ি পরিষ্কার করবে তুমি। পরে যোগাযোগ করবে ওর সঙ্গে। মনে রেখো, দুসপ্তাহের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ খাবার ওখানে জমা করতে হবে।'

'যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে মেয়েটা?' জানতে চাইল রামিন। 'ডাক্তার ডাকব?'

মাথা নাড়ল রানা।

'যদি কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মরেই যায়?'

'সেক্ষেত্রে বাগানের নীচের দিকের অংশে ওই ল্যাংড়া আম গাছের নিচে কবর দেবে। গভীর হতে হবে কবর। অন্তত আট ফুট। ওই কাজ করার আগে, বাড়ির সদর দরজার বোর্ডে লিখে দেবে, যেন কেউ বিরক্ত না করে।' চুপ হয়ে গিয়ে কী যেন ভাবল

রানা, তারপর বলল, 'ফোনের এক্সটেনশন লাইন নেবে গুহা পর্যন্ত। কিন্তু গুহায় যখন থাকবে না, সঙ্গে করে নেবে ওটা। খেয়াল রাখবে, সবসময় যেন বন্ধ থাকে গুহার দরজা।' হাত তুলে বেডরুম দেখাল রানা। 'এবার ওর পাশে গিয়ে বোসো। বলবে, ওষুধ পৌঁছে যাবে একটু পর।'

পেছনে বেডরুমের দরজা রামিন বন্ধ করার পর ল্যাণ্ড ফোনের দিকে হাত বাড়াল রানা। কয়েকটা ফোন করবে। সবশেষে যোগাযোগ করবে বিসিআই-এ। সোহেলের সঙ্গে কথা আছে ওর।

উনিশ

ভোর ছয়টা দশ মিনিট বাজতেই ছয়তলা অ্যাপার্টমেণ্ট বাড়ির সদর দরজায় জোরেসোরে ডেকে উঠল কোকিল। ইণ্টারকমের শব্দে ঝট্ করে মাথা তুলল রানা, ঝিমিয়ে নিচ্ছিল চেয়ারে বসে। চট্ করে দেখে নিল হাতঘড়ি। দেরি না করে দরজার কাছে চলে গেল, চাপ দিল ইণ্টারকমের বাটন। জানতে চাইল 'কে?'

'লাল বউ,' জবাব এল ফ্রেঞ্চ ভাষায়।

ওই কণ্ঠ ভাল করেই চেনে রানা। জবাবে বলল, 'ভাল বর।'

'কচু!' মন্তব্য করল পেঁচা ব্রিয়াঁ ফুলজেন্স। 'আবার বলে ভাল বর!'

দেয়ালের সুইচ বোর্ডের নির্দিষ্ট বাটন টিপে অপেক্ষা করল রানা, মৃদু হাসল। দু'মিনিট পর দরজার ওদিকে কাশির আওয়াজ

হতে বলল, 'ভেতরে এসো।' রানা সম্পূর্ণ সতর্ক, হাতে কোল্ট ১৯১১ পিস্তল।

সাবধানে দরজার কবাট খুলে ভেতরে ঢুকল মোটামত এক লোক। একহাতে কালো ব্রিফকেস, অন্য হাতে চামড়ার ফ্লাইট ব্যাগ। মেঝেতে নামিয়ে রাখল হাতের জিনিস। সোজা হয়ে বাড়িয়ে দিল ডানহাত। 'কী খবর, রানা?'

পিস্তল বামহাতে নিয়ে করমর্দন করল রানা। 'আরও মোটা হয়েছ!'

'মোটেও না।'

'কফি দেব?'

'কোন্ শালা ছাড়ে?'

'বসো।' কিচেনের দিকে পা বাড়াল রানা।

ফ্রেঞ্চ লোকটা গিয়ে বসে পড়ল চেয়ারে। চোখে রিমলেস চশমা। ওটার জন্য তাকে ডাকা হয় হুতুম-পেঁচা। দেখলে তাকে মনে হবে স্কুলের টিচার, বা ব্যাঙ্কের টেলার। পরনে ধূসর সুট ও নীল টাই।

কিচেন থেকে কফির মগ হাতে ফিরল রানা, মগ ধরিয়ে দিল ব্রিয়াঁ ফুলজেন্সের হাতে। একসময়ে পাতি এক রাজনৈতিক নেতার হয়ে মাস্তানি করত সে। গগলের কারণে নোংরা ওই পথ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে। আর রানার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার ক'দিনের ভেতর ওকে মনে মনে মেনে নিয়েছে সত্যিকারের বন্ধু হিসেবে।

কফির মগে চুমুক দিয়ে বলল পেঁচা ফুলজেন্স, 'সত্যি নরম হয়ে গেছি ভাববে বেশিরভাগ লোক, আর এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সুবিধা। কেউ গুরুত্ব দেয় না। ফলে সে বা তারা কিছু করার আগেই কাবু করি। তুমি তো জানো, রানা।'

মৃদু হাসল রানা। কিচেনের কাউন্টার থেকে নিজের জন্যেও

এনেছে মগ ভরা কফি, চুমুক দিল।

টেবিলে ব্রিফকেস তুলে ডালা খুলল পেঁচা।

ওর পাশের চেয়ারে বসল রানা। 'সঙ্গে অস্ত্র আছে তো?'

'হায়, ঈশ্বর, এ কী বললে?' প্রায় আর্তনাদ করল ফুলজেন্স। 'বাঁচতে হবে না?'

মৃদু মাথা দোলাল রানা।

'গগল বলল তোমার সঙ্গে দেখা করতে,' বলল পেঁচা। 'আমার নিজেরও কোনও কাজ নেই। বা থাকলেও ওসব ফেলে আসতাম। তুমি হলে গিয়ে আমার ওস্তাদ।'

'পিস্তল থাক সঙ্গে, কিন্তু আমার পরিচিত এক লোকের সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে,' বলল রানা। 'তখন অ্যাপার্টমেন্টে পিস্তলটা রেখে যেয়ো।'

'কাজটা কী?' জানতে চাইল ফুলজেন্স।

'খুব কঠিন কিছু না। ওই লোকের সঙ্গে কোপেনহেগেনে নিয়ে যাবে এক মেয়েকে। গাড়িতে করে যেতে আটচল্লিশ ঘণ্টা। পালা করে গাড়ি চালাবে। ওই মেয়ে হেরোইন অ্যাডিক্ট, সর্বক্ষণ ওষুধের প্রভাবে পড়ে থাকবে পেছনের সিটে। আমার এই বন্ধু ডেনিশ পুলিশের অফিসার।'

আঁৎকে উঠল পেঁচা।

'অত চিন্তার কিছু নেই,' বলল রানা, 'ভাল লোক। ওদেরকে কোপেনহেগেনে রেখে সোজা ওই গাড়ি নিয়ে ফিরে আসবে এখানে। খরচের ব্যাপারে ভাবতে হবে না।'

মাথা নাড়ল ফুলজেন্স। 'এত নিচু হয়ে যাইনি যে বন্ধুর কাছ থেকে কাজের জন্যে টাকা নেব।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। উঁকি দিল খোলা ব্রিফকেসের ভেতর। হাতড়ে দেখল মেডিসিন। পেয়ে গেল ডিসপোযেবল সিরিঞ্জ ভরা মেথাডন।

টেবিলে দুটো সিরিঞ্জ রেখে ব্রিয়াঁর দিকে চাইল। 'জানো কী করে ইঞ্জেকশন দিতে হয়?'

মাথা দুলিয়ে বলল ব্রিয়াঁ, 'একটা কথা বলবে?'

'তুমি শুনতে চাইলে হাজার কথা বলতে পারি,' মৃদু হাসল রানা।

'আমি তো তোমার লাডলা প্রেমিকা নই যে অত কথা শুনতে চাইব,' রাগী স্বরে বলল ফুলজেন্স। 'শেষে খেপে যাবে তুমি নিজেই— মোটা শালা কোনও কাজেরই না, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে পারে না! বিয়ের কথা তো মন থেকে বোধহয় মুছেই ফেলেছ!'

'তা তুমি নিজে কেন...'

'যাক গে ওসব,' তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে গেল পেঁচা, 'আসার সময় গাড়ির রেডিয়োতে নিউয শুনছিলাম। সাগর তীরে পওলো ক্যালভির ভিলায় হামলা হয়েছে। মারা গেছে বেশ কয়েকজন। ওই ঘটনার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই তো তোমার?'

অলসভাবে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। কিছু বলল না।

'পওলো মরেছে?' জানতে চাইল ফুলজেন্স।

মৃদু মাথা দোলাল রানা।

লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল পেঁচা, ঝট্ করে বাড়িয়ে দিল ডানহাত। ওটা ধরে নেড়ে দিল রানা।

'মেয়েরা কি এসেছে ওই ভিলা থেকেই?' জানতে চাইল ব্রিয়াঁ।

'হ্যাঁ। ওরা এখন দুই বেডরুমে। একজনের বয়স এখনও বারো হয়নি।'

ফুলজেন্সের চোখে রাগ ও ঘৃণা দেখল রানা।

'মরেছে তো কুকুরের বাচ্চাটা?'

'অনেক টুকরো হয়ে ছিটিয়ে আছে আকাশে বাতাসে।'

'নতুন চোখে দেখছি তোমাকে, ওস্তাদ,' খুশি হয়ে বলল ফুলজেন্স। 'আগেও মরতে রাজি ছিলাম তোমার জন্যে, আর এখন? খোদ যিশু বলে মনে হচ্ছে তোমাকে!'

সাদা ন্যাপকিনে সিরিঞ্জ জড়িয়ে নিল রানা, অন্য হাতে সামান্য তুলা ও ছোট এক বোতল সার্জিকাল স্পিরিট। ফুলজেন্সকে পিছনে নিয়ে প্রথম বেডরুমের দরজায় থামল রানা, টোকা দিল কবাটে। কয়েক সেকেণ্ড পর পিটার লারসেন দরজা খুলতেই তার সঙ্গে পেঁচা ব্রিয়াঁ ফুলজেন্সের পরিচয় করিয়ে দিল রানা।

লিলি বসে আছে বিছানায়। তিরতির করে কাঁপছে দেহ। বেচারির মুখ এতই ফ্যাকাসে, কার্টুনের সাদা ভূতের মুখের মত দেখাচ্ছে। খুব নিচু স্বরে ডেনিশ ভাষায় ওকে কী যেন বলল পিটার, হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিল ফুলজেন্সকে।

মেয়েটার দিকে চেয়ে হাসল পেঁচা। হাসলে একেবারে বদলে যায় চেহারা। যে-কেউ বলবে, এই হাসিখুশি মানুষটা হতে পারে তার প্রিয় চাচা বা মামা।

'তুমি কি ফ্রেঞ্চ ভাষা জানো?' জানতে চাইল ফুলজেন্স।

ওকে আরেকবার দেখে নিয়ে কাঁপা স্বরে বলল লিলি, 'অল্প।'

'ইংরেজি?' জিজ্ঞেস করল ব্রিয়াঁ।

'হ্যাঁ, ওটা মোটামুটি বুঝি।'

'গুড। তা হলে আমরা ইংরেজিতে কথা বলব। আমার ইংরেজি ভাল না, কিন্তু আগামী দু'তিন দিন তোমার কাছ থেকে অনেকটা শিখে নিতে পারব। আমরা এখন থেকে বন্ধু।' আবারও হাসল ফুলজেন্স।

ওই হাসি এতই আন্তরিক, ওর হাতে সাদা ন্যাপকিন ধরিয়ে দিয়ে বলল রানা, 'তুমিই ওষুধ দাও। কোপেনহেগেনে পৌঁছে যাওয়া পর্যন্ত প্রতি আট ঘণ্টা পর পর দেবে।' একবার পিটারের দিকে চেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল রানা।

ওর পিছু নিল ডেনিশ পুলিশ অফিসার। জানতে চাইল, 'এই লোক কে?'

'আমার বন্ধু। দেখলে মনে হয় সহজ-সরল মানুষ, কিন্তু আসলে সাঙ্ঘাতিক লড়াকু লোক। পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারো ওকে। তোমাকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে গাড়ি ড্রাইভ করবে। আজ রাতে তৈরি হবে লিলির কাগজপত্র, এরপর রওনা দেবে তোমরা।' টেলিফোন দেখাল ও। 'তোমার বোধহয় যোগাযোগ করা উচিত মারগিটের সঙ্গে। স্কুলে যেতে এখনও দেরি আছে। সংক্ষেপে কথা সারবে। শুধু বলবে ভাল আছ, বাহাত্তর ঘণ্টার ভেতরে পৌঁছবে বাড়িতে। জানিয়ে দিয়ো, কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। তোমরা ডেনিশ সীমান্ত পেরোবার আগে কারও সঙ্গে যেন ফোনে কোনও কথা না বলে। পরে যোগাযোগ করবে তোমার বসের সঙ্গে। ব্যবস্থা নেবে, যেন মেয়েটাকে সোজা নিয়ে গিয়ে তোলা যায় ভাল কোনও ক্লিনিকে। কাজটা শেষ হলে জানাবে ওর বাবা-মাকে।'

চিন্তিত দেখাল লারসেনকে। 'এদিকে রামিন, তোমার বা বাচ্চা মেয়েটার কী হবে?'

একবার হাতঘড়ি দেখল রানা। 'একঘণ্টা পর ফোন দেব গোজোতে। কয়েক দিনের ভেতর দ্রুতগামী বোট নিয়ে আসবে আমার এক বন্ধু। রামিন আর বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে যাবে।'

'গোজো দ্বীপে?'

'হ্যাঁ।'

'আর তুমি, রানা?'

শ্রাগ করল রানা। 'আমি যাব মিলানে। ওখানে কথা আছে এক লোকের সঙ্গে, মেয়েদের বিক্রি করার সঙ্গে জড়িত সে।' আবারও টেলিফোন দেখাল।

যন্ত্রটার সামনে থেমে নাম্বার টিপে ডায়াল করল পিটার লারসেন। ডেনিশ ভাষায় সংক্ষেপে কথা শেষ করে রেখে দিল

ফোন।

মনে মনে প্রশংসা করল রানা। নিজের নাম বা ও কে, তা ভুলেও বলেনি ফোনে।

'কিছু জিজ্ঞেস করল না?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নেড়ে হাসল পিটার। 'মারগিট তো পুলিশের বউ।'

লিলি ওলসেনের বেডরুম থেকে বেরিয়ে এল ফুলজেন্স, দরজা নীরবে ভিড়িয়ে দিয়ে বলল, 'শান্ত হয়ে এসেছে। কয়েক মিনিট পর ঘুমিয়ে পড়বে।' পিটারের উদ্দেশে বলল, 'রওনা হওয়া পর্যন্ত ওর পাশে থাকা দরকার। আপনাকে বিশ্বাস করে।' তারপর একটু ক্লান্ত হাসি হাসল সে, 'যদিও জানি না কেউ কেন কোনও পুলিশকে বিশ্বাস করবে!'

ঘোঁৎ আওয়াজে জবাব দিল পিটার, 'আমার কপাল ভাল, নইলে ফ্রেঞ্চ পুলিশ হয়ে খুন-ডাকাতি বা চুরি-চামারি করে বেড়াতাম!' ফুলজেন্সকে পাশ কাটিয়ে বেডরুমে গিয়ে ঢুকল সে।

ব্রিয়াঁর হাতে এখনও সাদা ন্যাপকিন।

অন্য বেডরুমের দরজায় টোকা দিল রানা।

কবাট খুলে দিল রামিন। একটু অবাক হয়েছে ফুলজেন্সকে দেখে। অবশ্য কিছু বলল না। হাতের ইশারা করে দেখাল বিছানা। ওখানে চুপ করে শুয়ে আছে পিচ্চি জেনি। বড় বড় নীল চোখে দেখছে ছাত। দৃষ্টিতে বড্ড অসহায়ত্ব, ভীষণ কষ্ট ও খুব ভয়।

ওর অবস্থা দেখে বিড়বিড় করে ফ্রেঞ্চ ভাষায় ড্রাগ্স্ ব্যবসায়ীদের বাপ-মা তুলে গালি দিচ্ছে ফুলজেন্স।

'রামিন, ব্রিয়াঁকে পরিচয় করিয়ে দাও ওর সঙ্গে,' নিচু স্বরে বলল রানা। 'দেখে শিখে নাও কীভাবে ইঞ্জেক্ট করবে মেথাডন।'

কিচেনের টেবিল ঘিরে বসল ওরা চারজন— রানা, রামিন, পিটার

ও ফুলজেন্স।

সকাল মাত্র সাড়ে সাতটা।

ওদের সবার ভেতর তৈরি হয়েছে এক অদ্ভুত বন্ধন, তা দাঁড়িয়ে আছে গভীর বিশ্বাসের শক্ত ভিত্তির ওপর। ওরা যেন একই দলের খেলোয়াড়, লড়বে ভয়ানক নিষ্ঠুর একদল শত্রুর বিরুদ্ধে।

সঙ্গে করে রোড ম্যাপ এনেছে ফুলজেন্স। ওটাতে ভালভাবে দেখানো হয়েছে মার্সেই থেকে কোপেনহেগেনের সড়ক-পথ। পিটারের সহায়তা নিয়ে রুট কী হবে এবং তাতে কতটুকু সময় লাগবে, তা বের করল ফুলজেন্স। কোথাও জ্যামে না পড়লে ওরা পৌঁছবে কোপেনহেগেনে চল্লিশ ঘণ্টায়।

গোজোতে ফোন করে সংক্ষেপে কথা সারল রানা।

আঠারো বছর বয়সে বড়লোক হওয়ার জন্যে গোজো ত্যাগ করে নিউ ইয়র্কে গিয়েছিল জনি আবদুল্লা। দশ বছর পর ফিরল ওর স্বপ্নে দেখা টাকার চেয়েও অনেক বেশি নিয়ে। সেই টাকার সামান্য অংশ খরচ করেই পেয়ে গেছে যা চেয়েছে। এখন আর কাজ না করলেও চলে। কিন্তু বসে থাকা যায় কত দিন? কাজেই কয়েকটা বোট কিনে ভাড়া দেয় জেলেদেরকে। রানার কথা শুনে খুব খুশি হয়েছে। যাক, কাজের মত একটা কাজ পাওয়া গেল। দেরি না করে জানিয়ে দিয়েছে, দু'দিনের ভেতর মার্সেই-এর তীরে পৌঁছবে ওর বোট। রানাকে ভাবতে হবে না, ওর সম্মানিত অতিথিদেরকে গোপনে নামিয়ে দেবে গোজোর সৈকতে।

আবদুল্লাকে জানিয়ে দিয়েছে রানা, নামার মত জায়গা পেলে যেন ফোন করে সে।

এদিকে দু'চার জায়গায় ফোন করল ফুলজেন্স, এরপর পকেট থেকে দামি মোবাইল ফোন বের করে বলল, 'মেয়েদের কাগজপত্রের জন্যে ছবি তুলতে হবে।'

পিটার ও রামিন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গেল, কিন্তু হাত তুলে বারণ করল ফুলজেন্স। 'অপেক্ষা করো। পুরো শান্ত হয়ে গেছে ওরা। গোলমাল করবে না।'

ডানদিকের বেডরুমে গিয়ে ঢুকল সে, খুলে রাখল দরজা। নরম সুরে বোঝাল কী করতে হবে লিলিকে। বাইরে থেকে ওর বক্তব্য শুনতে পেল ওরা। জবাবে শান্ত স্বরে কথা বলল লিলি।

রানার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল পিটার, 'মিলানের ওই লোক, যার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছ— সে আসলে কে?'

'ব্যবহার করে ছদ্মনাম,' বলল রানা, 'জান বাঁচাবার জন্যে ওই নাম জানিয়ে দিয়েছিল পওলো ক্যালভি। বংশ পরিচয় হিসেবে বলেছে "লাফাত্তা"।'

'মাত্র এটুকু সূত্র, মাসুদ ভাই?' হতাশ হয়ে বলল রামিন, 'পওলো মরেছে জানলেই হয়তো বেমালুম লাপাত্তা হয়ে যাবে ওই লাফাত্তা!'

মাথা নাড়ল পিটার। 'শুধু একটা নাম?'

'আরও একজনের কথা বলেছে,' বলল রানা, 'কিন্তু বুঝতে পারিনি স্পষ্ট। ভীষণ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হড়বড় করে কথা বলছিল পওলো, বুঝে গিয়েছিল মরতেই হবে। ওর কথায় যা বুঝেছি, লাফাত্তার এক গুপ্তচর আছে। লাফাত্তা আর পওলোর মাঝের শেকলের অংশ সে, সম্ভবত আধাআধি ফ্রেঞ্চ আর ইতালিয়ান। অনর্গল বলে ওই দুই ভাষা। কোনও নাম নেই। বলা হতো শুধু লিঙ্ক।'

'লাফাত্তার সঙ্গীর কোনও বর্ণনা দিয়েছে পওলো?' জানতে চাইল রামিন।

'হ্যাঁ, তাতে মাত্র একটা ব্যাপার পরিষ্কার: পুরো টাক পড়া লোক সে। বয়স পঞ্চাশ মত। অত্যন্ত শক্তপোক্ত। কম কথা বলে। মার্সেইল্‌স্‌-এ এলে সবসময় কচি মেয়েদের নিয়ে শুতে

চায়। আরেকটা অভ্যেস, ড্রিঙ্ক করে শুধু ক্যামপার দেয়া স্কচ উইস্কি।'

'এ থেকে কিছুই জানা যাচ্ছে না,' মন্তব্য করল রামিন, 'মনোযোগ দিতে হবে লাফাত্তা নামের লোকটার দিকে। তার অন্তত একটা নাম আছে। ...ওই লোক কি মাফিয়ার কেউ?'

'না,' মাথা নাড়ল রানা। 'পওলোর কথা অনুযায়ী, সে কাজ করে দ্য ডায়মণ্ড রিঙের হয়ে। ওই সংগঠনের সঙ্গে পওলোর একমাত্র সুতো ছিল সে। কচি মেয়ে হাতে পেলে তাকে ফোন করত পওলো। সে আবার বলে দিত কোথায় এবং কখন মেয়েদেরকে পৌঁছে দিতে হবে।'

চিন্তিত সুরে বলল পিটার, 'আমার ডিপার্টমেণ্ট যোগাযোগ রেখেছে ইতালিয়ান পুলিশ আর কারাবিনিয়ারির সঙ্গে। তাদের মাধ্যমে হয়তো ওই লোকের খোঁজ পাব আমরা।'

থমথম করতে লাগল ঘর। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল রামিন, 'অ্যালেকযেন্দ্রে ব্যারারের মত লোক হতে পারে তারা।'

চুপচাপ কথাটা হজম করল পিটার, আত্মরক্ষামূলক সুরে বলল, 'নিজেরাও কোপেনহেগেনে আমাদের ফাইল ঘেঁটে দেখতে পারি।' একটা কথা মনে পড়তেই বলল, 'আমি যখন পৌঁছাব ওখানে, তারপরেও পুরো সাত সপ্তাহ ছুটি থাকবে। তাই ভাবছি, বসে বসে বুড়ো আঙুল চুষে লাভ কী?' রাগী চোখে রানা ও রামিনকে দেখল সে।

মৃদু হাসল রানা। ডুবে গেল চিন্তার ভেতর। কিছুক্ষণ পর বলল, 'তুমি হয়তো কাজে আসবে। তোমাকে ব্যবহার করতে পারব পয়েণ্ট ম্যান হিসেবে।'

'সেটা আবার কী?' জানতে চাইল পিটার।

একবার রামিনকে দেখে নিয়ে বলল রানা, 'পয়েণ্ট ম্যানের কাজ এগিয়ে যাওয়া, ভুল পথ দেখিয়ে দেবে শত্রুকে। কাজটা

বিপজ্জনক নয়। অফিশিয়াল হিসেবে এখানে ওখানে গিয়ে ভুল তথ্য জোগাড় করবে। তাতে শত্রুরা বুঝবে, এই লোক কোনও কাজেরই না। এমন এক পুলিশ অফিসার, যে প্রচুর বকবক করে, কিন্তু কাজে দক্ষ নয়। কাজেই নার্ভাস হবে না তারা।'

হেসে ফেলেছে রামিন।

আরও রেগে গেল পিটার লারসেন। 'প্রচুর বকবক বলতে কী বোঝাতে চাইছ?'

আন্তরিক হেসে ওকে সহজ করে নিয়ে বলল রানা, 'বোকা ও বাচাল পুলিশ অফিসারের অভিনয় করবে তুমি। ওরা হাসবে তোমাকে নিয়ে, আর তখন ওদের পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকব আমি।'

কয়েক মুহূর্ত ভেবে বলল পিটার, 'জীবনেও বাড়তি বকবক করিনি! কিন্তু ঠিক আছে, তাতে যদি উপকার হয়, শিখে নেব কীভাবে বাচাল হতে হয়।' শেষ কথাটা খুব সিরিয়াস হয়ে বলেছে লারসেন। এই দল ছেড়ে চলে যাওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই ওর।

'তোমার সাহায্য কাজে আসবে, পিটার,' বলল রানা। 'এক সপ্তাহের ভেতর বেশ কিছু তথ্য জোগাড় করব। তিন সপ্তাহের ভেতর ফিরে এসে কাজে নামবে রামিন। আমাদের এ কাজে তাড়াহুড়োর উপায় নেই। সময় নিয়ে সারতে হবে। ইতালির কণ্ট্যাক্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'কাদের কথা ভাবছেন, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল রামিন।

'প্রথমে আলাপ করব নেপলসে রেমারিকের সঙ্গে। অনেকদিন হলো মার্সেনারি জীবন থেকে অবসর নিয়েছে, কিন্তু ওর আছে অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ ভাল পরামর্শ দিতে পারবে।'

কৌতূহলী চোখে রানার দিকে চেয়ে আছে পিটার লারসেন।

ভিটেলা রেমারিক সম্পর্কে সংক্ষেপে বলল রানা। অত্যন্ত দক্ষ মার্সেনারি, গোজোর অপরূপা মেয়ে জেসমিনের প্রেমে পড়ে বিয়ে

করেছিল। নেপলসে ছোট একটা হোটেল খুলে গুছিয়ে নিয়েছিল জীবন। কিন্তু মাত্র কয়েক বছর পর গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেল জেসমিন। তারপর থেকে খুব একা। বন্ধুরা চাপ দিলেও, আর কখনও বিয়ে করেনি, করবেও না। ইতালিতে গেলে উঠতেই হয় রানাকে ওর হোটেলে, নইলে ভীষণ কষ্ট পায় সে।

'রেমারিকের সঙ্গে কথা শেষ করে যোগাযোগ করব কর্নেল বার্নাদো গুগলির সঙ্গে,' বলল রানা।

এবার কৌতূহলী হয়ে উঠল রামিন।

বাধ্য হয়ে ব্যাখ্যা দিল রানা: 'উনিও পুরনো বন্ধু। অস্বাভাবিক বন্ধুও বলতে পারো। কারাবিনিয়ারির এক অংশের প্রধান তিনি, বহু দিন ধরেই ইতালিয়ান মাফিয়ার ওপর তথ্য জোগাড় করেছেন। কয়েক বছর আগে মিলান আর সিসিলির মাফিয়ার বড় নেতাদের বিরুদ্ধে নামতে হয়েছিল আমাকে। তখন চিনতাম না কর্নেলকে। কিন্তু আমার বিষয়ে সব তথ্য জোগাড় করেন, বুঝে যান কী করছি। খুলে দেন আমার সামনের পথ, যাতে খুন করতে পারি মাফিয়ার বড় বড় সব ডনকে। এরা মাফিয়োসি, তাদের হত্যাকারীকে আইন অনুযায়ী খুঁজে বের করে ব্যবস্থা নেয়ার কথা গুগলির, কিন্তু তিনি মোটেও তা করেননি, বদলে নিজের লোকদের সরিয়ে নেন, যাতে ঝাড়ে বংশে মরে ডনরা। পালারমোয় মাফিয়োসিদেরকে মেরে সাফ করে দেয়ার আগ পর্যন্ত আঙুলও নাড়েননি। নইলে আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল প্রধান ডন ও বেশিরভাগ লেফটেন্যান্টকে শেষ করা। সেই যুদ্ধে বাজেভাবে আহত হই। মরে যাওয়ারই কথা ছিল, কিন্তু বার্নাদো গুগলির বড় ভাই নেপলসে আমার দেহে বেশ কিছু অপারেশন করেন কারদারেলি হাসপাতালে। সই করেন ডেথ সার্টিফিকেটে। এতে সন্তুষ্ট হলো মাফিয়া পরিবারের সদস্যরা। কর্নেল গুগলির নির্দেশে আগেই হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল আমাকে, আরও

সুস্থ হওয়ার জন্যে গিয়ে উঠলাম গোজোতে রেমারিকের শ্বশুর-শাশুড়ির বাড়িতে।' মুচকি হাসল রানা। 'পরে শুনেছি কবরস্তানে আমার শেষকৃত্যে হাজার হাজার মানুষ গিয়েছিল।'

'এ কারণেই গোজোর লোক আপনার ওই ছদ্মনাম দিয়েছে,' বলল রামিন। পিটারের দিকে চেয়ে জানাল, 'গোজোতে সবার একটা করে ছদ্মনাম আছে।'

'রানার ছদ্মনাম কী?'

'আসলে দুটো-তিনটে আছে মাসুদ ভাইয়ের,' বলল রামিন। 'প্রথমে ''পুরুষ'', এরপর ''পুরুষ-সিংহ'' আর শেষে ''মেজেট''। গোজোতে মেজেট মানে: ''সেই মরা মানুষ''।'

'আর তোমার নাম ওখানে?' রামিনের দিকে তাকাল কৌতূহলী পিটার।

অস্বস্তি নিয়ে চট্ করে রানাকে দেখল রামিন, উদাস হয়ে গেল।

মুচকি হেসে বলল রানা, 'সবাই ওকে ডাকে, ''স্পিক্কা''। ওটার মানে: ''খতম হয়ে যাওয়া''। ওই ছদ্মনাম এসেছে প্রথমবার ডিস্কো নাচে যাওয়ায়। কপালে আঠার মত লেগে গেছে নামটা।'

'জানতাম না আপনি ওই দিন বাড়ি ফিরবেন,' বিড়বিড় করল রামিন, 'নইলে জীবনেও অত বিয়ার খেয়ে...'

পিটারের দিকে চেয়ে বলল রানা, 'তোমাকেও ছদ্মনাম নিতে হবে। ওটা তোমার কোড নেইম। ওই নাম শুনলে বুঝবে রামিন বা আমার কাছ থেকে কেউ গেছে।' রামিনের দিকে চাইল রানা। 'পিটারের কী নাম দেয়া যায়?'

ক'মুহূর্ত ভাবল রামিন, তারপর ফিক করে হেসে বলল, 'আমরা ওঁকে ডাকব পাভলোভা বলে। বিখ্যাত সব ডেযার্ট সাবড়ে দেয়ার ওস্তাদ।' আঙুল তুলে পিটারের মোটা কোমর দেখাল। 'চর্বি দেখেই বোঝা যায়।'

‘ঠিক আছে,’ বলল রানা, ‘এখন থেকে পিটার লারসেন হলো পাভলোভা।’

দ্বিতীয় বেডরুম থেকে বেরিয়ে এল ফুলজেন্স, হাতে তার পোলারয়েড ক্যামেরা ও কয়েকটা পাসপোর্ট সাইযের ছবি। টেবিলে ছবিগুলো রেখে দেখাল সবাইকে। আঙুল তাক করল একটা ছবির দিকে। ওখানে জেনি। মুচকি হেসে বলল, ‘বড় হলে আরও সিরিয়াস সুন্দরী হবে। জোর করে আমার কাছ থেকে চিরুনি চেয়ে নিয়ে চুল আঁচড়ে তৈরি হয়েছে, নইলে ছবি তুলতে দেবে না।’

ছবিগুলো রেখে দিল ব্রিফকেসে, একবার দেখল শোল্ডার হোলস্টারে পিস্তলটা ঠিক আছে কি না, তারপর ব্রিফকেসের ডালা বন্ধ করে বলল, ‘কয়েক ঘণ্টার ভেতর ফিরব কাগজপত্র নিয়ে।’

দরজার দিকে পা বাড়াতেই পিছন থেকে ডাকল পিটার, ‘এক মিনিট, ব্রিয়াঁ। তোমার ছদ্মনাম নেই?’

‘না, নেই,’ আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল ফুলজেন্স।

তীক্ষ্ণ চোখে রানার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল পিটার, ‘বলো তো ওর নামটা কী?’

চুপ করে বন্ধুর দিকে চেয়ে আছে রানা।

‘ঠিক আছে,’ বিরক্ত হয়ে বলল ফুলজেন্স, ‘এই কচুর চশমার জন্যে ওরা আমার নাম দিয়েছে হুতুম-পেঁচা। শালারা ভাল লোক না!’

হেসে ফেলল রানা ও রামিন।

পিটার লারসেন বলল, ‘ওটা তোমার পাসপোর্ট। কল করলে আমরা বুঝব তুমি কে। আর কখনও ব্যবহার করতে হবে না নিজের নাম।’

‘পেঁচা কোনও নাম হলো?’ তিক্ত চেহারা করে রওনা হয়ে গেল ফুলজেন্স। বিড়বিড় করল, ‘শালার মোটা উন্মাদ ডেনিশ

পুলিশ আমার পিছনে লেগেছে!'

বিশ

কোপেনহেগেনের ধনী এলাকা হেলারআপ-এ প্রকাণ্ড বাগান সমেত মস্ত বড় বাড়ি অ্যাস্ট্রাথ ও হান্না ওলসেনের। রাস্তা থেকে পৌঁছে না সামান্যতম আওয়াজ। এই দম্পতির মাত্র একটিই সন্তান, ফাঁকা পড়ে থাকে চারপাশ। যৌবনে ওঁরা ভেবেছিলেন আট-দশটা বাচ্চা নেবেন। কিন্তু সে অনুমতি দেননি স্রষ্টা।

রাত বারোটায় তাঁরা বিছানায় যাওয়ার দশ মিনিট পর বেজে উঠল অ্যাস্ট্রাথের মোবাইল ফোন। ঘুম চোখে কল রিসিভ করলেন তিনি। আধ মিনিট শোনার পর ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

'কে ফোন করল?' দুশ্চিন্তা নিয়ে জানতে চাইলেন তাঁর স্ত্রী।

হাতের ইশারায় চুপ থাকতে বললেন অ্যাস্ট্রাথ, কয়েক মুহূর্ত শুনে বললেন, 'জী... জী... হ্যাঁ... তা তো বটেই।' দেখলেন বেডসাইড টেবিলের ঘড়ি। 'পৌঁছব আধঘণ্টার ভেতর।' মোবাইল ফোন রেখে তাড়াহুড়ো করে বিছানা ছাড়লেন, 'এসো, হান্না! জলদি! লিলি... লিলিকে পেয়েছে পুলিশ!'

ক্লিনিকের গেটে অপেক্ষা করছিল পিটার লারসেন। দু'ঘণ্টা আগে পৌঁছেছে শহরে। বিএমডাব্লিউ গাড়িতে বসে আছে পেঁচা ব্রিয়াঁ ফুলজেন্স। ঝড়ের গতি তুলে এ দেশে এসেছে ওরা, মাঝে কোনও

বাধা-বিপত্তির মধ্যে পড়েনি। কার পার্কে সোনালি এক মার্সিডিয গাড়ি ঢুকতেই পিটারের মনে পড়ল, কী জানাতে হবে। কয়েক সপ্তাহ আগে ওর অফিসে চরম দুঃসংবাদ দিতে হয়েছিল ওলসেনদেরকে। তখন বুঝতে পেরেছিল, যথেষ্ট শক্ত মনের মানুষ তাঁরা। গ্রিনল্যাণ্ডের বিরান ও দুর্গম এলাকায় ভারী নির্মাণ ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছেন অ্যাস্ট্রাথ ওলসেন। নিজ যোগ্যতায় শত বাধা ঠেলে উঠে এসেছেন এত ওপরে। ছোটবেলা থেকেই প্রেম ছিল স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর। প্রথম থেকেই স্বামীর পাশে ছিলেন মহিলা। পিটারের অফিসে যদিও কেঁদে ফেলেছিলেন, কিন্তু আশা করা যায়, এখন শক্ত কঠিন বাস্তবতা মেনে নিতে পারবেন।

এণ্ট্র্যান্স পেরিয়ে হেঁটে এলেন মাঝবয়সী দম্পতি, চোখে আশা।

তাঁদের জন্যে দরজা খুলে দিল পিটার, হাতের ইশারা করে পথ দেখাল। থামল ওরা ছোট এক ওয়েইটিং রুমে। সবাই বসতেই একের পর এক প্রশ্ন ছুঁড়লেন হান্না ওলসেন। সেগুলোর ভেতর একটা হচ্ছে: 'আমাদের মেয়ে এই ক্লিনিকে কেন?'

স্বামী স্পর্শ করলেন তাঁর বাহু, নরম সুরে বললেন, 'একটু অপেক্ষা করো, হান্না। সবই ব্যাখ্যা করবেন মিস্টার লারসেন।'

বিস্তারিতভাবে তাই করল পিটার। দৃঢ় কণ্ঠে সহানুভূতি। তাঁদের মেয়ের ওপর কী ধরনের নির্যাতন হয়েছে, তা-ও বলল। জানাল, আগামী কয়েক সপ্তাহ খুব খারাপ সময়ের ভেতর দিয়ে যেতে হবে তাঁদের তিনজনকে। শেষ কথা হিসেবে বলল, তাঁদের মেয়ে এই ক্লিনিকে খুব ভাল চিকিৎসা পাবে। সুস্থ হলেই দেরি না করে ওকে ছেড়ে দেবেন ডাক্তার। আরেকবার বলল, ওর নিজের কারণে এ পরিণতি হয়নি লিলির, কাজেই উচিত হবে না ওকে কোনও দোষ দেয়া।

এই পর্যায়ে কার্পেট থেকে চোখ তুলে নিচু সুরে বললেন অ্যাস্ট্রাথ ওলসেন, ‘দোষ দিচ্ছি সেসব লোককে, যারা আমার মেয়েকে কষ্ট দিয়েছে। তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে?’

মাথা নাড়ল লারসেন। ‘তা করা হয়নি। কখনও তাদের আর ধরা যাবে না। তবে আপনাদের সন্তুষ্টির জন্যে বলতে পারি, তারা মারা গেছে, ভয়ঙ্কর কষ্ট পেয়ে। জানত কেন মরছে। ওখানে আপনাদের মেয়েই শুধু নয়, আরও মেয়ে ছিল। সত্যি বলতে, লিলির সৌভাগ্য, ফিরতে পেরেছে বাবা-মার কাছে।’

নীরবে কাঁদছেন হান্না, হাত তুলে চোখ মুছে জানতে চাইলেন, ‘আপনি কি তাদেরকে মেরে ফেলেছেন?’

আবারও মাথা নাড়ল পিটার। ‘না, কিন্তু ওখানে ছিলাম। ওই ঘটনা খুলে বলতে পারব না, নইলে আইনের কারণে অন্য কয়েকজন বিপদে পড়বে। তারাই উদ্ধার করেছে আপনাদের মেয়েকে, পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে। কাউকে বলা যাবে না তাদের বিষয়ে। কোনও পত্রিকায়ও আসবে না এসব।’

চুপ রইলেন দম্পতি। কয়েক মুহূর্ত পর অ্যাস্ট্রাথ ওলসেন বললেন, ‘যারা আমার মেয়েকে উদ্ধার করেছে, আর খুন করেছে ওই জানোয়ারগুলোকে... আমি কি তাদেরকে কোনও পুরস্কার দিতে পারি? আপনি হয়তো জানেন, আমি ঠিক গরিব মানুষ নই।’

সরাসরি তাঁর চোখে চেয়ে বলল পিটার, ‘হ্যাঁ, পুরস্কার দিতে পারেন। আবারও যখন সুস্থ হবে লিলি, ওর একটা ছবি পাঠিয়ে দেবেন আমার অফিসে। ওটা পৌঁছে দেব তাদের হাতে। তা-ই যথেষ্টরও বেশি পুরস্কার।’ উঠে দরজার কাছে গেল পিটার, কবাট খুলে ইশারা করল। সাধারণ জ্যাকেট ও স্ট্রাইপ্‌ড্ প্যান্ট পরনে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী এক লোক ঢুকল ভেতরে।

এই দম্পতির সঙ্গে ডাক্তার অ্যাবেলেন পৌলসেনের পরিচয় করিয়ে দিল পিটার। ডেনমার্কের সেরা নামকরা ড্রাগ্‌স্ নিরাময়

কেন্দ্র এই ক্লিনিকের প্রধান ডাক্তার পৌলসেন।

'ডক্টর পৌলসেন আপনাদেরকে খুলে বলবেন কী করতে হবে এবং কী করা চলবে না,' বলল পিটার। 'এই ক্লিনিকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব আমি।' ঘুরে দরজার দিকে পা বাড়াতেই পেছন থেকে বাধা দিলেন লিলির মা। উঠে এসে হাত রাখলেন ওর বাহুতে। নীরবে কাঁদছেন, একই সময়ে দিতে চাইলেন ধন্যবাদ।

তাঁর ভেজা গালে চুমু দিল পিটার, স্বামীর কাছে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে নীরবে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। বুকে যে সন্তুষ্টি, তা বেশিরভাগ সময় মেলে না ওর কাজে।

সেটিতে আরাম করে ঘুমিয়ে আছে পেঁচা ব্রিয়াঁ ফুলজেন্স।

নিজের ডাবল খাটে শুয়েছে পিটার। পাশেই মারগিট, হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ঘুমন্ত স্বামীর দেহে। বার-বার দেখছে কালো-নীল সব কালশিটে। দশ মিনিট আগে পিটার আর ওর বন্ধু আসতেই খুলে দিয়েছে অ্যাপার্টমেন্টের দরজা।

ওরা খাবার বা ড্রিঙ্ক চায়নি, একমাত্র চাহিদা শুধু ঘুম।

ওদের সংক্ষিপ্ত কথা বুঝতে পারেনি মারগিট। সেটিতে এখন শুয়ে আছে যে লোক, বেডরুমের দরজা থেকে তাকে বলেছে ওর স্বামী, 'গুডনাইট, পেঁচা।'

চোখ তুলে বলেছে ওই লোক, 'গুডনাইট, পাভলোভা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বামীর পেটে বেগুনি এক জায়গায় চুমু দিল মারগিট। সকালে পিটারের এই পেট থেকে বেরোবে সব।

একুশ

আকাশে চাঁদ নেই। কুচকুচে কালো সাগর। কিন্তু আটাশ নট গতি তুলে ভাটার স্রোতে বোট নিয়ে চলেছে জনি আবদুল্লা। ফ্লাইং ব্রিজে রামিনের পাশে চুপ করে বসে আছে সে। আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল রেইডার স্ক্রিন।

'সিসিলির পশ্চিম-দক্ষিণ তীর থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে আমরা। দুনিয়ার অন্যতম ব্যস্ত শিপিং লেনে ঢুকছি। সুয়েজ খাল ব্যবহার করে পুব ইতালি, গ্রিস, মধ্যপ্রাচ্য বা আরও দূর-পুবের দেশে চলেছে শত শত কার্গো জাহাজ আর অয়েল ট্যাঙ্কার।'

সামনে ঝুঁকে রেইডার স্ক্রিন দেখল রামিন। দপ্-দপ্ করছে অন্তত বারোটা ফোঁটা। জানতে চাইল, 'আবদুল্লা ভাই, এর ভেতর কী করে খুঁজে বের করবেন ম্যাকেটির জেলে নৌকা?'

হেসে ফেলল আবদুল্লা, ফুর্তিতে আছে। একবার হাতঘড়ি দেখে নিয়ে বলল, 'পনেরো মিনিট পর ম্যাকেটি ওর মাস্তুলে বিশেষ ট্র্যান্সপণ্ডার তুলবে, আর ওটাকে চিনবে আমার রেইডার।'

চট্ করে আবদুল্লাকে সন্দেহের চোখে দেখে নিয়ে বলল রামিন, 'কেন যেন মনে হচ্ছে, আগেও মানুষ পাচার করেছেন আপনি আর মাসুদ ভাই।'

'কথা মিথ্যা না,' স্বীকার করল জনি। 'তাতে কী?'

'কিছুই না।'

‘খুলে বলো মেয়েটার আসলে কী হয়েছে।’

দ্বিধাহীনভাবে বলল রামিন, ‘চাইলে জিজ্ঞেস করতে পারেন মাসুদ ভাইয়ের কাছে। আপনি তো জানেন...’

‘নিশ্চয়ই জানি,’ খুশি মনে বলল আবদুল্লা। ‘চমৎকার বাচ্চা মেয়েটা, কিন্তু খুব খারাপ কোনও লোক কিডন্যাপ করেছিল জেনিকে।’

নীরবে চলল বোট। বামের সাগরে মস্ত এক সুপারট্যাঙ্কার দেখল রামিন। ওটা ছোট কোনও শহরের মত ঝলমলে আলো ফেলেছে পানির ওপর। ডানে চোখ রেখে ওদিকেও কয়েকটা আলো দেখল।

রামিনকে বলল আবদুল্লা, ‘ওটা ফিশিং ফ্লিট। সিসিলির দক্ষিণ-পুবের পোর্টো প্যালো থেকে এসেছে। রাজা চিংড়ি ধরছে। সাধারণত সুযোগ পেলেই এক বোতল ব্ল্যাক লেবেল স্কচ উইস্কির বদলে ওদের কাছ থেকে নিই এক বাক্স চিংড়ি। কিন্তু আজ রাতে সে উপায় নেই। ...রামিন, একটা কথা... ওই বাচ্চাটার জন্যে যদি কোনও সাহায্য লাগে, বলতে দ্বিধা কোরো না। জানি না আসলে কী হয়েছে, কিন্তু বুঝতে পারছি, ড্রাগ্স্ দেয়া হতো ওকে। নিউ ইয়র্কে দেখেছি ওই ড্রাগসের কারণে কী করুণ অবস্থা হয় মানুষের। বাচ্চাদের ড্রাগ্স্ ছাড়ানো খুব কঠিন।’

‘দরকার পড়লে সাহায্য চাইব, আবদুল্লা ভাই,’ অন্তর থেকে বলল রামিন। ‘মাসুদ ভাই চাইছেন যেন নিজ হাতে ওর চিকিৎসা করি। বড় কথা, গোজোর কেউ যেন না জানে জেনি ওখানে। পরে উপযুক্ত কাগজপত্র জোগাড় করে নিয়ে ফিরবেন মাসুদ ভাই।’

‘সমস্যা নেই,’ বলল জনি। ডেকের নীচের দিকে আঙুল তাক করল। ‘ফেপ্পু ভাল করেই জানে কীভাবে মুখ বন্ধ রাখতে হয়। ম্যাকেটি আর ওর ছেলেরাও মুখ খুলবে না।’

আরও দশ মিনিট সাগরের বুকে চলল ওরা। সামনে চেয়ে থাকল আবদুল্লা। ডান বা বামে দৃষ্টি নেই, ড্যাশবোর্ডের রেইডার স্ক্রিনও দেখছে না। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ ঘোঁৎ করে উঠল। সামনে বেড়ে স্ক্রিন দেখাল। এক ডজন টিপ-টিপ করা আলোর ভেতর হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে একটা। খুশি হয়ে হেসে ফেলল আবদুল্লা। 'ওই যে ম্যাকেটির বোট! ওই আলো দেখলে মনে হবে সুপারট্যাঙ্কার। কিন্তু আসলে ষাট ফুটি ফিশিং বোট।'

কয়েক মিনিট ওই আলো অনুসরণ করল সে, তারপর মাথা দোলাল। 'হ্যাঁ, ম্যাকেটিই। দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিমে যাচ্ছে দশ নট গতি তুলে।' রেইডারের পাশের কমপিউটারে কয়েকটা সংখ্যা তুলে আবারও দেখল স্ক্রিন। 'ষোলো মিনিট পর দেখা হবে।'

হাতঘড়ি দেখে নিয়ে জানতে চাইল রামিন, 'হিসেব কষে বলবেন, ঠিক কখন গোজোতে পৌঁছুবে ম্যাকেটির বোট?'

কমপিউটারে কয়েকটা সংখ্যা তুলে বলল জনি, 'ধরে নিলাম গতি বারো নট। কারণ ওই গতি তুলেই যাবে। তা হলে তোমরা ওখানে পৌঁছাবে ভোর পাঁচটায়। একঘণ্টা পরেই সূর্য উঠবে।'

'ঠিক আছে, তো নিচে গেলাম,' বলল রামিন, 'জেনিকে তৈরি করে নিতে হবে।'

ডেকের নিচে কেবিনের দরজা জুড়ে প্রকাণ্ডদেহী ফেপ্পুকে বসে থাকতে দেখল রামিন। সে সরে যেতেই মৃদু মাথা দুলিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ও। বড়সড় ডাবল বেডে চুপ করে শুয়ে আছে জেনি। পরনে জিন্স ও কালো রঙের লম্বা হাতার টি-শার্ট। উদ্বিগ্ন চোখে দেখল রামিনকে।

'তুমি ঠিক আছ তো?' জানতে চাইল রামিন।

মাথা নাড়ল জেনি। 'খুব খারাপ লাগছে, আপনার দেয়া ওই জিনিস দরকার।'

'সময়ের আগেই ওষুধ দেয়া ঠিক নয়,' বলল রামিন। 'কিন্তু

অন্য বোটে উঠব, তাই আগে দেয়াই ভাল।' তালাবদ্ধ এক ড্রয়ার খুলল ও, ছোট এক বাক্স বের করে ওটা থেকে নিল সিরিঞ্জ।

টি-শার্টের ডান হাতের আস্তিন গুটিয়ে তুলল জেনি।

বাইশ

আজ শুক্রবার। প্রতি সপ্তাহের এই রাতে সবসময় তাঁর প্রিয় এক বিখ্যাত রেস্তোরাঁর অ্যালকোভে বসে ডিনার সারেন কর্নেল বার্নাদো গুগলি। মাত্র কয়েকটা অভ্যেস বজায় রেখেছেন, তার ভেতর প্রতি শুক্রবার রাতে এখানে ডিনার করা অন্যতম।

খেতে বসে গত সপ্তাহের প্রতিটি কাজ মন দিয়ে খুঁটিয়ে দেখবেন, তারপর স্থির করবেন আগামী সপ্তাহে কী কী কাজ। দেখলে কারাবিনিয়ারির কর্নেল বলে মনে হয় না তাঁকে। তিনি যেন বিখ্যাত গ্রাঁ প্রি ড্রাইভার বা অত্যন্ত সফল কোনও টেলিভিশন কোম্পানির মালিক। পোশাক এতই অভিজাত, মার্জিত ও আধুনিক, এমন পোশাকই স্বপ্নে দেখে দুনিয়া-সেরা সব দর্জি। কালচে-ধূসর ডাবল-ব্রেস্টেড সুটে সূক্ষ্ম কালো পিনস্ট্রিপ, এসেছে স্যাভিল রো-র হান্টস্ম্যান থেকে। অন্যগুলোর মতই ক্রিম সিল্ক শার্ট কোমোর ছোটখাট এক শার্ট প্রস্তুতকারী দর্জির তৈরি। গাঢ় লাল সিল্কের টাই আরমানির। পায়ের কিড লেদার শু রোমের কবলার্সের এক পাখোয়াজ মুচির তৈরি। দুর্দান্ত সুদর্শন পুরুষ গুগলি, যে-কোনও মেয়ে দ্বিতীয়বার ঘুরে দেখবে। কালো চোখ ও

বাজপাখির মত সামান্য বাঁকা নাক বুঝিয়ে দেবে তাঁর কর্তৃত্ব এবং রহস্যময়তা। ধনী ও সম্ভ্রান্ত এক পরিবার থেকে এসেছেন, সবসময় ওটার প্রধান ছিলেন তাঁর মা। ভদ্রমহিলা কখনও বুঝতে পারেননি, তাঁর এত রাজনৈতিক, সামাজিক কানেকশন, বিপুল সম্পত্তি এবং অঢেল টাকা থাকা সত্ত্বেও কেন সামান্য এক পুলিশের চাকরি নিল ছোট ছেলে!

বার্নাদো গুগলি যে কারাবিনিয়ারির সবচেয়ে কমবয়সী এবং প্রতিভাবান কর্নেল, তা কখনও মনে হয়নি তাঁর। নাক কুঁচকে সবসময় বলেছেন: দেখতে যতই সুন্দর হোক ইউনিফর্ম, তবুও তুমি সেই পুলিশেরই সামান্য লোক!

তাঁর বড় ছেলে ডাক্তারি পাশ করে হয়ে উঠেছেন ইতালির নামকরা সার্জন। তাতেও তাঁর সন্তুষ্টি নেই। বড় ছেলের কথা বলেন: ও তো লেখাপড়া শেখা কসাই, এর বেশি আবার কী!

কমার্স, ইণ্ডাস্ট্রি বা পলিটিক্সে ছেলেরা গেলে খুশি হতেন। সবসময় চেয়েছেন সমাজে প্রতিষ্ঠিত নামী ও ধনী পরিবারে বিয়ে করবে ছেলেরা। কিন্তু কী দুঃখজনক, তাঁর বড় ছেলে বিয়ে করেছে বোলোগনার এক নার্সকে। তার চেয়েও খারাপ দিক, ছোট ছেলে বার্নাদোর বিয়ে করার নাম নেই, প্রেম করে বেড়াচ্ছে একপাল কমবয়সী নায়িকাদের সঙ্গে। এ সহ্য করা যায়? শেষে দুই ছেলের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছেন তিনি, যদিও মুখে কড়া কথা বললেও ভালবাসেন অন্তর থেকে। বদলে পান দুই ছেলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

ইতালিয়ান মাফিয়ার বিষয়ে গভীর গবেষণার কারণে সুনাম অর্জন করেছেন কর্নেল গুগলি। কয়েক বছর ধরে অনুগত ও বিশ্বস্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট কোসিমা পাধানির সাহায্য নিয়ে তৈরি করেছেন প্রতিটি প্রধান মাফিয়া পরিবারের ওপর বিশদ ফাইল। প্রথমে সাফল্য আসছিল ওসব ফাইলের কারণে, কিন্তু পরে হতাশ হতে হয়েছে তাঁকে। সেসব ফাইল ব্যবহার করেন পালারমো ও অন্যান্য

এলাকার সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেটরা, কিন্তু এরপর অসহায় হয়ে তাঁকে দেখতে হলো, তাঁরা মাফিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে কাজে নামতেই গুলি করে বা বোমা মেরে খুন করে ফেলা হচ্ছে তাঁদের। সাহসী এবং সৎ মানুষ ছিলেন তাঁরা, কিন্তু মাফিয়ার বিরুদ্ধে তথ্য জোগাড় করে দিয়েও তাঁদেরকে কোনও সাহায্য করতে পারেননি গুগলি। আসলে রাজনৈতিক দুর্নীতি রক্ষা করেছে সেসব খুনিদেরকে। এরপর হতাশ হয়ে কয়েক মাস আগে ইতালির উত্তর দিকের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এলাকার রাজনৈতিক দুর্নীতি বিষয়ক কারাবিনিয়ারির শাখা দপ্তরের প্রধান হয়ে ট্র্যান্সফার নিয়েছেন। সঙ্গে রেখেছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কোসিমা পাধানিকে। গত কয়েক মাসে তাঁদের কাজের কারণে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে দেখছে একদল রাজনৈতিক নেতা।

জীবনে মাত্র তিনটে প্রিয় বিষয় আছে কর্নেল গুগলির। সেগুলোর প্রথম হলো: ভাল খাবার। দ্বিতীয়: সুন্দরী নারী। এবং তৃতীয়: ব্যাকগ্যামন। তিন শখের ভেতর শেষটা তৃতীয় স্থানে। প্রথম কথা, সব কাজ সেরে চমৎকার পরিবেশে ভাল কোনও রেস্তোরাঁয় বসে খেতে হবে দারুণ সুস্বাদু খাবার, অথবা রান্না করে নেবেন তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে; সেক্ষেত্রে সঙ্গে থাকতে হবে কোনও অপরূপা সুন্দরী। তারপর খাবার শেষ করে মেয়েটির সঙ্গে খেলে জিততে হবে ব্যাকগ্যামন, নইলে ওই মেয়েকে নিয়ে বিছানায় গেলে মন ছোট হবে তাঁর। আজ অন্তত রূপসী কোনও মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করছেন না, অবশ্য রবিবার রাতে তেমনই এক মেয়ে আসবে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে। ওই মেয়ে কোনও অভিনেত্রী নয়, নামকরা এক টেলিভিশন কোম্পানির লালচে চুলের অপরূপা উপস্থাপিকা।

আজও রেস্তোরাঁয় ঢুকে প্রিয় খাবারের অর্ডার দিয়েছেন: প্রথমে অ্যান্টিপাস্টো, তারপর ক্যাপন মাগরো। এসব শেষ করে

অর্ডার দিলেন প্রিয় গেলাটো দি টুটি ফ্রুটি। বেশি চর্বিদার খাবার খেলে মোটা হবেন বলে অত্যন্ত সতর্ক, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার রাতে একটু ছাড় দেন নিজেকে। ব্যারোলো ও ক্যাপন মাগরো একইসময়ে পৌঁছলে খুশি হয়ে উঠলেন। ভাবলেন, মাত্র এক দিন ডেযার্ট খেলে কীই-বা ক্ষতি? একবার তাকালেন রেস্তোরাঁর সদর দরজায়। ওখানে একজনকে দেখে ধীর হাতে চোখ থেকে খুলে ফেললেন চশমা। ওঁর দিকে হেঁটে আসছে ওই যুবক। নামিদামি সব লোক বসে আছে নানান টেবিলে। তাদের মাঝ দিয়ে অলস পায়ে আসছে সে। হাঁটার ভঙ্গি আর সবার থেকে ভিন্ন।

ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল বার্নাদো গুগলি, সরে গেলেন টেবিল থেকে।

একটু দূরের ক'জন কাস্টোমার খাওয়া বন্ধ করে সতর্ক চোখে দেখল তাঁকে। কয়েক সেকেণ্ড পর যুবককে আন্তরিকভাবে আলিঙ্গন করলেন কর্নেল, দুটো চুমু দিলেন দু'গালে।

রেস্তোরাঁর মালিক-কর্মচারী বা কাস্টোমাররা আগে কখনও কর্নেল বার্নাদো গুগলিকে এত খুশি হতে দেখেনি।

যুবক চেয়ারে বসতে নিজ জায়গায় বসলেন গুগলি। যুবকের পেছন পেছন এসেছে হেড ওয়েইট্রেস।

'রাতে কিছু খেয়েছ?' জানতে চাইলেন গুগলি।

মাথা নাড়ল রানা। 'প্লেনে স্যাণ্ডউইচ দিয়েছে।'

'তা-ও তো বোধহয় কয়েক ঘণ্টা আগের কথা।' টানা বলে গেলেন গুগলি কী কী খাবার আনতে হবে হেড ওয়েইট্রেসকে। তাঁর অতিথির জন্য চাই: স্প্যাগেটি অ্যালে ভোনগোল, এরপর ওসো বুকো। আপাতত ডেযার্ট দিতে হবে না তাঁকে। বদলে অতিথির খাওয়া শেষ হলে দ্বিগুণ পরিমাণ ওসো বুকো চাই। এ ছাড়া, লাগবে এক বোতল ব্যারোলো।

রওনা হয়ে গেছে হেড ওয়েইট্রেস।

মৃদু হাসল রানা। 'কিছুই ভোলো না।'

হেসে ফেললেন গুগলি। 'তোমার শেষকৃত্যের আগের রাতে কারদারেলি হাসপাতালে ওসব পদই চেয়েছিলে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'কেমন আছেন তোমার ভাই?'

'ভাল। তবে বেশি ব্যস্ত। বিশ্রামের উপায় নেই।'

'কাজই তো ওরকম।'

'তা-ই আসলে,' বললেন গুগলি। 'আমারও কাজ আছে, কিন্তু কাজ শেষ করতে প্রতিদিন চোদ্দ ঘণ্টা লাগে না। ...হঠাৎ মিলানে, রানা? তোমাকে ভালবাসি, কিন্তু খারাপ লাগে যখন হারতে হয় ব্যাকগ্যামনে লাখে লাখে লিরা।'

ওয়াইন ওয়েইট্রেস নিয়ে এল ব্যারোলো। বোতলটাকে খুব সম্মান দিয়ে সতর্ক হাতে খুলল ওটার কর্ক, সাবধানে ঢেলে দিল রানার গ্লাসে রক্তিম তরল।

ওয়াইনে চুমুক দিয়ে মাথা দোলাল রানা। ওয়েইট্রেস বিদায় হতেই বলল, 'নাম থেকে খুঁজে বের করতে হবে এক লোককে, সেজন্যে তোমার সাহায্য চাই। শুধু ওই নাম ছাড়া অন্য কোনও তথ্য নেই। ড্রাগ্স্ ও পতিতাদের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত সে।'

'নামটা বলে ফেলো,' বললেন গুগলি।

'লাফাত্তা।'

'ক্রিশ্চান নাম?'

'জানি না।'

'মিলানে থাকে?'

'কাজ তার মিলানে।'

স্প্যাগেটি হাজির করেছে ওয়েইট্রেস। চুপচাপ খেতে লাগল রানা। মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখছে কর্নেলকে। ভাল করেই জানে, একবার কিছু শুনলে কখনও ভোলে না গুগলি। আপাতত

মগজের কোটি কোটি খুপরির ভেতর হাতড়ে চলেছে।

কিছুক্ষণ পর বললেন গুগলি, 'মিলানে তিনজন লাফাত্তাকে চিনি। একজন যাজক, অন্যজন লা স্ক্যালার জুনিয়র কণ্ডাকটর, আর তৃতীয়জন তৈরি করে শহরের সেরা পাউরুটি। মনে হয় না তাদের কেউ ড্রাগ্স্ বা পতিতা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসলেন গুগলি। 'কিন্তু কে জানে? গত মাসে এক যাজক কিনল গাড়ি। ওটা বিএমডাব্লিউ। খুব দামি গাড়ি না, কিন্তু বড় কথা হচ্ছে, ওটা নতুন।'

হাসল রানা। 'কখনও দ্য ডায়মণ্ড রিঙের নাম শুনেছ?'

আবারও মাথার ভেতরের কমপিউটার ব্যস্ত হলো গুগলির। রানা খাবার শেষ করে আধ গ্লাস ওয়াইন গলায় ঢালতেই জবাব দিলেন, 'মনে হচ্ছে মগজে বাজছে অনেক দূরের ঘণ্টি। কিন্তু নিশ্চিত নই। ধরে নিচ্ছি লাফাত্তার সঙ্গে দ্য ডায়মণ্ড রিঙের সম্পর্ক আছে।'

'হ্যাঁ, আছে। যেখানে চাকরি করি, আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করে পুরো খুলে বলেছি, কী জানতে চাই। খোঁজ নিয়ে সে জানিয়েছে, সত্যিই বছর খানেক আগে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর এক গোপন সঙ্ঘ ঢুকে পড়েছে বাংলাদেশে। স্বার্থে সামান্য আঘাত এলেই খতম করে দিচ্ছে যে-কাউকে। হয়তো বছরের পর বছর ধরেই আছে তারা বহু দেশে। ছড়িয়ে পড়েছে দুনিয়ার সবখানে। খুব সতর্ক ও পেশাদার। নানান দেশের পুলিশ বা অন্যান্য আইনী সংগঠন এদের বিষয়ে প্রায় অজ্ঞ অথবা বিপুল টাকার বিনিময়ে চুপ করে আছে। রানা এজেন্সির প্রতিটি শাখায় ফোন করে এদের বিষয়ে খোঁজ বের করতে বলেছি। অথচ তথ্য বলতে সামান্য একটা নাম। ওই লোকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল যার, মারা গেছে সে। কাজেই ছুটে গেছে শেকলের আংটা। বা বলতে পারো, মইয়ের ওপরের ধাপ ওই লাফাত্তা। হয়তো অনায়াসেই লম্বা ওই শেকলের

কিছু আংটা কেটে ফেলবে ওরা। সেক্ষেত্রে ওই দলের বড় সব নেতাকে খুঁজে বের করা খুব কঠিন হবে।'

'তুমি জড়িয়ে গেলে কীভাবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'খুলে বলতে সময় লাগবে।'

সবমিলে প্রায় একঘণ্টা ব্যয় হলো রানার। গভীর মনোযোগে ওর কথা শুনলেন গুগলি, মাঝে মাঝে পরিষ্কারভাবে বুঝতে প্রশ্ন তুললেন।

গেলাটো দি টুটি ফ্রুটি ফুরিয়ে যাওয়ার পর শেষ হলো রানার কথা। খুব সাবধানে ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছলেন গুগলি, শেষ ফোঁটা ওয়াইন জিভে ফেলে বললেন, 'ঠিক আছে, একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পারছি, মাফিয়ার সঙ্গে জড়িত নয় দ্য ডায়মণ্ড রিং। কাজ করছে খুব গোপনে। নইলে ধরা পড়ত বড় কোনও নেতা। এরা অত্যন্ত শক্তিশালী ও নির্মম। আমার এক কলিগ কাজ করছে এসব বেআইনী সংগঠনের বিরুদ্ধে। সকালে যোগাযোগ করব তার সঙ্গে। মিলানে কয়দিন আছ? এবং কোথায় থাকছ?'

টেবিল পরিষ্কার করতে হাজির হয়েছে ওয়েইট্রেস। তাকে দুটো এসপ্রেসো কফি এবং দুটো ডাবল আরম্যানিয়াকের জন্য অর্ডার দিলেন গুগলি।

'যতক্ষণ লাফাত্তার খোঁজ না পাই, এই শহরেই আছি,' বলল রানা। 'স্টেশনের কাছে ছোট এক হোটেলে উঠেছি।' ক্লান্ত হাসল। 'নাম হোটেল ইন্টারন্যাশনাল। কিন্তু আসলে জাতীয় পর্যায়েও উঠতে পারেনি। বড় কথা, অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারছি।'

'আমার অ্যাপার্টমেন্টের গেস্টরুমে ওঠো,' বললেন গুগলি, 'অবশ্য, সবসময় ভূতের মত গোপনে থাকতেই ভালবাসো।'

কফি ও আরম্যানিয়াক পানের ফাঁকে পুরনো দিনের কথা তুললেন গুগলি। বিশেষ করে ভিটেলা রেমারিকের বিষয়ে। তখন

মাফিয়ার বিরুদ্ধে লড়ছিল রানা। গুগলি ও রেমারিক দু'জন হয়ে ওঠে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তখন চমৎকার সঙ্গ পাওয়ার লোভে প্রতি সপ্তাহে রেমারিকের হোটেলে যেতেন গুগলি। দ্বিতীয় লোভ, ভাল খাবার। আর পরবর্তী সময়ে হয়ে উঠল তৃতীয় আকর্ষণ: বছরের পর বছর ব্যাকগ্যামনে যত লাখ লিরা হেরেছেন রেমারিকের কাছে, চেষ্টা চালাতেন সেসব উদ্ধার করতে।

একসময় চলে গেল সব কাস্টোমার, সময় হলো রেস্তোরাঁ বন্ধ হওয়ার, তখন ওখান থেকে বেরিয়ে এল কর্নেল বার্নাদো গুগলি ও মাসুদ রানা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আরেকবার আলিঙ্গন করল দুই সাহসী পুরুষ, তারপর রওনা হয়ে গেল যে-যার পথে।

তেইশ

গোজো দ্বীপে জেনিকে নিয়ে মাসুদ রানার বাড়িতে ওঠার পর আজ দ্বিতীয় দিন। ভীষণ ভয় পেয়েছে রামিন রেযা।

মেনে চলেছে রানার প্রতিটি নির্দেশ।

গতকাল ভোরের আগে নেমেছে মগার ল'সিনির সৈকতে। ম্যাকেটির এক ছেলে ল্যাণ্ড-রোভার নিয়ে অপেক্ষা করছিল। রামিন ও জেনিকে পৌঁছে দিয়ে গেছে পাহাড়ি বাগানবাড়িতে। স্লিপিং পিলের প্রভাবে ঘুমিয়ে ছিল বাচ্চা মেয়েটা, কম্বল দিয়ে ওকে মুড়িয়ে রেখেছিল রামিন। দু'হাতে তুলে নিয়ে গেছে বাড়ির ভেতরে, শুইয়ে দিয়েছে নিজের বিছানায়।

পরের দু'ঘণ্টা প্রচণ্ড খাটুনি খেটে তকতকে পরিষ্কার করেছে ওয়াইনের গুহা। আগে থেকেই যেসব রসদ আছে, সব রেখেছে বাড়ির গেস্টরুমে। ওখান থেকে ম্যাট্রেস ও গোটা পনেরো কম্বল নিয়েছে গুহায়। পিপেয় ভরেছে বাগানের কল থেকে পানি। দরজার কাছে ছাতে একমাত্র বাতি জ্বলছে কি না দেখেছে সুইচ টিপে, তারপর ফিরে এসেছে বেডরুমে। দেখল ঘুম ভেঙে গেছে জেনির। ওর পাশে বিছানায় বসল রামিন, মেয়েটার হাত হাতে তুলে নিয়ে নরম সুরে আলাপ শুরু করল। আগেই ঠিক করেছে, কোনও মিথ্যা বলবে না মেয়েটাকে।

অনুভূতিহীন চেহারায় রামিনের কথা শুনেছে জেনি, তারপর বলেছে, 'ভাইয়া, তুমি আমার পাশে থাকবে না?'

'হ্যাঁ।'

'সবসময়?'

'হ্যাঁ। তবে কখনও দু'চার মিনিটের জন্যে বাড়ি থেকে খাবার আনতে যেতে হবে।'

মাথা দুলিয়ে আস্তে করে রামিনের হাতে চাপ দিয়েছে জেনি। এরপর শেষবারের মত মেথাডন ইঞ্জেক্ট করেছে রামিন, মেয়েটাকে নিয়ে গেছে গুহার ভেতর। বেচারির পরনে শুধু টি-শার্ট ও জিন্স। হাতে জুতো ও মোজা।

পাথুরে গুহায় ঢুকেই দম আটকে এসেছে জেনির।

রামিন ব্যাখ্যা করেছে, এক সময়ে এই গুহার ভেতর ওয়াইন তৈরি করে জমিয়ে রাখা হতো। এখানে থাকাই ভাল, নইলে বাড়ির কাছে কেউ এলে সমস্যা হবে।

শীত লাগছে বলে মোজা ও জুতো পরে নিয়েছে জেনি। শুয়ে পড়েছে ম্যাট্রেসে। তখন রামিন বলেছে, ফিরবে একঘণ্টা পর। বাস্তবে একঘণ্টা নয়, আধ ঘণ্টার ভেতর গ্রাম থেকে ফিরে এসেছে। ততক্ষণে পাহাড়ের মাথায় হাসছে কমলা সূর্য। গ্রামে

ওকে দেখে অবাক হলেও খুশি হয়েছে গ্যাব্রিয়েলা, সব ক'টা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, যখন শুনেছে আগামী দু'সপ্তাহ কাজে যেতে হবে না; কিন্তু ঠিকঠাক পাবে বেতন। এরপর ছোট এক গ্রোসারি দোকান থেকে কয়েক বাক্স রসদ কিনেছে রামিন। বেশিরভাগ জিনিস ক্যান করা খাবার, ফলমূল, পাস্তা ও সফ্ট্ ড্রিঙ্ক। ঠিক করেছে, আগামী ক'দিন ভুলেও ধারেকাছে যাবে না বিয়ারের। বাড়ি ফিরে সব রসদ মজুদ করে গুহা পর্যন্ত নিয়ে গেছে ফোনের এক্সটেনশন। দরজা খুলে দেখেছে, অকাতরে ম্যাট্রেসে ঘুমিয়ে আছে জেনি। আবারও বেরিয়ে বাগান থেকে নিয়ে এসেছে একটা ক্যানভাসের চেয়ার।

ঠিক বারো ঘণ্টা পর সত্যিই শুরু হলো জেনির কষ্ট।

বিস্তারিতভাবে রামিনকে সবই বলেছে রানা। কাজেই কী ঘটতে চলেছে বুঝতে সময় লাগল না ওর।

ভীষণ অস্থির হয়ে উঠল কিশোরী। ম্যাট্রেসে আড়াআড়িভাবে পা রেখে পিঠ রাখল পাথুরে দেয়ালে। একটু পর পর হাই তুলল। শুরু হলো কাঁপুনি। ভিজে গেল চোখের পাতা। নাক-চোখ থেকে পড়তে লাগল নোনা পানি। জেনিকে বলে গুহার দরজা লক করে বেরিয়ে এল রামিন, কিচেন থেকে নিল কয়েক বাক্স টিশ্যু। গুহায় ফিরে জেনির হাতে দিল একটা বাক্স। কিন্তু টিশ্যু ভিজিয়ে থামল না চোখ ও নাকের পানি। ঘামে ভিজে গেল টি-শার্ট ও জিন্সের প্যান্ট।

ম্যাট্রেসে জেনির পাশে কয়েক ঘণ্টা বসে রইল রামিন, দু'হাতে ধরে রাখল বেচারির দু'হাত। মেয়েটার গলা থেকে বেরোতে লাগল করুণ গোঙানি। যেন খুব কষ্ট পাচ্ছে ছোট কোনও জন্তু। তারপর হঠাৎ করেই কীভাবে যেন ঘুমিয়ে পড়ল বেচারি।

রানার কাছে আগেই শুনেছে রামিন, এমনি ঘটবে হেরোইন-

সেবীদের বেলায়। কয়েক ঘণ্টা চলবে ওই ঘুম, তারপর শুরু হবে আরও অনেক বেশি যন্ত্রণা। দরজা লক করে বেরিয়ে এল রামিন, জেনির কষ্টের মাত্রা বুঝতে পেরে ভোঁতা হয়ে গেছে ওর মগজ।

আবারও নামল পাহাড়ি রাত। সুইমিং পুলের পাড়ে দাঁড়িয়ে অনেক নিচে গ্রামের বৈদ্যুতিক আলো, দূরের কোমিনো ও মাল্টা দ্বীপ দেখল রামিন। যেসব লোক ও মেয়েলোক জেনির এই অবস্থা করেছে, তাদের কথা ভাবতে গিয়ে ঘৃণায় রি-রি করতে লাগল ওর শরীর-মন। রানার কথা ভাবল। সে এখন আছে মিলানে, খুঁজছে ওই পশুটাকে। মনে মনে প্রার্থনা করল রামিন, মাসুদ ভাই যেন খুঁজে পেয়ে যান তাকে।

কয়েক ঘণ্টা পর আবারও গুহায় ফিরল ও। তখনও ঘুমিয়ে জেনি। আবারও সুইমিং পুলের পাড়ে এল রামিন। পোশাক ছেড়ে সাঁতরে এপার-ওপার করল পুরো পঞ্চাশবার।

দু'ঘণ্টা পর জেগে উঠল জেনি। ততক্ষণে মেথাডনের শেষ ডোয দেয়ার পর পেরিয়ে গেছে পুরো চব্বিশ ঘণ্টা। স্রেফ নরকে পৌঁছে গেছে বেচারি। ক্যানভাস চেয়ারে বসে চুপচাপ ওর কষ্ট দেখল রামিন। বার-বার হাই তুলতে লাগল জেনি। এতই দ্রুত, রামিনের মনে হলো, খুলে পড়বে মেয়েটার চোয়াল। নাক থেকে দর দর করে ঝরতে লাগল সর্দি, চোখ থেকে অশ্রু। ফুলে গেল চোখের পাতা। দাঁড়িয়ে গেল শীতল হয়ে যাওয়া শরীরের সব সূক্ষ্ম রোম। থরথর করে কাঁপছে জেনি। এরপর বাড়ল আরও যন্ত্রণা। পেটে শুরু হলো বেদম ব্যথা, সেই সঙ্গে ডায়ারিয়ার মত পাতলা পায়খানা। ভিজে গেল জেনির জিন্সের প্যান্ট, গুহার মেঝেতে গড়াতে লাগল নোংরা হলদে পদার্থ। ঘৃণা নিয়ে প্যান্ট খুলে ফেলল জেনি। তারপর জুতো। মোজা। টি-শার্ট। পুরো উলঙ্গ হয়ে গেল বেচারি। কোনও খেয়াল নেই গুহায় উপস্থিত আছে রামিন। তারপর খেয়াল করল মানুষটা কাছেই আছে। বিকৃত কণ্ঠে ওর

কাছে কাতর অনুরোধ জানাল জেনি, ওকে যেন দেয়া হয় ইঞ্জেকশন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পিপের কাছে গেল রামিন, কাঠের গভীর বড় চামচ দিয়ে ভিজিয়ে দিল জেনির শরীর। এই একই কাজ করতে লাগল একটু পর পর। কিন্তু কোনওভাবেই পরিষ্কার রাখা গেল না জেনিকে। বমি করতে লাগল বেচারি। পড়ে থাকল মেঝেতে, ছিটকে মুখ দিয়ে বেরোল বমি।

রামিন খেয়াল করল, বমির সঙ্গে একটু একটু রক্ত যাচ্ছে। জেনিকে যারা এই অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে, তাদের কথা ভাবতে গিয়ে রাগে অন্ধ হয়ে গেল ও, কিন্তু বেচারির জন্যে কিছু করবে, সে-উপায় নেই।

অস্থির ঢেউয়ের মত নড়তে লাগল জেনির পেট। মনে হলো চামড়ার নিচে ওখানে কিলবিল করছে গুচ্ছের সাপ।

রানার কথা মনে পড়ল।

নাড়ি-ভুঁড়ির তীব্র নড়াচড়ার জন্যে এমন হচ্ছে।

রামিন জানে, বাচ্চা মেয়েটা কী কারণে এত ভীষণ ব্যথা পাচ্ছে। কিন্তু তাতে সামান্য স্বস্তিও পেল না মনে। আগেই জানা আছে, এরপর সামনে কী আসছে। আর বিশ্রাম পাবে না জেনি, ঘুমাতেও পারবে না। হয়তো ফিরবে ওই নরক থেকে বাস্তব জগতে, নইলে চোখের সামনে মরবে করুণভাবে।

বারকয়েক অযৌক্তিকভাবে রামিন ভাবল: সরু গভীর কবর খুঁড়লেই হবে। প্রতিবার এ কথা মনে এলে নিজেকে চাবুক দিয়ে পেটাতে ইচ্ছে হলো ওর।

পরের কয়েক ঘণ্টায় আরও কয়েকবার জেনিকে গোসল করিয়ে দিল ও। পুরো ভিজে গেছে বেচারি, সপ্-সপ্ করছে ম্যাট্রেস। গুহার মেঝেতে বইছে স্রোত। রামিনের হাত থেকে ঝুলছে বড় চামচ, অসহায় চোখে দেখছে চারপাশ। ভুলে গেছে

ঘড়ির কথা, কাজেই জানা নেই কয়টা বাজে। একদিন পেরিয়ে গেছে, না এক সপ্তাহ? খাটতে খাটতে ব্যথা হয়ে গেছে শরীর। অসহায় বোধ করছে জেনির কষ্ট দেখে। ঘড়ি দেখে বুঝল, ছত্রিশ ঘণ্টারও বেশি ড্রাগ্স্ ছাড়া জেনি। আরও চার-পাঁচটা দিন এই নরকে বাস করবে, অথবা আগেই মারা পড়বে।

কর্কশ স্বরে ফিসফিস করতে লাগল জেনি। বার-বার বলছে, দয়া করে যেন দেয়া হয় ইঞ্জেকশন।

আবারও ক্যানভাস চেয়ারে ফিরে গেল হতভম্ব রামিন।

এড়াতে চাইল জেনির দৃষ্টি।

কাজটা অসম্ভব।

নিজের চোখও বার-বার ফিরছে বেচারির দিকে।

ছোট, সাদা, ফুটফুটে পুতুলের মত। থরথর করে কাঁপছে নোংরা ম্যাট্রেসে শুয়ে। নিজের সবই দিতে চাইল জেনি। হাত তুলে দেখাল ছোট্ট স্তন। পা ফাঁক করে আহ্বান করল। তবুও যেন একটু হেরোইন দেয়া হয় ওকে।

জেনির মাথার ওপর পাথুরে দেয়ালের কালো এক দাগে চোখ গেঁথে রাখল রামিন।

এরপর অভিশাপ দিতে লাগল জেনি। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে সাহায্য চাইল। প্রায় বারো বছর বয়সী এক কিশোরীর আর্তনাদ বেরোল না গুহার বদ্ধ জায়গা থেকে। দু'পায়ের ভয়ঙ্কর ব্যথায় ছটফট করতে লাগল জেনি। রগে টান ধরেছে।

রামিন জানত না, শ্রান্তিহীনভাবে নানান দিকে ছিটকে পড়তে পারে কোনও মানুষ। বুঝেও পেল না, সুস্থ-সবল লোক যেখানে বাঁচবে না এই কষ্টে, সে-অবস্থায় এখনও কী করে বেঁচে আছে অসুস্থ, অসহায়, দুর্বল এক কিশোরী!

ভীষণ ভয় হলো রামিনের, হেরে যাচ্ছে যুদ্ধে। বাঁচাতে পারবে না জেনিকে। তখনই বেজে উঠল এক্সটেনশন ফোন। ওই

আওয়াজ শুনল জেনি, দাপড়ে পড়ছে এদিকে-ওদিকে। ভীষণ যন্ত্রণায় ছুঁড়ছে দু'পা।

ফোনের রিসিভার তুলে নিল রামিন। ক্লিক আওয়াজ হলো, তারপর শুনতে পেল রানার কণ্ঠ: 'তুমি?'

'জী।'

'কী অবস্থা?'

বড় করে দম নিয়ে যতটা পারা যায় শান্ত স্বরে বলল রামিন, 'আমি গুহার ভেতর। মনে হচ্ছে মারা যাচ্ছে জেনি।'

'কী করছে জানাও।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রামিন, 'নানান দিকে ছিটকে পড়ছে। লাথি মারছে যেদিকে পারছে। কাতর হয়ে চাইছে হেরোইন।'

শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল রানা, 'পায়খানা করছে, সঙ্গে বমি?'

'হ্যাঁ।'

'পেটে সাপের মোচড় দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'অনেকক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছে?'

'হ্যাঁ। ক'ঘণ্টা আগে জেগে গেছে। মাসুদ ভাই, ও বাচ্চা মেয়ে, আর সহ্য করতে পারছে না ওর শরীর।'

পেরিয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর জানতে চাইল রানা, 'শেষবার কখন মেথাডন দিয়েছ?'

চট্ করে হাতঘড়ি দেখল রামিন। 'সাড়ে আটত্রিশ ঘণ্টা আগে।'

আবারও ওদিক নীরব। তারপর বলল রানা, 'আগামী চব্বিশ ঘণ্টা টিকে গেলে হয়তো বাঁচবে। এর ভেতর ঘুমাতে পেরেছ?'

'না।'

'তা হলে মন দিয়ে শোনো। জেনির যা ঘটছে, সেটা ড্রাগ্স্ ছেড়ে দেয়ার সময় হবেই। রামিন, যা-ই ঘটুক, যত কষ্টই হোক

মনে, ভুলেও ওকে মেথাডন দিয়ো না।' কঠোর হয়ে উঠল রানার কণ্ঠ: 'জেনি যা খুশি করুক বা বলুক, ভুলেও কোনও ডাক্তার ডেকে এনো না। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। নইলে ডাক্তার এসে ওকে মেথাডন ইঞ্জেক্ট করে পাঠিয়ে দেবে ডিটক্স সেন্টারে। শেষে হয়তো বাঁচবে, কিন্তু সর্বনাশ হবে ওর। সমাজে হবে অচ্ছুত। বাড়ি ফিরলেও সহ্য করবে সৎ-বাবার মানসিক-শারীরিক অত্যাচার। তা চাই না। কোনও কোনও অ্যাডিক্টের জন্যে ডিটক্স সেন্টারই ঠিক, কিন্তু আমার ধারণা, তুমি ওর পাশে থাকলে এই বিপদ উতরে যাবে জেনি। এবার ওকে রেখে দরজা বন্ধ করে সোজা ঘরে গিয়ে কমপক্ষে চার ঘণ্টা ঘুম বা বিশ্রাম নেবে। ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখো। গুহার ভেতর ঘুমিয়ে পড়লে মস্ত বিপদ হবে।'

নিজের ওপর রাগ নিয়ে বলল রামিন, 'এই অবস্থায় ওকে ছেড়ে যাই কী করে, মাসুদ ভাই!'

'কাজটা করতেই হবে। চার ঘণ্টার জন্যে ওখান থেকে বেরিয়ে এসো। ওর ক্ষতি হবে, এমন জিনিস জেনির কাছ থেকে সরিয়ে ফেলো।'

দরজার কাছে গিয়ে একবার দেখল রামিন, গলা-কাটা মুরগির মত আছড়ে পড়ছে জেনি। এদিকে ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে ওর নিজের শরীরও। মনে হচ্ছে এক মুঠো বালি কচকচ করছে চোখের ভেতর। টনটনে ব্যথা সারা শরীরে।

জেনি শুয়ে পড়েছে বেশ কয়েকটা কম্বলের নীচে। বার-বার গা থেকে সরিয়ে ফেলছে, আবারও ওগুলো দিয়ে ঢাকছে শরীর।

বেচারি কী করছে ফোনে রানাকে জানাল রামিন।

'পরের স্টেজ শুরু হয়েছে,' বলল রানা, 'ভীষণ শীত লাগবে ওর। বেশ কয়েক ঘণ্টা এমন হবে। ঘুমাতে পারবে না। ভীষণ কষ্ট দেবে পেটের খিঁচ। ওই খিঁচুনির কারণে মারাও যেতে পারে।

কিন্তু আমাদের কারও কিছুই করার নেই। জেনি যদি বাঁচে, পরে তোমার সাহায্য লাগবে ওর। যাও, গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।'

সিদ্ধান্ত নিল রামিন, 'তাই করব, মাসুদ ভাই। ওখানে কিছু জানলেন?'

'মার্সেইল্‌স্‌-এর ওই লোকের নাম অনুযায়ী খোঁজ নিচ্ছি। আশা করি দু'তিন দিনের ভেতর তথ্য পাব। তখন তোমাকে জানাব। ...মন শক্ত করো, রামিন।'

কেটে গেল ফোনের কানেকশন।

চব্বিশ

রানার দুটো চার উঠতে ছাতের দিকে চোখ তুলে দুর্ভাগ্য আর ইবলিশ নিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বললেন কর্নেল বার্নাদো গুগলি। বোর্ড থেকে শেষ দুটো কাউন্টার তুলে নিল রানা, চট্‌ করে দেখে নিল দ্বিগুণ ডাইস, হিসেব কষে বলল, 'তা হলে যোগ হচ্ছে আরও চার লাখ ছাব্বিশ হাজার লিরা।'

আবারও বিড়বিড় করে কাকে যেন অভিশাপ দিলেন গুগলি, তারপর উঠে আড়মোড়া ভাঙলেন। চলে গেলেন ড্রিঙ্কের কেবিনেটের সামনে।

গুগলির সঙ্গে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে আছে রানা।

শনিবারের বিকেল।

ওদের পরনে বাসায় ব্যবহৃত সুতি প্যান্ট ও গলা খোলা শার্ট।

দু'ঘণ্টা হলো ফোন কলের জন্যে অপেক্ষা করছে। বসে থাকতে ভাল লাগছিল না বলে খেলতে বসেছে ব্যাকগ্যামন।

বুক সমান কেবিনেটের সামনে গুগলির পাশে পৌঁছে গেল রানা। একবার দেখে নিল হাতঘড়ি।

ভোদকা-সোডা ঢেলে রানার হাতে লম্বা ফ্রস্টেড গ্লাস ধরিয়ে দিলেন গুগলি। 'যে-কোনও সময়ে ফোন করবে। নির্ভরযোগ্য। কেউ লাফাত্তার খোঁজ বের করতে পারলে সে ওই লোক।'

মৃদু হাসল রানা। 'অধৈর্য হচ্ছি না, বার্নাদো। বরং তার উল্টো, একফোঁটা আপত্তি নেই সারাদিন ব্যাকগ্যামন খেলতে।'

তিক্ত চেহারা করে বললেন গুগলি, 'আমি জানি না, তুমি আর রেমারিকের ভেতর কে বড় লোলুপ শয়তান! তোমরা নিজেরা যখন খেলতে বসো, জেতে কে?'

'খেলা চলে সমানে সমানে,' বলল রানা, 'কিন্তু আমরা টাকা দিয়ে খেলি না।'

'খেলো না কেন?'

'খেলি প্র্যাকটিসের জন্যে। যাতে অতিরিক্ত বেতন পাওয়া কারাবিনিয়ারি কর্নেলের মানিব্যাগ হালকা করা যায়।'

দাঁত খিঁচিয়ে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন গুগলি।

প্রেযো ফিসো বোর্ডিং হাউস অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্ট-এ সুযোগ পেলেই যান। ভোজন রসিক মানুষ, কিচেনে সাহায্যও করেন রেমারিককে। রেগুলার কাস্টোমারদের ধারণা নেই, মাঝে মাঝে তাদের সালাদ তৈরি করেন পুরোদস্তুর এক কর্নেল। ব্যাকগ্যামনে এ-পর্যন্ত এক মিলিয়ন লিরা হেরেছেন বটে, কিন্তু রেমারিকের সঙ্গে কাটে চমৎকার সময়। সত্যি বলতে, রেমারিকের প্রতি তাঁর আছে গভীর শ্রদ্ধা।

শুধু শ্রদ্ধা তা-ও নয়, মধুর বন্ধুত্বও আছে দু'জনের। এর একটা কারণ, বিপরীত চরিত্রের প্রতি আকর্ষণ। দু'জন মানুষের

মধ্যে এর চেয়ে বেশি অমিল থাকতে পারে না। রেমারিক গম্ভীর, মিতভাষী, সতর্ক, তার নাক ভাঙা। এদিকে গুগলি হাসি-খুশি, সদালাপী, লম্বা; সুদর্শন।

নিয়াপলিটান এই বন্ধুকে দারুণ পছন্দ করেন কর্নেল। প্রথম পরিচয়ের আড়ষ্ট ভাবটা দূর হলে রেমারিক যখন মুখ খুলেছিল, গুগলি বুঝেছিলেন, নিজ সমাজ ও দুনিয়াদারি সম্পর্কে কতটা গভীর জ্ঞান রাখে রেমারিক। শুকনো রসিকতাবোধও আছে তার। ওর অতীত সম্পর্কে বহু কিছুই জানেন গুগলি, তাই কখনও কখনও জানতে চান, বর্তমান পেশায় রেমারিক সন্তুষ্ট কি না।

এভাবে জীবন কাটাতে একঘেয়ে লাগে না?

মাথা নেড়ে, মৃদু হেসে জবাব দেয় রেমারিক, উত্তেজনা চাইলে অতীত রোমন্থন করে। তা ছাড়া, মাঝে-মধ্যে দু'একটা দুর্লভ সুযোগও আসে, তখন উত্তেজনার অভাব থাকে না— এই যেমন, ব্যাকগ্যামন খেলায় অতি শিক্ষিত কারাবিনিয়ারি অফিসারকে গো-হারা হারিয়ে দেয়া।

'দেখো, একদিন ধরে ফেলব তোমরা কী করে চুরিটা করো,' প্রায় নালিশ করলেন গুগলি।

পাশের কাউন্টারে বেজে উঠল ল্যাণ্ড ফোন। রিসিভার তুলে চুপচাপ শুনলেন দু'মিনিট, তারপর বললেন, 'ধন্যবাদ।' ক্রেডলে রিসিভার রেখে রানার দিকে ফিরলেন। 'হয়তো... হতে পারে। শহরে আছে এক গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তা। ব্যবসায়ী। বয়স পঞ্চাশের মত। নেপলসের স্থানীয়। কিন্তু মিলানে বাস করছে গত ত্রিশ বছর ধরে। কোনও ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই। ব্যবসায়ী আর ব্যাঙ্কার। সমাজে অত্যন্ত সম্মানিত লোক। গত পনেরো বছর ধরে প্রচুর টাকা মুনাফা করেছে তার সব ব্যবসায়িক সংগঠন। সবচেয়ে বেশি মুনাফা করেছে বড় এক ট্রেডিং কোম্পানি। ব্যবসা করে মিডল্ ইস্ট ও ফার ইস্টে। রপ্তানি করছে কোটি কোটি

টাকার দামি টেক্সটাইল ও তৈরি পোশাক। ঘুরে বেড়ায় দুনিয়া জুড়ে। মারা গেছে তার স্ত্রী, লাফাত্তার ব্যবসায় বসেছে কমবয়সী তিন ছেলে। মিলানে আছে তার পেন্টহাউস অ্যাপার্টমেন্ট। এ ছাড়া, লেক কোমোর তীরে ছোট ভিলা।'

গভীর মনোযোগে শুনেছে রানা। ভোদকায় চুমুক দিয়ে বলল, 'আর কিছু?'

কাঁধ ঝাঁকালেন গুগলি। 'আমার কলিগ ওই লোককে সন্দেহ করে।'

'কী কারণে?'

মুচকি হাসলেন গুগলি। 'লোকটা মোটেও আয়কর ফাঁকি দেয় না।'

'কাজেই তাকে সন্দেহ না করে উপায় নেই?'

'দেশটা ইতালি, তা ভুলে গেলে?' সিরিয়াস হয়ে গেলেন গুগলি। 'আমরা বেশিরভাগ সময় ক্রিমিনালদেরকে ধরতে পারি শুধু আয়কর ফাঁকি দেয় বলে। অ্যাল ক্যাপনকে আমেরিকানরা ধরতে পেরেছিল শুধু ওই কারণে। গত কয়েক মাস ধরে নতুনভাবে গবেষণা করছি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আর রাজনীতিকদের দুর্নীতি বিষয়ে। কখনও দেখিনি সৎভাবে ট্যাক্স দিয়েছে কোনও ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি। কী এমন হলো যে দেবতার মত ভাল হয়ে উঠতে হবে লাফাত্তাকে! কী কারণে আয়কর দিচ্ছে সে? হাজার পথ আছে ফাঁকি দেয়ার। এ কারণেই মনে হচ্ছে, ছোট সব ব্যবসার আয় দেখিয়ে পরিষ্কার রাখছে সে নিজেকে। আসলে কান পর্যন্ত ডুবে আছে ভয়ঙ্কর কোনও অপরাধে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল রানা, 'শুধু সন্দেহের কারণে অপরাধী বলে ধারণা করা হচ্ছে।'

আলাপ চলছে ইতালিয়ান ভাষায়।

যার কাছে শিখেছে রানা, সে নিয়াপলিটান লোক—

রেমারিক। ওর সুরে রয়ে গেছে সেই টান। এতই নিখুঁতভাবে অনুকরণ করেছে, স্থানীয়রা ভাবতেও পারবে না ও আসলে বাঙালি। অবশ্য খেয়াল করলে বুঝবে, কথায় কথায় হাত নাড়ছে না এই লোক। গুগলি খাঁটি, সম্ভ্রান্ত ইতালিয়ান; জোর দিয়ে কথা বলার সময় দু'হাত ছোঁড়েন নানান দিকে।

'ব্যাপারটাকে সাধারণ সন্দেহ না ধরে জোরালো ধারণা বলতে পারো,' বললেন তিনি, 'ভুলে যেয়ো না, আমরা কিন্তু ওই লাফাত্তা ছাড়া আর কাউকে সন্দেহ করার মত পাইনি। একমাত্র সে জড়িত থাকতে পারে আন্তর্জাতিক বেআইনী কর্মকাণ্ডে।' আবারও ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন তিনি। কয়েক সেকেণ্ড পর কথা বললেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কোসিমা পাধানির সঙ্গে। দিচ্ছেন একের পর এক নির্দেশ। পরীক্ষা করে দেখতে হবে গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তার ব্যবসায়িক হিসাবপত্র। দেশের বাইরের সব ব্যবসা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

ফোন রেখে আবারও রানার দিকে ফিরলেন বার্নাদো গুগলি। 'আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার ভেতরে কিছু না পেলে প্রতিদিন চব্বিশ ঘণ্টা তার মোবাইল ফোন আর ল্যাণ্ড ফোনে কান পাতব। প্রতি মুহূর্ত অনুসরণ করা হবে তাকে।'

'কী কারণে?'

'কী কারণ?' ভুরু কুঁচকে রানাকে দেখলেন গুগলি।

'এসব করার কী দরকার?' শ্রাগ করল রানা। 'ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাজারটা কাজ আছে। হঠাৎ দ্য ডায়মণ্ড রিঙের ব্যাপারে এত আগ্রহী হয়ে উঠলে কেন?'

চট্ করে উত্তর দিলেন না গুগলি, ভাবছেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'রানা, বোকার মত প্রশ্ন করেছ। ভুলে গেছ তোমার একদল বন্ধু আছে? নাকি মানতে চাও না, একা বাঁচতে পারে না কেউ? তোমার কি ধারণা এমনি এমনি তোমার জন্যে জান দিতে

রাজি রেমারিক? ওই একই কাজ করবে অনেকে। তুমি তো দেখি একটা গাধা!' রেগে গেছেন গুগলি। খালি হয়ে গেছে দেখে দু'জনের জন্য গ্লাসে ভোদকা ঢাললেন।

তিনি এমনই এক লোক, যিনি বেশিরভাগ সময় গোপন করেন নিজের অনুভূতি। কিন্তু আজ রেগে গেছেন বলে মুখ খুললেন। 'বেশ কয়েক বছর ধরে তোমাকে চিনি, রানা। এ-ও জানি কতটা বিশ্বস্ততা অর্জন করে নিয়েছ বন্ধুদের বুকে। কিন্তু নিজেকে চিনলে না এখনও। তোমার ওই দ্য ডায়মণ্ড রিং হয়তো বাস্তবেই আছে, অথবা নেই। যদি থেকেও থাকে, তুমি ওটা ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু কাজটা সহজ না-ও হতে পারে। সারাজীবন একা লড়েছ, সাহায্য চাওনি কোনও বন্ধুর কাছে। ভবিষ্যতেও সাহায্য চাইবে না। কিন্তু যে কাজে নেমেছ, ওটা একার নয়। বন্ধুরা পাশে থাকলে নানান দিক থেকে সুবিধে পাবে। তুমি তো জানো, সবসময় রেমারিকের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রেখেছি, ওকে মনে করি নিজের আপন ভাইয়ের মত... আমার বড় ভাইও ওকে অন্তর থেকে ভাইয়ের মতই দেখে। কখনও কখনও রেমারিক গভীর রাত পর্যন্ত বলে তোমার জীবনের কাহিনি। কীভাবে বার-বার রক্ষা করেছ ওকে। আমার জীবনেও হঠাৎ করেই এসেছিলে। কিশোরী ওই মিষ্টি মেয়ে লুবনাকে ভালবেসে ফেলেছিলে বলে, চরম ধ্বংস নিয়ে এসেছিলে মাফিয়া পরিবারে। আমার উচিত ছিল তোমাকে গ্রেফতার করা। কিন্তু ভুলেও সে কথা ভাবিনি। মাত্র কয়েক দিনের ভেতর অন্তত দশ বছরের জন্যে পঙ্গু করে দিলে মাফিয়ার হারামজাদা লোকগুলোর হাত-পা। তুমি যে দ্য ডায়মণ্ড রিঙের কথা বলছ, সেটা সম্পর্কে কিছুই শুনিনি, কিন্তু জানব ঠিকই। যে কাজে নেমেছ, তাতে লাখো লোককে পাবে পাশে। ভেবো না তুমি একা। আরও সতর্ক হও। যা ভাবছ, হয়তো তার চেয়ে ঢের বিপজ্জনক এরা। তোমার ধারণা, ওই দল আছে বহু

বছর ধরে। আমারও তাই বিশ্বাস। কিন্তু সবসময় রয়ে গেছে আড়ালে। এতই সংগঠিত, সতর্ক এবং নিজেদের কাজে দক্ষ, এমন কী মাফিয়াও জানে না এরা কী করছে।'

বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন গুগলি, আরেক ঢোক ভোদকা গিলে নিয়ে বললেন, 'খুব কঠিন হবে আগের মত হামলা করা। কিন্তু তোমাকে দেখছি তাজা বোমার মত। তুমি কাজে নামলে, আমি জানি, কয়েক দিনের ভেতর ওপর থেকে চাপ আসবে, যেন গ্রেফতার করি তোমাকে। ওই চাপ এড়িয়ে যাব। আজকাল দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করছি। তাতে কী লাভ হচ্ছে? ধরে আনছি অপরাধী, আর রাজনীতিকদের কানে মোচড় দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তারা জেলের বাইরে। প্রতিবার চড় খাচ্ছি গালে। চরম বিরক্ত হয়ে গেছি। তোমার পাশে আমাকে রাখো, রানা। তিক্ত হয়ে গেছে জীবনটা। আমার ধারণা, ওই লাফাত্তা তোমার প্রথম লিঙ্ক। যা খুশি ভাবো, কিন্তু আমার অন্তর বলছে, ওই লোকই তোমার মইয়ের প্রথম আংটা। তুমি তো চেনো আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট... ভুল বললাম, সহকর্মীকে... পাধানি সাহায্য করবে তোমাকে। লম্বা ছুটিও পাওনা হয়েছে ওর। তোমার পাশে কাজ করবে। নানান ধরনের সাহায্যে আসবে ও। এদিকে তোমার মাথার ওপর মেলে দেব আইনের ছাতি। আর ওদিকে যাদের দরকার, তাদের নিয়ে কাজে নেমে পড়বে। চাই যেন ধ্বংস হয় ওই জানোয়ারগুলো। ইউরোপের এমন কোনও দেশ নেই যেটার সংবিধানে তাদের সত্যিকারের বিচার হবে।'

অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল, তারপর মৃদু হাসল রানা। 'সব কাজ ফুরিয়ে যাওয়ার পর আমাকে পেনশন দেবে তো কারাবিনিয়ারি?'

হাসলেন গুগলিও, ওই হাসিতে আবেগ। 'আজ যেভাবে বললাম, আর কখনও হয়তো এভাবে বলতে শুনবে না। যে অশুভ

সংগঠনের বিরুদ্ধে লড়তে চাও, সেটার লোকগুলোর উপযুক্ত বিচার হবে না আইনের কোনও কোর্টে। একমাত্র শাস্তি হওয়া উচিত মৃত্যুদণ্ড। যদি তাই দাও, প্রয়োজন পড়লে পুরো আড়াল করে রাখব তোমাকে। তবে খুব সতর্ক থাকতে হবে। নইলে ইতালির কোনও শহরে নিরাপদ থাকবে না তুমি। ভুলে যেয়ো না, তোমার আগের চেহারা যেমন চেনে মাফিয়ার নেতারা, তেমনি তাদের হাতে আছে তোমার বর্তমান চেহারার ছবিও। বাগে পেলে তোমাকে ছাড়বে না ওরা।'

শ্রাগ করল রানা। 'বুঝি, সেজন্যেই আছি নোংরা, ছোট এক হোটেলে।'

আনমনে মাথা দোলালেন চিন্তান্বিত গুগলি। কয়েক সেকেণ্ড পর আঙুল তাক করলেন টেলিফোনের দিকে। 'যোগাযোগ করো সবার সঙ্গে।'

বার্নাদো গুগলির চোখে তাকাল রানা। 'তোমার এই ফোন সিকিয়োর?'

'আমার তা-ই ধারণা।'

রিসিভার তুলে ডায়াল করল রানা। ব্রাসেলস থেকে জবাব দিল সুসি। সংক্ষেপে গোপন সঙ্কেত ব্যবহার করে কথা বলল রানা। প্রতিটি কথা বুঝল সুসি।

'একটা ঘাঁটি,' বলল রানা।

'পেয়ে গেছ।'

যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, তাদের কোড-নেম ব্যবহার করল রানা। 'পরে হয়তো আসবে রামিন। জেনির একটা ব্যবস্থা করেই। আসবে কোপেনহেগেনের এক পুলিশ অফিসার। আলাপ হয়েছিল তার সঙ্গে। মার্সেই থেকে আসবে এক ফ্রেঞ্চ। ওর নাম বলবে পেঁচা। যার ওখানে ওর সঙ্গে পরিচয়, সে-ও যোগাযোগ করবে।'

মৃদু হাসল সুসি গোল্ডা। ‘চিনি। ভাল মানুষ। খুব সম্মান করে তোমাকে। আর কেউ?’

‘অবশ্যই সিম। অসির সঙ্গে যোগাযোগ করো। আরেক ফ্রেঞ্চ। আসুক সে। খরচ নিয়ে ভাবতে হবে না। কয়েক দিন পর যোগাযোগ করব।’ ফোন ক্রেডলে রেখে গুগলির দিকে চাইল রানা।

এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত হাসছেন কর্নেল। সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, ‘তা হলে যুদ্ধ শুরু হলো!’

‘তুমি সূত্র হাতে তুলে দেয়া মাত্র,’ বলল রানা। আবারও ফোন তুলে ডায়াল করল। ওদিকে বাজতে লাগল। হঠাৎ কী ভেবে যেন রিসিভার নামিয়ে রাখল ও।

বিস্মিত হয়েছেন গুগলি। ‘কী হলো?’

কয়েক সেকেণ্ড পর বলল রানা, ‘হয়তো কান পাতা হয়েছে রেমারিকের ফোনে।’

আস্তে করে মাথা নাড়লেন গুগলি। ‘ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওই হোটেলে কাটাই। প্রতিবার নতুন করে ফোন লাইন পরিষ্কার করিয়ে নিই। বাগ থাকবে না।’

আবারও রিসিভার তুলে ডায়াল করল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর লাইনে এল রেমারিকের ছোকরা কর্মচারী।

‘কী খবর?’ জানতে চাইল রানা।

‘আগে আপনার খবর বলুন!’ উত্তেজিত হয়ে জানতে চাইল ফুরেলা। মাফিয়া পরিবারগুলোকে ধ্বংস করে দেয়ার সময় রানার ভক্ত হয়ে গেছে।

‘আছি। কেমন আছ?’

‘দারুণ।’

‘বুড়োটা কই?’

‘ওঁর মা-র ওখানে। মাথা-ব্যথা, তাই ডেকে পাঠিয়েছেন।’

মৃদু হাসল রানা। 'ঠিক আছে, একটা খবর পৌঁছে দেবে। কয়েকজন যোগাযোগ করবে। তাদের নামঃ রামিন, গুগলি, পাধানি, সুসি, পাভলোভা, পেঁচা, সিম, জ্যাকি, অসি আর মউরোস। তোমার ওস্তাদকে বোলো এসব নাম। যখন-তখন খবর পাবে। অন্য কারও ফোনে গুরুত্ব দিতে হবে না।'

চুপ হয়ে গেল লাইন। নোটবুকে টুকে নিচ্ছে ফুরেলা। কিছুক্ষণ পর বলল, 'আসছেন?'

'কয়েক দিনের ভেতর, আশা করি।' ফোন রেখে দিল রানা। গুগলির দিকে চেয়ে বলল, 'আরও দু'তিনটে কল, তারপর তৈরি হয়ে যাব।'

মাথা দুলিয়ে আবারও গ্লাসদুটো ভরে দিলেন গুগলি।

মার্সেইল্স্-এ আছে গগল, যোগাযোগ করল রানা। বাড়তি কোনও কথা হলো না। তার ভেতর থাকল কয়েকটা ছদ্মনাম। গগল বুঝে গেল কারা কাজে নেমেছে এবং কী অস্ত্র লাগবে।

আগ্রহ নিয়ে শুনলেন, কিন্তু অর্থ ভালভাবে বুঝলেন না গুগলি। অবশ্য জানেন, গগল কে। এ-ও বুঝতে দেরি হলো না, মিলান ও নেপলসে অস্ত্র পৌঁছে দিতে বলেছে রানা।

ওদিক থেকে গগল বলল, 'পৌঁছে গেছে পেঁচা। আসতে চায়।'

'ভাল হয়,' বলল রানা। বিদায় না নিয়েই রেখে দিল ফোন। এবার গোজো দ্বীপে যোগাযোগ করল রামিনের সঙ্গে।

রাগী কণ্ঠ তরুণের। রানার প্রতি রাগ নেই, নরপিশাচগুলোর প্রতি। কয়েকটা পরামর্শ দিল রানা, চোখে-মুখে অপরাধ। আরও কিছু কথা শুনে ফোন রেখে দিল।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইলেন গুগলি।

চুপ করে থাকল রানা। খুব কম মানুষ ওকে চিনতে পারে। ওকে ঘিরে রেখেছে লোহার মত শক্ত খোলস, কিন্তু খুব নরম মন।

ওর কাঁধে হাত রেখে নিচু স্বরে বললেন গুগলি, 'কাজে যখন নেমেছ, উপযুক্ত বিহিতও হবে লোকগুলোর।'

'আশা করি।' গ্লাস খালি করল রানা। 'হয়তো আটচল্লিশ ঘণ্টা পর পাজেরো আর অনোরিয়া তাজার বাড়িতে যোগ হবে আরও একটা নতুন মুখ। খুশিই হবে ওরা।'

রানার কাছে আগেই জেনির বিষয়ে সব শুনেছেন গুগলি। 'আমি ওর খরচ দিতে চাই,' বললেন। 'হয়তো কখনও বিয়ে করব না, কিন্তু নিজের একটা মেয়ে থাকলে আর চিন্তা থাকে না বুড়ো বয়সে।'

'আপত্তি তুলবে তাজারা,' বলল রানা। 'বলবে, ওদের তো টাকার অভাব নেই।'

হাসলেন গুগলি। 'আমাকে চেনেন তাঁরা, রেমারিকের সঙ্গে গিয়ে ওখান থেকে বেড়িয়ে এসেছি। অনুরোধ ফেলতে পারবেন না। তা ছাড়া, আমি মানছি না কিছুই। ওঁরা যাই বলুন, বাপ বা চাচা হওয়ার স্বাদ নেয়ার সুযোগ ছাড়ব কেন? আর ওই দ্বীপের চমৎকার পরিবেশে প্রতি মাসে ঘুরতে গেলে সুস্থ থাকবে মন আর শরীর।'

'গুগলি, গির্জায় না গেলেও সত্যিই তুমি ধার্মিক,' মন্তব্য করল রানা। 'যদি প্রার্থনা করার সময় পাও, স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা কোরো, যাতে সুস্থ হয়ে ওঠে জেনি।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন গুগলি।

পঁচিশ

সপ্তম দিন ভোরে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে গেল জেনি। খামচে ধরল তলপেট। একের পর এক যৌনাবেগের ভয়ানক ঢেউ আঘাত হানল কিশোরী শরীরে। চুপ করে ক্যানভাসের চেয়ারে বসে রইল রামিন, কিন্তু জেনির উত্তেজনা আরও বেড়ে গেলে গুহার ভেতর থাকা আর সমীচীন মনে করল না ও। ভাল করেই জানে, ড্রাগ্‌সের প্রতিক্রিয়ার শেষপর্যায়ে পৌঁছে গেছে জেনি। হেরোইনের কারণে দুর্বল হৃৎপিণ্ড যে-কোনও সময়ে থেমে যেতে পারে। অথবা হয়তো একঘণ্টা বা আরও বেশি সময় ধরে তীব্র কামনা পুড়িয়ে দেবে ওর অন্তর। শারীরিকভাবে হামলা করতে পারে জেনি, হয়তো পুরো পাগল হয়ে উঠবে যৌন মিলনের জন্যে, অথবা ওর মনে জন্ম নেবে প্রবল ঘৃণা।

চেয়ার, বড় চামচ ও টেলিফোন হাতে গুহা ত্যাগ করল রামিন। পিছনে তালাবন্ধ করে দিল দরজা। ঘড়ির অ্যালার্ম চালু করে সুইমিং পুলের পাড়ে শুয়ে ঘুমিয়ে নিল একঘণ্টা। তারপর কাঁপা কাঁপা বুকে আবারও ফিরল গুহায়। জানে, হয় মারা গেছে জেনি, অথবা ঘুমিয়ে পড়েছে।

প্রথমে রামিনের মনে হলো মারাই গেছে জেনি। পুরো ভিজে গেছে ওর শরীর, পড়ে আছে স্থির হয়ে। সপ্‌-সপ্‌ করছে ভেজা ম্যাট্রেস। খুব সাবধানে জেনির পাশে থামল রামিন, পরীক্ষা করবে

মারা গেছে কি না। গা মুচড়ে বেকায়দাভাবে পড়ে আছে বেচারি।

প্রথমে আলতো করে জেনির কাঁধ স্পর্শ করল রামিন। ত্বক হিমশীতল। হাত রাখল বুকে। এলিয়ে পড়া হাত সরিয়ে পরখ করল থুতনির নীচের আর্টারি। খুব মৃদু কাঁপছে ধমনী। উঠে ঘাম ও কাদা ভরা হতক্লান্ত জেনিকে দেখল রামিন। ওর মনে হলো, পৃথিবীতে নিষ্পাপ এই মেয়ের মত কাউকে দেখেনি, আর কখনও দেখবেও না।

বড় ভাইয়ের আদর নিয়ে 'জেনি' 'জেনি' বলে কয়েকবার ডাকল রামিন। কিন্তু জ্ঞান নেই বেচারির। ওকে কোলে তুলে গুহা থেকে বেরিয়ে এল ও, বাড়ির ভেতরে ঢুকে চলে এল রানার বেডরুমে। সাবধানে জেনিকে শুইয়ে দিল মস্ত ডাবল-বেড বিছানার কিনারায়। বাথরুমে ঢুকে কুসুমগরম পানি দিয়ে ভরে ফেলল মস্ত বাথটাব। জেনিকে তুলে এনে যত্ন করে পরিষ্কার করল ওর ছোট্ট দেহের প্রতিটি অঙ্গ। ভালভাবে গোসল করিয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছল শরীর, তারপর বড় একটা তোয়ালে এনে মুড়িয়ে দিল ওকে। শুইয়ে দিল রানার বিছানায়। বিড়বিড় করে কী যেন বলল জেনি, কিন্তু নড়ল না।

বাথরুমে ঢুকে উত্তপ্ত পানির শাওয়ার নিল রামিন, ওর মনে হলো মন থেকে মুছে গেল নরকের ওই দিনগুলোর পাহাড় সমান অবসাদ। পোশাক পরে বেডরুমে ঢুকে আরেকবার পরীক্ষা করল জেনির শ্বাস-প্রশ্বাস। হালকা দম নিচ্ছে মেয়েটা, কিন্তু তা নিয়মিত।

কিচেনে এসে দেরি না করে রাঁধতে বসল রামিন। প্রথমে ফ্রিয থেকে নিল মস্ত দুই মুরগি, কেটে নিয়ে ছেড়ে দিল ফ্রাইং-প্যানের জলপাই তেলে। চমৎকারভাবে ভাজা হয়ে যেতেই গরম পানি ভরা এক হাঁড়িতে রাখল ফ্রাইং-প্যানের মাংস। ছুরি দিয়ে কচাকচ পেঁয়াজ, গাজর, টমেটো, শিম, বরবটি, মৌরি, পুদিনাপাতাসহ

আরও অন্তত দশ জাতের শাকসবজি কেটে ফেলল হাঁড়ির ভেতর। কমিয়ে দিল চুলার আঁচ। ঢাকনি দিয়ে ঢেকে দিল হাঁড়ির মুখ। আবার ফিরল বেডরুমে। পাশে শুয়ে জড়িয়ে ধরে রাখল জেনিকে। বার-বার রামিন দেখল, ঘুমের ভেতর এপাশ ওপাশ করছে জেনি। কিন্তু প্রতিবার আবারও ফিরে এসে নাক গুঁজল বড় ভাইয়ের বুকে। চেতনা আছে ওর,, কী এক অভিমানে একটু পর পর ভিজে গেল গাল ও কাঁধ। তারপর মিষ্টি এক লাজুক পরীর মত ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

এল গভীর রাত।

তারপর ভোর।

সকালে মাংস-সবজির ঘন সুপ বড় এক বাটিতে ভরে জেনির সামনে হাজির হলো রামিন। ঘুম থেকে তুলে খুব সাবধানে ওকে খাইয়ে দিল সুস্বাদু খাবার। খাওয়া শেষ হলে মুছে দিল মুখ। শুয়ে পড়ে আবারও ঘুমিয়ে গেল জেনি। ঘুম ভাঙল কয়েক ঘণ্টা পর। আবারও প্রচুর পরিমাণে সুপ দিল রামিন। খেয়াল করল, পোশাক নেই বলে লজ্জা পাচ্ছে বেচারি। রানার চেস্ট অভ ড্রয়ার্স খুলে রংচঙে এক সারোং পেয়ে ওটা জেনিকে পরিয়ে দিল রামিন। কপালে চুমু দিয়ে বলল, 'আবারও ঘুমিয়ে পড়ো, আপু।'

আপত্তি থাকল না জেনির। ভাল করেই বুঝে গেছে, এই মানুষটা অন্যরকম। খুবই অন্যরকম। ওর কোনও বিপদ হবে না এখানে।

দু'দিন পর বড় একটা এনভেলপে করে গগলের তরফ থেকে এল মেয়েটির জন্যে তৈরি করা জরুরি কাগজপত্র। সব এসেছে মার্সেইল্‌স্ থেকে। সদর দরজায় কুরিয়ার পিয়নের হাত থেকে ওগুলো নিল রামিন। সই করে দিল ফর্ম-এ। সদর দরজা বন্ধ করে বাড়িতে ফিরে সোজা ঢুকল কিচেনে। কড়া কালো কফি তৈরি করে বসল এনভেলপ খুলতে। খামের ভেতরে রয়েছে প্রায়

দশ বছর বয়সী জেনি গুগলির কাগজপত্র। আজ থেকে দু'বছর আগে ওকে দত্তক নিয়েছেন কর্নেল বার্নাদো গুগলি। কিন্তু তিনি রাষ্ট্রীয় জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁর পরিচিত পাজেরো ও অনোরিয়া তাজার বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করবে মেয়েটি। পূরণ করা ফর্মে লেখা: এতিম এই মেয়ে বেলজিয়ান। জাতীয়তা সেই দেশের। কিন্তু পরে দত্তক নেয়ার পর পেয়েছে ইতালির নাগরিকত্ব। ব্রাউয়েস শহরের যে এতিমখানার নাম দেয়া হয়েছে, তা-ও সঠিক। আপাতত ওকে দেয়া হয়েছে মাল্টার গ্রিনকার্ড। ছবি ও সব সই নিখুঁত।

হাসতে হাসতে কাগজপত্র নিয়ে বেডরুমে ঢুকল রামিন। এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে জেনি, ইতালিয়ান কাগজপত্র ও পাসপোর্ট দেখে খুশিতে হেসে ফেলল। লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে দুই হাতে জড়িয়ে ধরল রামিনের গলা, ওকে টেনে নিচু করে নিয়ে চুমু দিল গালে। 'ভাইয়া, সত্যিই আর ফিরতে হবে না জার্মানিতে?'

'একেবারে নিশ্চিত!' হাসল রামিন।

ছাব্বিশ

তার বস্ কর্নেল বার্নাদো গুগলির শত্রুরাও একবাক্যে স্বীকার করবে, তিনি ভাল পুলিশ অফিসার। সততা ও ব্যক্তিগত বিশাল সয়-সম্পত্তি আছে বলে দুর্নীতি স্পর্শ করতে পারেনি তাঁকে। ক্ষুরের মত ধারাল বুদ্ধি, অঢেল প্রাণচাঞ্চল্য আর মানুষের মন

বোঝার দুর্লভ ক্ষমতা তাঁকে গড়ে তুলেছে একজন সফল পুলিশ অফিসার হিসেবে। সেই তিনিই নতুন এক অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছেন মেজর কোসিমা পাধানিকে। বেশ কয়েক বছর ধরেই ওঁর সহকারী হিসেবে কাজ করছে সে। প্রথম দিকে, পুরো এক বছর ধরে, মানুষটার কাছ থেকে পালিয়ে যাবার ঝোঁক ছিল তার মধ্যে। কিন্তু বদলি হতে চাইলে সঙ্গত কারণ দেখানো চাই।

কর্নেল গুগলিকে যে পছন্দ করে না, তা-ও নয়। কিন্তু ওকে ভয়ঙ্কর অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। কিন্তু বদলির আবেদন জানাবার জন্যে কোনও কারণই খুঁজে বের করতে পারেনি। তাঁর শ্লেষ মেশানো মন্তব্য, হঠাৎ কঠোর হয়ে ওঠা, নায়কসুলভ চেহারা, এমন কী বংশ-গৌরবও পাধানির জন্যে কোনও সমস্যার সৃষ্টি করেনি। তার অস্বস্তির কারণ ছিল, একজন সিনিয়র কারাবিনিয়ারি অফিসারকে যা মানায় না, সেসবই আছে কর্নেলের মধ্যে। পাধানি হয়তো নিজেও জানত না, সম্ভবত তাঁকে ঈর্ষা করে সে।

কিন্তু দুটো কারণে পালিয়ে যাবার ঝোঁকটা দূর হয়ে যায় মন থেকে। একবছর কাজ করে বসের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ স্মরণশক্তির পরিচয় পেয়ে গিয়েছিল পাধানি। এই দুই গুণ বরাবর ছিল কর্নেলের মধ্যে, কিন্তু আগে চোখে পড়েনি তার। দ্বিতীয় কারণ, তার বোন। ডাক্তারী পড়ার জন্যে কাটানযারো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে চাইল, তার রেজাল্টও খুব ভাল, কিন্তু ওপর মহলের কারও সঙ্গে ওদের পরিবারের দহরম-মহরম নেই। কাজেই তার আবেদনপত্র বিবেচনা না করেই বাতিল করে দেয়া হলো। পাধানির মনেও ছিল না, কথায় কথায় অফিসে ঘটনাটা বলেছিল। কিন্তু এক সপ্তাহ পর পাধানির বোন ইউনিভার্সিটি থেকে চিঠি পেল, তাঁদের সিদ্ধান্ত বদলে নিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস শুরু হওয়ার পর পাধানির বোন জানল, কে

এক প্রফেসর গুগলি, নেপলসের কারদারেলি হাসপাতালের সিনিয়র সার্জন, তার ব্যাপারে নাকি বিশেষ সুপারিশ করেছেন।

প্রসঙ্গটা একদিন তুলল পাধানি।

তাতে বিস্মিত হয়ে সহজ সুরে বললেন কর্নেল, 'কী আশ্চর্য! আমি তোমার সহকর্মী, একসঙ্গে কাজ করি, তোমার সুবিধে-অসুবিধে আমি দেখব না তো কে দেখবে!'

বদলি হবার চিন্তাটা সেই মুহূর্তেই বাতিল করেছিল পাধানি। কর্নেল উপকার করেছেন বলে নয়। তাঁর প্রকাশভঙ্গিটা ভাল লেগেছিল। "আমি তোমার সহকর্মী, আমরা একসঙ্গে কাজ করি"– আমার 'জন্যে' বা আমার 'অধীনে' নয়।

এরপর কয়েক বছর ধরে চমৎকার একটা টিম হিসেবে কাজ করছে ওরা। এখনও আগের মতই আছেন কর্নেল, বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যের ধার কমেনি, মাঝে মধ্যে অসম্ভব একগুঁয়ে হয়ে ওঠেন, এবং কোনওরকম দ্বিধা না করেই বলা যায়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আরও সুপুরুষ ও সুদর্শন হয়ে উঠেছেন। কিন্তু ভেতরের মানুষটাকে এখন চিনে নিয়েছে পাধানি, সেই সঙ্গে তাঁর কিছু অভ্যেস আর আচরণও অনুকরণ করছে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আগের চেয়ে খুঁতখুঁতে হয়ে উঠেছে, বেশি ভাড়ার ফ্ল্যাটে উঠেছে, সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে নরম আচরণ করে। শুধু ব্যাকগ্যামন খেলাটা তার ধাতে সয় না।

এই মুহূর্তে নিজের অফিসে প্রিয় অ্যাপল ম্যাকিনটশ কমপিউটার সামনে নিয়ে বসে আছে পাধানি। ওই যন্ত্রটাকে ওর জগৎ বললেও ভুল হবে না। প্রথম থেকেই অদ্ভুত ন্যাক ওর টেকনোলজির বিষয়ে। আর ওই টেকনোলজির মাধ্যমে গত কয়েক দিনে একগাদা তথ্য সংগ্রহ করেছে গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তা সম্পর্কে। এখন চিন্তাভাবনা করে ঢুকতে চাইছে লোকটার মগজে।

কী পথে চিন্তা করে লোকটা?

পেরিয়ে গেল বহুক্ষণ, অনেক আগেই নেমে এসেছে রাত। নতুন করে আবারও ফাইলে মন দিল পাধানি। প্রথমে ওর চোখে ধরা পড়ল না লাফাত্তার কোনও খুঁত। কিন্তু দু'মিনিট পর ঘণ্টি বাজল মগজে। কি-বোর্ড ব্যবহার করে আবারও ফিরল পেছনের পাতায়। নতুন করে পড়ল পুরনো তথ্য, তারপর দেখল আরও পিছনের পাতা। এরপর চলে গেল একেবারে নতুন ফাইলে। যার নামে ওই ফাইল, সে ইতালির সিসিলি দ্বীপের লোক। লাফাত্তার মতই ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি। গোটা দুনিয়া জুড়ে তার কারবার।

দশ বছর ধরে নেপলস শহরের বাইরে মস্ত এক বিলাসী ভিলা তৈরি করে বাস করছে। দুধ দিয়ে ধোয়া তুলসি পাতার মতই, কোনও বদনাম ছিল না তার। নিয়মিত পরিশোধ করছিল আয়কর। কিন্তু দু'বছর আগে এক বাংলাদেশি ব্যবসায়ীর কারণে বদনাম হলো। শিল্পপতি গিয়ারডিনি ক্যালভেসিওর টেক্সটাইল্‌স্‌ মিল থেকে ভুলবশত শিশু, কিশোর ও কিশোরীদের পর্নোগ্রাফি এবং শয়তানের উপাসনা সম্পর্কিত রঙিন ছাপা কয়েক রোল কাপড় পাঠিয়ে দেয়া হলো চট্টগ্রামের ওই ব্যবসায়ীর কাছে। সরাসরি নালিশ করেন তিনি ইতালিয়ান কর্তৃপক্ষের কাছে। তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ জানল, কাজটা করেছে শিল্পপতির চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দেয়া এক কর্মচারী। গ্রেফতারও করা হলো ওই লোককে। জেল খাটছে সে এখন।

সামান্য অস্পষ্ট যোগাযোগ আছে ব্যবসায়ী গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তা আর শিল্পপতি গিয়ারডিনি ক্যালভেসিওর ভেতর। তারা ইতালিয়ান এক সাংস্কৃতিক সংঘের সদস্য। গত চার বছর ধরে পরিচালক কমিটিতে আছে।

মস্ত বড়লোক সব ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, নামকরা নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা, বড় লেখক, এঁরা রয়েছেন ওই সাংস্কৃতিক

সংঘে। এঁদের অনেকেই ঠিকভাবে আয়কর দেন না বলেই ওই সংঘের ওপর প্রথমে চোখ পড়ে কারাবিনিয়ারির।

ফাইলগুলো আবারও বার-বার করে পড়তে লাগল মেজর কোসিমা পাধানি। একঘণ্টা পর আবিষ্কার করল, গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তা আর শিল্পপতি গিয়ারডিনি ক্যালভেসিওর ভেতর আরও কিছু মিল আছে। বর্তমান সরকারের উঁচু পর্যায়ের বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে খাতির এই দু'জনের। এসব রাজনৈতিক নেতার কারণে অনায়াসেই ব্যবহার করছে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ। আরও কিছুক্ষণ ফাইল ঘেঁটে কমপিউটার বন্ধ করে হাতঘড়ি দেখল পাধানি।

প্রায় মাঝরাত।

তাতে সমস্যা নেই, গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন কর্নেল গুগলি। কী জানতে পেরেছে, সেটা জানিয়ে দেয়ার জন্যে বসকে ফোন দিল পাধানি।

চুপচাপ সব শুনলেন বার্নাদো গুগলি, তারপর বললেন এখন থেকে নজর রাখতে হবে ওই দুই লোক এবং তাদের পরিবারের ওপর। পাধানি ফোন রেখে দেয়ার পর ল্যাণ্ড ফোন ব্যবহার করে রানার হোটেল রুমে যোগাযোগ করলেন তিনি। আরেকটু হলে পেতেন না বাঙালি বন্ধুকে।

তৈরি হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল রানা। রাতের ফ্লাইটে যাবে ব্রাসেলসে।

গুগলির কথা শুনে রানা মন্তব্য করল, 'অত্যন্ত সন্দেহজনক দুই চরিত্র।'

মৃদু হেসে টিটকারির সুরে বললেন গুগলি, 'মস্ত বড়লোক, প্রতি বছর না চাইতেই দিচ্ছে প্রচুর ট্যাক্স! তাদের বিষয়ে কেন নাক গলাবে কর্তৃপক্ষ? মোটেও সন্দেহজনক চরিত্র নয়!'

সাতাশ

রবিবার দুপুরে পাজেরো-অনোরিয়া তাজার বাড়িতে জেনিকে নিয়ে লাঞ্চে গেল রামিন। ব্যাপারটা অনেকটা হয়ে উঠেছে রীতির মত। গোজো দ্বীপে আসার পর থেকে রানা ও রামিন এক সপ্তাহ পর পর রবিবার দুপুরে ওখানে লাঞ্চ করে। পরের সপ্তাহে সন্ধ্যায় ওখানে রাঁধা হয় দুর্দান্ত কাবাব বা রোস্ট ও ঘিয়ে ভাজা মচমচে পরোটা।

বাড়ি ছেড়ে রওনা হওয়ার আগে জেনিকে রানার বেডরুমে নিয়ে গিয়ে বলল রামিন, 'এই ঘরে একটা সিন্দুক আছে। খুব ভালভাবে লুকিয়ে রাখা। তুমি তো মাসুদ ভাই আর আমার ছোট বোন হয়ে গেছ, তাই তোমাকে জেনে নিতে হবে কীভাবে খুলতে হবে ওই সিন্দুক।'

জেনির কাগজপত্র ও পাসপোর্ট হাতে রামিন চলে গেল মস্ত ডাবল বেডের মাথার কাছে। একটু পেছনে পুরু দেয়াল। ওখানে কোমর উচ্চতায় অন্যান্য টাইলসের মাঝে ছোট এক লাইমস্টোনের স্ল্যাব।

'খাটের ডানের স্ল্যাব থেকে গোনো,' বলল রামিন। 'চাপ দেবে সপ্তম স্ল্যাবে।' লাইমস্টোনের স্ল্যাবে হাত রেখে ঠেলল ও। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রিযের দরজার মত খুলে গেল স্ল্যাব। দেয়ালের ফোকরে দেখা দিয়েছে তিন ফুট উঁচু এক ফুট চওড়া স্টিলের

দরজা। বুকে হ্যাণ্ডেল। পাশে কমবিনেশন লকের ডায়াল। 'স্মৃতি কেমন তোমার?' জানতে চাইল রামিন।

মাথা দোলাল জেনি, ভালই। আর সব বাচ্চা মেয়ের মতই আগ্রহী হয়ে উঠেছে সিন্দুকের ব্যাপারে। তার চেয়েও বড় কথা, রামিন ভাইয়া পুরোপুরি বিশ্বাস করছে ওকে!

'এবার ডায়াল করো: বিসিআই এজেন্ট এম আর নাইন।'

অক্ষর ও সংখ্যা দু'বার আউড়ে মুখস্থ করে নিল জেনি। ওকে দিয়ে ডায়াল করাল রামিন। হ্যাণ্ডেল টেনে খুলে দিল ভারী ডালা। ভেতরে কয়েকটা তাক। ওপরের তাক দেখাল রামিন। ওখানে চামড়া দিয়ে মুড়িয়ে রাখা কী যেন। 'অস্ত্র,' বলল, 'হ্যাণ্ডগান, দুটো ছোট সাব-মেশিনগান, সাপ্রেসর আর গুলি। পরে শিখিয়ে দেব কীভাবে এসব অস্ত্র চালাতে হয়।' মাঝের তাক দেখাল, ওখানে বেশ কিছু পুরু ফাইল। 'গুরুত্বপূর্ণ একদল লোকের ওপর তথ্য। কেউ বন্ধু, কেউ শত্রু।' নীচের তাক দেখাল। সরু সব ফাইল। 'এসব মাসুদ ভাই আর আমার কাগজপত্র।' একটা ফাইল খুলে ওখানে রেখে দিল জেনির পাসপোর্ট ও কাগজপত্র। নীচের তাকে সরু একটা ড্রয়ার, খুলল ওটা। সামনে ঝুঁকে দেখল জেনি।

'নানান দেশের কাগুজে নোট। ইউএস ডলার, সুইস ফ্র্যাঙ্ক, স্টার্লিং পাউণ্ড, ডয়েশমার্ক, সৌদি আরবের রিয়াল ইত্যাদি।' ছোট একটা ক্যানভাস ব্যাগ তুলে ঝাঁকি দিল রামিন। ভেতর থেকে এল ঝনঝন আওয়াজ। 'সোনার মোহর। কাগুজে নোটের মতই চলে মিডল ইস্টে।' আবার সব রেখে ড্রয়ার ঠেলে বন্ধ করল রামিন। আটকে দিল সিন্দুকের দরজা। ডায়াল ঘুরিয়ে বলল, 'ওখানে যে পরিমাণ টাকা আছে, তা মোটামুটি দশ লাখ ডলারের সমান। যদি কোনও বিপদে পড়ো বা খুব প্রয়োজন পড়ে টাকার, ওখান থেকে নেবে।' চোখ পাকিয়ে জেনিকে দেখে নিয়ে হেসে ফেলে বলল, 'তাই বলে দেখতে চাই না, পরের সপ্তাহেই নতুন মার্সিডিয বেনয্

স্পোর্টস্ কার ড্রাইভ করে ঘুরে বেড়াচ্ছ!'

খিলখিল করে হেসে ফেলল জেনি।

মনে মনে স্বস্তি পেল রামিন। সুস্থ হয়ে উঠছে জেনি। যেমন হয় হাসি-খুশি কিশোরীরা। অবশ্য, গত কিছু দিনের মানসিক-শারীরিক অত্যাচারে একেবারে শুকিয়ে গেছে। হাত-পা কাঠির মত। বেরিয়ে এসেছে চোয়ালের হাড়।

রামিনের ধারণা: গত কয়েক দিনে কমপক্ষে বিশ কেজি ওজন কমেছে জেনির। তাতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। খাবারের রুচি ফিরে পেয়েছে, আগামী কিছু দিনের ভেতর স্বাভাবিক হয়ে উঠবে ওজন। এরই ভেতর ব্যায়াম করছে। সকালে আর বিকেলে সুইমিং পুলে সাঁতার কাটছে রামিনের সাথে।

ড্রাইভ করে রাবাত পেরিয়ে নাদুরে পৌঁছে রামিন বলল, 'আমি বা মাসুদ ভাই দ্বীপ ছেড়ে চলে গেলে তুমি পাজেরো তাজার বাড়িতে থাকবে। খুবই ভাল মহিলা পাজেরো তাজার স্ত্রী অনোরিয়া। তোমার কোনও সমস্যা হবে না। আজ তাঁদের সঙ্গে লাঞ্চ করব আমরা। ওখানে আছে টম, খুব হাসি-খুশি। তোমার খারাপ লাগবে না।' ছোট ছেলেটার কথা আগেই জেনিকে বলেছে রামিন। 'ওদের সবাইকে পরিবারের সদস্য বলে মনে করবে। ওদের কাছে বিনা দ্বিধায় বলবে মনের কথা, বিশ্বাসও করতে পারবে। দেখো, কীভাবে আদর করে তোমাকে বুকে টেনে নেবেন অনোরিয়া।'

ঝড়ের গতি তুলে ধুলোময় সরু রাস্তা পেছনে ফেলছে জিপ গাড়ি, খামার বাড়ির দিকে যেতে যেতে দূরের কোমিনো আর মাল্টার দিকে চেয়ে রইল জেনি। কিছুক্ষণ পর নিচু স্বরে বলল, 'আশা করি আমাকে পছন্দ করবেন তাঁরা।'

চট্ করে জেনিকে দেখে নিল রামিন। বুঝে গেল, নার্ভাস হয়ে গেছে বেচারি। স্টিয়ারিং হুইল থেকে একহাত তুলে জেনির মাথার

চুল নেড়ে দিল ও। 'চিন্তা কোরো না। ভয় নেই। সবার খাবার শেষ হলে প্লেট ধোয়ার সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ো অনোরিয়ার দিকে। দেখবে, সবাই বুঝে গেছে তুমি ওদের একজন।'

সত্যিই আন্তরিকভাবে ওকে গ্রহণ করা হলো ওই বাড়িতে। রামিন বলতেও গেল না জেনি কে। আগে শুধু ফোন করে বলেছে, আমার সঙ্গে একজন আসছে। আঙিনায় জিপ থামতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল পরিবারের সবাই, আলিঙ্গন করার পর বাহুতে হাত রেখে জেনিকে ভেতরে নিয়ে গেলেন অনোরিয়া। জেনির আরেক হাত ধরে রাখল টম।

রামিনের মনে পড়ে গেছে, বেশ কয়েক বছর আগে ছোট্ট বোনটা মারা গিয়েছিল জণ্ডিসে। 'জেনি আমার খুঁজে পাওয়া বোন,' শুধু এটুকুই বলল।

সাদা মনে হেসে কথাটা মেনে নিল সবাই। অনোরিয়া ছাড়া প্রত্যেকে একবার করে আলিঙ্গন করল জেনিকে। চুমু দিল দুই গালে।

'লাঞ্চের সময় সব বলব,' জানাল রামিন।

বরাবরের মতই ব্যবস্থা হলো রাজসিক খাবারের। খাসির রোস্ট, মুরগির রোস্ট, ভাত, রুটি ও তাজাদের বিশাল ফসলের মাঠের অন্তত দশ জাতের সবজি। খেতে বসে চুপচাপ থাকল সবাই, শুনল রামিনের মুখে জেনির জীবনের কাহিনি।

রামিন শেষ করলে রাগী সুরে বললেন অনোরিয়া, 'রামিন, আমি খুব রাগ করেছি! বাড়ি ফিরেই আমাকে ফোন দেয়া উচিত ছিল। বেচারি জেনির কত কষ্টই না হয়েছে! আমরা সবাই মিলে ওকে আগলে রাখতে পারতাম। নাকি তোমার মনে হয়েছে আমাদেরকে বিশ্বাস করা যায় না?'

আত্মরক্ষা করতে চাইল রামিন, 'ইয়ে... ম্যানে... আসলে...

মাসুদ ভাই...'

ওকে বাঁচাল জেনি, খুব সহজ সুরে অনোরিয়াকে বলল, 'আন্টি, আসলে এ-ই ভাল হয়েছে যে একা দেখভাল করেছে রামিন ভাইয়া। ও তো জানে কী ঘটবে, তাই তৈরি ছিল। তা ছাড়া, ড্রাগ্‌সের নেশা ছুটতে শুরু হলে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম কষ্টে। রামিন ভাই ছাড়া অন্য কেউ থাকলে পরে লজ্জায় মরে যেতাম।' একবার রামিনকে দেখে নিয়ে প্লেটে চোখ রাখল জেনি। খুব নিচু স্বরে বলল, 'তখন কয়েকবার মনে হয়েছে, মরেই যাব। রামিন ভাইয়া না থাকলে হয়তো মরেই যেতাম।' সরাসরি অনোরিয়ার চোখে তাকাল জেনি। 'এরপর বোধহয় ভাইয়াকে বকবেন না, আন্টি?'

ছোট্ট মেয়েটা রামিনকে কতটা ভালবেসে ফেলেছে বুঝে বারকয়েক মাথা দোলালেন অনোরিয়া। 'ঠিক আছে, এবারের মত ওকে ছেড়ে দিলাম।' একবার রামিনকে দেখে নিয়ে চোখ রাখলেন জেনির চোখে। 'ঠিকই বলেছ। আমরা ভাবতেও পারি না কীসের ভেতর দিয়ে গেছ তুমি। কিন্তু পরে আবারও কোনও কষ্ট পেলে বা মন খারাপ হলে সোজা ফোন দেবে আমাকে। নিজে গিয়ে নিয়ে আসব তোমাকে। ...রানা ফোন করেছিল। রামিন দ্বীপ ছেড়ে চলে গেলে তুমি আমাদের কাছেই থাকবে।'

মৃদু হেসে মাথা দোলাল জেনি। 'যা দারুণ রান্না আপনার, আন্টি, খুশি মনে থাকব।'

জবাবে জেনির প্লেটে খাসির রোস্টের সবচেয়ে বড় টুকরো তুলে দিলেন অনোরিয়া।

'কী ব্যাখ্যা দেবে রানা বা তুমি?' রামিনের দিকে চাইলেন পাজেরো।

শ্রাগ করল বাঙালি তরুণ। 'বেশিরভাগ লোকের জন্যে গভীর এক রহস্য হয়ে থাকবে এসব। আপনার সঙ্গে তো কথা বলেছেন

মাসুদ ভাই আর কর্নেল গুগলি?'

'হ্যাঁ। বিস্তারিত নয়। দত্তকের কাগজপত্র সব নিখুঁত করা হয়েছে।' মাথা দোলালেন পাজেরো। 'যার খুশি বসে থাকুক কৌতূহল নিয়ে, আমাদের কী!' হাসলেন তিনি।

তাঁর বউমা লুসি মাল্টা পুলিশ ফোর্সে ক্লার্কের চাকরি করে, জোর দিয়ে বলল, 'আজকাল ইমিগ্রেশন রেকর্ড, পাসপোর্ট, আইডি কার্ড সবই কমপিউটারাইয্‌ড্ করা হয়েছে। এই দেশে ইমিগ্রেশনের মাধ্যমে জেনির আসা-যাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে পারে কর্তৃপক্ষ। ওর পাসপোর্টের নম্বর কম্পিউটারে না পেলে মুশকিল হবে।'

এ কথা শুনে হাসল রামিন। 'আগেই মাসুদ ভাই যোগাযোগ করেছেন পিওতর মেনিনোর সঙ্গে।'

জেনি ছাড়া অন্যরা বুঝে গেলেন যা বুঝবার।

অবাক হয়ে চেয়ে আছে বেচারি।

পিওতর মেনিনো, পুলিশ ফোর্সের সিনিয়র অফিসার।

'ও আমার ভাই,' বললেন পাজেরো। 'ওর ডিপার্টমেন্টের ভেতর পড়েছে ইমিগ্রেশন শাখা। রানা সাহায্য করেছিল ওকে। তা ভুলবে না কখনও।' বউমার দিকে চাইলেন। 'ইমিগ্রেশন সফ্‌ট্ওয়্যারে হাত দিতে পারবে, লুসি?'

'পারব। সকালে আমার প্রথম কাজই হবে ওটা। ইমিগ্রেশন নিয়ে ঝামেলা করতে পারবে না কেউ।'

'এসব কাজ তো খুব কঠিন, কিন্তু আপনাদের কাছে যেন কিছুই নয়,' বলল জেনি। 'মনে হচ্ছে সিনেমায় দেখা মাফিয়ার মত ব্যাপার।'

সবাই হেসে ফেলল।

নিডো বলল, 'এই দ্বীপে মাফিয়া নেই।'

'ঠিক, ওরা নেই,' সিরিয়াস সুরে বলল ওর বউ। চোখে

দুষ্টুমি। 'সত্যি বলতে মাঝে মাঝে আসে ওরা, তখন নতুন কিছু শিখে বাড়ি ফেরে।'

সবার খাওয়া শেষ হলে অনোরিয়া ও লুসি টেবিল পরিষ্কার করতে যেতেই চেয়ার ছেড়ে ওদের পাশে কাজে নেমে পড়ল জেনি। কঠোর সুরে ওকে বললেন অনোরিয়া, 'বসে পড়ো, মেয়ে, এ বাড়িতে কখনও কাজ করে না কোনও অতিথি।'

চেয়ারে বসল না জেনি, সমান তেজে বলল, 'অতিথি নই, আমি এই পরিবারের একজন।'

একবার জেনিকে কঠিন চোখে দেখলেন অনোরিয়া, তারপর হাল ছেড়ে দেয়া সুরে লুসিকে বললেন, 'আরে, এ দেখছি আমাকেও ছাড়িয়ে যাবে!'

জেনি ছাড়া হো-হো করে হেসে ফেলল সবাই। মেয়েটির জন্যে সবার চোখে স্নেহ।

কয়েকটা এঁটো প্লেট তুলে নিয়ে কিচেনের দিকে রওনা হয়ে গেছে জেনি।

'সত্যিকারের মেয়ে হলে লুসি আর জেনির মত হতে হয়,' মাথা দুলিয়ে বললেন পাজেরো। তাঁর স্ত্রী আগ্রহ নিয়ে চেয়ে আছেন দেখে চট্ করে বললেন, 'অনোরিয়া, তুমিও... তুমিও, বাপু, খুব মন্দ লোক না!'

আটাশ

'তুমি যেতে চাও, তাই না?' ক্লান্ত হাসল জ্যাকিউলিন।

ওর দিকে চেয়ে শ্রাগ করল সিম কর্নেলিস। 'স্বাভাবিক, জ্যাকি। যে বন্ধুর কাছ থেকে এত সাহায্য পেয়েছি, তার কোনও কাজে আসতে পারলে নিজেকে মনে হবে মানুষ।' স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখল প্রাক্তন মার্সেনারি। 'চিন্তা কোরো না। এক বছর আগে যে কথা দিয়েছি, ভাঙব না সেই শপথ। বিপদ এড়িয়ে চলব। সাংসারিক জীবনে অসুখী নই। তবে মাঝে মাঝে কেমন অস্থির লাগে বুকের ভেতর। কিন্তু তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি, তার বিনিময়ে অন্য কিছুই চাই না।'

মাঝরাত।

খালি হয়ে গেছে রেস্তোরাঁ।

ওরা দাঁড়িয়ে আছে বার-এর পেছনে। কর্নেলিস কাপড় দিয়ে ঘষে তকতকে পরিষ্কার করছে গ্লাস। আরম্যানিয়াকের গ্লাস সামনে নিয়ে কাউন্টারের ওপর কনুই রেখেছে জ্যাকি। গ্লাস তুলে মৃদু চুমুক দিয়ে কী যেন ভাবছে। দোকানে রয়ে গেছে মাত্র তিনজন, কিন্তু তারা খদ্দের নয়। দূরের টেবিলে বসে নিচু স্বরে আলাপ করছে।

মাসুদ রানাকে ভাল করেই চেনে জ্যাকি। ওই মানুষটার কারণেই সফল জীবনে ফিরতে পেরেছে। অসি কালাহানকেও চেনে। প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান মার্সেনারি। আফ্রিকা আর এশিয়ায় রানার পাশে লড়াই করেছে। দেখে মনেই হয় না কঠোর যোদ্ধা বা মার্সেনারি। মাঝবয়সী লোক। প্রকাণ্ড শরীর, সেই তুলনায় মাথা ছোট। চাঁদি জুড়ে মস্ত টাক। হয়তো স্বর্গের দেবতা হতে পারত, যদি পেত একটা সোনালি মুকুট।

কর্নেলিস ও কালাহানের সঙ্গে একই সময়ে পরিচয় হয়েছিল জ্যাকির। আমেরিকান মাফিয়া কিডন্যাপ করতে চেয়েছিল বলে এক সিনেটরকে পাহারা দেয়ার কাজ জুটিয়ে দিয়েছিল ওদেরকে রানা। খুব সফলভাবে নিজেদের কাজ শেষ করে ওরা। বদলে

পেয়েছিল দুই মিলিয়ন ডলার। চার আনা পয়সাও ওদের কাছ থেকে নেয়নি রানা। ওদের কাজের সময় একদিন এসেছিল আরেক লোক। একই কাজ দেয়া হয়েছিল তাকেও। নাম জ্যাঁ মউরোস। মার্সেনারি। কয়েকবার কাজ করেছে রানার অধীনে। সে যে শুধু মার্সেনারি, তা নয়, চিমনির মত লম্বা আর চিকন। রোদে পোড়া চেহারা ভরা এক শ'টা ক্ষতের দাগ। সব মিলে সত্যিকার পিশাচ বলেই মনে হবে। কিন্তু অন্তর থেকে হাসলে এক ফুৎকারে মিলিয়ে যায় তার মুখের সব অশুভ ভাব।

কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আবারও স্বামীকে দেখল জ্যাকি। চোখ ভুরু করে তিন বন্ধুর দিকে চেয়ে আছে কর্নেলিস। টের পেল চেয়ে আছে ওর বউ। চট্ করে আরেকটা গ্লাস তুলে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে ঘষতে লাগল।

মুচকি হেসে স্বামীর চুল নেড়ে দিল জ্যাকি। নরম সুরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি... ওদের মতই কঠোর ছিলে?'

ধরা পড়া চোরের মত হাসল কর্নেলিস। 'তাই তো মনে হয়। অন্তত কালাহান আর মউরোসের মতই। নিজেকে রানার সঙ্গে তুলনা করব না।'

জানতে চাইল কৌতূহলী জ্যাকি, 'রানার মত লড়াকু বলে কাকে মনে হয় তোমার?'

কিছুক্ষণ ভেবে তারপর বলল কর্নেলিস, 'হ্যাঁ, ওর প্রিয় বন্ধু রেমারিক প্রায় ওর সমানই দক্ষ যোদ্ধা। ওর কথা তো শুনেছ আমাদের কাছে। বিয়ের আগে বউকে কথা দিয়েছিল আর কখনও লড়বে না। মেয়েটি মারা যাওয়ার পরও শপথ ভাঙেনি।'

'ওই মেয়ে মারা গেছে কয়েক বছর আগে,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল জ্যাকি। 'তার পরেও ফিরে যায়নি মার্সেনারির কাজে?'

'না। অনেক পরে গুয়াতেমালার প্রত্যন্ত এক গ্রামের সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে আমাদেরকে ডেকেছিল রানা, তখন গিয়েছিল।'

‘আচ্ছা?’ মাথা দোলাল জ্যাকি। ‘তার মানে মেয়েটা যত দিন বেঁচে ছিল, নিজের শপথ ভাঙেনি রেমারিক। পরে তা করেছে বন্ধুর বিপদে। তা দোষের নয়। আমি কিন্তু তোমাকে বাধা দেব না। আপাতত ড্রয়ারে শপথ রেখে রানার পাশে দাঁড়াও।’ খুব নিচু হয়ে গেল ওর কণ্ঠ, ‘সিম, তোমার সঙ্গে যখন পরিচয় হয়েছিল, তখন আমি ছিলাম প্রায় পতিতা এক মেয়ে। তুমি তা জানতে। কিন্তু পাত্তা দাওনি সেসব। আমাকে যে সম্মান ও বুক ভরা ভালবাসা দিয়েছ, আগে কখনও তার একফোঁটাও পাইনি কারও কাছে। তখনই বুঝলাম, সত্যিকারের ভালবাসা ধুয়ে মুছে নিয়ে যায় সব পাপ। কখনও ভুলব না ওই ভালবাসা পেয়েছি কার কাছ থেকে। যখন আমাকে বিয়ে করে বাসরঘরে আনলে, সত্যিই মনে হয়েছিল আমি কুমারী। লজ্জা আর এক হাজার পৃথিবীর সব দ্বিধা ছিল বুকে। ভেবেছি, আমি কি তোমার উপযুক্ত? ঠকে গেলে না তো?’ প্রিয় স্মৃতি রোমন্থন করে মৃদু হাসল জ্যাকি। আবারও গম্ভীর হয়ে বলল, ‘নিজেকে বুদ্ধিমতী মনে করি। তাই তোমার ভালবাসা ধরে রাখতে মস্ত ঝুঁকি নেব। সারাজীবন আসলে ঝুঁকি নিয়েছি। আবারও নিতে ভয় কী?’ কোনার টেবিলের দিকে আঙুল তুলে বলল জ্যাকি, ‘যাও, বন্ধুদের পাশে গিয়ে বোসো। সব জানতে অস্থির হয়ে গেছ।’ হাসল কর্নেলিসের বউ। ‘নিজেও আমি কৌতূহলী। তোমাদের জন্যে কফি আর কনিয়্যাক নিয়ে আসছি।’

কয়েক সেকেণ্ড পর একটা চেয়ার টেনে নেয়ার আওয়াজ শুনে মুখ তুলে দেখল সিম কর্নেলিসের তিন বন্ধু।

‘জ্যাকি পাঠাল,’ চোর-চোর চেহারা করল সিম। ‘মুক্ত করে দিয়েছে শপথ থেকে। ঘটনা যাই হোক, আপাতত কোনও কাজ নেই আমার। আমাকে উপযুক্ত মনে করলে দলে নিতে পারো।’

বার-এ দাঁড়িয়ে থাকা জ্যাকিকে ঘুরে দেখল রানা।

মৃদু মাথা দোলাল কর্নেলিসের বউ, পা বাড়াল কিচেনের

দিকে। একটু পর কফির পট, কনিয়্যাকের বোতল, মগ ও গ্লাস ভরা ট্রে হাতে হাজির হলো রানাদের টেবিলে।

মৃদু মাথা দুলিয়ে নীরব ধন্যবাদ দিল রানা। নরম সুরে বলল, 'বসে পড়ো, জ্যাকি, আমাদের কোনও ভুল হলে ধরিয়ে দিতে পারবে।'

মউরোস ও কালাহানের দিকে চেয়ে হাসল জ্যাকি।

মাথা দোলাল দুই মার্সেনারি।

আবারও বার-এ ফিরল জ্যাকি, নিয়ে এল আরম্যানিয়াকের বোতল। ওর জন্যে চেয়ার টেনে দিল রানা। আধঘণ্টা পর আড়ষ্ট কণ্ঠে স্বামীকে বলল জ্যাকি, 'আমি যে শুধু তোমাকে শপথ থেকে মুক্ত করে দিয়েছি, তাই নয়, যদি বন্ধুদের পাশে থেকে ওই শয়তানের বাচ্চাগুলোকে খতম করতে না পারো, বাকি জীবন নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারব না। আমার কপাল ভাল যে তোমার মত খাঁটি মনের মানুষকে জীবনে পেয়েছি। কিন্তু বেশিরভাগ দুর্গত মেয়ের এমন কপাল হয় না। ওদেরকে ড্রাগ্স্ দিয়ে কী ভয়ঙ্কর সর্বনাশ করছে রেজন্যারা, ভালই দেখেছি। ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিকে যেতে হয় সবাইকে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানার দিকে চাইল সিম কর্নেলিস। 'বুঝতেই পারছ, আমাকে সঙ্গে না নিয়ে উপায় নেই তোমাদের।'

মউরোস হেসে বলল, 'পুরনো দিনের মত, কী বলো? গত ছয় মাস ধরে এক নাদান সুইডিশ শিল্পপতির পুরুষ আয়ার কাজ করেছি। সারাদিন দেয়ালের রং শুকিয়ে যাচ্ছে কি না তা খেয়াল করার মতই বিরক্তিকর কাজ। কেউ যদি ব্যাটাকে কিডন্যাপ করত, পরের দিন বাপ বাপ করে ফেরত দিয়ে আসত ওর বউয়ের কাছে— "নিন, ম্যাডাম, আমাকে বাঁচান, আপনার ময়লার বস্তা বুঝে নিয়ে এবারের মত মাফ করে দিন আমাকে! আর কখনও ওটার ধারে-কাছেও আসব না!" নিজ পকেট থেকে পয়সা দিতেও

আপত্তি তুলত না কিডন্যাপার।'

ওর বলার ভঙ্গি শুনে হেসে ফেলল সবাই।

জ্যাকিকে বলল রানা, 'জ্যাকি, তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না। আমাদের সঙ্গে সিম থাকলে ভাল হবে। সবসময় একে অপরের পাশে ছিলাম আমরা।'

'আপনাদের এই দলে আরও কারা আছে?' জানতে চাইল জ্যাকি।

'সুসি গোল্ডা,' বলল রানা, 'এ দেশে কমিউনিকেশনের কাজ করবে। ওই একই কাজ করবে রেমারিক নেপলসে। ওকে মানা করব সরাসরি জড়িয়ে যেতে।' একটু ভেবে নিয়ে বলল রানা, 'এ ছাড়া, এক ডেনিশ পুলিশ অফিসার আর পেঁচা ফুলজেন্স। পুলিশ অফিসার লারসেন প্রথম থেকেই এসবের সঙ্গে জড়িত। খুব করে অনুরোধ করায় দলে রাখা হচ্ছে তাকে।'

'লড়াইয়ের সময় কাজে আসবে?' জানতে চাইল কর্নেলিস।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'যথেষ্ট বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ আর কঠোর। একা চলতে জানে। গড়পড়তা যোদ্ধার চেয়ে ওপরে।'

'আমাদের তুলনায়?' জানতে চাইল মউরোস।

'বেশ নীচে।'

'আপনার মানের যোদ্ধা পৃথিবীতে কয়জন, রানা?' জানতে চাইল জ্যাকি। ঠোঁটে মৃদু হাসি।

'আমাদের মত কমবেশি পঞ্চাশজন,' বলল রানা, 'নীতিহীন মার্সেনারি আছে অন্তত আড়াই হাজার।'

অন্যরা শুনছিল, মাথা দোলাল সবাই।

রানাকে জিজ্ঞেস করল জ্যা মউরোস, 'ওই ডেনিশ লোক আবার বোঝা হয়ে উঠবে না তো? ওর পিঠ বাঁচাতে আমাদের কাউকে চোখ রাখতে হবে?'

শেষ ফোঁটা কফি শেষ করে মাথা নাড়ল রানা। 'না। ওই

কাজ করবে পেঁচা ব্রিয়াঁ ফুলজেন্স। বডিগার্ডের কাজও করেছে। ওকে তো চেনো তোমরা।'

'সত্যিকারের কাজের মানুষ,' বলল কর্নেলিস। 'বন্ধুর মর্যাদা দিতে জানে।' রানার দিকে চাইল। 'লারসেনকে কী ধরনের কাজ দেবে?'

'পয়েন্ট ম্যানের কাজ,' বলল রানা। 'ডেনিশ পুলিশের মিসিং পার্সন্স ব্যুরোর অফিসার। খুলতে পারবে দরকারী দরজা। অন্তত আরও একমাস বেতন ছাড়া ছুটি আছে। প্রয়োজন পড়লে বাড়িয়েও নেয়া যাবে ছুটি।'

'আর এদিকে রামিন?' জানতে চাইল কর্নেলিস।

কয়েক সেকেণ্ড ভেবে তারপর বলল রানা, 'জেনির ব্যাপারে তো তোমাকে বলেছি। কয়েক ঘণ্টা আগে রামিনের সঙ্গে কথা হয়েছে। মানসিক-শারীরিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠছে মেয়েটা।' কৌতূহল নিয়ে রানার দিকে চেয়ে আছে জ্যাকি। অন্যরা টের না পেলেও ও বুঝল, নরম হয়ে উঠেছে রানার কণ্ঠ। 'আগামী সপ্তাহে রেমারিকের শ্বশুর-শাশুড়ির বাড়িতে ওকে রেখে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে রামিন। ততদিনে আমরা বুঝে যাব, লাফাত্তার বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য জোগাড় করতে পারল কি না কর্নেল গুগলি ও পাধানি।' হাতঘড়ি দেখল রানা। 'তিনটেয় মিলানের বিমানে উঠব। সকালে দেখা করব কর্নেল গুগলির অফিসে।' জ্যঁা মউরোস ও কালাহানের দিকে ইশারা করল। 'আগামী পরশু উঠবে রেমারিকের হোটেলে। গগল কিছু যন্ত্র পাঠাবে ওর কাছে। হ্যাণ্ডগান, গ্রেনেড আর এসএমজি। ওই একই প্যাকেট যাবে মিলানে।' কর্নেলিসের দিকে চাইল রানা। 'আগামীকাল রাতে ফোন দেব তোমাকে। এখনও জানি না কেমন তথ্য দেবে কর্নেল গুগলি। সেগুলো কাজে এলে তোমাকে যেতে হবে মিলান বা নেপলসে।'

'ডেনিশ লোকটা কোথায় আসবে?' জানতে চাইল সিম।

'আগামীকাল মিলানে, এদিকে মার্সেইল্‌স্‌ থেকে আসবে ফুলজেন্স। আমার হোটেলে দেখা করবে ওরা।' চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল রানা।

একই কাজ করল অন্যরা।

জ্যাকি দেখল, মার্সেনারিদের বন্ধুত্বের নিয়ম অনুযায়ী সবাই একে একে আলিঙ্গন করছে রানাকে। বামহাত বন্ধুর ঘাড়ে, চুমু দিচ্ছে দু'গালে।

উনত্রিশ

যাতে পাশে থাকতে পারে জেনি, তাই সাঁতারের গতি কমিয়ে রেখেছে রামিন। সুইমিং পুলে পঁচিশবার এপার ওপার করল ওরা। তারপর থেমে হাঁপাতে লাগল কিশোরী। একটু জেদ করেই বলল, 'চাইলে আরও দশবার পারব।'

সুইমিং পুল থেকে উঠে চেয়ার থেকে তোয়ালে নিয়ে হাসল রামিন। 'আর পাঁচবারের বেশি না।' গা শুকিয়ে নেয়ার ফাঁকে দেখল শীর্ণ কিন্তু অদ্ভুত সুন্দরী জেনিকে। সাঁতরে চলেছে, পরনে গতকাল কেনা লাল ওয়ান পিস সুইম-সুট। জেনি ও টমকে নিয়ে রাবাত-এ গিয়ে নামকরা এক শপিং মল থেকে ওদের প্রয়োজনীয় পোশাক ও অন্যান্য সবই কিনেছে রামিন। নতুন পোশাক ও খেলনা পেয়ে খুব খুশি টম। জেদ ধরেছিল, ওদের সঙ্গে

বাগানবাড়িতে থাকবে, কিন্তু স্কুল চলছে বলে ওকে পাঠাতে রাজি হননি অনোরিয়া। জেনি খুশি, ওকে ভালবেসে ফেলেছে টম। ক'দিন পর হয়তো ওকে উঠতে হবে পাজেরো তাজা আঙ্কেলের বাড়িতে। তারপর আবার সেই কবে মাসুদ ভাই আর রামিন ভাইয়ার দেখা পাবে, কে জানে!

ভোর হয়েছে একঘণ্টা আগে।

প্রতিদিন ভোরে বিছানা ছাড়ে ওরা। ব্রেকফাস্ট শেষ করে বেরোয় জিপ গাড়ি নিয়ে। জেনিকে ঘুরিয়ে দেখায় রামিন অপূর্ব সুন্দর এই অরণ্যময়, সবুজ খেতভরা দ্বীপের চারপাশ। সময় হলে রাজকীয় লাঞ্চের জন্যে যায় সাগ্রার ওলেণ্ডার-এ। স্থানীয় সব ডিশ ভালবাসে জেনি। ওই দোকানের মালিক ব্যালুকে পছন্দ করে ফেলেছে, কারণ সে ওকে কিশোরী হিসেবে ধরে না নিয়ে সম্মান দিচ্ছে ভদ্রমহিলার। লাঞ্চ শেষ করার তিনঘণ্টা পর আবারও সাঁতার কাটে ওরা। এবার সাগরে। দ্বীপের সেই দূরের পাথুরে কোয়ালা পয়েন্টে। এরপর এক বা দুই ঘণ্টা সূর্যস্নান। প্রায় সব সময় জেনির সঙ্গে থাকে নোটবুক ও সরু বই। মাল্টার ভাষা শিখছে। রামিন বুঝে গেছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রাখে ছোট মানুষটা। বেশি দিন নেই অনায়াসেই মাল্টিয ভাষায় আলাপ জুড়বে স্থানীয়দের সঙ্গে।

রামিনকে বলেছে, 'আমি তো ইতালির নাগরিক। আছি মাল্টায়। এই দুটো দেশের ভাষা আমার শিখে নেয়া উচিত।'

'ভাল কথা,' বলেছে রামিন। 'কিন্তু ভুলে যেয়ো না মাল্টায় থাকলেও তুমি গোযিটান।'

'তফাত কী?' জানতে চেয়েছে জেনি।

'আছে। মাল্টিযরা বলে গোযিটানরা এ দ্বীপের আদিবাসী। কিন্তু গোজোর সবাই একবাক্যে বলবে, চাইলে পকেটে তিনজন মাল্টিযকে পুরে ঘুরে বেড়াতে পারে এক একজন গোযিটান।'

'তা হলে গোয়িটান হওয়াই ভাল,' হেসে ফেলেছে জেনি।

আরও পাঁচবার এপার ওপার করে পুলের তীরে পৌঁছে হাঁপাতে লাগল মেয়েটা, খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

হাত বাড়িয়ে ওকে টেনে ওপরে তুলল রামিন। জিজ্ঞেস করল, 'নাস্তায় কী খেতে চাও?'

উঁচু-নিচু হচ্ছে ছোট্ট বুক, ভাল খাবারের কথা ভাবতে গিয়ে জ্বলজ্বল করে উঠল জেনির মিষ্টি মুখ। 'কেমন হয় স্ক্র্যাম্বলড এগ, বিফ স্টেক, মাশরুম আর গ্রিল্ড টমেটো... আর সঙ্গে অনেক টোস্ট... আর এক জগ তাজা কমলার জুস?'

কিচেনের দিকে রওনা হয়ে গেল রামিন। পেছনের শুনতে পেল জেনির চিৎকার: 'ডিনার আমি তৈরি করব!'

দশ মিনিট পর কিচেনে এল জেনি। পরনে ডেনিম শর্টস্ ও স্মাগলার্স ইন নামের এক রেস্তোরাঁ থেকে পাওয়া সাদা টি-শার্ট। সুন্দর পোশাক পেয়ে পিৎযার ওই রেস্তোরাঁ প্রিয় হয়ে গেছে ওর। পনি টেইল করেছে জেনি, রোদের ভেতর থাকে বলে ব্রোঞ্জের মত রং ধরেছে ওর ত্বক। সুস্বাদু নাস্তার গন্ধ নেয়ার জন্যে আকাশে তুলল নাক।

চুলা নিয়ে ব্যস্ত রামিন, কাঁধের ওপর দিয়ে বলল, 'আগামী সপ্তাহে অনোরিয়া আর পাজেরো তাজার বাড়িতে পৌঁছে দেব তোমাকে।'

'কেন?' অবাক হলো জেনি।

'আপাতত দ্বীপ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

'কোথায় যাবে, ভাইয়া?'

'এখনও জানি না। ইতালির কোথাও। ওখানে আছেন মাসুদ ভাই।'

চেয়ারে বসে দমে যাওয়া সুরে জিজ্ঞেস করল জেনি, 'কত দিন পর ফিরবে?'

‘এখনও জানি না। হয়তো কয়েক দিন, এক সপ্তাহ, আবার বেশিও লাগতে পারে।’ ঘুরে চাইল রামিন। ভেবেছিল দেখবে জেনির চোখে-মুখে বিষণ্নতা। তেমন কিছু নেই।

একবার মাথা দোলাল জেনি, বুঝতে পেরেছে। কয়েক সেকেণ্ড পর জিজ্ঞেস করল, ‘আমি এখানে একা থাকি?’

প্লেটে খাবার তুলে ওর সামনে রাখল রামিন। ‘উচিত হবে না। মাসুদ ভাই আর আমি দুশ্চিন্তায় থাকব। এমনিতেই অনেক ঝামেলার ভেতর পড়তে হবে আমাদেরকে।’

আবারও মাথা দোলাল জেনি। স্ক্র্যাম্বলড এগ খেতে খেতে বলল, ‘যেদিন ওই বাড়িতে যাব, অনোরিয়া আণ্টি আর পাজেরো আঙ্কেলকে বলব, আমাকে যেন শেখান মাল্টিয ভাষা। ভাইয়া, যখন ফিরবে, ততদিনে আমি পুরো গোযিটান।’ ওর মুখ খুব সিরিয়াস। ‘তখন পকেটে পুরে রাখব তিনজন মাল্টিযকে।’

হেসে নাস্তায় মন দিল রামিন।

ত্রিশ

বিমানে বসে ঝিমিয়ে নিল রানা। মিলানে নামার আগে থেকেই খিঁচড়ে গেছে মন। কেন, জানে না। সঙ্গে ওভারনাইট ব্যাগ ছাড়া কিছুই নেই বলে কাস্টমসের জন্য অপেক্ষা করল না। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে পেয়ে গেল ট্যাক্সি। পেছনের সিটে বসেই বলল, ‘রেইলওয়ে স্টেশনের কাছে ইণ্টারন্যাশনাল হোটেল।’

বিড়বিড় করে কপালকে অভিশাপ দিল ড্রাইভার। কেউ স্টেশনের কাছে সস্তা হোটেলে উঠবে মানেই, ওই লোক ভাল টিপস্ দেবে না। খুব বকবক করে ইটালিয়ান ড্রাইভাররা, কিন্তু আলাপ করার সুযোগ পেল না সে। পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিট একদম চুপচাপ বসে থাকল লোকটা। বিশ মিনিট পর সেই যে পেছনে হেলান দিয়েছে, আর চোখই খুলল না। আর দেখার আছেই বা কী, মিলান পৃথিবীর অন্যতম কুৎসিত কারখানা নগরী। কিন্তু চোখ মেলে চারপাশ দেখলে রানা খেয়াল করত, খুব আগ্রহ নিয়ে রিয়ার ভিউ মিররে ওকে দেখছে ড্রাইভার। আরও পাঁচ মিনিট পর ড্রাইভারের কথা শুনে চটকা ভাঙল রানার। 'আপনি কি মিলানে বেশ কয়েক দিন থাকছেন?'

মৃদু মাথা নাড়ল রানা। ঝিমুনি কাটছে না। 'না, মাত্র কয়েক দিনের জন্যে এসেছি।'

'ব্যবসা না ফুর্তি?'

রানার বিরস কণ্ঠ বুঝিয়ে দিল আলাপের আগ্রহ নেই। 'পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে।'

কিন্তু হাল ছাড়ার লোক নয় ড্রাইভার। 'নেপলস থেকে এসেছেন?'

'না। তবে বেশ কয়েকবার গেছি।'

মাথা দোলাল ড্রাইভার। 'কথার সুরেই বুঝতে পেরেছি। আমি নিজেও পছন্দ করি না ওই শহর। ওখানে সবাই আছে বিপদে।'

চুপ করে থাকল রানা।

ড্রাইভার বুঝতে পেরেছে, কথা বাড়াতে চাইছে না যুবক।

যাত্রার শেষ অংশ কাটল নীরবতায়।

টিপস দেয়া হলো ড্রাইভারকে। পাঁচ হাজার লিরার নোট।

হতবাক হয়ে টাকা গুনল সে। ঘুরে দেখল পুরনো ও নোংরা এক হোটেলে গিয়ে ঢুকল যুবক।

গাড়ি ছেড়ে সামনের মোড় নিয়ে বুক পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করল ড্রাইভার। এমন কোনও ট্যাক্সি ড্রাইভার নেই যে গাড়ি চালাবার সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার করে না। যদিও তা বেআইনী। মিলানের ট্যাক্সি ড্রাইভাররা আসলে কোনও না কোনও দলের ইনফর্মার। কেউ পুলিশের, কেউ ড্রাগ্স্ বিক্রেতার, কেউ পতিতার দালালের, আবার কেউ স্থানীয় মাফিয়া কাপোর। এই ট্যাক্সি ড্রাইভার কাজ করে স্থানীয় দুই মাফিয়া কাপোর একজন জুলিয়ো গ্যারিবাল্ডির হয়ে।

সকাল মাত্র সাতটা, কিন্তু মাত্র দু'মিনিট পর গ্যারিবাল্ডি নিজে এল লাইনে।

পাঁচ মিনিট পর জুলিয়ো গ্যারিবাল্ডি ফোনে যোগাযোগ করল রোমের কাপো জিয়ান্না ক্যান্টারায়ার সঙ্গে। '...হ্যাঁ, সে-ই। শপথ করে বলছে ট্যাক্সি ড্রাইভার। আপনি তো ভাল করেই জানেন, টেলিভিশনে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান দেখেছি, অথচ গভীর রাতে মাটি খুঁড়ে দেখা গেল সবই ছিল ভুয়া আর নকল! ...পরে আমেরিকায় আমাদের ভাইয়েরা খুঁজে বের করল, দিব্যি চলে ফিরে বেড়াচ্ছে সে অন্য চেহারা নিয়ে। ...না-না, আগে সামনা-সামনি দেখেনি ড্রাইভার। কিন্তু পরে তার প্লাস্টিক সার্জারি করা চেহারার যে ছবি আমরা গোটা ইতালি জুড়ে ছড়িয়ে দিই, মনে আছে ড্রাইভারের সেই মুখ। চট্ করে ভোলা যায় না। আরও বলেছে, নিখুঁত নিয়াপলিটান সুরে ইতালিয়ান ভাষায় কথা বলে। ...হ্যাঁ, সব মিলে যাচ্ছে। ...আমার ছেলেরা যথেষ্ট দক্ষ... পাঠিয়ে দেব নজর রাখতে... ঠিক আছে... হ্যাঁ... ছয়জন... আমার সেরা... হ্যাঁ... ভুলব কী করে? ধরে আনলেই নিজ চোখে দেখে নিশ্চিত হব।'

একত্রিশ

মনোযোগ দিয়ে 'ওয়ান হাণ্ড্রেড ইয়ার্স অভ সলিচ্যুড' বইটি পড়ছে রামিন। খুব ওজনদার শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। পড়া বাদ দিতে চেয়েছিল, কিন্তু রানা বলেছে, ওর পড়া উচিত। ওই বই এক শতাব্দীর অন্যতম ভাল বই। কোয়ালা পয়েন্টে পাথরের ছায়ায় বসে দাঁতভাঙা সব শব্দ বুঝতে চাইছে। মাঝে মাঝে চট্ করে দেখে নিচ্ছে জেনিকে। চিত হয়ে রোদে পড়ে আছে ও। হাতে মাল্টিয ভাষা শেখার বই। কখনও কখনও বিড়বিড় করে মুখস্থ করছে শব্দ।

একঘণ্টা পর শরীর শীতল করতে আবারও সাগরে নামল ওরা। কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে বসে পড়ল পাথরের ঠাণ্ডা ছায়ায়। কুল বক্স থেকে নিজের জন্য বিয়ার আর জেনির জন্যে কোক নিল রামিন। জেনি প্রায় সুস্থ বলে আবারও মাঝে মাঝে বিয়ার গিলছে ও।

কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল নীরবে, তারপর নিচু স্বরে বলল জেনি, 'ওই ব্যাপারে কথা বলতে চাই।' কোমিনোর কাছের গাঢ় নীল সাগরে চোখ ওর। খুব ঠাণ্ডা সুরে বলল, 'মার্সেইল্স্-এ যা ঘটেছে, তারপর আজকাল অনেকটা ভাল লাগে। শরীর ঠিক হয়ে আসছে। খাচ্ছি উপকারী খাবার। সৈকতে বসে রোদ পোহাতেও চমৎকার লাগে। নতুন করে বাড়ছে ওজন। শক্তিও।' ঘুরে

রামিনকে দেখল জেনি। অসহায় শোনাল ওর কণ্ঠ, 'কিন্তু রাতে ঘুমাতে পারি না। শুধু দুঃস্বপ্ন দেখি আর ঘামতে থাকি। বোধহয় কিছুই ভুলে যাইনি। তাই মনে হলো, ভাইয়া, তোমাকে সব খুলে বলা উচিত।'

রামিনকে এ বিষয়ে আগেই বলেছে রানা। কাজেই তৈরি ছিল ও, সহজ সুরে বলল, 'জেনি, একদল লোক আছে, তারা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। ডাক্তার। সমাজ সেবক। ওরা এসব ভাল করেই বুঝিয়ে দিতে পারবে। আমি অতটা বোঝাতে পারব না। তোমার যেটা হচ্ছে, তাকে বলে ডিলেইড রিঅ্যাকশন। এটা স্বাভাবিক। সুস্থ হতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ লাগে অনেকের। কখনও মাসের পর মাস বা বছর। কেমন ছিল অতীত, তার ওপর নির্ভর করে কত সময় লাগবে। তোমার দুঃস্বপ্ন শুরু হয়েছিল জীবনে সৎ-বাবা আসার পর থেকেই। ওই লোক তোমাকে কষ্ট দিয়েছে। তাই মাসুদ ভাই আর আমার মনে হয়, এবার সময় হয়েছে বিশেষজ্ঞ কোনও ডাক্তারের সাহায্য নেয়ার। মাল্টায় তেমনই এক ভাল ডাক্তার আছেন। মহিলা। প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ইংল্যাণ্ডে।'

বারকয়েক মাথা নাড়ল জেনি। 'না, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার চাই না, ভাইয়া। আমি এমন একজনের সঙ্গে কথা বলতে চাই, যাকে বিশ্বাস করা যায়। সে হতে পারে মাসুদ ভাই বা তুমি। কিন্তু তোমরা অনেক দিনের জন্যে চলে যাবে দূরে। আর মাসুদ ভাই এখানে নেই। তাই যা বলার বলব তোমাকে। তোমার আপত্তি না থাকলে, এখানে বসেই সেরে ফেলতে চাই। তারপর মন থেকে মুছে ফেলব সব— ঠিক আছে?'

বিয়ারে চুমুক দিল রামিন, 'ঠিক আছে। বলো।'

পরের আধঘণ্টা বলে গেল জেনি। কেঁদে ফেলল দু'বার। ও সামলে না নেয়া পর্যন্ত ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিল রামিন। সব শুনে একই সঙ্গে চিন্তিত ও হতভম্ব হলো।

‘তার মানে তোমার সৎ-বাপ কখনও রেপ করেনি?’

‘না। কিন্তু ওটা আমার হাতে ধরিয়ে... কী যে কষ্ট লাগত মনে... জোর করে আমাকে দিয়ে... মানা করলেই বেধড়ক মারত। পেটাতে ভালবাসত সে।’

মাথা দোলাল রামিন। ‘হয়তো তোমার মা এর বেশি কিছু করতে দিতে চায়নি।’

মাথা নাড়ল জেনি। ‘তা নয়, আমি মরে গেলেও কিছুই যেত আসত না মা-র। সেজন্যেই পালিয়ে যাই। ওই লোকটা বার-বার বলত, বারো বছর হলেই সেই জন্মদিনে আমাকে ধরে...’ রামিনের দিকে চাইল জেনি, চোখে টলমল অশ্রু। ‘বলেছিল ওটা আমাকে তার দেয়া সেরা জন্মদিনের উপহার...’

চুপ থাকল রামিন। মন চলে গেছে সুদূর জার্মানির ছোট এক বাড়িতে। ভাবছে, সামনের কাজটা শেষ হলে ওখানে যাবে। জেনির সৎ-বাপকে দেবে তার নিজের জন্মদিনের সেরা উপহার—নিশ্চিত মৃত্যু। এমন লোকের প্রাপ্য নিষ্ঠুর মৃত্যু। আবারও বাস্তবে ফিরল। ‘মার্সেইল্‌স্‌-এর কুকুরগুলোও ওসবই করতে চেয়েছে?’

প্রায় বুজে গেল জেনির কণ্ঠ: ‘হ্যাঁ। আমার হাতে দিয়ে... মুখে...’ মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল বেচারি। একটু সামলে নিয়ে বলল, ‘একটা মেয়েলোক আসত। আমাকে শেখাতে চাইত। অদ্ভুত সুন্দরী। জোর করত তার গোপনাঙ্গে...’ আবারও কাঁদতে লাগল জেনি।

হাত বাড়িয়ে ওকে নিজের বুকে টেনে নিল রামিন, ধরে রাখল শক্ত করে। ওর কাঁধ ভিজে গেল জেনির চোখের জলে।

আজ বেশ গরম পড়েছে। কিন্তু হিম শীতল হয়ে গেছে রামিনের বুকের ভেতরটা। প্রচণ্ড রাগ চেপে শান্ত সুরে বলল, ‘জেনি, জানি না এটা শুনলে তোমার ভাল লাগবে কি না; কিন্তু ওই সুন্দরী মেয়েলোকটা গুলি খেয়ে পড়ে কপাল ফাটিয়ে মরেছে।

সে আর কখনও বিরক্ত করবে না তোমাকে।'

মুখ তুলে রামিনকে দেখে নিয়ে একটু সরে বসল জেনি। 'ভাইয়া, তুমি ওকে... নিজ হাতে... কী করে?'

সেই দিন মার্সেইল্স্-এর ওই প্রকাণ্ড ভিলার বেযমেন্টে কীভাবে অ্যাবে ল্যামন্টে মরল, তার পুরো বর্ণনা দিল রামিন।

হতবাক হয়ে সব শুনল জেনি। তারপর অবাক চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আর ওই সুন্দরী মহিলার সঙ্গের দামি পোশাক পরা লোকটা? যার পায়ে সাপের বা গিরগিটির চামড়ার জুতো থাকত?'

মাথা দোলাল রামিন।-'ও মরেছে মাসুদ ভাইয়ের হাতে। ওর সঙ্গে ছিল এক অসৎ পুলিশ অফিসারও। ওদেরকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন উনি।' জেনির চোখে তৃপ্তি দেখল ও। 'শুনে একটু ভাল লাগছে?' জানতে চাইল।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল কিশোরী। 'আমি যেভাবে গরম পানিতে শাওয়ার নিই, সেভাবেই সহজে তোমরা শয়তানদেরকে মেরে ফেলো।' রামিনের চোখে সামান্য বিস্ময় দেখে জিজ্ঞেস করল জেনি, 'কী হয়েছে, ভাইয়া?'

কাঁধ ঝাঁকাল রামিন। 'আসলে... এটা বুঝলাম, ছোট্ট এক নিষ্পাপ মেয়েকে ভোগ করবে বলে খাপ পেতে বসে ছিল ইবলিশ এক সৎ-বাপ। কিন্তু এটা বুঝছি না, মার্সেইল্স্-এর কুকুরগুলো কেন দেরি করল। তাদের তো তর সওয়ার কথা নয়। ডেনিশ মেয়েটাকে ছিবড়ে করে দিতে চেয়েছিল।' আরেকটা চিন্তা মগজে ঘাই দিতে জানতে চাইল রামিন, 'জেনি? আপু... ইয়ে... তুমি... কি... ইয়ে কুমারী?'

'হ্যাঁ,' আস্তে করে মাথা দোলাল জেনি। 'বুড়ি মেয়েলোকটা পরীক্ষা করে দেখেছিল। অনেক কিছু জানত। আমার ভেতরে আঙুল দিয়ে বলেছিল: "কুই... কেস্ত লা!" ভালই ফ্রেঞ্চ ভাষা বুঝি

আমি। আন্তর্জাতিক স্কুলে পড়তাম।'

'এবার বুঝলাম,' বলল রামিন, 'তোমাকে কুমারী রেখেছিল অনেক বেশি টাকায় বিক্রি করবে বলে। অপূর্ব সুন্দরী বারো বছরের মেয়ে... অনেক দামে কেনার লোক আছে।'

আবারও মাথা নাড়ল জেনি। 'আমার মনে হয় অন্যকিছু।'

'তা কী?'

'ঠিক জানি না, কিন্তু ওরা আরও কিছু বলেছিল। সুন্দরী মহিলা আর সাপের জুতো পরা লোকটা আলাপ করছিল। ওখানে আরেক লোকও ছিল। ওরা জানত না আমি ফ্রেঞ্চ ভাষা জানি। বেশিরভাগ কথাই শুনেছি। অন্য লোকটার সঙ্গে খুব নরম সুরে কথা বলছিল সাপের জুতো। সেই লোক আমাকে ভোগ করতে চেয়েছিল, কিন্তু জুতো বলল আমি কুমারী। তাতে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল টেকো। জুতোকে নিয়ে গেল এক দিকে, তারপর বলল, "তোমার হাতে তুলে দেব রাজার ধন।" তা শুনে খুব হাসতে লাগল সুন্দরী মেয়েলোকটা। পাত্তা না দেয়ার সুরে বলল, "রাজার ধনের চেয়েও বেশি পাব এই কুমারী মেয়ের জন্যে। ওর কুমারীত্ব, ওর কৈশোর... ওর জীবন... সব দেবে অনেক বেশি কিছু।" তখন সাপের জুতো মহিলাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল।'

বিস্ময় গোপন করল রামিন। 'ওরা বলেছে কুমারীত্ব, কৈশোর আর জীবন...' শ্রাগ করে উঠে দাঁড়াল ও। 'চলো, বাড়ি ফেরা যাক। আজ শিককাবাব করব।'

গাড়িতে নীরব থাকল ওরা।

রাবাত পেরিয়ে যাওয়ার পর জেনি বলল, 'ভাইয়া, মনে হচ্ছে আজ রাতে ঠিকই ঘুমাতে পারব।'

একবার জেনিকে দেখে নিয়ে হাসল রামিন, নরম সুরে বলল, 'ভাল ঘুম দরকার তোমার। দারুণ খাবার শেষ করে শুয়ে পড়বে, উঠবে সেই ভোরে। ঠিক আছে?'

বাড়ি ফিরে কুল বক্স হাতে কিচেনে ঢুকল রামিন। তখনই বেজে উঠল ফোন। শাওয়ার নিতে বেডরুমে গেছে জেনি। সিঙ্কের নিচে কুল বক্স রেখে রিসিভার তুলল রামিন।

যোগাযোগ করেছে নেপলস থেকে রেমারিক। দুশ্চিন্তা ভরা কণ্ঠে বলল, 'আজ সকাল থেকে উধাও হয়ে গেছে রানা। সকাল দশটার সময় কর্নেল গুগলির সঙ্গে দেখা করার কথা। কিন্তু ওখানে যায়নি। ব্রাসেলসের বিমান থেকে নেমে মিলানের এয়ারপোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসে। হোটেল, এয়ারপোর্ট ও সমস্ত হাসপাতালে খোঁজ নিয়েছে বার্নাদো গুগলি। হোটেলে সকাল আটটায় চেকইন করেছে রানা। কিন্তু বেরিয়ে গেছে আধঘণ্টা পরেই। তারপর আর ফেরেনি। ঘরে রয়ে গেছে ওভারনাইট ব্যাগ। এদিকে ওর হোটেলে গেছে পিটার লারসেন ও ফুলজেন্স।'

'হয়তো ভাল কোনও সূত্র পেয়েছেন মাসুদ ভাই,' বলল রামিন। 'এতই ব্যস্ত, দ্য ডায়মণ্ড রিঙের ব্যাপারে কর্নেলের সঙ্গে আলাপ করার সময় ছিল না।'

'ভাল করেই চেনো তুমি রানাকে,' বলল রেমারিক, 'আর তোমার চেয়ে অনেক বেশি চিনি আমি ওকে। কোথাও গেলে কোথায় যাচ্ছে তা জানিয়ে যেত।'

গলা শুকিয়ে গেল রামিনের।

'তা হলে কী ভাবছেন, কিডন্যাপ্‌ড্‌ হয়েছেন মাসুদ ভাই?'

'সম্ভাবনা নিরানব্বুই পার্সেন্ট।'

'দ্য ডায়মণ্ড রিং?'

'হয়তো। হয়তো নয়। ইটালিতে শত্রুর অভাব নেই ওর। খোঁজ নেয়ার জন্যে কারাবিনিয়ারির লোক মাঠে নামিয়ে দিয়েছে কর্নেল গুগলি। একঘণ্টা পর মিলানের উদ্দেশে রওনা হব। খবর দিয়েছি কর্নেলিসকে। ওর সঙ্গে আসবে কালাহান আর জ্যাঁ মউরোস। অনেকক্ষণ ধরে ফোন করেও তোমাকে পাইনি।

অ্যালিটালিয়ায় রাত আটটার ফ্লাইটে তোমার জন্যে টিকেট কেটেছি। এয়ারপোর্টে ওই বিমান কোম্পানির ডেস্কে গেলেই পেয়ে যাবে।'

একবার হাতঘড়ি দেখে নিয়ে বলল রামিন, 'পৌঁছে যাব।'

আগেই ফোন করে দিয়েছে, আধঘণ্টা পর জিপ ড্রাইভ করে জেনিকে নিয়ে তাজা-খামারবাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল রামিন। একটু খুশি, নতুন এই খারাপ সংবাদ শুনেও ভেঙে পড়েনি মেয়েটা। কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিয়েছে। ওর সঙ্গে যেতে চেয়েছিল ইটালিতে, কিন্তু যখন দেখল থমথম করছে রামিনের গম্ভীর মুখ, তখন আর জোর করেনি। তবে ওর আবদার: 'ভাইয়া, ঘটনা যাই হোক, প্রতিদিন আমাকে ফোনে জানাবে।'

খামারবাড়িতে ওদেরকে আন্তরিকভাবে নিলেন অনোরিয়া। রামিনের সংক্ষিপ্ত কথা শুনে, জেনিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেন একতলা দালানের পাশের দোতলা। ওখানে রয়েছে রানার বেডরুম। নিজে বাগানবাড়ি করলেও ওই ঘর শুধু ওর বা রেমারিকের জন্যেই রেখে দেয়া হয়েছে।

খবর পেয়ে বাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে টম তাজা। একদৌড়ে হাজির হলো জেনির সামনে। 'জেনি আপু! যাক্, চলে এসেছ!'

পিচ্চি ছেলেটার মাথার চুল এলোমেলো করে দিল জেনি, মিষ্টি হাসছে। মনে কষ্ট, চলে যাচ্ছে রামিন ভাইয়া। 'কেমন আছ, ভাইয়া?'

'খুব ভাল। দারুণ মজা হবে, চলে এসেছ।' অনোরিয়ার দিকে চাইল টম। 'এখন থেকে আপুর পাশে ঘুমাব। ভাল হবে না?'

'খুবই ভাল হবে,' হাসলেন অনোরিয়া। জেনিকে নরম সুরে

বললেন, 'টমের সঙ্গে যাও। সব রেখে এসো ওপরের ঘরে। এখন থেকে ওই ঘরে থাকবে তোমরা দু'জন।'

'হুর্‌রে! অনেক রাত জেগে গল্প করব, তা-ই না, জেনি আপু?'

জেনি কিছু বলার আগেই চোখ পাকালেন অনোরিয়া। 'রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে হয়, গল্প নয়!'

টমকে কোলে তুলে নিয়ে গালে চুমু দিয়ে নামিয়ে দিল রামিন। জেনির কাঁধে হাত রেখে বিদায় চাইল। 'একদম ভাববে না। সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে। আমরা ভালই থাকব। সবসময় কোনও না কোনও কাজে ব্যস্ত থেকো।'

'তুমিও খুব সাবধানে থেকো, ভাইয়া,' জবাবে বলল জেনি।

অনোরিয়ার চোখে দুশ্চিন্তা দেখছে রামিন, জিপের কাছে গিয়ে বলল, 'মিলানে জড় হচ্ছে মাসুদ ভাইয়ের বন্ধুরা, নামকরা মার্সেনারিদের ভেতরও সেরা তারা। আপনি মাসুদ ভাই আর আমাদের জন্যে প্রার্থনা করবেন।'

মাথা দোলালেন অনোরিয়া। কয়েক সেকেণ্ড পর বললেন, 'যাত্রা শুভ হোক, রামিন।'

বত্রিশ

'মস্ত উপকার করেছি তোমার,' বলল রানা।

টেবিলের ওদিকে বসে আপত্তির সঙ্গে ঘোঁৎ আওয়াজ তুলল

জুলিয়ো গ্যারিবাল্ডি। 'উপকার!' রানার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা দুই বডিগার্ডের দিকে তাকাল। তাদের হাতে কক করা সাবমেশিন-গান, নল তাক করেছে রানার পিঠে। যদিও চেয়ারে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসে আছে রানা।

বডিগার্ডদের একজন ঠোঁটে ঝুলিয়ে রেখেছে টিটকারির হাসি। কিন্তু অন্যজন সরু চোখে দেখছে রানার মাথার পেছন দিক। সে সতর্ক লোক, শুনেছে কী করতে পারে সামনের ওই লোক। বসের চেহারা দেখল সে। মোটা, বেঁটে, ঘাড় বলতে কিছুই নেই। পরনে দামি সুট। ভাল খাবার প্রচুর পরিমাণে খায় বলে বদনাম আছে গ্যারিবাল্ডির। শত্রুরা বলে, তার পেট ভরা হিংসা।

আবারও ঘোঁৎ করে উঠল জুলিয়ো গ্যারিবাল্ডি। 'কীসের উপকার করেছ, অ্যাঁ?'

কনকনে ব্যথা সহ্য করে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ফুলে গেছে গালের একপাশ। কেটে গেছে কপাল। ওখানে শুকনো রক্ত। 'কয়েক বছর আগে মিলানের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী কাপো করে দিয়েছি তোমাকে।'

'কী করেছ?' কপালে ভুরু তুলল গ্যারিবাল্ডি।

'মিথ্যা নয়। স্মৃতি বলতে কিছু থাকলে স্মরণ করো।'

ডানহাতের তর্জনী তুলল গ্যারিবাল্ডি।

ঝট্ করে দু'পা সামনে বাড়ল এক বডিগার্ড। মাপা হাতে সাবমেশিন-গানের বাঁট দিয়ে মারল রানার ঘাড়ের নীচে, পিঠে।

রানার কণ্ঠ থেকে ব্যথার কোনও আওয়াজ বেরোল না। চুপচাপ চেয়ে আছে গ্যারিবাল্ডির চোখে।

'হ্যাঁ, আমার মগজ খারাপ না,' তিক্ত সুরে বলল কাপো। 'আর তাই খুঁজে বের করতে চাইছি কীভাবে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়ে তোমাকে খুন করা যায়। কীসের উপকার, শালা, কালো কুকুরের গু?'

কাঁধ সামান্য ঝাঁকাল রানা। ব্যথার ছাপ নেই মুখে। 'কয়েক বছর আগে,' শুরু করল ও, 'তুমি ছিলে এই শহরের ছোট একটা কাপো। কাজ করতে হিনো ফনটেলার অধীনে। ফনটেলাকে খুন করেছি। মনে আছে?'

হেসে ফেলতেই আরও অনেক কুৎসিত দেখাল জুলিয়ো গ্যারিবাল্ডিকে। 'হ্যাঁ, মনে আছে। পোঁদের ভেতরে একটা বোমা রেখে তাকে উড়িয়ে দিয়েছিলে। নষ্ট হয়ে গিয়েছিল গোটা ছাত।'

মাথা দোলাল রানা। 'ওর লেফটেন্যান্টরাও রক্ষা পায়নি। তাতে তুমি হয়ে উঠলে প্রধান কাপো।'

দাঁত খিঁচিয়ে সামনে ঝুঁকে বসল গ্যারিবাল্ডি। 'এমনিতেই প্রধান কাপো হতাম আমি।'

মাথা নাড়ল রানা। 'তা ছিল অসম্ভব। তোমার চেয়ে অনেক চালাক ছিল ফনটেলা। বড় নেতাদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক ভাল ছিল।'

'ও যদি এত বুদ্ধিমানই হবে,' বলল গ্যারিবাল্ডি, 'তো কেন তুলে নিয়ে যেতে দিল? এ সম্ভব? কেন ভরতে দিল পোঁদে বোমা? আমি জীবনেও এমন হতে দেব না।'

রানার ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখল গ্যারিবাল্ডি। শুনতে পেল নিচু কণ্ঠ: 'ফনটেলা, রোমে তার কয়েকজন বস ও পালারমোর ডনের ওপর রাগ ছিল আমার, তোমার সঙ্গে শত্রুতা ছিল না। নইলে বসে থাকতে না এখানে।' মাথা কাত করে পেছনের বডিগার্ডদেরকে দেখাল রানা। সামনে ঝুঁকে বসল। 'একটা কথা মগজে গেঁথে নাও, গ্যারিবাল্ডি, তোমার কোনও বাঁদর আবারও ব্যথা দিলে শত্রুতা তৈরি হবে তোমার সঙ্গে আমার।'

থমথম করছে ঘর।

পরিবেশ শীতল।

বেশ কিছুক্ষণ বাঙালি যুবকের চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি ফেলল

গ্যারিবাল্ডি, তারপর দেখল বডিগার্ডদের। বলে উঠল মাপা স্বরে, তাতে স্পষ্ট ঘৃণা: 'তোমার সাহস আছে, সেটা আমরা জানি। টার্কির মত হাত-পা বাঁধা, পিঠে সাবমেশিন-গানের নল, তবুও হুমকি? এমন একজনকে হুমকি দিচ্ছ, যে কি না ভাবছে কীভাবে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়ে খুন করা যায়।'

ছোট্ট হাসি ছুঁয়ে গেল রানার ঠোঁট। 'পরিস্থিতিটা গুছিয়ে বলছি তোমাকে। আন্দাজ দু'ঘণ্টা আগে আমাকে সনাক্ত করেছ। তখন প্রথমেই ফোনে যোগাযোগ করেছ রোমে, জিয়ান্না ক্যাণ্টারায়ার সঙ্গে। আসলে বড় কোনও সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে পরামর্শ নাও। তুমি নিজে কোনও সিদ্ধান্ত নিলে, রোম থেকে এসে তোমার পাছার ছাল তুলে ফেলবে ক্যাণ্টারায়া। না... ভাল করেই জানি, আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে তুমি। নইলে কান ছিঁড়ে নেবে সে। আগামীকাল রোম থেকে এসে একের পর এক প্রশ্নের জবাব চাইবে সে আমার কাছে।' কাপোর চিন্তিত চোখে চোখ রেখে জবাব পেয়ে গেল রানা।

অস্বস্তি বোধ করে তর্জন ছাড়ল গ্যারিবাল্ডি, 'কারও সাধ্য নেই জুলিয়ো গ্যারিবাল্ডিকে নির্দেশ দেবে... কক্ষণো না!'

'তাই নাকি?' হাসল রানা।

উঠে দাঁড়িয়ে এক বডিগার্ডের পাশে চলে গেল গ্যারিবাল্ডি, তার হাত থেকে নিয়ে নিল এসএমজি। অস্ত্রের নল ঠেকিয়ে দিল রানার বাম কানে। তারপর আবারও বলল, 'কারও সাধ্য নেই আমাকে অর্ডার মারবে।'

ক্লান্ত রানা শ্বাস ফেলে বলল, 'তো টিপে দাও ট্রিগার, মানা করছে কে তোমাকে?'

পেরিয়ে গেল বেশ কয়েক মুহূর্ত, তারপর বলল গ্যারিবাল্ডি, 'কোসা নস্ট্রায় আমরা সবাই একে অপরকে সহায়তা করি। জিয়ান্না ক্যাণ্টারায়ার দুলাভাই ছিল আতুনি বেরলিংগার, এবং

তাকে খুন করেছ তুমি ভয়ঙ্করভাবে। কাজেই তোমার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ক্যান্টারায়া। তাই তাকে জানিয়ে দিয়েছি, মাছ এখন আমার জালে। স্বাভাবিক, খুন করার আগে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইবে সে।'

মাথা নেড়ে কান থেকে এসএমজির নল সরিয়ে দিল রানা। চোখ তুলে দেখল গ্যারিবাল্ডিকে। 'স্বাভাবিক। এবার তোমার বাঁদরদের কাউকে বলো, আমার জন্যে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি আনতে। আরও খুশি হব এক গ্লাস ভাল লাল ওয়াইন দিলে। জিয়ান্না ক্যান্টারায়ার সঙ্গেও আলাপ করতে চাই, কারণ তোমার মতই ওরও একই উপকার করেছি। মাত্র বছর কয়েক আগে বেরলিংগার ওকে ব্যবহার করত পিয়নের মত, যদিও বিয়ে করেছিল ওর বোনকে।'

আবারও নীরবতা নামল ঘরে। কিছুক্ষণ পর বডিগার্ডদের একজনের দিকে মাথার ইশারা করল গ্যারিবাল্ডি।

ঘর ছেড়ে চলে গেল লোকটা।

কাঁধ নেড়ে আড়ষ্টতা দূর করতে চাইল রানা, সহজ সুরে বলল, 'একবার প্রস্রাবও করতে হবে।'

'তো প্যান্ট ভিজিয়ে দাও,' বলল গ্যারিবাল্ডি। 'ক্যান্টারায়া না আসা পর্যন্ত ওই চেয়ার থেকে নড়তে পারবে না। আর চেয়ার তখনই ছাড়বে, যখন কক্ষণো আর পেশাব করতে হবে না।'

তেত্রিশ

শরতের শুরু। ঝমাঝম পাগলা বাদলে ভিজছে মিলান এয়ারপোর্ট, কাস্টম্‌স্‌ পেরিয়ে যাওয়ার সময় ছাতে জোরালো তবলার বোল শুনতে পেল রামিন, নিজেও প্রকৃতির মতই বিক্ষুব্ধ।

ভিড়ের ভেতর ভিটেলা রেমারিককে দেখে একটু ভাল হলো মন। পরস্পরকে আলিঙ্গন করল ওরা। পথ দেখাল রেমারিক, ওকে নিয়ে পৌঁছল পার্কিং এরিয়ায়। কালো এক ল্যান্সিয়ার দিকে চলেছে। ওটার কাছাকাছি যেতেই খুলে গেল পেছনের দুই দরজা। ঢুকে পড়ল ওরা গাড়ির ভেতর।

স্টিয়ারিং হুইলে আছে সিম কর্নেলিস, পাশেই অসি কালাহান। গাড়ি রওনা হতেই কাঁধের ওপর দিয়ে বলল সিম, 'বৃষ্টি যতই বিরক্তিকর হোক, ভাল লাগছে তোমাকে দেখে, রামিন।' ডানহাতে ইশারা করল। 'এ অসি কালাহান। আগেও এর কথা শুনেছ।'

বাতির মৃদু হলদে আলোয় দেবদূতের মত টাকপড়া মাথাটা ঘুরিয়ে রামিনকে দেখল কালাহান। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, রামিন।'

'আমিও,' বলল রামিন। চাইল রেমারিকের দিকে। 'খুলে বলুন।'

গাড়ির কোণে কুঁজো হয়ে বসে আছে রেমারিক। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিল সে। 'ধরে নেয়া যায় মাফিয়ার হাতে আছে রানা।

আমাদের ধারণা, শহরের প্রধান কাপোর ওখানে। ওই লোকের নাম জুলিয়ো গ্যারিবাল্ডি। যেভাবেই হোক রানাকে চিনে ফেলে তার লোক। জানোই তো, আক্রোশ কখনও ভোলে না, সুযোগ পেলেই প্রতিশোধ নিতেও ভুল করে না মাফিয়া।'

'আমাদের হাতে কী আছে?' জানতে চাইল রামিন।

'এ শহরের অনেককে সাহায্য করেছে রানা,' বলল রেমারিক। 'তাদের ভেতর একজন হচ্ছেন কর্নেল গুগলি। উনি আছেন কারাবিনিয়ারিতে। আগেও শুনেছ ওঁর নাম। গুগলি জেনেছেন, ব্রাসেল্স্ থেকে হোটেলে ফিরে আধঘণ্টা পর তাঁর অফিসে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে আসে রানা। প্রায় একই সময়ে হোটেল থেকে দুই ব্লক দূরে শুরু হয় গোলমাল। ছয়জন লোক ছিল তারা। বড় একটা কালো লিমোর ভেতর ছিল তাদের দু'জন। অন্য চারজন ফুটপাথে। গুলি করা হয় মাত্র একবার। গুলি লাগে রাস্তায়। চারজনের দু'জনের তলপেটে লাথি মেরে ফেলে দেয় রানা। ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্য দু'জন। রানা চ্যাপ্টা করে দেয় তাদের একজনের নাক। অন্যজন কী কারণে যেন কই মাছের মত তড়পাচ্ছিল রাস্তায়। কিন্তু ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে অন্য দু'জন। তাদের একজন পিস্তলের বাঁট ব্যবহার করে। রক্তে ভিজে যায় রানার কপাল ও গাল। তারপর মাথার তালুতে আঘাত খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এরপর ওকে গাড়িতে তুলে উধাও হয় তারা। যে বর্ণনা দিয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা, তাতে গুগলি নিশ্চিত, ওই যুবক রানাই ছিল। এটা আজ সকালের ঘটনা। এরপর থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় নানান তথ্য আসছে। এখন প্রথম কাজ হবে আমাদের বেইয ঠিক করা। নতুন কোনও তথ্য পেলেই জানাবেন গুগলি।'

'এখানে আমরা ক'জন?' জানতে চাইল রামিন।

গাড়ির সামনের দুই সিট দেখাল রেমারিক। 'আমাদের সঙ্গে

সিম আর কালাহান, এ ছাড়া জ্যাঁ মউরোস, ডেনিশ পুলিশ আর ফুলজেন্স। আরও আছেন কর্নেল গুগলি, তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট পাধানি, আর গুগলির গুপ্তচর। তার নাম বলা হয়েছে, লাজুক ভূত।'

'তো আমাদের সঙ্গে থাকছে তিনজন ইটালিয়ান পুলিশ,' বিড়বিড় করল রামিন। 'পুলিশ দেখলেই সন্দেহ হয় আমার।'

মাথা নাড়ল রেমারিক। 'আমাদের টিমের এদের তিনজনকে বিশ্বাস করতে পারো, অন্য কাউকে নয়।'

কালো ল্যান্সিয়া গাড়ি থামল মিলানের শহরতলীর ছোট এক বাড়ির সামনে। দরজা খুলল পঁচাশি বছরের পক্বকেশ এক বৃদ্ধা। ট্যারা দুই সাবধানী চোখে ওদের দেখে নিয়ে ছাড়ল দরজা।

বসার ঘরে ঢুকে রামিন দেখল বেশ কয়েকজনকে। তাদের ভেতর রয়েছে পেঁচা ফুলজেন্স। অপরিচিত জ্যাঁ মউরোস, মেজর কোসিমা পাধানি, লাজুক ভূত ও কর্নেল গুগলির সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিল রেমারিক। 'অন্যদের সবাইকে তো তুমি চেনোই।'

এই বাড়িতে পৌঁছুতে গিয়ে পেরিয়ে গেছে মাঝরাত।

ইতালির নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকের সঙ্গে আলিঙ্গন করল রামিন। মস্ত গোল টেবিল ঘিরে বসল সবাই।

লাজুক ভূত অবশ্য বসেছে ছোট, আধুনিক একটা রেডিয়ো কন্সোলে, নিচু স্বরে কথা বলছে মাইক্রোফোনে। রামিন চেয়ারে বসে টের পেল, অন্যরা মোটেও পাত্তা দিচ্ছে না ওকে।

আলোচনা চলছে টেবিলে।

নিজের বক্তব্য দিচ্ছে পাধানি: 'সন্দেহ নেই কাজটা জুলিয়ো গ্যারিবাল্ডির। রাস্তা ছেড়ে সরে গেছে তার "সৈনিকরা"। আমরা জানি, শহরতলীতে রয়েছে তার প্রধান দুই পতিতালয়। ও-দুটোর যে কোনওটায় রেখেছে মিস্টার রানাকে। উত্তর দিকের পতিতালয় উঁচু এলাকায়, সহজ হবে আত্মরক্ষা করা।'

‘আমরা কখন জানব কোথায় আছে ও?’ জানতে চাইল জ্যাঁ মউরোস।

‘আগামী একঘন্টার ভেতর,’ বলল পাধানি। ‘কিন্তু খুব সতর্ক থাকতে হবে।’ রামিনকে দেখল সে। ‘দুঃখজনক, কিন্তু ইতালির আর সব সংগঠনে ঢুকে পড়েছে মাফিয়া। আমরা বিশ্বাস করতে পারব তেমন লোক খুব কম।’

মাথা দুলিয়ে তিক্ত চেহারায় বললেন গুগলি, ‘হাতে গোনা কয়েকজন তারা।’

‘মার্সেইল্‌স্ থেকে যন্ত্রপাতি পৌঁছে গেছে,’ বলল কর্নেলিস। ‘আমরা তৈরি। রানাকে কোথায় রেখেছে জানলেই পথ তৈরি করে নিতে পারব।’

মাথা নাড়লেন গুগলি। ‘আপনারা যখন ওর গুহায় ঢুকে পড়বেন, তার আগেই রানার মাথায় গোটা দশেক গুলি গেঁথে দেবে গ্যারিবাল্ডির লোক। খুব সাবধানে আবারও ভাবুন।’ রেমারিকের দিকে ইশারা করলেন তিনি। ‘আমাদের বন্ধু এক সময়ে মাফিয়ার হয়ে কাজ করত। ও কিন্তু ভাল করেই জানে, কী ঘটবে।’ বুকে টোকা দিয়ে পাধানিকে দেখালেন। ‘আমরা দু’জন কয়েক বছর লড়েছি মাফিয়ার বিরুদ্ধে। তাদের সংগঠন কেমন এবং কী করবে, তা বুঝতে পারি। ওদের খুলে বলো, পাধানি।’

চাঁদের মত গোল মুখওয়ালা, বেঁটে ইতালিয়ান ব্যাখ্যা করল বর্তমান পরিস্থিতি। ‘একসময় প্রধান সব মাফিয়া পরিবারের সঙ্গে আস্ত সেনাবাহিনীর মত একা লড়েছেন মিস্টার রানা। অন্তত দশ বছর পিছিয়ে দেন তাদের। বর্তমানে মিলানের প্রধান দুই কাপোর একজন জুলিয়ো গ্যারিবাল্ডি। তার এক ধাপ ওপরে আছে রোমের জিয়ান্না ক্যান্টারায়া। আমরা জানি, আজ বিকেলে রোমে ডেট্রয়েট-এর এক কাপোর সঙ্গে মিটিং করেছে। ডিনার সেরেছে রিস্তোরেন্তে অ্যাদেসিওতে। বিমান বা ট্রেনে ভ্রমণ করতে অস্বস্তি বোধ করে

ক্যান্টারায়া। মাঝরাতের পর রওনা হয়ে গেছে লিমো নিয়ে। পিছনে আরেকটা গাড়িতে আসছে তার বডিগার্ডরা। অটোস্ট্রাডা ধরে আসছে মিলানে। পৌঁছুতে আন্দাজ ভোর সাড়ে পাঁচটা। তার মানে, সে পর্যন্ত মিস্টার রানাকে বাঁচিয়ে রাখা হবে। আমার মনে হয়, ক্যান্টারায়া আর গ্যারিবাল্ডি ধারণা করছে, মাফিয়ার শেকড় উপড়ে ফেলতে আবারও হাজির হয়েছেন মিস্টার রানা। কিন্তু তা কী করে করবেন, বা কেন আবারও পেছনে লেগেছেন, এসব জানতে চেয়ে নির্যাতন করবে তারা।'

সবার মুখ দেখে নিল পাধানি। 'আমরা জানি, মরলেও কিছুই বলবেন না মিস্টার রানা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অত্যাচার সহ্য করবেন। অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা পিছিয়ে দেবেন মাফিয়া নেতাদেরকে। তারপর খুব কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলা হবে তাঁকে। ফেলে রাখবে শহরের ব্যস্ত কোনও রাস্তায়। যাতে সবাই বুঝতে পারে, মাফিয়ার বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি কিছু করলে কী হয়।' হাতঘড়ি দেখল পাধানি। 'ধরে নিতে পারি, আমাদের হাতে আছে সব মিলে ত্রিশ ঘণ্টা।'

চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করেছে কর্নেলিস, উদ্বিগ্ন। 'তিরিশ ঘণ্টা অনেক সময়। রানাকে কোথায় রেখেছে জানলে অ্যাকশনে যেতে পারব। মাফিয়ার লোকদের মন অন্য দিকে সরিয়ে দেব। হামলা করব কালাহান, মউরোস আর আমি।'

হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন গুগলি। 'চাইলে কারাবিনিয়ারির অ্যান্টি-টেররিস্ট ইউনিট ঘিরে ফেলতে পারে ওই এলাকা। তাতে দুটো কারণে সর্বনাশ হবে। প্রথমত: আমাদের ইউনিটে যে পরিমাণ দুর্নীতি, অন্তত একঘণ্টা আগে সতর্কসঙ্কেত পেয়ে যাবে মাফিয়া। দ্বিতীয়ত: ওই ধরনের অপারেশনে যেতে চাইলে খুঁজে বের করতে হবে সৎ কোনও ম্যাজিস্ট্রেট বা জাজকে। তেমন লোক খুব কম। বেশিরভাগকে মেরে ফেলেছে ওরা।' আরেকবার

মাথা নাড়লেন। 'আমাদের অবস্থা পরিষ্কারভাবে বললাম।'

উঠে দাঁড়িয়ে বিজাতীয় সুরে ইংরেজি বলল মউরোস, 'আমরা কয়েকজন ছাড়া অন্য কাউকে দলে চাইছি না। আগেও সামাল দিয়েছি এসব। আমাদের কাজ হবে রানাকে সরিয়ে নিয়ে আসা। আপনারা খুঁজে বের করুন ও আছে কোথায়, পরের কাজ আমাদের।'

টেবিলে চোখ রেখে বসে আছে রামিন। প্রথমবারের মত মাথা তুলে তাকাল। ওর চোখ সরাসরি কর্নেলের চোখে। 'আরও কিছু তথ্য দরকার। গ্যারিবাল্ডির কোনও পরিবার নেই?'

পাধানির দিকে চাইলেন গুগলি।

তাঁর সহকারী জানাল, 'গ্যারিবাল্ডির বাবা-মা মারা গেছে। কোনও ছেলে-মেয়েও নেই। তার ভাই আর বোন থাকে নিউ ইয়র্কে। স্ত্রী থাকে বোলোগনায়। প্রায় বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। ছোট এক কাপোর সঙ্গে তার দৈহিক সম্পর্ক।' রামিনের দিকে চেয়ে বাঁকা হাসল পাধানি। 'ওই অ্যাংগেলে ভেবে লাভ হবে না।'

'আর ক্যাণ্টারায়া?' জানতে চাইল রামিন।

কাঁধ ঝাঁকাল পাধানি। 'তার স্ত্রী আছে, উপপত্নী অসংখ্য। মা ছাড়া আর কারও প্রতি কোনও ভালবাসা নেই তার অন্তরে।'

'তার মা কোথায় থাকে?'

প্রথমবারের মত সরু হাসি ফুটল কর্নেল গুগলির ঠোঁটে। রামিন কী ভাবছে বুঝে গেছেন। আগ্রহের সঙ্গে বললেন, 'ক্যাণ্টারায়ার মাকে সবাই ডাকে ক্যাণ্টারায়েলা। রোম থেকে উত্তর দিকে বিশ মাইল দূরের ছোট এক শহরে থাকে। ব্র্যাক্কিয়ানো ল্যাগো। বয়স্কা মহিলা, খুবই ধার্মিক। প্রতিদিন চার্চে গিয়ে প্রার্থনা করে, যাতে নরকের আগুন থেকে রক্ষা পায় তার ডাকাত-খুনি ছেলে। আমার মনে হয় না প্রার্থনা করে কোনও কাজ হবে।'

লাজুক ভূতের দিকে চেয়ে বলল রামিন, 'আজকের রাত দীর্ঘ

হবে। ঘুমাতে পারব না কেউ। আপনি কি দেখবেন আমাদের জন্যে পাস্তা আর ড্রিঙ্ক সরবরাহ করা যায় কি না?'

উঠে দরজা থেকে বেযমেন্টের উদ্দেশে কর্কশ হাঁক ছাড়ল লাজুক ভূত, 'খাবার আর ড্রিঙ্ক কই, অ্যাই পুরনো ময়দার বস্তা, দজ্জাল, কামচোর বুড়ি! খেয়াল নেই, শত্রু বধ করতে পেটে ভর দিয়ে মার্চ করে চলেছে ক্ষুধার্ত সৈনিকরা?'

অচেনা অনুভূতি সবার মনে। ওরা কঠোর লোক, অভিজ্ঞ, কিন্তু টের পেয়ে গেছে, ওদের সব মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে তরুণ রামিন রেযা।

প্রথমে রেমারিকের উদ্দেশে বলল ও, 'দেরি না করে ফিরে যাওয়া উচিত নেপলসে, সামনের কাজে আপনার কোনও ভূমিকা নেই। কাজে আসবেন সবার ভেতর বার্তাবাহক হিসেবে।' সিম কর্নেলিসের দিকে চাইল। 'আমরা ওদের দুর্গে হানা দেব না।' পাধানির উদ্দেশে বলল, 'ভোরের আগেই পৌঁছে যেতে চাই ব্র্যাক্কিয়ানো ল্যাগো শহরে। আমার সঙ্গে যাবেন কালাহান, মউরোস ও ফুলজেন্স। তুলে আনব ক্যাণ্টারায়ার মাকে। বদলে ছুটিয়ে নেব মাসুদ ভাইকে।' কর্নেল গুগলিকে বলল, 'কর্নেল, ভোরে একটা হুইলচেয়ার আর যাজকের পোশাক লাগবে।' পেঁচা ফুলজেন্সের দিকে তাকাল। 'কাজে নামবেন লারসেন।' লাজুক ভূতের উদ্দেশে বলল, 'আপনি চেনেন এই এলাকা। কর্নেলিসকে নিয়ে কাপোর আস্তানার কাছে অপেক্ষা করবেন। ব্র্যাক্কিয়ানো ল্যাগো শহরে গোলমাল বেধে গেলে, দেরি না করে যোগাযোগ করব। সেক্ষেত্রে তাদের আস্তানায় ঢুঁ দেবেন না। যা করার করবেন কর্নেলিস।' উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি শুরু করল রামিন। ডুবে গেছে গভীর চিন্তার ভেতর। আবারও কর্নেল গুগলির চোখে তাকাল। 'ভয়েস কমিউনিকেশন লাগবে। শুধু যে নিজেদের ভেতর কথা বলতে হবে, তা নয়, সরাসরি যেন যোগাযোগ করতে

পারি লাজুক ভূত বা সিমের সঙ্গে। আগামী কয়েক ঘণ্টার ভেতর যন্ত্রগুলো পাওয়া যাবে?'

মাথা দোলালেন গুগলি। চোখে হাসি। জীবনে অনেক ঝুঁকি নিয়েছেন, বসে আছেন অত্যন্ত বিপজ্জনক একদল অভিজ্ঞ যোদ্ধার মাঝে, কিন্তু বুঝে গেলেন, প্রায় কিশোর এক ছেলে হঠাৎ করেই নিয়ন্ত্রণ করছে সবাইকে। ভাগ্যের এই নাটকীয়তা হাস্যকর মনে হলো তাঁর। জানতে চাইলেন, 'আর কিছু লাগবে তোমার?'

'আশা করি লাজুক ভূত বেঈমান না, ওকে লাগবে আমার। আপনি ভাল করেই জানেন, কর্নেল, কী করব আমরা; কাজেই আপনার কাজ হবে কারাবিনিয়ারিকে দূরে সরিয়ে রাখা। মিলানে ট্রেস করা যাবে না এমন দুটো গাড়ি লাগবে কর্নেলিস আর লাজুক ভূতের। রোমে লাগবে দুটো। একটা আমার জন্যে, অন্যটা ব্যাক-আপ টিমের। রোমে কোনও আস্তানা দরকার। ধরে নিচ্ছি, মিলানের এই বাড়িকে বেস হিসেবে ব্যবহার করতে পারব। এ ছাড়া, চার্টার করতে হবে বিমান, যাতে তিন ঘণ্টার ভেতর আমার টিম নিয়ে পৌঁছুতে পারি রোমে। চার্টার বিমান হতে হবে প্রাইভেট কোম্পানির, কারাবিনিয়ারির নয়। ...সম্ভব?'

মাথা দোলালেন কর্নেল গুগলি। তখনই খুলে গেল দরজা। ওয়াইনের বোতল, গ্লাস, সসপ্যানে পাস্তা, প্লেট ইত্যাদি মস্ত বড় এক ট্রে-তে নিয়ে ভেতরে ঢুকল বয়স্কা মহিলা। অতি প্রাচীন মুখে চকচক করছে ফ্যাকো করা দু'চোখ, মুখে খুশির হাসি। এক চোখ ছাতে, অন্য চোখ লাজুক ভূতের ওপর। আদুরে, ফ্যাসফেঁসে কণ্ঠে বলল বুড়ি, 'আবারও পুরনো ময়দার বস্তা, দজ্জাল, কামচোর বুড়ি বলে ডেকেছ, প্রিয়তম! গভীর রাতে আসছি আমি, উঠব তোমার বিছানায়, বুঝিয়ে দেব আসলে আমি মোটেও বুড়ি হইনি!'

সুদর্শন ত্রিশ বছর বয়সী লাজুক ভূত, গোবি মরুভূমির মত শুকিয়ে গেল ওর গলা। দু'চোখে আতঙ্ক নিয়ে খুনখুনে বুড়িকে

দেখে, বুকে আঁকল ক্রুশ। হেসে উঠল সবাই।

সবাই খেতে বসলে প্ল্যান আরও নিখুঁত করতে কিছু বিষয়ে মনোযোগ দিল রামিন।

চৌত্রিশ

ঘরের কোণে রানার ওপর ঝলমলে উজ্জ্বল আলো ফেলেছে শক্তিশালী স্পটলাইট। বাতির পেছনের আঁধারে দুই বডিগার্ড। প্রতি দু'ঘণ্টা পর পর পালাবদল হচ্ছে প্রহরীদের। এদেরকে কঠোরভাবে বলে দেয়া হয়েছে, ওই লোককে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখলেও ঢিল দেয়া যাবে না পাহারায়— মাসুদ রানা মানেই হিমঠাণ্ডা রাতের স্বয়ং মৃত্যুদূত!

সতর্ক থাকা উচিত ছিল রানার। মস্ত ভুল করেছে একই হোটেলে উঠে। মোড়ে কোনও গাড়ি অপেক্ষা করছে কি না, দেখতে পারত। অবশ্য, চট্ করে বুঝে গিয়েছিল, কী করবে ওই লোকগুলো। এখন আর ভেবে লাভ নেই। ওই বিষয়ে নিজের সব দোষ স্বীকার করে নিয়েছে। এখন খচ্-খচ্ করছে না মন। চরম ক্লান্তিতে বুকে এসে ঠেকেছে থুতনি। প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে, অথচ সতর্ক মগজ। বহু দিনের প্র্যাকটিসের ফল।

আনমনে হাসল রানা। মনে মনে জোরসে মোচড় দিল দুই কানে। ব্যাটা হাঁদা, মার্সেইল্স্-এ লেকচার ঝেড়েছিলি রামিনের ওপর। ছেলেটার চেয়ে অনেক গুরুতর ভুল করেছিস তুই নিজে।

আচ্ছা, ইটালিতে পৌঁছে গেছে রামিন?

খুঁজছে ওকে?

ওর সঙ্গে থাকবে একদল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। পাশে তাদেরকে পেলে কৃতজ্ঞ হয়ে যেত যে-কোনও নেতা।

যাক্ ওসব।

এখন কথা হচ্ছে, কীভাবে ওই দলকে পরিচালনা করবে রামিন?

আবারও জিয়ান্না ক্যান্টারায়ার কথা ভাবল রানা। বহু কিছুই শুনেছে তার ব্যাপারে। দেশের উত্তর অংশের মাফিয়া নেতা সে। ক্যালাব্রিয়া বা সিসিলির নেতাদের মত বর্বর জানোয়ার নয়। ত্যাগ করেনি ড্রাগসের ব্যবসা। চাই নোংরা টাকা। কমবয়সী লোক ক্যান্টারায়া। অত্যন্ত নিষ্ঠুর, কিন্তু ব্যবসা থেকে সরিয়ে রেখেছে নিজের পরিবারকে।

রামিন কী বুঝবে বিষয়টা?

নইলে ওকে ব্যাখ্যা করে বোঝাবে রেমারিক বা গুগলি।

জোয়ারের মত প্রবল ব্যথার ঢেউ আছড়ে পড়ছে শরীরে। ওদিক থেকে মন সরিয়ে রানা ভাবল, ওরই শেখানো কৌশলে মার্সেনারিদের নেতৃত্ব হাতে তুলে নেবে রামিন। ওরই ছায়া দেখবে ওরা তার ভেতর।

জেনির কথা মনে এল রানার। ছোট ভাই টম আর বড় ভাই রামিনকে গোজোতে পেয়েছিল মেয়েটি, নইলে সহজ হতো না ওর পক্ষে সুস্থ হয়ে ওঠা। টম থাকবে ওখানে, কিন্তু ইটালিতে চলে এসেছে রামিন। কী করবে কে জানে!

আবারও ভাবল রানা ক্যান্টারায়ার কথা। ড্রাগ্স্, মানুষকে নিরাপত্তা দেয়া, দুর্নীতি ও বাহ্যত আইনী সব নির্মাণ কাজে ব্যস্ত সে। গ্যারিবাল্ডির মত মেয়েমানুষের ব্যবসা করে না। খুব খুশি হবে ওকে নিজ হাতে খুন করতে পারলে। সেক্ষেত্রে টেক্কা দিতে

পারবে রোমের অন্য কাপোদেরকে।

মুখোমুখি হবে জিয়ান্না ক্যান্টারায়ার, বুঝতে পারছে রানা।

পঁয়ত্রিশ

প্রবল মানসিক চাপে আছে রামিন রেযা। জানে, ওর ব্যক্তিত্ব এবং মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে ওর সম্পর্কের কারণে আপাতত এই দলের নেতা হিসাবে ওকে মেনে নিয়েছে অন্যরা। প্রত্যেকে তারা দক্ষ যোদ্ধা। ওর কোনও ভুল হলে ঠিকই তা চোখে পড়বে। মুখে কিছু না বললেও ভাববে, রানার যোগ্য সহকারী নয় রামিন। সেই নীরব অপমান সহ্য করতে পারবে না ও। এর চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল।

ভেসে নেমে এসে রানওয়ের মেঝে স্পর্শ করল লিয়ার জেট বিমান। আবহাওয়া অফিস থেকে জানানো হয়েছে, শীতল কিন্তু রোদেলা দিন হবে রবিবার।

এখন ভোর চারটে।

শহর থেকে পনেরো মাইল দূরের এই ছোট্ট এয়ারপোর্টে নামে দেশের ছোট সব চার্টার বিমান। রামিনকে জানিয়ে দিয়েছেন কর্নেল গুগলি, আমলাতন্ত্রের প্রভাব এই আকাশ-বন্দরে কম। পিঠে রঙিন বাতিওয়ালা ছোট একটি গাড়ি পথ দেখাল লিয়ার জেট বিমানকে, ওটাকে রাখল ফ্লাড লাইটের আলোয় ভরা এক

হ্যাঙারে।

বিমানের পাশে থামল দামি লিমাযিন।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসার এক মিনিট পর ওদের হাতে তুলে দেয়া হলো ব্যক্তিগত ব্যাগেজ। ভেতরে রয়েছে অস্ত্রশস্ত্র।

একঘণ্টা পর ওরা পৌঁছল রোম শহরের বাইরে এক সেফ হাউসে। আগের মতই, শহরতলীর সাধারণ বাড়ি। দরজা খুলল আরেক বুড়ি। চেহারা দেখে মনে হলো না, এত ভোরে পাঁচজন লোক দেখে অবাক হয়েছে।

ডাইনিং রুম পেরিয়ে কিচেন। ওখানে টেবিলের ওপর যাজকের পোশাক ও ব্র্যাক্কিয়ানো ল্যাগো শহরের ম্যাপ। পাশেই হুইল চেয়ার। ম্যাপে কালি দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে, কীভাবে ওই শহর থেকে ফিরতে হবে এই সেফ হাউসে।

কিচেন টেবিল ঘিরে বসল রামিন ও অন্যরা। এক জগ কফি তৈরি করে দিল বুড়ি। নতুন করে ওর পরিকল্পনার খুঁটিনাটি দিক নিয়ে কথা বলল রামিন।

ওর কথা শেষ হলে কালাহান বলল, 'ভাল আর সহজ প্ল্যান। কিন্তু একটা ব্যাপারে দুলছে মন।' পিটার লারসেনের দিকে তাকাল সে। 'পিটারকে সামনে রাখছি আমরা। কিন্তু ওর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নেই। মউরোস, পেঁচা বা আমি ওই ভূমিকা নিলে ভাল হতো না?'

মাথা নেড়ে হাসল রামিন। 'যে কারণেই হোক, যাজক বলে মনে হয় পিটার লারসেনকে। বেশিরভাগ পুরোহিত, মৌলভি বা যাজক ধর্ম ভাঙিয়ে মানুষের কাছ থেকে প্রচুর রোজগার করে। ভাল ভাল চর্ব্যচোষ্য খাবার খেয়ে ওরই মত মোটা হয়েছে। ...আমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে, ওখানে থাকবে একজন গার্ড। বেশিও থাকতে পারে। প্রথম গার্ডের চেহারার বর্ণনা আমরা পেয়েছি। মহিলা চার্চের ভেতরে ঢুকলে বাইরে অপেক্ষা করে সে।

কালাহান, মহিলা যখন বেরিয়ে আসবে, তখন আপনি ওই গার্ডের পাশে থাকবেন। দুই গাড়ির একটায় থাকবেন মউরোস। আমি মহিলাকে কিডন্যাপ করলেই কালাহানকে তুলে নেবেন তিনি। চাই না খুন করতে হোক গার্ডকে। অবশ্য, বাধ্য হলে দেরি করবেন না কালাহান।'

'ধরে নিচ্ছি, ওই লোককে খুন করতে বাধ্য হবে কালাহান,' বলল মউরোস, 'ভুলে গেলে চলবে না, ওই লোক পাহারা দিচ্ছে ক্যান্টারায়ার মাকে। কেউ চোখের সামনে দিয়ে মহিলাকে কিডন্যাপ করলে এমনিতেও মরতে হবে তাকে।'

'হয়তো,' বলল রামিন। 'কিন্তু এ-ও মাথায় রাখতে হবে, বেশ কয়েক বছর ধরে ওই কাজ করছে সে। কেউ ভাবেনি কিডন্যাপ হবে মহিলা। কাজেই অতিরিক্ত সতর্ক থাকবে না সে। হয়তো মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করতে পারবেন কালাহান।' পেঁচা ফুলজেন্সের দিকে তাকাল রামিন। 'অন্য গাড়িটা আপনি চালাবেন। তৈরি থাকবেন, যাতে পিটার লারসেন, বুড়ি মহিলা আর আমাকে চট্ করে তুলে নিতে পারেন।' সবার ওপর দিয়ে ঘুরে এল ওর চোখ। 'আমাদের সঙ্গে থাকবে শুধু হ্যাণ্ডগান। ব্র্যাক্কিয়ানোর দিকে যাওয়ার পথে পুলিশের কোনও রোড-ব্লক পড়লে যেন লুকিয়ে ফেলতে পারি।'

প্রথমবারের মত মুখ খুলল পেঁচা, 'ফেরার সময় রোড-ব্লক পড়লে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রামিন। 'গুলি করতে করতে বেরিয়ে যাব। সুযোগ থাকলে আরও চিন্তা-ভাবনা করে প্ল্যান করতাম। কাছে রাখতাম সেফ হাউস।' হাতঘড়ি দেখল ও। 'হাতে যথেষ্ট সময় নেই। চমক ও গতির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে আমাদের। যাওয়ার পথে এবং ফেরার সময় রাস্তায় প্রচুর গাড়ি থাকবে। বাধ্য না হলে রোড-ব্লক করবে না পুলিশ।' পায়ের কাছে ব্যাগের চেইন

খুলে ওটা থেকে ট্র্যান্সিভার বের করে সবার হাতে ধরিয়ে দিল।

পরীক্ষা করে দেখল সবাই।

বাটন টিপে সিম কর্নেলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইল রামিন। শুনল কর্কশ ও বেসুরো কণ্ঠ। বিকৃত, কিন্তু বোঝা যায় বক্তব্য।

মাইক্রোফোনে বলল রামিন, 'একঘণ্টার ভেতর রওনা হচ্ছি। পযিশনে থাকুন সকাল নয়টায়। যোগাযোগ রাখুন।'

'ঠিক আছে, গুড লাক,' বলল সিম কর্নেলিস।

ছত্রিশ

আলাপের ভঙ্গিতে কথা হচ্ছে। জুলিয়ো গ্যারিবাল্ডি মনোযোগ দিয়ে শুনছে জিয়ান্না ক্যাণ্টারায়ার কথা।

বলে চলেছে বটে মাফিয়া কাপো, কিন্তু তার মনোযোগ মাসুদ রানার ওপর। 'আঠারো ঘণ্টা,' বলল ক্যান্টারায়া, 'এর বেশি কেউ না। ওই ফ্রেঞ্চ ছিল ইউনিয়ন কর্সের সদস্য। দামি এক শিল্পকর্ম আমার কাছ থেকে চুরি করতে গিয়ে তিন বছর আগে ধরা পড়েছিল আমার এলাকায়। ঠিক করি, উপযুক্ত শাস্তি দেব। তার ওপর কাজ করতে দিই সেরা দু'জনকে। কাজের ছেলে ওরা, পোপকে হাতে পেলে আধঘণ্টার ভেতর তার মুখ থেকে অনর্গল বের করত, "প্রভু আবার কীসের ঈশ্বর! আপনারাই আমার ঈশ্বর!" পুরো আঠারো ঘণ্টা টিকল সে। অবাক হয়ে গেলাম

সবাই।' রানাকে দেখল ক্যান্টারায়া। 'তুমি নিশ্চয়ই অত বোকা নও? বোঝোই তো, শেষে কী অপেক্ষা করছে।'

মস্ত হাই তুলল রানা, সামনে ঝুঁকে বসে বলল, 'ক্যান্টারায়া, তোমার সঙ্গে কোনও বিরোধ নেই আমার। তুমি বা তোমার দলের কারও সঙ্গে লড়তে ইতালি আসিনি। নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলাম, এমন সময় রাস্তা থেকে আমাকে তুলে এনেছে ওই জোকার। এখন যদি ছেড়ে না দেয়, কষ্ট পেয়ে মরবে ও। তুমি যেহেতু ওর বস, কাজেই মরতে হবে তোমাকেও।'

নিষ্ঠুর হাসি হাসল ক্যান্টারায়া। 'হুমকি দেয়ার অবস্থায় নেই তুমি, বাপু। চুপ থাকো। কিছু জানতে চাইলে জবাব দেবে।' রেগে গেছে মাফিয়া নেতা। 'আমার দুলাভাই আর চাচাত ভাইকে মেরে ফেলেছিলে।'

'তোমার চাচাত ভাই? কী নাম?'

'নাম জানার দরকার নেই, ও ছিল আমার দুলাভাইয়ের সৈনিক। রোমে ওই ক্যাডিলাক গাড়িতে দুলাভাই আর অন্য দুই সৈনিকের সঙ্গে পুড়ে মারা যায় সে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'সেক্ষেত্রে মরেছে নিজের কাজ করতে গিয়ে। ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল না আমার। আমি বড়জোর ছিলাম তোমাদের ঈশ্বরের পাঠানো মৃত্যুদূত।'

ঘোঁৎ শব্দ বেরোল ক্যান্টারায়ার নাক থেকে। 'এই ধরনের মৃত্যুদূত আমরা পছন্দ করি না। কেউ আমাদের বিরুদ্ধে লড়লে কখনও ভুলি না: সে শত্রু। কাজেই প্রতিশোধ নেব। তবে তার আগে মুখ খুলতে হবে তোমাকে।'

কাঁধের আড়ষ্টতা দূর করতে চাইল রানা। নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কী বিষয়ে কথা বলতে চাও?'

'জানতে চাই: তুমি কেন ইতালিতে? কী চাও? সঙ্গে কে বা কারা আছে? তোমার বেয ইতালির ভেতরে আর বাইরে কোথায়?'

ক্যাণ্টারায়াকে অবাক করে দিয়ে মুখ খুলল রানা, 'ইতালির বেয সম্পর্কে বলতে কোনও আপত্তি নেই আমার।'

বিস্মিত চোখে পরস্পরকে দেখল ক্যাণ্টারায়া ও গ্যারিবাল্ডি।

'কিন্তু কথা বলব শুধু তোমার সঙ্গে, ক্যাণ্টারায়া,' বলল রানা, 'অন্যদেরকে চলে যেতে হবে ঘর ছেড়ে।'

'ভুলে যাও,' দেরি না করে বলল গ্যারিবাল্ডি।

ক্যাণ্টারায়ার চোখে তাকিয়ে আছে রানা।

পেরিয়ে গেল দীর্ঘক্ষণ, তারপর বলল ক্যাণ্টারায়া, 'জুলিয়ো, কয়েক মিনিট সময় দিতে হবে। আমি খুশি হব।'

অনুরোধের মত করে কথাটা বললেও আসলে ওটা অলঙ্ঘ্য নির্দেশ।

রাগী চোখে রানাকে দেখল গ্যারিবাল্ডি, গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ফাঁদ পেতে শিকার ধরতে চাইছে এই কুকুরের বাচ্চা! খুব কুটিল মন। আশা করি বুঝছেন, কত বড় ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রকারী? ওর কারণে খুন হয়ে গেছে আমাদের দলের বড় বড় নেতারা।'

মাথা দোলাল ক্যাণ্টারায়া। 'ঠিকই বলেছ, জুলিয়ো। অন্তর থেকে বিশ্বাস করি তোমার কথা। এক পলকের জন্যেও ওকে সুযোগ দেব না। কিন্তু ওকে মেরে ফেলার আগে কয়েক মিনিট কথা বললে হয়তো আমরাই উপকৃত হব।'

আবারও নীরবতা নামল ঘরে। ক্যাণ্টারায়া চুপ করে আছে দেখে ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল গ্যারিবাল্ডি। নিজের দুই বডিগার্ডের দিকে মাথার ইশারা করল। সাবমেশিন-গান হাতে ঘর ছেড়ে চলে গেল তারা। গ্যারিবাল্ডি ইমিডিয়েট বসের কাছে জানতে চাইল, 'আপনার সঙ্গে অস্ত্র আছে তো?'

'না,' জবাবে বলল ক্যাণ্টারায়া, 'বাধ্য না হলে সঙ্গে রাখি না।'

কোটের পকেটে হাত ভরে পিস্তল বের করল গ্যারিবাল্ডি, সেফটি ক্যাচ অফ করে যন্ত্রটা রাখল টেবিলে ক্যান্টারায়ার সামনে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ওর হাত-পা বাঁধা... তবু সতর্ক থাকুন।'

মৃদু হেসে বলল ক্যান্টারায়া, 'বন্ধু, এতদিন বেঁচে আছি, কারণ খুব সতর্কই থাকি। আশা করি, অনেক বয়সে বিছানায় মৃত্যু হবে আমার। ...কথা শেষ হলে তোমাকে ডেকে নেব।'

একবার কঠোর চোখে রানাকে দেখে নিয়ে ঘর ছাড়ল গ্যারিবাল্ডি। স্থির করেছে, এমন নির্যাতন করে মারবে ওই বাঙালি শালাকে, এমন কী চমকে যাবে ক্যান্টারায়াও।

সাঁইত্রিশ

পাশেই পুত্রবধূ লুসি, কিচেনের প্রশস্ত জানালা দিয়ে ফসলের মাঠ দেখছেন অনোরিয়া তাজা। নিচু স্বরে বললেন, 'এই মেয়ে এতই মুগ্ধ করবে, ওকে অন্তর থেকে ভালবাসবে ওর স্বামী।'

মাঠে রোটোভেটর নিয়ে ব্যস্ত পাজেরো তাজা। পাশেই জেনি, হাসতে হাসতে কীসব যেন বলছে। রোটোভেটরের ইঞ্জিনের আওয়াজে প্রায় বধির হওয়ার দশা, তবে স্বামীর উঁচু কণ্ঠের কথা শুনলেন অনোরিয়া। উনি বুঝিয়ে বলছেন, কী কারণে এত জরুরি হয়ে উঠল চাষ দেয়া। তাঁর সঙ্গে চলেছে জেনি। মাঠের শেষ কোণে পৌঁছে যন্ত্রটা বন্ধ করলেন পাজেরো। পকেট থেকে

ক্যানভাসের ব্যাগ বের করে ওটা থেকে নিলেন তামাক। নিচু দেয়ালে তাঁর পাশে বসে আলাপ জুড়ল জেনি। ছোট্ট গ্লাসে শীতল ওয়াইন ঢেলে ওর হাতে ধরিয়ে দিলেন প্রৌঢ়।

'মা, ঠিকই বলেছেন,' সায় দিল লুসি। 'মাত্র একদিনের ভেতরে ওর ভক্ত হয়ে গেছে বাবা, নিডো আর টম। ও ইশারা করলে এখন উঠবে-বসবে ওরা তিনজন। প্রশ্ন হচ্ছে, মাসুদ ভাইকে ওভাবে মুঠোর ভেতর নিতে পারবে কি না।'

কিছুক্ষণ ভেবে বললেন অনোরিয়া, 'বোধহয় না। রামিনকে একেবারেই না। আসলে ওরা বড় ভাই, বেশি আস্কারা দেবে না।'

'মাসুদ ভাই ফিরবেন তো,' শঙ্কা নিয়ে বলল লুসি, 'হাতের মুঠোয় পেলে, মাফিয়া চাইবে প্রতিশোধ নিতে।'

'তা চাইবে, কিন্তু কঠিন হবে ওকে শেষ করে দেয়া,' বললেন অনোরিয়া। 'রামিন খুঁজে বের করবে রানাকে। ঠিকই ফিরে আসবে ওরা এখানে।'

দু'জন শুনতে পেল, ফসলের মাঠের নিচু দেয়ালে বসে জিজ্ঞেস করল জেনি, 'কত দিন আগে এই খামার করেছেন, আঙ্কেল?'

কিশোরী মেয়েটার দিকে চেয়ে হাসলেন পাজেরো। 'শত শত বছর ধরেই এই জমি আমার পূর্বপুরুষের।' গাছ ভরা পাকা টমেটো দেখালেন। 'আমি অবশ্য পাগলের মত কাজ করি। প্রতিদিন বারো থেকে চোদ্দ ঘণ্টা। আগামী সপ্তাহে বাজারে তুলব ওগুলো, পাব বড়জোর পঁয়ত্রিশ লিরা। সার, কীটনাশকের খরচ আর আমার পরিশ্রম প্রতি ঘণ্টায় মাত্র কয়েক সেণ্ট করে ধরলেও, দেখা যাবে পণ্ডশ্রম করছি আমি।'

'তা হলে খামার করছেন কেন?'

'ওটা আছে রক্তে,' বললেন পাজেরো। 'ওই একই জিনিস থাকে গোযিটানদের রক্তে। যখন হাতে পাব ওই পঁয়ত্রিশ লিরা,

মনে হবে মস্ত বড়লোক হয়ে গেছি। আরও একটা ব্যাপার আছে। যত সবজি টেবিলে দেখো, সব জন্মেছে আমাদের মাঠে। এ ছাড়াও মুরগি, ডিম, খরগোশ, হাঁস, ছাগল বা গরু— কোনও কিছুরই অভাব নেই। সবই আসছে খামার থেকে। তাতে যে সন্তুষ্টি মনে আসে, তুলনা নেই তার। আগামীকাল থেকে দুনিয়ার সব দোকান বন্ধ হয়ে গেলেও আমার কচুও যাবে-আসবে না। না খেয়ে মরবে না আমার পরিবার।' ওয়াইনের বোতল মুখে তুলে চুমুক দিলেন পাজেরো। ওটা ধরিয়ে দিলেন জেনির হাতে। 'তৃষ্ণায় কষ্ট পেতে হবে না... খামারে আছে ঝর্না। আঙুর গাছেরও অভাব নেই, যখন খুশি তৈরি করে নিতে পারি ওয়াইন।'

এক ঢোক ওয়াইন নিয়ে পাজেরোর দিকে চেয়ে হাসল জেনি। 'খুবই ভাল ওয়াইন। বুঝি, কত মজা লাগে আপনার।'

মাথা দোলালেন পাজেরো। 'অনেক কষ্টের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে তোমাকে, হয়তো তাই বোঝো। হাজার বছর ধরে আমরাও অনেক যুদ্ধ ও বিপদের ভেতর দিয়ে গেছি। বার-বার হামলা করেছে শত্রুরা। ধরে নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে আমাদেরকে বহু দূরের দেশে। শেষ যুদ্ধের সময় খুব ছোট ছিলাম। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সব দোকান।' সবুজ ফসলের খেত দেখালেন তিনি। 'তখন বাবা আর চাচার সঙ্গে কাজ করতাম মাঠে। আমরা কিন্তু না খেয়ে থাকিনি। যা রয়ে যেত, পাঠিয়ে দেয়া হতো মাল্টায় ক্ষুধার্ত মানুষের জন্যে।'

'তা হলে সত্যিই আপনি সুখী মানুষ?' জানতে চাইল জেনি।

ওর হাত থেকে বোতল নিয়ে চুমুক দিলেন পাজেরো, জবাব দেয়ার আগে ভাবতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'কিছু কিছু দিক থেকে আমি সুখী। সুন্দরী আর শক্তপোক্ত বউ আছে আমার, গর্ব করার মত ছেলে আর পুত্রবধূ আছে। ওই মেয়ে আমাকে দেবে নাতি-নাতনি। আরও আছে রেমারিক আর রানা। ওরা যেন

আমাদের বুড়ো-বুড়ির সন্তান। আর আছে রামিন ও টম। ওরাও আমাদের সন্তান।' জেনির মাথায় কড়া পড়া হাত রেখে আলতো চাপড় দিলেন তিনি। 'আর এখন মনে হয়, আবারও ফিরে পেয়েছি আমার মেয়েকে। এতে আমি খুবই খুশি। কিন্তু আমার দুই হারিয়ে যাওয়া মেয়ের জায়গা পূরণ করতে হবে তোমাকে। কাজটা কঠিন হয়ে যাবে তোমার জন্যে। খুব ভাল মেয়ে ছিল ওরা।'

পাহাড়ের কোলে বসে থাকা খামারবাড়ি দেখল জেনি। অনোরিয়া আর লুসি বসে আছে বারান্দায়। খুব নিচু স্বরে বলল জেনি, 'জেসমিন আর ভায়োলার কথা জানি। বলেছে রামিন ভাইয়া। কখনও তাঁদের জায়গা নিতে পারব না। সারিয়ে দিতে পারব না আপনার মনের ক্ষত।' ঘুরে পাজেরো তাজার চোখে তাকাল জেনি। 'এটা বলতে পারি, অন্তর থেকে ভালবাসব আপনাদেরকে। এর বেশি কিছু বলা উচিত হবে না।'

নিচু দেয়াল থেকে নেমে পেছন দিক চাপড়ে ধুলো ঝাড়লেন পাজেরো, রওনা হয়ে গেলেন রোটোভেটর লক্ষ্য করে। 'এসো, আরেকটা মাঠের কাজ শেষ করে ফেলি। তারপর যাব এক বন্ধুর ওখানে।'

'আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?' জানতে চাইল জেনি।

মাথা দোলালেন পাজেরো। 'কেন নয়?'

আটত্রিশ

এক শ' গজ দূরে গির্জার চত্বরে হুইলচেয়ারে বসে আছে রামিন। উরুর ওপর কম্বল, তার ওপর মোটা বই। হুইলচেয়ারের পেছনে পিটার লারসেন, পরনে যাজকের জমকালো পোশাক। দু'জনের কানেই হিয়ারিং এইড।

সকাল নয়টা বাজতে দুই মিনিট বাকি, এমন সময় চার্চের সামনে থামল পুরনো কিন্তু যত্নে রাখা কালো একটি ল্যান্সিয়া গাড়ি। লাফ দিয়ে সিট ছেড়ে নেমে পড়ল ড্রাইভার, খুলে দিল পেছনের দরজা। বেরিয়ে এলেন বয়স্কা এক মহিলা। ড্রাইভার তাঁকে সাহায্য করতে চাইলেও হাতের ইশারায় মানা করলেন। লাঠির সাহায্য নিয়ে উঠতে লাগলেন সিঁড়ির ছোট ছোট ধাপ। তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন এক যাজক। বাহু ধরে মহিলাকে নিয়ে গেলেন গির্জার ভেতর। আবারও গাড়িতে চেপে বসল ড্রাইভার, আঙিনা পেরিয়ে থামল ছোট এক ক্যাফের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে ক্যাপুচিনো কফি নিল সে।

আঙিনায় চোখ বোলাল রামিন, তারপর বই তুলে ওটার উদ্দেশে খুব নিচু স্বরে বলল, 'মাত্র একজন। আগের মতই। তাকে দেখতে পেয়েছেন?'

হিয়ারিং এইড-এ কালাহানের কণ্ঠ: 'হ্যাঁ, দেখেছি।'

'ত্রিশ মিনিট পর,' বলল রামিন। একবার দেখল পিটার

লারসেনকে।

কোব্ল পাথরের মসৃণ চত্বরে পবিত্র মনের যাজকের মতই হুইলচেয়ার ঠেলতে লাগল ডেনিশ পুলিশ অফিসার, চলেছে ক্যাফের দিকে।

উনচল্লিশ

মাফিয়া কাপোর চেহারায় কোনও প্রতিক্রিয়া হয় কি না দেখছে রানা, টেবিলের ওদিক থেকে ধীরে ধীরে বলল, 'দ্য ডায়মণ্ড রিং।'

ভাবলেশহীন ক্যাণ্টারায়ার মুখ, একটু বিস্মিত কালো দুই চোখ। আনমনে প্রশ্নের সুরে বলল, 'দ্য ডায়মণ্ড রিং?'

চুপ করে আছে রানা, দেখছে কাপোকে।

আবারও উচ্চারণ করল ক্যাণ্টারায়া: 'দ্য ডায়মণ্ড রিং?' কয়েক সেকেণ্ড পর সামান্য মাথা দোলাল। 'সম্ভবত কোনও গুজব। মনে হচ্ছে কয়েক বছর আগে শুনেছি ওই নাম। বাস্তবে ওরা আছে কি না, জানা নেই।'

সহজ সুরে বলল রানা, 'হ্যাঁ, ওরা আছে। আর সেজন্যেই ইতালিতে এসেছি।'

দু'পক্ষের আলাপ চালু হতেই যেন শুরু হয়েছে পোকার খেলা। দুই খেলোয়াড় বুঝতে চাইছে প্রতিপক্ষের হাতে কী তাস। চুপ করে থাকল রানা।

'ওরা যদি থেকেও থাকে, তাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই

কোসা নস্ট্রার,' কিছুক্ষণ পর বলল ক্যান্টারায়া।

হাত-পা প্রায় অবশ রানার। হাতের আঙুল নাড়তে গিয়ে টের পেল, বোঝা যাচ্ছে না ওটা আছে কি না। ঝাঁকিয়ে কাঁধের আড়ষ্টতা দূর করতে চাইল। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'তা জানি। ওদের সঙ্গে মাফিয়ার সম্পর্ক থাকলে এতক্ষণে এখানে থাকতে না। হাত-পা বেঁধে রোমে নিয়ে যেতাম তোমাকে।'

পাত্তা না দেয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ক্যান্টারায়া। 'দ্য ডায়মণ্ড রিং সম্পর্কে কী জানো?'

'বলতে আপত্তি নেই,' বলল রানা, 'তবে, আগে তোমাকে বলতে চাই জিয়ান্না ক্যান্টারায়া সম্পর্কে।'

অবজ্ঞার হাসি হাসল কাপো, হাতের ইশারা করল। 'বলো।'

যতটা পারে সামনে বেড়ে বসল রানা। শুরু করল, 'রোমে মাফিয়ার সামান্য সৈনিক ছিল জিয়ান্না ক্যান্টারায়া। তারপর তার বোনকে বিয়ে করল আতুনি বেরলিংগার। যে কি না ছিল রোম ও উত্তর ইতালির কাপোদের নেতা। ওই বিয়ের কারণে কপাল খুলে গেল ক্যান্টারায়ার। হয়ে উঠল গুরুত্বপূর্ণ একজন লেফটেন্যান্ট। যদিও বেরলিংগার তাকে কখনও প্রাপ্য সম্মান দেয়নি।'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্যান্টারায়া, ঠোঁটে সেই অবজ্ঞার হাসি।

বলে গেল রানা, 'কিন্তু কয়েক বছর আগে, বেরলিংগারের অধীনস্থ মিলানের কাপোদের নেতা হিনো ফনটেলা কিডন্যাপ করল এক কিশোরী মেয়েকে। তাকে রক্ষা করতে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হলাম। ওদের হাতে মারা গেল মেয়েটা। সে কারণে সুস্থ হয়ে হিনো ফনটেলা এবং তার লেফটেন্যান্টদেরকে খুন করলাম। ভয়ঙ্কর খেপে গিয়েছিলাম। এতই যে, মাফিয়ার সর্বোচ্চ নেতাকেও ছাড়িনি। আতুনি বেরলিংগার এবং তার লেফটেন্যান্টদেরকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিলাম। কিন্তু ছেড়ে দিলাম তোমাকে।'

‘তা জানি,’ ধৈর্যের সঙ্গে বলল ক্যাণ্টারায়া।

‘হ্যাঁ, জানো, কিন্তু আরও কিছু ব্যাপার জানো না। ছাড়লাম না পালারমোর ডন বাকালা আর তার সব লেফটেন্যাণ্টকে। এরপর খবর ছড়িয়ে গেল, আমি মারা গেছি।’

মাথা দোলাল ক্যাণ্টারায়া। ‘সাহায্য পেয়েছিলে ঘনিষ্ঠ বন্ধু কর্নেল গুগলির।’

‘তা ঠিক। ডন বাকালা খুন হয়ে যাওয়ায় প্রতিশোধ সমাপ্ত হলো আমার। কাজেই তোমার প্রতি বা কোসা নস্ট্রার বিষয়ে থাকল না কোনও ঘৃণা।’

শীতল হাসল ক্যাণ্টারায়া। ‘প্রতিশোধ-স্পৃহা দূর করতে চাই অন্তত দু’জনকে। আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছ তুমি। কাজেই প্রতিশোধ নেব আমরা। এবার আর নকল মৃত্যু হবে না, বিশ্বাস রাখো আমার ওপর।’

মৃদু হাসল রানা। ‘আমি বোকা লোক নই, ক্যাণ্টারায়া। তোমাদের ব্যাপারে কিছুই জানি না, তা ভেবো না। গত কয়েক বছরে পাল্টে গেছে পরিস্থিতি। তুমি উঠে এসেছ রোম ও উত্তর ইতালির কাপোদের ছাড়িয়ে ওপরে। কিন্তু কখনোই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবে না ক্যালাব্রিয়া, নেপলস বা সিসিলিকে। উত্তর দিকে আছ তুমি, দক্ষিণে আরেকজন। উত্তরে তুমি সভ্য হয়ে উঠতে চাইছ, আশা করছ ধীরে ধীরে সমাজের কাছ থেকে পাবে সম্মান। সময় হলে তখন হয়তো সত্যিই তা পাবে। কিন্তু গ্যারিবাল্ডির মত লোক সঙ্গে নিয়ে তা অসম্ভব। গত যুগের লোক সে।’

কিছুই পাত্তা দেবে না এমন ভঙ্গি নিয়ে রানার কথা শুনছে ক্যাণ্টারায়া, কিন্তু তার চোখে আগ্রহের ছাপ দেখল রানা। আবারও মুখ খুলল, ‘জিয়ান্না ক্যাণ্টারায়া অন্য জাতের নেতা। হ্যাঁ, সে ড্রাগসের ব্যবসা করে, বা যারা বিক্রি করে, তাদের কাছ থেকে

চাঁদা নেয়; নিরাপত্তা দেয়ার জন্যেও টাকা আদায় করতে কসুর করে না, কিন্তু তার বেশিরভাগ টাকা আসছে রাজনৈতিক নেতা এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে।' একটু চিন্তান্বিত হয়ে উঠল রানার কণ্ঠ: 'কিন্তু মেয়েমানুষের ব্যবসা তুমি করো না। পতিতালয় থেকে সরিয়ে রেখেছ নিজেকে। বাধ্য হলে খুন করো, কিন্তু দক্ষিণ বা সিসিলির জানোয়ারদের মত করে নয়। সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে খুনি লেলিয়ে দাও না। তুমি মেয়েদের খুন করো না, বা তাদের ব্যবহার করো না।'

নীরবতা নামল ঘরে। কয়েক সেকেণ্ড পর মাত্র দুটো শব্দ উচ্চারণ করল ক্যান্টারায়া, 'তাতে কী?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কাজেই আশা করি দ্য ডায়মণ্ড রিঙের বিষয়ে মুখ খুলবে তুমি। ওরা নষ্ট করছে কোসা নস্ট্রার সম্মান।'

থমথম করছে ঘর।

অপেক্ষা করতে গিয়ে রানা বুঝল, এই ইতালিয়ান লোকটা কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে, তার ওপর নির্ভর করছে ওর জীবন।

আরও ক'সেকেণ্ড পর জিজ্ঞেস করল ক্যান্টারায়া, 'সম্মান কেন নষ্ট হবে?'

প্রথম সেতু পেরিয়ে গেছে, টের পেল রানা। 'কোসা নস্ট্রা আর তোমার সম্মানে আঠার মত সেঁটে যাচ্ছে দ্য ডায়মণ্ড রিঙের ওই নোংরা কালিমা। এবং তা হচ্ছে, কারণ নিজের এলাকায় ওদেরকে নিশ্চিন্তে ব্যবসা করতে দিচ্ছ।'

রেগে গেছে ইতালিয়ান।

রানা টের পেল, পেরিয়ে গেছে দ্বিতীয় সেতু।

'আসলে কী বলতে চাও তুমি?' দাঁত খিঁচিয়ে জানতে চাইল ক্যান্টারায়া। 'ওসব সামান্য গুজব। ওরকম কোনও সংগঠন আছে কি না, তা-ও প্রমাণ করতে পারেনি কেউ। আমার ধারণা, দ্য ডায়মণ্ড রিং নামে আসলে কিছুই নেই।'

এবার জোর দিয়ে বলল রানা, ‘আছে। ওরা আছে তোমার এলাকা এবং গোটা ইতালি জুড়ে। আমি ওদের খুঁজে বের করে শেষ করতে চাই।’

‘কী কারণে?’

‘আমি ওদেরকে ঘৃণা করি।’

‘কী জন্যে?’

‘আমি ওদের পাশবিক নোংরামি দেখেছি।’

‘তারা কী করেছে যে শেকড় থেকে উপড়ে ফেলতে চাও?’

‘নিষ্পাপ, সুন্দরী যুবতীদের কিডন্যাপ করার সঙ্গে জড়িত এরা। ভুল না হয়ে থাকলে, নানান দেশের বড় শহরের অভিজাত এলাকায় তাদের আছে বিলাসবহুল পতিতালয় ও ড্রাগ্স্ বিক্রির সেণ্টার। যে সংগঠনে কাজ করি, সেখানে আমার এক সুযোগ্য বন্ধু তাদের বিষয়ে খোঁজ বের করছে। এরই ভেতর জানা গেছে, এসব পশ পতিতালয় আর ড্রাগসের জয়েণ্টে নিয়মিত যাচ্ছে ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক নেতা ও বড় ব্যবসায়ীদের খরুচে, লম্পট ছেলেরা। প্রচুর ঘুষ পাচ্ছে সরকারী আইনী সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। তারা সব দেখেও দেখছে না অসহায় মেয়েদের বিক্রি বা কেনার সঙ্গে কীভাবে জড়িত দ্য ডায়মণ্ড রিং, বা কীভাবে ড্রাগ্স্ ব্যবহার করে ধ্বংস করে দিচ্ছে নিরীহ মেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। ছিবড়ে করে দিচ্ছে তাদের শরীর ও মন। এরপর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে মেরে ফেলছে। লাশ পাওয়া যাচ্ছে সাগর-নদী-খালে-বিলে।’

একবার মাথা দোলাল ক্যাণ্টারায়া। ‘মাঝে মাঝে এ ধরনের দলের কথা কানে এসেছে। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে কী কারণে নেমেছ?’

সাবধানে ভেবে নিয়ে বলল রানা, ‘কারণ, এরা গোটা সমাজের সর্বনাশ করছে... এমন কী বাদ পড়ছে না শিশুও... আর

তখন খুব স্ফূর্তি হচ্ছে এদের। কষ্ট বা যন্ত্রণা দিতে পারলে খুশি।'

চুপ করে টেবিলের দিকে চেয়ে আছে ক্যাণ্টারায়া, হঠাৎ উঠে চলে গেল ঘরের আরেক মাথায়। ওদিকের দেয়ালে ঝুলছে গামলা ভরা ফলের পেইণ্টিং। ওখানে থমকে কী যেন দেখছে মাফিয়া নেতা।

বুঝে গেল রানা, পেরিয়ে গেছে তৃতীয় সেতু।

চল্লিশ

দ্বিতীয়বারের মত লাঠি তুলে রামিনের গালে আঘাত করতে চাইলেন মহিলা, সেই সঙ্গে ছাড়লেন চিল-চিৎকার: 'ভ্যাগাবণ্ড! দাঁড়া, আজ তোর একদিন কী...'

লাঠির বাড়ি থেকে সরতে গিয়ে আরেকটু হলে হাত থেকে পিস্তল পড়ে যেত রামিনের, কিন্তু সরু লাঠি এড়িয়ে লাফ দিয়ে আবারও সামনে বাড়ল ও। তখনই আবার সাঁই করে এল লাঠি। খপ্ করে ওটা ধরে আরেক হাতে বুড়ি মহিলার কোমর জাপ্টে ধরল রামিন। পরক্ষণে কাঁধে তুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল। ওর কাঁধে কামড় দিতে চাইলেন মহিলা, তাতে মুখ থেকে খসে পড়ে গেল তাঁর দুই পাটি নকল, ধবধবে সাদা দাঁত।

সিঁড়ির ধাপ উড়ে নামল রামিন। সামনেই পুরনো মার্সিডিয বেন্য্। এইমাত্র ঘ্যাচ্ করে ব্রেক কষে দাঁড় করিয়েছে পেঁচা ফুলজেন্স।

এদিকেই ছুটে আসছে পিটার লারসেন। বাদুড়ের ডানার মত উড়ছে তার যাজকের কালো পোশাক।

ওই একই সময়ে রামিন দেখল, আঙিনায় লুটিয়ে পড়েছে মহিলার বডিগার্ড। পাশেই কালাহান, হাতে পিস্তল। আরও দু'বার বাঁট ব্যবহার করে শিথিল বডিগার্ডের মাথায় আলু তুলল সে। পরক্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উদাস ভঙ্গিতে অপেক্ষা করল।

কালো মার্সিডিযের পেছনের দরজা খুলে ফেলেছে পিটার লারসেন, বুড়ি মহিলাকে ভারী বস্তার মত সিটে ফেলল রামিন। লাফ দিয়ে উঠল পাশে। সামনের সিটে চেপে বসল লারসেন। ধপ্-ধপ্ শব্দে বন্ধ হলো দরজা। পেঁচা অ্যাক্সেলারেটার টিপে ধরতেই চাকার রাবার পুড়িয়ে ছিটকে রওনা হয়ে গেল গাড়ি। চাকা ঘষ্টানোর কর্কশ, রি-রি আওয়াজের ওপর দিয়ে এল গির্জার সিঁড়ি থেকে হৈ-চৈ, চেঁচামেচির শব্দ। পরক্ষণে আঙিনা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ল মার্সিডিয, দেখতে না দেখতে উধাও হয়ে গেল।

পাঁচ সেকেণ্ড পর কালাহানের সামনে থামল আরেকটা গাড়ি। ঘুরেই এক দৌড়ে ওটাতে উঠল সে। পরক্ষণে গির্জার আঙিনা ছেড়ে বেরিয়ে গেল গাড়ি।

দুঃসাহসিক এ ঘটনা ঘটতে লাগল মাত্র পনেরো সেকেণ্ড।

একচল্লিশ

'কিন্তু আমাদের দু'জনের ভেতর অনেক বিভেদ। বাধ্য হয়েই

নিতে হবে আমার প্রতিশোধ,' ছবি থেকে চোখ সরাল না জিয়ান্না ক্যান্টারায়া। 'আমার পরিবারের লোককে খুন করেছ তুমি।'

'খুন করেছি তোমার দুলাভাইকে,' শান্ত স্বরে বলল রানা, 'আমার ধারণা, তাকে পছন্দ করতে না তুমি। খুন করেছি তোমার চাচাত ভাইকে, যে ছিল সৈনিক, এবং মারা গেছে যুদ্ধে। আমি তোমার বোনকে খুন করতে যাইনি। দু'বছর আগে আবার বিয়ে করেছে। একটা মেয়েও হয়েছে। তুমি তার গডফাদার। তোমার বোনকে কুত্তীর সম্মানও দিত না আতুনি বেরলিংগার। তা তুমি নিজেও জানো।'

ফিরে এসে চেয়ারে বসল ক্যান্টারায়া। তার চেহারায় অনুভূতির ছাপ পড়ল। চাপা স্বরে বলল, 'তবুও, প্রতিশোধ সবসময় প্রতিশোধই। তা শেষ হবে তোমার মৃত্যুর মাধ্যমে।'

কয়েক মুহূর্ত ইতালিয়ানের চোখে চেয়ে তারপর বলল রানা, 'মন দিয়ে শোনো আমার কথা। আজ থেকে কয়েক বছর আগে ইটালির এক দুর্গম গ্রামে শেষ হয়েছে প্রতিশোধ নেয়া। প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল দুই পরিবার। নিজেদের ভেতর লড়াই করেছে চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে। দুই পরিবারে মারা গেছে বিশজনেরও বেশি সদস্য। ওদের মনেই ছিল না ঠিক কী নিয়ে ছিল বিরোধ। শেষ পর্যন্ত দুই পরিবারে পুরুষ বলতে রয়ে গেল মাত্র দু'জন। তাদের একজন পনেরো বছরের এক কিশোর। সামনেই তার ষোলোতম জন্মদিন। তার মা আর বোন বলল, ষোলো বছর বয়স হলে বাবার লুকিয়ে রাখা বন্দুক নিয়ে গিয়ে প্রতিশোধ নিবি বাপ-চাচা-ভাইয়ের মৃত্যুর। কিন্তু ছেলেটা অনর্থক খুনোখুনি চাইল না। তাতে লজ্জায় নত হলো তার মা ও বোনের মাথা। স্থানীয় যাজক এই ঘটনা দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করার ব্যবস্থা নিলেন।' কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকল রানা, তারপর বলল, 'পুলিশ থেকে বলা হয়েছিল তারা নিরাপত্তা দেবে

ছেলেটাকে। অনেক পরিবার ওকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজি হয়নি ছেলেটা। যে রাতে তার ষোলো বছর হলো, বাড়ি ছেড়ে চলে গেল ওর মা-বোন, যাওয়ার আগে বেচারার চোখে-মুখে থুতু দিয়ে গেল। দরজা খুলে রেখে গিয়েছিল তারা। সেই রাতে বারোটা বাজার পরপরই অন্য পরিবারের লোকটা এসে গুলি করে মেরে রেখে গেল তাকে। ছেলেটা ঘুমিয়ে ছিল। ছেলেটার মা-বোন যায়নি বেঈমান ছেলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়। এটাকে তুমি কী ধরনের প্রতিশোধ বলবে? তুমি কি তেমনই প্রতিশোধ নিতে চাও আমার ওপর?'

টেবিলে রাখা পিস্তল তুলে নিয়ে আবারও নামিয়ে রাখল ক্যাণ্টারায়া। নিচু স্বরে বলল, 'তুমি ভাল করেই জানো আমাদের নিয়ম। নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হবে আমাকে।'

মৃদু হাসল রানা। 'হাত-পা বাঁধা এক লোকের মগজে বুলেট গেঁথে নিজেকে শক্তিশালী প্রমাণ করতে চাইলে, এমনিতেই হারিয়ে বসেছ তোমার কর্তৃত্ব।'

চুপ করে আছে ক্যাণ্টারায়া। এমন সময় দড়াম করে খুলে গেল দরজা, যেন উড়ে এসে ভেতরে ঢুকল গ্যারিবাল্ডি। 'জলদি আসুন!' তাড়া দিল সে।

চেয়ার ছেড়ে তার পিছু নিল ক্যাণ্টারায়া, বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। অবশ্য, দু'মিনিট পর আবারও ফিরল ঘরে। গনগনে রাগে লাল হয়ে গেছে চেহারা। খপ্ করে পিস্তলটা তুলে নিয়েই তাক করল রানার মাথায়। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে, ধমকের সুরে বলল, 'হ্যাঁ, প্রতিশোধ, হারামজাদা! বলছিলি প্রতিশোধের কথা! তুলে নিয়ে গেছিস আমার মাকে! আমার মাকে... শুয়োরের বাচ্চা!'

জবাবে গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা, 'ভুল বলছ! আমাকে গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে আটকে রাখা হয়েছে এই চেয়ারে!'

'তা হলে তোর লোক!' সামনে বেড়ে রানার দুই চোখের

মাঝে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে দিল ক্যান্টারায়া।

বুক ভরে বাতাস নিয়ে ধীরে ধীরে দম ছাড়ল রানা, তারপর শান্ত স্বরে বলল, 'সত্যি যদি আমার লোক হয়, তুমি ট্রিগার টিপে দিলে ধরে নিতে পারো, সঙ্গে সঙ্গে খুন হয়ে যাবে তোমার মা।'

ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে ক্যান্টারায়া।

পেছন থেকে বলল গ্যারিবাল্ডি, 'গুলি করুন শুয়োরটাকে!'

'উনি তো আর তোমার মা নয়,' বলল রানা। আগের চেয়ে ঠাণ্ডা সুরে বলল ক্যান্টারায়াকে, 'কখন এই ঘটনা ঘটেছে? এবং কোথায়?'

রানার দু'চোখের মাঝ থেকে পিস্তলের নল এক ইঞ্চি পিছিয়ে নিল ক্যান্টারায়া। 'উনি যে শহরে থাকেন, সেই গির্জার সামনে থেকে। পনেরো মিনিট আগে।'

কী যেন ভাবছে রানা, পুরো একমিনিট পর মাথার ইশারায় চেয়ার দেখাল। 'বসো। অপেক্ষা করতে হবে। ওরা আমার লোক হলে, দশ মিনিটের ভেতর ফোন দেবে। টেবিলে ফোন আনার ব্যবস্থা করো।'

টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে ঘরে।

আবারও মুখ খুলল গ্যারিবাল্ডি, 'এর বদলে আপনার মাকে ছুটিয়ে আনতে চেষ্টা করব আমরা।'

'না!' কর্কশ ধমক দিল ক্যান্টারায়া, 'এই ঘর থেকে প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারবে না এ।'

'গ্যারিবাল্ডি যা বলছে, তা সম্ভব,' বলল রানা, 'কিন্তু দশটা মিনিট অপেক্ষা করতে বলব। মনে রেখো, আমি কখনও নিরীহ মহিলার ওপর হামলা করি না। কোনও কাপোর মা হলেও না।'

আবারও নীরবতা নামল ঘরে।

কয়েক সেকেণ্ড পর ঘুরে বলল ক্যান্টারায়া, 'একটা ফোনের এক্সটেনশন আনো। ফোনে স্পিকার থাকতে হবে।'

ওই ফোন কলটা এল আঠারো মিনিট পর। রিসিভার তুলে চুপচাপ শুনল ক্যাণ্টারায়া। আবারও নিজের ওপর ফিরে পেয়েছে নিয়ন্ত্রণ। হাতে এখনও পিস্তল। রানার দিকে ইশারা করল। হাত দিয়ে মাউথপিস চাপা দিয়ে বলল, 'বলছে তোমার ছোট ভাই। আটকে রেখেছে আমার মাকে। আমি জানতাম না তোমার ছোট ভাই আছে।'

'কয়েক মিনিট আগে আমিও জানতাম না তোমার মা আছে। ওর সঙ্গে কথা বলতে দাও আমাকে।'

ক্যাণ্টারায়ার পেছনে দাঁড়িয়ে চোখ ঘোরাল গ্যারিবাল্ডি। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'শালা পুরো উন্মাদ!'

'মুখটা বন্ধ রাখো,' ধমকে উঠল রানা।

মগজের দু'অংশের যুদ্ধে বিপর্যস্ত বোধ করছে ক্যাণ্টারায়া। তিন সেকেণ্ড পর রানার কানে ফোন দিল। টিপে দিল কন্সোলের বাটন।

'রামিন?' ইংরেজিতে জানতে চাইল রানা।

স্পিকারে ভেসে এল তরুণের কণ্ঠ: 'হ্যাঁ। আপনি ঠিক আছেন তো, মাসুদ ভাই?'

'হ্যাঁ। তুমি আটকে রেখেছ ক্যাণ্টারায়ার মাকে?'

'জী।'

'দেরি না করে এক্ষুণি ছেড়ে দাও।'

অন্তত পাঁচ সেকেণ্ড পর এল রামিনের কথা, 'ওরা আপনার মাথায় পিস্তল ধরেছে বলে এ কথা বলছেন, মাসুদ ভাই? তা হলে ওদের বলুন, মস্করা করতে বসিনি, আমিও পিস্তল ধরে আছি বুড়ি মহিলার মাথায়।'

'ছিহ্, রামিন! যা বলছি করো! আমরা মহিলাদের বিরুদ্ধে লড়ি না! এক্ষুণি ছেড়ে দেবে ওঁকে। নিজে ড্রাইভ করে পৌঁছে দেবে ক্যাণ্টারায়ার রোমের বাড়িতে। তাঁর যেন কোনও অসুবিধে

না হয়, তা দেখবে। উনি ওখানে পৌঁছে গেলে যেন যোগাযোগ করেন এই নাম্বারে। ধারণা করছি, তোমার সঙ্গে আছে আমার কয়েকজন বন্ধু। ওদেরকে বলবে, যাকে ভাইয়ের মত মনে করি, ওরা যেন চলে যায় ওখানে। বেঁচে থাকলে পরে কল দেব।'

লাউড স্পিকারে পরিষ্কার শুনল ওরা ক্লিক আওয়াজ।

খুব ধীরে নিজের রিসিভার নামিয়ে রাখল ক্যান্টারায়া।

নীরবতার ভেতর গ্যারিবাল্ডি বলল, 'এটা নির্ঘাত ফাঁদ! নিজে থেকে ছেড়ে দেবে কেন?'

ক্যান্টারায়ার চোখে চোখ রেখে বলল রানা, 'গ্যারিবাল্ডির মত গাধা লোক এসব বুঝবে না। আগেই বলেছি... মহিলাদের বিরুদ্ধে কখনও লড়ি না আমরা।'

বিয়াল্লিশ

ঘরে ঢুকে রোগীর বেডের পাশে দাঁড়ালেন কর্নেল বার্নাদো গুগলি। এই ঘর সাধারণ কোনও হাসপাতালের রুম নয়। তুলনা করা যেতে পারে দামি কোনও হোটেলের সুইটের সঙ্গে। রোগীর বাহুতে স্যালাইনের ড্রিপ না দেখলে বোঝার উপায় নেই, বেডে শুয়ে থাকা যুবক আসলে রোগী। পাশেই সুন্দরী নার্স। পরনের ইউনিফর্ম ডিযাইন করেছেন স্বয়ং ভ্যালেন্টিনো।

নার্স মাপছে রোগীর ব্লাড প্রেশার। ডায়াল দেখে সন্তুষ্টি নিয়ে মাথা নাড়ল। মিষ্টি কণ্ঠে বলল, 'এবার আপনাকে ঘুমাতে হবে।'

কঠোর চোখে দেখল গুগলির দিকে। 'এর আরেক অর্থ, পনেরো মিনিটের ভেতর বিদায় নেবেন আপনার ভিযিটর।'

আস্তে করে মাথা দুলিয়ে বলল রানা, 'তোমার নাম কী?'

'লিনিয়া,' জবাবে বলল নার্স।

মৃদু হাসল রানা। 'লিনিয়া, কর্নেলের সঙ্গে আলাপ আছে, তাতে সময় লাগবে। খুশি হব তুমি এক বোতল ভাল ব্যারোলো আর দুটো গ্লাস দিয়ে গেলে।'

'তিন গ্লাস,' বললেন কর্নেল, 'দু'তিন মিনিটের ভেতর পৌঁছে যাবে পাধানি।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল নার্স। 'ড্রিঙ্ক চাইলে তা জানাতে হবে ডক্টর সিলভিয়োকে। উনি ধারণা করছেন, ডিলেইড রিঅ্যাকশন হবে রোগীর।'

রানার দিকে চেয়ে হেসে ফেললেন গুগলি। রানাও হাসছে।

নার্সকে বললেন কর্নেল, 'তুমি পাঁচ মিনিটের ভেতর ড্রিঙ্ক না এনে দিলে মারাত্মক শক পাবে এই বেচারা।'

রাগী চোখে গুগলিকে দেখে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল নার্স। রানার বেডের পাশে, চেয়ারে বসলেন গুগলি। 'রেমারিকের সঙ্গে কথা হয়েছে। জানিয়ে দিয়েছি তুমি সুস্থ। আগামীকাল পৌঁছুবে নেপলসে। রামিনের সঙ্গেও কথা হয়েছে ওর। তোমার নির্দেশ মত প্রায় সবই করেছে ছেলেটা।'

উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'প্রায়টা কীসের, বার্নাদো?'

'আমার ধারণা, ঠিকই করেছে। তোমার বন্ধুদের সবাইকে নিয়ে চলেছে নেপলসে। রয়ে গেছে শুধু কর্নেলিস।'

'ও কোথায়?'

'এক শ' মাইল দূরে নেই। কোথায় বলতে পারব না, কারণ জানি না। কিন্তু ঘাঁটি গেড়েছে এই হাসপাতালের কোথাও। তোমার মত করেই সব বুঝে তারপর প্ল্যান তৈরি করে রামিন।'

ভাবতে গিয়ে মাথা দোলাল রানা। 'অহেতুক পাহারা দিচ্ছে সিম। অবশ্য, যোগ্য কেউ চোখ রেখেছে শুনে খারাপ লাগছে না।'

হাসলেন গুগলি। 'আগেও বলেছি, তোমার মত করেই চিন্তা করে রামিন।'

বামহাতে ঘাড় টিপতে টিপতে বলল রানা, 'ঠিকই ধরেছে ডক্টর সিলভিয়ো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রেখেছে বলে ক্ষতি হয়নি, কিন্তু ঘাড়ে সমস্যা করেছে সাবমেশিন-গানের বাঁটের গুঁতো। মেরুদণ্ডের ওপরের দিকের একটা হাড়ে ফাটল ধরেছে। আরও কয়েক ঘণ্টা বেঁধে রাখলে হাত-পায়ের আঙুলে গ্যাংগ্রিন হয়ে যেত।' মৃদু হাসল। 'পরে মিলিয়ে গিয়েছিল ব্যথা। বুঝতেই পারিনি, বিকল হয়ে যাচ্ছে অঙ্গ।'

দরজায় টোকা পড়ল। দু'সেকেণ্ড পর ভেতরে ঢুকল কর্নেল গুগলির সহকারী পাধানি, হাতে ব্রিফকেস। বেডের আরেক পাশে ব্রিফকেস নামিয়ে রেখে দুটো চুমু দিল রানার দু'গালে। বামহাতে ঘাড় জড়িয়ে ধরে তার মুখ নামিয়ে নিয়ে গালে চুমু দিল রানা।

কয়েক বছর পর দেখা দু'জনের। চেয়ারে বসে হাঁটুর ওপর ব্রিফকেস রেখে ডালা খুলল পাধানি। ভেতর থেকে একটা পাতলা ফাইল বের করে রানাকে দেখাল।

'পড়ে শোনাও,' আগ্রহ নিয়ে বলল রানা।

ফাইল খুলে পুলিশ রিপোর্ট পড়তে লাগল পাধানি: 'সকাল সাড়ে দশটার সময় ব্র্যাক্কিয়ানো ল্যাগোর চার্চ থেকে বের হন সেনোরা ক্যান্টারায়েলি। গির্জার সিঁড়ির নিচে অপেক্ষা করছিল হুইলচেয়ারে বসা এক তরুণ, পেছনে এক যাজক। সাক্ষীরা শপথ করে বলেছে, ওই যাজক ছিল সোনালি চুলের মোটা এক যুবক। সেনোরা ক্যান্টারায়েলির বডিগার্ড গামেল সিলভেস্ট্রি যাচ্ছিল ভদ্রমহিলার গাড়ির দিকে। এমন সময় পায়ের ওপর থেকে কম্বল সরিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় হুইলচেয়ারে বসা তরুণ, হাতে

পিস্তল। সিলভেস্ট্রি দৌড়ে আসবে ক্যান্টারায়েলিকে রক্ষা করতে, কিন্তু তখনই এক পাশ থেকে হাজির হয় আরেক লোক, তার হাতেও ছিল পিস্তল। পরনে কালো সোয়েটার ও কালো প্যান্ট। নিজের পিস্তল বের করার কোনও সুযোগ ছিল না সিলভেস্ট্রির, এর আগেই তার মাথায় পিস্তল দিয়ে আঘাত করে পাশের লোকটা। মাটিতে পড়ে জ্ঞান হারায় বডিগার্ড। তার আগে তাঁর লাঠি দিয়ে তরুণের মুখে বাড়ি দেয়ার চেষ্টা করেন সেনোরা ক্যান্টারায়েলি। তখন হাজির হলো কালো এক মার্সিডিয গাড়ি। কোমর জড়িয়ে ধরে ভদ্রমহিলাকে তোলা হলো গাড়িতে। সামনের সিটে বসল যাজক। পেছনের সিটে সেনোরা ক্যান্টারায়েলির পাশে তরুণ। তুমুল গতি তুলে গির্জা এলাকা ছেড়ে চলে গেছে ওই গাড়ি। পাঁচ সেকেণ্ড পর সিলভেস্ট্রির অজ্ঞান দেহের পাশে থামল আরেকটা গাড়ি। ওটাতে লাফিয়ে উঠল বডিগার্ডের ওপর হামলাকারী। এরপর দেরি না করে ওই এলাকা ছেড়ে চলে গেল দ্বিতীয় গাড়িও। আন্দাজ পঁচিশ মিনিট পর পুলিশ আটকে দিল ব্র্যাক্কিয়ানো ল্যাগোর সব রাস্তা। আমাদের ধারণা, অত্যন্ত পেশাদার একদল লোক করেছে ওই কিডন্যাপিং।'

ফাইল বন্ধ করল পাধানি, প্রথমে দেখল কর্নেল গুগলিকে, তারপর রানাকে।

'দক্ষ লোকের কাজ,' মন্তব্য করল রানা।

কাঁধ ঝাঁকালেন গুগলি। 'যেমন ওস্তাদ, তেমনি সাগরেদ। সঙ্গে ছিল পেশাদার একদল কমাণ্ডো। ওরা যে কাজে অভ্যস্ত, ইতালির প্রেসিডেন্টও পুরো নিরাপদ নন।' রানাকে দেখলেন। 'সময়ের হিসেব দেখে বুঝতে পারছি, মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ক্যান্টারায়াকে কল দিয়েছে রামিন। আর রোমে তাঁর ছেলের বাড়িতে মাত্র একঘণ্টা পর পৌঁছেছেন সেনোরা ক্যান্টারায়েলি... এবার বলো, রানা, কাজটা কেন করল রামিন? আর এরপর কী

ঘটল তোমার?'

ঘাড়ের ব্যথায় হাত বুলিয়ে বলল রানা, 'প্রথম থেকেই তার ছুঁচোর মত স্যাঙাত গ্যারিবাল্ডি ক্যাণ্টারায়াকে বলছিল, আমাকে যেন মেরে ফেলে। কিন্তু সমস্যার ভেতর পড়েছিল ক্যাণ্টারায়া। দ্য ডায়মণ্ড রিঙের বিষয়টা চিন্তিত করে তুলেছিল ওকে। এমন সময় জানতে পারল, তার মাকে কিডন্যাপ করেছে রামিন। ভয়ঙ্কর খেপে গেল ক্যাণ্টারায়া। বুঝে গেল, এবার খুন করে ফেলতে হবে আমাকে। কিন্তু তার কিছুক্ষণের ভেতর রামিনকে বলে দিলাম, কাপোর মাকে এক্ষুণি ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে তার ছেলের বাড়িতে।'

অবাক চোখে রানাকে দেখল পাধানি। 'বেঁধে রেখে মেরে ফেলবে ঠিক করছে, এমন সময় ওই নির্দেশ দিলেন রামিনকে?'

মাথা দোলাল রানা। 'ঝুঁকি নিয়ে হিসেব নিকেশ করে চাল দিয়েছি।'

কৌতূহলী কর্নেল গুগলি বললেন, 'ওর মাকে ছেড়ে দিলে, তার আগে কোনও শর্ত দাওনি?'

মাথা নাড়ল রানা। ওই ঘরে কী ঘটছিল পরিষ্কার মনে আছে ওর। যে-কোনও সময়ে খুন হবে, এমনই ছিল পরিস্থিতি।

রানা ফাঁদ পেতে থাকলেও তা বুঝতে পারছিল না, হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল ক্যাণ্টারায়া।

'তোমার মা-র ফোনের জন্যে অপেক্ষা করো,' বলেছিল রানা। 'আমার ভুল না হয়ে থাকলে উনি দৃঢ় মনের মহিলা। আমার ছোটভাই ওঁর মাথায় পিস্তল ধরেছে, কিন্তু সেজন্যে মিথ্যার আশপাশ দিয়েও যাবেন না উনি। তোমার বোধহয় এখন অপেক্ষা করা উচিত।'

ঘরের একমাথা থেকে আরেক মাথা পায়চারি শুরু করল ক্যাণ্টারায়া, তারপর হঠাৎ থেমে গ্যারিবাল্ডির উদ্দেশে ধমকে

উঠল, 'আমাদের দু'জনকে বিরক্ত করবে না, বাইরে যাও!'

চোখে-মুখে নীরব, প্রবল আপত্তি নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল গ্যারিবাল্ডি। তার আগে কাঁধের ওপর দিয়ে বলল, 'ওই কুকুরের বাচ্চাকে বিশ্বাস করবেন না! বাইরে অপেক্ষা করছি!' পেছনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেল সে।

কবরের মত স্তব্ধ চারপাশ।

অপেক্ষা করতে লাগল রানা ও ক্যাণ্টারায়া।

পায়চারির মাঝে ওই ফলের বাটির ছবি দেখছে মাফিয়া নেতা। ওসব ফল যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে, সবুজ, তাজা প্রাণের কথা। ক্যাণ্টারায়াকে দেখছে রানা, মাঝে মাঝে হাতের বাঁধন। আরও বারো মিনিট পর এল ফোন। চালু আছে স্পিকার। পরিষ্কার শুনল রানা দু'জনের আলাপ।

খেপে বোম হয়ে গেছেন ক্যাণ্টারায়ার মা। ধমক দিলেন, 'জাহান্নামের কাজ— এসব কী করে বেড়াচ্ছিস তুই?'

'তুমি কোথায়, মা?'

'তোর ভিলায়।'

'তুমি একা?'

'লরা আছে সঙ্গে।'

'তুমি ঠিক আছ তো, মা?'

অত্যন্ত বিরক্ত সুরে জবাব দিলেন ক্যাণ্টারায়েলি, 'ঠিক আছি মানে? ধর্মোপদেশ শুনছিলাম। নিজের ছেলের একগাদা নোংরা পাপের জন্যে করুণাময়ের কাছে দু'হাত তুলে মাফ চাইছিলাম। গরীবদের জন্যে রাখা দানবাক্সে দিয়েছি পনেরো হাজার লিরা। তারপর কোথা থেকে দুর্দান্ত সুদর্শন এক ছোকরা এসে ঈশ্বরের গির্জার সামনে থেকে তুলে নিয়ে গেল আমাকে। গাড়িতে তুলে ঢেকে দিল কালো কম্বল দিয়ে। তাতে সারা গা কুটকুট করতে লাগল। তারপর গাড়িতে ঝড়ের গতি তুলে কোথায় যেন নিয়ে

গেল। ...এর মানেটা কী, অ্যাঁ?'

'তারপর কী হলো, মা?'

'তারপর ফোনে কথা বলল ছেলেটা। ওদিকের কথা শুনতে পেলাম না। আবারও আমাকে নিয়ে ড্রাইভ করে পৌঁছে দিয়ে গেল তোর বাড়িতে। বিদায় নেয়ার আগে আমার দুই গালে দুটো চুমুও দিয়েছে। দেখতেও তেমনি সুন্দর। লরার হাতে আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে তিনবার মাফ চেয়ে পালাল। ওকে যে বসিয়ে এক গ্লাস ওয়াইন দেব, সেই সময়ও দিল না। ...হ্যাঁ রে, বেয়াদব, বেয়াক্কেলে, জিয়ান্না, এসব কী করে বেড়াচ্ছিস তুই? আগেও বলেছি, ওই শুয়োর আতুনি বেরলিংগারের সঙ্গে সম্পর্ক করেছিস বলে একদিন তোর অন্তর দখল করে নেবে ইবলিশ! ...হায়, কী করে এমন নষ্ট হয়ে গেল আমার ছোট্ট ছেলেটা! এত প্রার্থনা করি তোর জন্যে, গির্জায় গিয়ে এত মোমবাতি পুড়িয়ে শেষ করলাম... তাতে কচুও কাজ হলো না! তুই জানিস, সুন্দর ছোকরার সঙ্গে একজন যাজকও ছিল? এবার ভেবে দ্যাক! তুই আজকাল এসব কী করে বেড়াচ্ছিস যে বুড়ি মহিলাদেরকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছে মোটা যাজকগুলো?'

মহিলার রাগী কথা শুনে মুচকি হেসে ফেলেছে রানা।

তিক্ত চোখে ওকে দেখল ক্যান্টারায়া, টিপে অফ করে দিল লাউড স্পিকারের বাটন, তারপর ফোনে বলল, 'মা... লরাকে ফোনটা দাও।' কাজের মেয়েকে সংক্ষেপে দু'চার কথায় মা-র যত্ন নিতে বলে ফোন রেখে দিল ক্যান্টারায়া। অন্তত দুই মিনিট চেয়ে রইল রানার চোখে, তারপর বলল, 'কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আগেই বলেছি, কোনও মহিলার সঙ্গে আমার শত্রুতা নেই।'

বিস্ময় নিয়ে মাথা নাড়ল ক্যান্টারায়া। 'আসলে কিছুই বুঝছি না। ছেড়ে দিয়েছ আমার মাকে। নিজে রয়ে গেছ আমার মুঠোর

ভেতর...' হঠাৎ একটা চিন্তা এল তার, 'ও, তুমি জানতে, আমার মাকে ছেড়ে না দিলে, ছাড়তে পারব না আমি তোমাকে। এ-ও জানতে, তোমাকে খুন করলে তোমার ভাই খুন করবে আমার মাকে। কারও কোনও চাল দেয়ার উপায় ছিল না।'

মাথা দোলাল রানা, ঠোঁটে মৃদু হাসি। 'কথা মিথ্যা নয়। এখন আরেক সমস্যার ভেতরে পড়েছ।'

'কীসের সমস্যা? আমি কী পাত্তা দিই নাকি কাউকে! ঠিক করেছি ছেড়ে দেব তোমাকে, কারও বাপেরও সাধ্য নেই এই সিদ্ধান্ত বদলে দেবে।'

'অদ্ভুত লোক, তাই ছেড়ে দেবে আমাকে। কিন্তু তা করলে যারা চেয়ে আছে, তেমন একদল লোক শ্রদ্ধা হারাবে তোমার প্রতি। যেমন গ্যারিবাল্ডির মত ছুঁচো।' দরজার দিকে ইশারা করল রানা। 'ওরাই গদিতে বসিয়ে দিয়েছে, কাজেই নিজের সম্মান রক্ষা করতে হবে, নইলে হারাবে ওই ক্ষমতা। শুধু তাই নয়, কোনও এক আঁধার রাতে ওর মত কোনও ছুঁচোর বুলেট উড়িয়ে দেবে তোমার মাথার খুলি।'

চুপ রইল ক্যাণ্টারায়া। আপত্তি তুলছে না, বা কিছুই বলছে না।

কিছুক্ষণ পর বলল রানা, 'নির্বোধ গ্যারিবাল্ডিকে বলো, সে যেন এনে দেয় ধারালো ছোরা।'

সরু হলো ক্যাণ্টারায়ার চোখ। বিস্মিত।

'যা বলছি, তা করো,' বলল রানা।

কয়েক সেকেণ্ড পর চেয়ার ছেড়ে দরজার কাছে গেল ক্যাণ্টারায়া। নির্দেশ দিল গ্যারিবাল্ডিকে। একমিনিট পর দরজা বন্ধ করে ফিরে এল ছোরা হাতে।

'যথেষ্ট ধারালো তো?' জানতে চাইল রানা।

ফলার ওপর আঙুল বুলিয়ে মাথা দোলাল ক্যাণ্টারায়া।

নরম সুরে বলল রানা, 'এবার দেখো, আমার ডান কব্জির ওপরের দিকের মাংসে সূক্ষ্ম একটা কাটা দাগ আছে।'

ঝুঁকে দেখল ক্যান্টারায়া। 'হ্যাঁ, আছে। লম্বায় আধ ইঞ্চি।'

'ওই মাংসের নিচে আছে জরুরি একটা চিপ্‌স্,' বলল রানা, 'যে সংগঠনের হয়ে কাজ করি, তাদের দেয়া। পরিচয় আর দরকারী সব তথ্য ওখানে। ছোরা দিয়ে উপড়ে নেবে।'

রানাকে দেখছে ক্যান্টারায়া। বিরক্ত হয়ে বলল, 'ওই চিপ্‌স্ বের করে কী লাভ হবে?'

'তেমন কিছুই হবে না, কিন্তু ছাড়ব বিকট আর্তনাদ,' বলল রানা। 'তোমার কাছে রুমাল আছে?'

ভোঁতা চোখে মাথা দোলাল ক্যান্টারায়া।

'যথেষ্ট পরিষ্কার তো?' জানতে চাইল রানা।

'সর্দি ঝাড়িনি ওতে,' বলল কাপো। দামি কোট থেকে ঘিয়ে রঙের সিল্কের বড় রুমাল বের করে টেবিলে রাখল।

'চিপ্‌স্ বের করে নেয়ার পর আমি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকার ভান করব, কব্জি মুড়িয়ে বাঁধবে রুমাল,' বলল রানা, 'যথেষ্ট রক্ত পড়বে ক্ষত থেকে। এরপর ডাকবে নিজের লোক। পরে গ্যারিবাল্ডিকে জানাবে, সে যেন ছোট কোনও ক্রিস্টালের বয়ামে ওই চিপ্‌স্ রেখে, পাঠিয়ে দেয় রোমে তোমার বাড়িতে। ওটা তোমার মা-র জন্যে সুন্দর উপহার। প্রতিশোধের ব্যাপারটা বুঝবে ওই ছুঁচো। এরপর যে নোংরা হোটেলের সামনে থেকে আমাকে তুলে এনেছিল গ্যারিবাল্ডি, নিজের লোক দিয়ে ওখানে পাঠিয়ে দেবে অচেতন আমাকে।'

ক্ষুরধার ছোরার দিকে তাকাল ক্যান্টারায়া, কিছুক্ষণ পর হাসল। সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বলল, 'ঠিক আছে, মন্দ হয় না। কিন্তু অ্যানেস্থেশিয়ার ব্যবস্থা নেই, মারাত্মক ব্যথা পাবে।'

'তা বুঝতে পারছি,' বলল রানা। 'কিন্তু ও নিয়ে ভাবতে হবে

না তোমাকে। দেরি না করে কাজে নেমে পড়ো।’

রানার কথা শেষ হওয়ার পর চুপ করে থাকল কর্নেল গুগলি ও মেজর পাধানি। দুঃসাহসী মানুষটার ডান কব্জির ওপরের দিকে দেখছে সাদা ব্যাণ্ডেজ।

‘মোটেও ব্যথা পাইনি,’ বলল রানা, ‘এমনিতেই অবশ ছিল হাত-পা। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, দক্ষ সার্জন না ক্যাণ্টারায়া।’ গুগলির দিকে চেয়ে হাসল। ‘তোমার বড় ভাই ওকে বাগে পেলে শিখিয়ে ছাড়তেন কীভাবে সার্জারি করতে হয়। কিন্তু চিপ্‌স্ বের করে নেয়ার পর, যেন স্বয়ং যম ভয়ঙ্করভাবে খুন হয়ে যাচ্ছে, এমনই মারাত্মক এক বিকট চিৎকার ছেড়ে জ্ঞান হারালাম। যদিও দেখছিলাম চোখ সরু করে সবই।’ অক্ষত হাতে খুঁজে নিয়ে রক্তমাখা সিল্কের রুমাল তুলে দেখাল রানা। ‘অকেজো, নষ্ট ওই চিপ্‌সের বদলে পেয়েছি সুন্দর এই দামি রুমাল!’

তেতাল্লিশ

অশুভ অভিষেক অনুষ্ঠান আরম্ভ হতেই সামনে বাড়ল কালো আলখেল্লা পরা যুবক, মাথায় কালো হুড। চেহারা তার ফ্যাকাসে সাদা। অক্ষিকোটরের গর্তে কালো দু'চোখ, তির-তির করে বার-বার নড়ছে চোখের মণি। একবার ডানে আবার বামে যাচ্ছে, যেন খুব দ্বিধান্বিত। লালচে ক্রিমির মত সরু দু'ঠোঁট। সামনে এগিয়ে

আছে চোখা থুতনি। সবমিলে দেখলে মনে হবে, সে কার্টুনের ভয়ঙ্কর কোনও অভিশপ্ত, বুড়ি ডাইনী।

আবারও নাম ডেকে তাড়া দেয়া হলো তাকে।

কয়েক মুহূর্ত পর কালো বেদির কাছে থেমে সরাসরি সামনে চোখ রাখল যুবক। বেদির মাঝে দু'গজ উঁচু, উল্টো এক কালো ক্রুশ। ওটার পেছনে আবলুস কাঠের মোমদানীতে জ্বলছে প্রকাণ্ড এক কালো মোমবাতি। উল্টো ক্রুশের দু'পাশে অপেক্ষাকৃত ছোট ছয়টি করে কালো মোমবাতি। সবমিলে জ্বলছে তেরোটি মোমবাতি। ক্রুশের সামনে কালো শিঙের হাতলওয়ালা দীর্ঘ এক রুপালি ফলার ছোরা। বেদির বামে স্রষ্টার মত সম্মান দেয়া হয়েছে স্টাফ করা বড় এক ছাগলকে। ভয়ঙ্কর অশুভ হাসিতে ঝিকঝিক করছে সাদা দাঁত। বেদির ডানে ধবধবে তরুণ এক সাদা মোরগ। এক পা কালো সিল্কের দড়ি দিয়ে বাঁধা। পাশেই উল্টে রাখা সাদা একটা নর করোটি।

বাম থেকে হেঁটে উল্টো ক্রুশের সামনে দাঁড়াল উচ্চপদস্থ যাজিকা। পরনে তামাটে আলখেল্লা। মাথায় কালো হুড। আবারও যুবকের নাম ডাকল যাজিকা।

পায়ে পায়ে এগোতে লাগল যুবক, মনে হলো না কাজ করছে মগজ। তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে থামল যাজিকার এক ফুট নীচে। সরাসরি চোখ রাখল সাদা পাউডার মাখা মহিলার লালচে চোখে। যাজিকার ঠোঁটে কালো লিপস্টিক। মাসকারা দেয়া চোখের ওপরের কপালে আঁকা ছাগলের দুই শিং। সামনে বেড়ে যুবকের মাথায় হাতের তালু রেখে নিচু স্বরে বলল সে, 'তা হলে তুমি অস্বীকার করছ ঈশ্বরকে?'

যেন কোনও চিন্তা না করেই বলল যুবক, 'আমি যে-কোনও ঈশ্বরকে অস্বীকার করছি।'

উপস্থিত তেরোজন অতিথিকে দেখল যাজিকা।

তাদের সবার পরনে কালো আলখেল্লা। পেছনে লম্বা এক টেবিলে সুস্বাদু সব খাবার ও দামি ওয়াইন। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী মানুষগুলো একই সময়ে উচ্চারণ করল: 'সে অস্বীকার করছে... অস্বীকার করছে ঈশ্বরকে।'

যুবকের মাথা থেকে হাত সরিয়ে ঘুরে দাঁড়াল যাজিকা, পেছনে অপেক্ষারত অতিথিদের পাত্তা না দিয়ে বেদি থেকে রুপালি ছোরা নিয়ে তুলে ধরল মাথার ওপর।

ফিসফিস করল অতিথিরা, 'সে অস্বীকার করছে ঈশ্বরকে।'

মোরগের সামনে পৌঁছে খপ্ করে ওটার ঘাড় ধরল যাজিকা, অভ্যস্ত ভঙ্গিতে এক কোপে কাটল মাথা। কেটে ফেলল পায়ের কালো ফিতা, নামিয়ে রাখল ছোরা। মরণ-যন্ত্রণায় ছটফট করছে মোরগ। ওটাকে খামচে ধরে নিয়ে গেল উল্টো ক্রুশের সামনে। মোরগের ঘাড় নিচু করে রক্ত ঢালল করোটির ভেতর। এক মিনিট পর ঘুরে মৃত মোরগের দেহ ছুঁড়ে দিল উপস্থিত সবার দিকে।

খুশিতে চিৎকার ছেড়ে হাত ও হাঁটুর ওপর ভর করে বসে পড়ল অতিথিরা।

মোরগের বিচ্ছিন্ন মাথা তুলে করোটির রক্তে ফেলল যাজিকা। বামহাতে আলখেল্লার ফিতা খুলে দু'পা ফাঁক করে প্রস্রাব করল ডানহাতে ধরা করোটির ভেতর।

পাথরের মূর্তির মত চুপ করে অপেক্ষা করছে নতুন সদস্য, চেয়ে আছে উল্টো ক্রুসের দিকে।

রক্ত-প্রস্রাব ভরা করোটি দু'হাতে উঁচু করল যাজিকা, ইঙ্গিত করল নতুন সদস্যকে। করোটির ভেতরের জিনিসে চুমুক দিতে হবে।

খুব ধীরে হাত বাড়াল যুবক, করোটির এক পাশে মুখ রেখে চুমুক দিল।

অতিথিরা আবারও ফিসফিস করল, 'হ্যাঁ, সে অস্বীকার করছে

ঈশ্বরকে।'

যুবকের বয়স বড়জোর পঁচিশ। কালো চুল মাথার মাঝে সিঁথি করা। তার হাত থেকে করোটি নিল যাজিকা, অবশিষ্ট তরল ঢেলে দিল তার মাথায়। আবারও বেদির ওপর করোটি নামিয়ে রেখে এক টানে খুলে ফেলল নিজের আলখেল্লা। নিচে কোনও পোশাক নেই, সম্পূর্ণ উলঙ্গ ধবধবে সাদা, হৃষ্টপুষ্ট দেহ। তার মতই পোশাক খুলল অতিথি ও অভিষিক্ত যুবক। সাতজন মহিলা এবং ছয়জন পুরুষ। বয়স বিশ থেকে চল্লিশ।

সবাই গেল খাবারের টেবিলে। পরের আধঘণ্টা নানান সুস্বাদু খাবার ও দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ওয়াইন খেল তারা। তারপর শুরু হলো সবার ভয়ানক লজ্জাজনক বেলেল্লাপনা। সারারাত ধরে চলল ন্যক্কারজনক, বিকারগ্রস্ত যৌন উল্লাস।

সূর্য উঠবে এমন সময় শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরের এক উপত্যকার ছোট্ট এক গ্রামের বিলাসবহুল, মস্ত ভিলা থেকে এল দু'জন লোক, অত্যাধুনিক মার্সিডিয গাড়ি থেকে নেমে দেখল চারপাশ। একটু দূরেই গির্জা ও ওটার সুউচ্চ টাওয়ার। ঢং-ঢং শব্দে বাজছে পেতলের ঘণ্টি, মহান স্রষ্টার কাছে প্রার্থনার জন্য ডাকছে বিশ্বাসীদেরকে।

যে দু'জন এইমাত্র গাড়ি থেকে নেমেছে, তাদের একজনের বয়স পঞ্চাশ মত। মাথা জুড়ে টাক। পরনে দামি সুট।

অন্যজন সুদর্শন, দীর্ঘদেহী ও পেশিবহুল। তার সুটও দামি।

তার উদ্দেশে বলল বয়স্কজন, 'সবই ঠিকভাবে চলছে। প্রায় একবছর লেগেছে গ্যানডোলফোর ছেলেকে ভেড়াতে। আশা করি গতরাতের কথা কখনও ভুলবে না।'

'না ভুললেই ভাল,' বলল যুবক, 'সেক্ষেত্রে আরও উৎসাহ পাবে । আগামী মাসে মূল উৎসর্গের সময় জড় হবে সবাই।

ততদিনে বুঝবে, ঈশ্বর নয়, আসল ক্ষমতাশালী হচ্ছে শয়তান।'

কাঁধ ঝাঁকাল টাক-পড়া। 'আমাদের অনুষ্ঠান করা কঠিন হবে। খুব ভাল এক মেয়েকে পেয়েছিলাম মার্সেইল্স্-এ, কিন্তু পওলো ক্যালভির ভুলে হারিয়ে বসেছি। তেমন কাউকে এখনও পাওয়া যাচ্ছে না।'

'তাই?' তিক্ত চেহারা করল যুবক, 'ওই মেয়ে গেছে, টাকাও গেছে? দেরি না করে কাউকে জোগাড় করতে হবে।'

'আপাতত যারা আছে, সবাই এশিয়া বা আফ্রিকার,' বলল মধ্যবয়স্ক লোকটা। 'হয়তো পাব মাত্র দু'একজন কুমারী।'

'কুমারী হলেই হবে না,' আপত্তির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল যুবক। 'তাকে হতে হবে সাদা চামড়ার সুন্দরী মেয়ে। আমাদের অনুষ্ঠানের সময়ের সঙ্গেও মিলতে হবে। তাকে হতে হবে বারো বছরের মেয়ে। দরকার হলে এক কোটি কেন, দশ কোটি ডলার খরচ করবেন আমাদের প্রধান যাজক। ম্যানুয়েল য্যারাফার ওই আলবেনিয়ার প্রজেক্ট এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই উচিত। ওর সংগঠনকে কাজে লাগাতে হবে। যা করার, গোপনে করতে পারবে সে।'

আকাশে উদাস চোখে চেয়ে আস্তে করে মাথা দোলাল টাক-পড়া মধ্যবয়স্ক। 'গামবেরির সঙ্গে আলাপ করব আলবেনিয়া বা আলজিয়ার্সের সাদা চামড়ার মেয়ে খুঁজে বের করাই সহজ। ওই দুই দেশে চলছে রাজনৈতিক সমস্যা। এদিকে কয়েক বছর পর আবারও গিয়ারডিনি ক্যালভেসিও আর আমার পেছনে লেগেছে পুলিশ।'

'খুব সিরিয়াস?' জানতে চাইল যুবক, 'এসব কি মার্সেইল্স্-এর ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত?'

মাথা নাড়ল গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তা। 'না, ওই শহরের সঙ্গে এসবের সম্পর্ক নেই। ওখানে সম্ভবত দুই দলের

বিরোধ থেকে খুনোখুনি হয়েছে। যাক সেসব, আমি চিন্তিত অন্য কারণে। আমাদের বিষয়ে দু'জায়গা থেকে খোঁজ নেয়া হয়েছে। সে জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও নিয়েছি।' একটু দূরের ভিলার দিকে ইশারা করল সে। 'বাবা লিভারের রোগে মরছে, কাজেই আগামী কিছু দিনের ভেতর নতুন সদস্য পাবে বিশাল সব ইণ্ডাস্ট্রি। ওকে পুরো গেঁথে ফেলতে পারলে নানান দিক থেকে সুবিধা পাব।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভিলা দেখল যুবক। 'হয়তো, কিন্তু আরও অনেক জরুরি আমাদের প্রিয় ছাগলের কাছে উৎসর্গের জন্যে কুমারী শ্বেতাঙ্গিনী মেয়ে খুঁজে বের করা।'

চুয়াল্লিশ

জেনি ও টমকে নিয়ে নাদুর গ্রামে শপিঙে এসেছেন অনোরিয়া তাজা। প্রথমেই ঢুকলেন পরিচিত এক বেকারের দোকানে। আভনে কাঠের আগুনে তৈরি হচ্ছে গোলাকার সব সুস্বাদু, সুগন্ধি পাউরুটি। ওখান থেকে চারটে কিনলেন তিনি। জেনি জানতে চাইল, মাল্টিয ভাষায় পাউরুটিকে কী বলে। বলে দেয়ায় আউড়ে নিল উচ্চারণ। কয়েকবার বলার পর সন্তুষ্ট হলেন অনোরিয়া। এরপর ওরা গেল মাংসের দোকানে। ওখানে সব ধরনের মাংসের মাল্টিয নাম জানল জেনি। মাংস কেনার জন্যে দোকানে ভিড় করেছেন গ্রামের কালো পোশাকের বৃদ্ধা মহিলারা, তাই ওখানে অনোরিয়াকে আবারও বলতে হলো, উমোর বন্ধু ইতালির

কারাবিনিয়ারির কর্নেল বার্নাদো গুগলির দত্তক নেয়া মেয়ে জেনি। তাঁদের সঙ্গেই থাকবে এখন থেকে। এতে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা দোলালেন বুড়ি মহিলারা। তাঁদের নিজেদের একেকজনের রয়েছে পনেরো-ষোলোটা ছেলে-মেয়ে। গোজোর মহিলাদের ধারণা, যত বড় হবে পরিবার, ততই ভাল। এরপর শাক-সবজি ও ফলের দোকানে গেলেন অনোরিয়া। প্রতিটি জিনিসের নাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইল জেনি।

গাড়ির দিকে যাওয়ার পথে নতুন খোলা এক বটিক দোকানের পাশ দিয়ে চলেছে ওরা, এমন সময় জানালার দিকে চেয়ে একটা পোশাকের প্রশংসা করল জেনি। খপ্ করে ওর হাত ধরলেন অনোরিয়া, আরেক হাতে ধরেছেন টমের হাত, ঢুকে পড়লেন দোকানে। জেনিকে বললেন, 'আগেই টমের পোশাক কেনা হয়ে গেছে। সামনের শনিবার নিডো আর লুসির দ্বিতীয় বিবাহ-বার্ষিকী। মস্ত অনুষ্ঠান হবে, জেনি, তোমাকে জিন্স পরলে তখন ভাল দেখাবে না।'

খুব সুন্দর, লাল একটি ড্রেস বাছাই করলেন অনোরিয়া। ওটা কিনতে পেরে এতই খুশি হলেন, জেনি মুখ ফুটে বলতে পারল না, রংটা বেশি উজ্জ্বল লাগছে ওর। বটিকের মালিক অবশ্য জানালেন, পোশাকটা জেনির তুলনায় একটু বড়। তাতে বাস্তববাদী মহিলা অনোরিয়া জেনিকে দেখিয়ে বললেন, 'আমাদের মেয়েও বড় হয়ে উঠছে, ওজনও বাড়ছে, আগামী কয়েক দিনের ভেতর এই পোশাকের জন্যে উপযুক্ত হয়ে যাবে।'

পোশাক না পাল্টে তার বদলে চওড়া, কালো এক চামড়ার বেল্ট কিনলেন তিনি। ওটা ঠিকভাবে আটকে রাখবে জেনির ড্রেস। কিন্তু এত সুন্দর পোশাকের সঙ্গে মানানসই জুতো না হলে চলে না। কাজেই টম ও জেনিকে নিয়ে জুতোর দোকানে গেলেন অনোরিয়া।

মাল্টা ছেড়ে যাওয়ার আগে দেড় শ' মাল্টিয পাউণ্ড দিয়ে গেছে রামিন। ওটা খরচ করতে চাইল জেনি, কিন্তু কোনও কথাই শুনলেন না অনোরিয়া। বললেন, 'সবসময় আমার পাশে থেকে, সবার কাপড় ধোও, খাবারের বাসন-পেয়ালা পরিষ্কার করো, তাই ড্রেস, বেল্ট আর জুতো উপহার দিচ্ছি।'

খামারবাড়িতে ফিরে ফসলের মাঠে পাজেরো তাজার পাশে কাজ করতে গেল টম। সবার লাঞ্চ তৈরির জন্য অনোরিয়ার পাশে কাজে নামল জেনি। সবসময় দুপুরে আয়োজন হয় দিনের সেরা খাবার। প্রথমেই তৈরি করল ওরা সবজির ঘন সুপ। অনোরিয়া বললেন, ওই সুপের নাম বিধবার সুপ। আসলে গোজোতে এতই শাক-সবজি মেলে, সবচেয়ে কম দামে তৈরি করা যায় ওই সুপ। এরপর গরুর মাংস ও সবজির ঝোল রাঁধলেন অনোরিয়া। পরিমাণে এতই বেশি, দশজন খেয়েও শেষ করতে পারবে না। জেনিকে বললেন, 'কেউ জানে না, কতজন লোক এসে বসবে লাঞ্চে, তাই একটু বেশিই রাঁধি। এই ডিশের নামঃ কোয়ালাটা। নিডোর বাবার সবচেয়ে প্রিয় খাবার।'

দুপুর বারোটা বাজতেই ফসলের মাঠ থেকে টমকে নিয়ে হাজির হলেন পাজেরো তাজা। কিছুক্ষণ পর টেবিলে ব্যস্ত হয়ে টম ও পাজেরোর বাটিতে খাবার তুলে দিল জেনি। অবাক হয়ে দেখল, বাটি ভরা সুপ শেষ করে আরও বড় একটা বাটি নিয়ে কোয়ালাটার ওপর হামলে পড়লেন পাজেরো। মাংস ও সবজির ঝোলের সঙ্গে সাঁটিয়ে দিলেন আস্ত এক মস্ত পাউরুটি। সঙ্গে গেল নিজের তৈরি এক বোতল ওয়াইন।

টেবিল পরিষ্কারের সময় বেজে উঠল ফোন।

যোগাযোগ করেছে রানা। সংক্ষেপে অনোরিয়ার সঙ্গে কথা বলল। এরপর ডেকে দেয়ায় রানার সঙ্গে কথা বলল উত্তেজিত জেনি।

অনেকক্ষণ কথা হলো ওদের।

প্রথমেই জেনি জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছে, ভাল আছে কি না রানা ও রামিন। এরপর জানতে চাইল, ওরা কোথায় আছে। তখন রানা বলল, ওরা ইতালিতেই আছে। তবে বলতে পারবে না ঠিক কোথায়। ফিরতে আরও কয়েক সপ্তাহ লাগবে। তবে সুযোগ পেলে একবার ঘুরে যাবে গোজো থেকে।

এরপর জেনিকে বলল রানা, 'আগামী সপ্তাহে ভর্তি করে দেয়া হবে তোমাকে স্কুলে।'

'কিন্তু আমি তো স্কুলে যেতে চাই না,' আপত্তি তুলল জেনি।

'স্কুলে না গেলে কিছুই শিখতে পারবে না,' বলল রানা।

'কিন্তু আমি তো এ দেশের ভাষা এখনও শিখতেই পারিনি,' বলল জেনি। 'আরও অন্তত এক থেকে দু'মাস লাগবে এই ভাষা বুঝতে। তার আগে স্কুলে গিয়ে ঘুরে আসা পুরো সময় নষ্ট বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

ওদিক থেকে মৃদু হাসি শুনল জেনি।

'স্কুলে গেলে সময় নষ্ট হবে না,' বলল রানা, 'কার্সেমে একটা স্কুল আছে। ওটা চালায় নানরা। পড়াশোনার সময় ব্যবহার করা হয় ইংরেজি ভাষা। অনোরিয়ার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হয়েছে আমার। উনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করে সব ঠিকঠাক করে রাখবেন।'

হতাশ চোখে অনোরিয়াকে দেখে নিল জেনি। মিটিমিটি হাসছেন মহিলা। ফোনে বলল রানা, 'ওখানে তোমার বয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারবে, তাতে তৈরি হবে বন্ধুত্ব।'

'আমার তো এমনিতেই অনেক বন্ধু।'

'যেমন?'

'যেমন ইয়ে... অনোরিয়া আন্টি, পাজেরো আঙ্কেল... টম... নিডো ভাইয়া... লুসি আপু... তারপর পাজেরো আঙ্কেলকে যে

সাগরের মাছ দিয়ে যায়, সেই লরি বালুচ্চি; ওই যে, যে চোঁ-চোঁ করে খেয়ে শেষ করে ফেলছে আঙ্কেলের সব ওয়াইন। শেষে থাকবে না আঙ্কেলের ভাণ্ডারে কিছুই। তারপর আছে...'

'উঁহুঁ, তোমাকে স্কুলে যেতে হবে,' একটু কঠোর হলো রানা। 'গুগলি, রামিন বা আমি চাই না অশিক্ষিত আর বোকা রয়ে যাও তুমি। আমি ফিরে এসে ভাল দেখে একটা সাইকেল কিনে দেব।'

'সাইকেল!' উত্তেজিত হয়ে উঠল জেনি।

'ওকে ঘুষ দেবে না, রানা!' ঘরের আরেক দিক থেকে ধমক দিলেন অনোরিয়া।

নরম সুরে বলল জেনি, 'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই, আমি স্কুলে যাব। কিন্তু আমার ড্রেসের মত লাল রঙের সাইকেল কিনে দিতে হবে।'

নিডো-লুসির বিবাহ-বার্ষিকীর অনুষ্ঠানের কথা রানাকে খুলে বলল জেনি। তারপর আরও দু'চার কথা শেষ করে ফোন রেখে দিল রানা।

কিচেনে কাজ করতে গিয়ে অনোরিয়াকে বলল জেনি, 'আমার কখনও সাইকেল ছিল না... জানিও তো না কী করে চালাতে হয়!'

'আমি খুব ভাল চালাতে পারি, তোমাকে শিখিয়ে দেব।' হাসলেন অনোরিয়া। 'টমকেও।' এবার কঠোর হলেন তিনি, 'কিন্তু কক্ষণো ভাববে না রানা বা আমার স্বামীর মত করে আমাকে পটিয়ে ফেলতে পারবে। তোমার মত মেয়ের মাথা ঠিক রাখার জন্যে আমার মত কঠোর মহিলার দরকার আছে। নইলে মগজ নষ্ট করে দেবে তুমি সবার।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, আন্টি,' সায় দিয়ে বলল জেনি। মুখে ফুটল না দুষ্টু হাসি। ভাবছে, অনোরিয়ার দেয়া লাল দামি পোশাক, দারুণ সুন্দর বেল্ট বা চমৎকার লাল জুতোর কথা।

পঁয়তাল্লিশ

কে যে কীসে ভয় পাবে, বলা মুশকিল। হয়তো সামান্য এক নিরীহ মাকড়সা দেখে আত্মা কেঁপে গেল কারও, অথচ অন্যরা মজা পাওয়ার জন্য পুষছে ওই একই জাতের মাকড়সা। আসলে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব হলেও ভয়কে পাত্তা দেয় না মানুষ।

আতঙ্ক যে-কোনও মানুষের বিপক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র, ওটার কারণে খুব সহজেই কাবু হয় যে-কেউ। আর এটা ভাল করেই জানে জিয়ান্না ক্যান্টারায়া। তরুণ বয়সে নিজেও ওটার শিকার হয়েছে। আতঙ্ক কীভাবে গ্রাস করে, তা নিজের এবং অন্যের বেলায় দেখেছে। এখন ডেস্কের ওদিকে বসে আছে বয়স্ক লোকটা। তার ভেতর সে দেখছে ওই ভয়ানক আতঙ্ক। কিন্তু ওই দু'চোখে ভয় দেখবে, আগে ভাবতে পারেনি।

সেই কচি বয়স থেকেই কোসা নস্ট্রা বা মাফিয়ার সঙ্গে আছে বেনেটো ম্যাসোরো। তার বাবা আর তিন চাচা মারা গেছে জেলে। প্রায় অসভ্য এলাকা ক্যালাব্রিয়ায় মস্তানি করত তারা। ম্যাসোরো সতেরো বছর বয়সে দেশের উত্তর দিকে, নেপলসে আসে দূর সম্পর্কের চাচাত এক ভাইয়ের কাছে। বাপ-চাচার পথ ধরে। বড় কোনও পদ কখনও পায়নি।

তার প্রথম কাপো খুন হয়েছিল অন্তর্দলীয় লড়াইয়ে। তখন তুঙ্গে উঠেছে মাফিয়ার কয়েকটা দলের যুদ্ধ। খুন হয়ে যাচ্ছে শত

শত লোক। বাধ্য হয়ে মিলানে সরে আসে ম্যাসোরো। বলতে গেলে, সারাজীবন ধরেই প্রাণ বাঁচিয়ে চলেছে। সুযোগই ছিল না মই বেয়ে ওপরে ওঠার। নাক ভাসিয়ে রাখতে গিয়েই পেরিয়ে গেছে জীবন। আর এ জীবনে কম দেখেনি, মানুষ খুন হয়ে গেলেও কোনও বিকার হয় না তার।

গত কিছু দিন ধরে দলের বুড়োদের সঙ্গে আলাপ করছে ক্যান্টারায়া। মনে আশা, জরুরি তথ্য পাবে, যেগুলো কাজে আসবে ওর বা রানার। দাওয়াত দিয়ে পুরনো সদস্যদেরকে অফিসে আনছে, জানতে চাইছে তাদের পরিবারের কথা। কারও যদি কেউ-ই না থাকে, সেক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করছে, তার জন্য কী করতে পারে। জানিয়ে দিচ্ছে, ব্যক্তিগত সমস্যা বা আর্থিক দিক যতটা পারা যায় দূর করবে সে।

আর এ কাজ করতে গিয়ে নিজেকে মানুষ বলে মনে হচ্ছে জিয়ান্না ক্যান্টারায়ার। সে যেন অপরাধী কোনও সংগঠনের নেতা নয়, সত্যিকারের কোনও করপোরেশনের চেয়ারম্যান।

এখন পর্যন্ত সব মিলে পনেরোজন বুড়ো সদস্যের সঙ্গে দেখা করেছে সে। প্রতিবার তা ছিল সাক্ষাৎকারের মত। শেষে জানতে চেয়েছে, তারা জানে কি না দ্য ডায়মণ্ড রিং সম্পর্কে। বোকার মত ক্যান্টারায়ার চোখে চেয়ে মাথা নেড়েছে তারা। ভাবতে শুরু করেছিল জিয়ান্না, আসলে কিছুই নেই দ্য ডায়মণ্ড রিং বলে। কিন্তু বেনিটো ম্যাসোরোর চোখ দেখে হোঁচট খেয়েছে সে।

এত দ্রুত ঝট্ করে মুখ তুলে দেখল বুড়ো, যেন খেয়েছে বৈদ্যুতিক শক। ওই দু'চোখে ভয়ানক ভয়।

'দ্য ডায়মণ্ড রিং,' আবারও উচ্চারণ করল ক্যান্টারায়া।

একবার তাকে দেখল বুড়ো, চোখে আবারও ফুটে উঠল ভীষণ ভয়। চোখ সরিয়ে এদিক ওদিক দেখল। মনে হলো দেয়ালের প্যানেল থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে ভয়ঙ্কর কোনও জন্তু, আর

তখনই মরতে হবে তাকে।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল ক্যান্টারায়া।

আরও কিছুক্ষণ পর কাঁপা স্বরে জিজ্ঞেস করল বুড়ো, 'কী জানতে চান, ডন ক্যান্টারায়া? আমি বুড়ো লোক, রোদে বসে থাকি মরার অপেক্ষায়।'

মৃদু হাসল কাপো জিয়ান্না। 'ম্যাসোরো, অবসর নেয়ার আগে কাজ করতে আমার দুলাভাইয়ের হয়ে। মঙ্গল হোক তাঁর। তার আগে কাজ করতে তাঁর বাবার হয়ে। তাঁরা কি অন্যায় করেছেন তোমার প্রতি?'

খুব সতর্ক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ম্যাসোরো। 'তা কখনও করেননি তাঁরা। সবসময় ভেবেছি, তাঁরা আমার পরিবারের একজন। আমি তাঁদের সন্তান।'

'তুমি এখনও এই পরিবারের একজন,' বলল ক্যান্টারায়া। 'যদিও তোমার প্রভুরা চলে গেছে স্বর্গে।'

'আপনি আসলে কী জানতে চান, মালিক?'

'জানতে চাই দ্য ডায়মণ্ড রিং সম্পর্কে।'

আবারও ঘরের চারপাশে ঘুরতে গেল বুড়োর দু'চোখ। আরামদায়ক চেয়ারে বসে অস্বস্তির ভেতর পড়ে গেছে। উশখুশ করছে।

আরও ধৈর্য ধরল ক্যান্টারায়া।

কিছুক্ষণ পর নিচু স্বরে কর্কশ, ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠে বলল বুড়ো: 'ওরা আমাদের কেউ নয়। আমাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই।'

'তা জানি। কিন্তু ওরা কারা?'

যেন নিজের সঙ্গে ফিসফিস করছে, এমনভাবে বলল বুড়ো, 'ওদের তুলনায় আমরা স্বর্গের দেবতা।. এমন কী আমাদের খারাপরাও সাধু-সন্ত। ওদের চেয়ে অশুভ কেউ নেই। নরকের কীট হিটলারও ছিল ওদের তুলনায় সামান্য শিশু। ওদের কথা

ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়।'

কথাটা শুনে অবাক হয়েছে ক্যান্টারায়া, সামনে ঝুঁকে বসল। 'তারা এত ভয়ঙ্কর খারাপ কোন্ দিক থেকে?'

হোঁচট খেয়ে সামনে ঝুঁকল বুড়ো, পরক্ষণে নাড়ল মাথা। ক্যান্টারায়ার চোখে চোখ রেখে বলল, 'মাফ করবেন, ডন, কিন্তু মনে করি না আপনার উচিত ওই ইবলিশগুলোর ব্যাপারে খোঁজ নেয়া। আপনার দুলাভাইয়ের বাবা একবার খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন বলেই মরতে হয়েছে তাঁকে।'

চমকে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত পর বলল ক্যান্টারায়া, 'উনি মারা যান ক্যানসারে।'

খুব ধীরে মাথা দোলাল বেনেটো। বুক পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল ও গালের ঘাম মুছল। রুমাল রেখে তাকাল ডেস্কের চকচকে অংশে। ফিসফিস করে বলল, 'ওরা তা-ই বলে। কিন্তু ওই দলের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন তিনি। হঠাৎ করেই ক্যানসার হয়েছিল তাঁর। বয়স মাত্র তেতাল্লিশ বছর। মাত্র এক মাস আগে ছিলেন তরতাজা ষাঁড়ের মত, পরের মাসেই কঙ্কালের মত শুকিয়ে মরে গেলেন।'

'তার মানে কী?'

কাঁধ ঝাঁকাল বুড়ো। 'ওদের ব্যাপারে আরও তথ্য পেতে চেয়েছিলেন তিনি।'

'তুমি কি বলতে চাও, ওরা ক্যানসার ধরিয়ে দিয়েছিল?' জানতে চাইল ক্যান্টারায়া।

'শুধু বলব, তাদের আছে অদ্ভুত সব ক্ষমতা। এমন ক্ষমতা, যাতে আমাদের কোনও অস্ত্র কাজে আসে না।'

ক্যান্টারায়ার মনে পড়ল, এই লোক বড় হয়েছে ক্যালাব্রিয়ার দক্ষিণ পাহাড়ি এলাকায়। বুক ভরা সন্দেহ আর কুসংস্কার।

'এসব ক্ষমতা আছে বুঝলাম, এ ছাড়া আর কী করে এরা?'

জানতে চাইল ক্যান্টারায়া।

'ওরা শয়তানের পূজা করে। খুন করে মেয়েদেরকে।'

'তাই?'

মাথা দোলাল বুড়ো। 'তা-ই জানি। আর কিছু জানি না।'

'আর কিছুই জানো না?' কঠোর চোখে দেখল ক্যান্টারায়া।

চুপ করে থাকল বুড়ো। কিন্তু চোখে অপরাধ বোধ।

'ঠিক করে বলো, আর কী জানো,' ধমক দিল মাফিয়া ডন। 'নইলে কুকুর দিয়ে খাওয়াব তোমাকে।'

'তা-ও বুঝি ভাল,' বিড়বিড় করল ম্যাসোরো।

'তুমি চিনতে তাদের কাউকে,' জোর দিল ক্যান্টারায়া। 'এখন গোপন করছ। আমি জানতে চাই তাদের সম্পর্কে।'

কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবল মানুষটা, তারপর নিচু স্বরে বলল, 'তাদের এক দুর্গে দাওয়াত পেয়ে গিয়েছিলাম অশুভ অনুষ্ঠানে। তখন কী মনে করে তাদের বড় এক নেতার খাতা পেয়ে লুকিয়ে রাখি মস্ত বড় লাইব্রেরিতে। তা এক বছর আগের কথা। সন্দেহ করেনি কেউ, বিপদে না পড়েই বেরিয়ে আসি। কিন্তু মাত্র তিন দিন পর জানলাম, যারা পাহারা দিত দুর্গ, নদীতে ভেসে উঠেছে তাদের সবার বিকৃত লাশ।'

'ওই খাতা এখন কোথায়?'

মাথা নিচু করে ফেলল বুড়ো ম্যাসোরো। কিছুক্ষণ দ্বিধা করে জানিয়ে দিল তথ্যটা।

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ইশারা করতেই ঘর ছেড়ে বিদায় নিল বুড়ো। পুরো পনেরো মিনিট থম মেরে বসে থাকল ক্যান্টারায়া। চিন্তা গুছিয়ে নেয়ার পর ফোন দিল মৃত দুলাভাইয়ের মা-র কাছে।

কম করে হলেও ভদ্রমহিলার বয়স নব্বুই।

কয়েক ঘণ্টা ধরে কমপিউটার মনিটরের দিকে চেয়ে আছে মেজর

কোসিমা পাধানি। আরও বেশ কিছু তথ্য পেয়েছে গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তার বিষয়ে। অবশ্য, সেসব কাজে আসবে কি না, তা এখনও জানে না।

পাধানি কমপিউটার ঘাঁটলে বেশির ভাগ সময়েই পেয়ে যায় দরকারী তথ্য। এরই ভেতর জেনে গেছে, ওই গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তার বাবা ছিল ইতালির ফ্যাসিস্ট পার্টির অন্যতম অফিশিয়াল, তরুণ বয়সে হয়ে ওঠে মুসোলিনির ব্যক্তিগত সহকারী।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর লুকিয়ে পড়ে কোথায় যেন। সত্তর দশকে আবারও নাক ওপরে তুলে জানান দেয়, সে বেঁচে আছে। কোনও অপরাধ প্রমাণ না হওয়ায় তাকে ছেড়ে দেয়া হয় আদালত থেকে। ওই একইভাবে রক্ষা পেয়েছিল গিয়ারডিনি ক্যালভেসিওর বাবা। অবশ্য সে মারা গেছে আশির দশকে।

কর্নেল বার্নাদো গুগলির নির্দেশে, এরই ভেতর ওই দু'জন এবং তাদের পরিবারের ওপর চোখ রাখছিল কারাবিনিয়ারির গুপ্তচররা। কাজে দক্ষ ও পেশাদার, কিন্তু খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেছে, নেপলস বা মিলান শহর ছেড়ে স্রেফ অদৃশ্য হয়েছে গিয়ারডিনি ক্যালভেসিও এবং গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তা।

ছেচল্লিশ

শুকিয়ে যাওয়া আপেলের মত কুঁচকে গেছে মহিলার প্রাচীন মুখ,

কিন্তু মগজ একেবারে ক্ষুরের মত মারাত্মক ধারালো।

দুলাভাইয়ের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের পর মহিলার সঙ্গে আর দেখা হয়নি ক্যান্টারায়ার। এ কারণে অপরাধ বোধ কাজ করছে মনে। এখন সুযোগ পেয়ে দুঃখ প্রকাশ করল, আসলে এত ব্যস্ত থাকে, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সময় করে আসতে পারে না।

পুরু চশমার ওদিক থেকে, সামান্য টিটকারির চোখে মাফিয়া ডনকে দেখলেন তিনি। অবশ্য খুব খুশি হলেন সাদা ও লাল গোলাপের বিশাল বাকেট পেয়ে। বয়স্কা ইতালিয়ান মহিলাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে অস্ত্র হিসেবে ওই ঝুড়ি সঙ্গে রাখে ক্যান্টারায়া, তাতে কাজ দেয় চমৎকার।

সাবধানে দ্য ডায়মণ্ড রিং বিষয়ে কথা পাড়ল ক্যান্টারায়া। কিন্তু তার আগে আলাপ জুড়ল বাজে আবহাওয়া, নোংরা রাজনীতিকদের লজ্জাজনক লোভ, সাধারণ মানুষের দৈনিক খরচ বেড়ে যাওয়া আর মানুষের নীতিহ্রাসের বিষয়ে।

ক্যান্টারায়ার পেটে আরও কিছু আছে, কিন্তু বলছে না, কাজেই জানতে চাইলেন মহিলা, আসলে কী কাজে এসেছে সে।

নিচু ও আরামবিহীন ছোট্ট চেয়ারে বসে আছে ক্যান্টারায়া, দুই হাঁটু উঠে এসেছে থুতনির কাছে। মস্ত ঘরে ঠেসে রাখা ভারী সব আসবাবপত্র, স্পষ্ট বোঝা গেল মোটেও আধুনিকতা পছন্দ করেন না ঘরের মালিক। পুরু, ঘন কালচে পর্দা ঢেকে রেখেছে জানালা। ওদিক থেকে আলো আসছে না, কিন্তু ঘরের ছাতে জ্বলছে প্রকাণ্ড এক ঝাড়বাতি।

'সেনোরা বেরলিংগার,' সম্মানের সঙ্গে বলল ক্যান্টারায়া, 'আমি আসলে এসেছি আপনার উপদেশ পাব, সেই আশায়।'

মহিলার পাশেই টেবিল। সেখানে কারুকার্যময় চাইনিয ফুলদানীতে বাকেটের গোলাপ রাখল কাজের মেয়ে। ওদিকে ঝুঁকে হাড্ডিসার আঙুলে ফুল কাছে টেনে শুঁকলেন সেনোরা

বেরলিংগার। 'তুমি অবাক করলে,' কয়েক মুহূর্ত পর বললেন। 'বলো তো, একজন ক্ষমতাশালী কাপো কেন উপদেশ চাইবে বুড়ি মহিলার কাছে? আমার ধারণা, তুমি উপদেশ নিতে আসোনি, তোমার দরকার জরুরি তথ্য।'

এ কথায় অস্বস্তি নিয়ে খুক-খুক করে কাশল ক্যান্টারায়া। এবার ভান না করেই বলল, 'গত দু'দিন আগে কথা হচ্ছিল আমাদের পুরনো এক লোকের সঙ্গে।'

'নাম কী তার?'

'বেনিটো ম্যাসোরো।'

পুরু কাঁচের চশমার ভেতর দিয়ে ক্যান্টারায়াকে দেখছেন সেনোরা বেরলিংগার। কয়েক মুহূর্ত পর মাথা দোলালেন। 'হ্যাঁ, ওর কথা মনে আছে। ...বছর চল্লিশেক আগে তরুণ ছিল।'

হাসল ক্যান্টারায়া। 'তাই ছিল, সেনোরা। আপনাকে খুব সম্মান করে। আমাকে বলেছে, আপনার সঙ্গে দেখা হলে যেন পৌঁছে দিই তার শ্রদ্ধা।'

'বেনিটো ম্যাসোরোর বিষয়ে কী জানতে চাও?'

মূল বিষয়ের আরও গভীরে গেল জিয়ান্না, 'আমাকে বলেছে, ওর ধারণা: আপনার স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দ্য ডায়মণ্ড রিং নামের এক গোপন সংগঠন।'

অনেকক্ষণ ক্যান্টারায়ার চোখের দিকে চেয়ে রইলেন সেনোরা বেরলিংগার। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছিল ক্যানসারে।'

'তা জানি, সেনোরা। আমি দ্য ডায়মণ্ড রিং সম্পর্কে কথা তুলতেই বুড়ো বেনিটো ম্যাসোরোর চোখে ভীষণ ভয় দেখতে পেয়েছি, তাই আগ্রহী হয়ে উঠেছি।'

জড়িয়ে রাখা কালো শালের নিচে শীর্ণ কাঁধ ঝাঁকালেন সেনোরা। 'বেনিটো ম্যাসোরো এসেছিল ক্যালাব্রিয়া থেকে।

কুসংস্কার ভরা হারামি একদল লোকের এলাকা।'

মহিলার শেষ কথা শুনে একটু চমকে গেছে ক্যান্টারায়া।

ওর বিস্ময় দেখে হাসলেন সেনোরা বেরলিংগার। 'হ্যাঁ, ওদেরকে দেখেছি ভীতু ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ হিসেবে। সাহস ছিল, কিন্তু যেসব গোপন বিষয় বুঝত না, খুব এড়িয়ে চলত।'

'কী ধরনের গোপন বিষয়, সেনোরা?'

কিছুই পাত্তা না দেয়ার সুরে হাসলেন সেনোরা বেরলিংগার। নিষ্ঠুর শোনাল কণ্ঠ: 'ওরা সবাই রাতের আঁধারকে ভয় পেত। যাজক যেসব রহস্যের ব্যাখ্যা দিতে পারত না, সেসবে খুব ভয় ছিল। মন ভরা অশুভ অভিশাপের কথা। যদিও, আমার দেখা এমন কোনও দক্ষিণ ক্যালাব্রিয়ার লোক দেখিনি, যে আসলে নিজে যথেষ্ট অশুভ নয়।'

বড় করে দম নিয়ে আবারও আগের প্রসঙ্গে ফিরল ক্যান্টারায়া, 'সেনোরা, আপনি কি দ্য ডায়মণ্ড রিং সম্পর্কে কিছু জানেন?'

পাশের টেবিলে চাপড় দিলেন মহিলা। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল ঘরের দরজা। ভেতরে ঢুকল কাজের মেয়ে, তার বয়সও প্রায় সেনোরা বেরলিংগারের সমান।

হাতের ইশারা করলেন সেনোরা, তাতে এগিয়ে এসে কাবার্ড থেকে লালচে একটা বোতল বের করে দুটো গ্লাসে তরল ঢালল সে। একটা দিল ক্যান্টারায়ার হাতে, অন্যটা সেনোরা বেরলিংগারের হাতে। সেনোরার চেহারা দেখে ক্যান্টারায়া বুঝল, এই প্রসঙ্গ পছন্দ হয়েছে বয়স্কা মহিলার।

নাকের কাছে তুলে গ্লাসের তরল শুঁকল ক্যান্টারায়া।

'অনেক পুরনো কনিয়্যাক,' বললেন সেনোরা বেরলিংগার। 'ওই এক ডজন কেস দিয়েছিলেন মৃতপ্রায় এক বুড়ো কাপো।' হাসলেন মহিলা। 'জানতেন না, মরতে বসেছেন আমার স্বামীর

বুলেটে।'

গ্লাস তুলে বলল ক্যাণ্টারায়া, 'ড্রিঙ্ক করছি আপনার স্বামীর স্মৃতি মনে করে... মস্ত মানুষ ছিলেন।' সিল্কের মত মসৃণভাবে গলা দিয়ে নেমে গেল দারুণ স্বাদু মদ। এক মুহূর্ত তৃপ্তি নিয়ে চুপ করে থাকল ক্যাণ্টারায়া, তারপর ফিরল আগের প্রসঙ্গে: 'আপনি কি আরও কিছু শুনেছেন দ্য ডায়মণ্ড রিং সম্পর্কে?'

'খুব সামান্য,' বললেন সেনোরা, 'ওদের সংগঠন শুরু হয়েছিল আঠারো শ' সালের দিকে। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে প্রথম গুজব শোনা গেল ফ্যাসিস্ট আমলে।'

'কী ধরনের গুজব, সেনোরা?'

'ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে তাদের। তখন কোসা নস্ট্রাকে শেষ করে দেয়ার জন্যে সেনাবাহিনী আর পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছিল মুসোলিনি। পর পর দু'বার জেলে যেতে হয় আমার বাবাকে। কোনও অপরাধ না করেও। বুঝতেই পারছ।'

'সেই সময়ের কথা শুনেছি। তখন মাথা চাড়া দিল দ্য ডায়মণ্ড রিং? কী করত তারা?'

'আমার বাবা বলেছিলেন, ওরা ফ্যাসিস্ট নেতাদেরকে সরবরাহ করত ড্রাগ্স্ ও মেয়েমানুষ। মুসোলিনি নিজেও ড্রাগ্স্ আর মেয়েমানুষে আসক্ত ছিল। ওর মত বুড়ো ছাগলও কম করেনি। বুঝতেই পারছ, সেনোর, কোসা নস্ট্রার ওপর হামলা শুরু হলে ফ্যাসিস্টদের ড্রাগ্স্ বা মেয়েলোক জোগাড় করে দেয়ার কেউ ছিল না। তখন মাঠে নামল দ্য ডায়মণ্ড রিং।'

'আপনি নিশ্চিত?' সামনে ঝুঁকল ক্যাণ্টারায়া।

'আমার বাবা তা-ই বলেছিলেন। দ্বিতীয়বার জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর মাত্র কয়েক মাস বেঁচে ছিলেন। মৃত্যু হয়েছিল বিষক্রিয়ার কারণে।'

'তাই? আমি শুনেছিলাম উনি মারা গেছেন হার্ট অ্যাটাকে।'

'না, তা নয়, বিষক্রিয়ায়,' জোর দিয়ে বললেন সেনোরা বেরলিংগার, 'খুব ধীরে ধীরে তাঁকে গ্রাস করেছিল ওই বিষ। শুনেছি, ওই বিষ সরবরাহ করেছিল দ্য ডায়মণ্ড রিং।'

বেকায়দা চেয়ারে অস্বস্তি নিয়ে হেলান দিল ক্যান্টারায়া। দুই হাঁটুর মাঝ দিয়ে দেখছে বয়স্কা মহিলাকে। জানতে চাইল, 'এই বিষয়ে জানতেন আপনার স্বামী?'

মাথা দোলালেন মহিলা। 'অনেক পরে। ওকে এসব বলে ভুল করেছিলাম। প্রথমে ভেবেছিল, অন্য সব মেয়ের মতই সন্দেহ নিয়ে বসে আছি। কিন্তু তারপর খোঁজখবর শুরু করল দ্য ডায়মণ্ড রিং সম্পর্কে।'

চুপ হয়ে গেলেন মহিলা।

পেরিয়ে গেল কিছুক্ষণ, তারপর বলল ক্যান্টারায়া, 'আর মারা গেলেন তিনি ক্যানসারে?'

'হ্যাঁ। আমি দ্য ডায়মণ্ড রিং সম্পর্কে বলার ছয় মাস পর।'

'তাদের কারণে আপনার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করেন? বুড়ো লোকটা তাই বলেছে।'

আবারও কাঁধ ঝাঁকালেন মহিলা। 'বিষ সম্পর্কে জানা আছে। ক্যানসার সম্পর্কে তেমন কিছু জানা নেই আমার।'

সোজা হয়ে বসল ক্যান্টারায়া। ব্যথা শুরু হয়েছে দুই হাঁটু জুড়ে। 'দ্য ডায়মণ্ড রিং সম্পর্কে আরও তথ্য পেতে চাইলে, কী করতে হবে আমাকে?'

'কথা বলতে হবে কোনও যাজকের সঙ্গে, তাতেই হবে।'

আরেকটু হলে গ্লাসের কনিয়্যাক ফেলে দিত ক্যান্টারায়া। 'যাজক?'

হাসলেন সেনোরা বেরলিংগার। চিকন মানুষ তিনি, ঠোঁটে অশুভ হাসি। 'হ্যাঁ, যাজকের সঙ্গে যোগাযোগ করো। কিন্তু তাকে হতে হবে বিশেষ যাজক। ভ্যাটিকানের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক

কেমন? আমার বাবা, স্বামী বা ছেলের সঙ্গে ভাল ছিল তাদের সম্পর্ক।'

তিক্ততা চেপে হাসল ক্যান্টারায়া। 'সম্পর্ক ঠিকই আছে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক দিক থেকে। এ ছাড়া উপায়ও নেই।'

সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন সেনোরা বেরলিংগার। 'তা হলে তাদের মাধ্যমে যোগাযোগ করো শয়তান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোনও যাজকের সঙ্গে।'

'শয়তান সম্পর্কে কী জানবে যাজক?'

হাসলেন সেনোরা বেরলিংগার। 'সবই জানে ওরা। শত্রুর সম্বন্ধে তথ্য জোগাড় করবে যে-কেউ, এটাই স্বাভাবিক না?'

সাতচল্লিশ

কোপেনহেগেনের পুলিশ ফোর্সের স্ট্র্যাটেজি মিটিং ও সেমিনারে সবসময় যোগ দেয় পিটার লারসেন। বাধ্য না হলে কথা বলে না। অবশ্য, সিনিয়র কোনও অফিসার ওর ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে বোকার মত মন্তব্য করলে, ছেড়ে কথা বলে না। সেসব মিটিং এক রকম, কিন্তু এখন যে মিটিঙে এরা বসেছে, তার থই পাচ্ছে না পিটার।

প্রথম কথা, এই মিটিঙের টেবিলে হাজির হচ্ছে দারুণ সব খাবার, এতে যথেষ্ট সন্তুষ্ট বোধ করছে ও। প্রেযো ফিসো বোর্ডিং হাউসের ডিম আকৃতির টেবিল ঘিরে বসেছে সবাই। অনেকটা

নিচে দেখা যাচ্ছে নেপলসের ঝলমলে রঙিন বাতি। সেসব ছাড়িয়ে দূরে বিশাল আকৃতির কালো উপসাগর। তার বুকে এখানে-ওখানে ট্রলার বা নৌকার টিমটিমে হলদে বাতি। মারাত্মক গম্ভীর চেহারার এক বৃদ্ধ দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করছে খাবার।

খুব দ্বিধার ভেতর পড়ে গেল লারসেন। একবার মনে হলো, ওর থাকার কথা নয় এই মিটিঙে। আবার এ-ও মনে হচ্ছে, কী করে যেন জড়িয়ে গেছে সবকিছুর সঙ্গে। টেবিলের পেটের কাছে বসেছে। এক মাথায় মাসুদ রানা। এক পাশে রামিন, অন্য পাশে কর্নেলিস। আরেক পাশে রেমারিক। ওর বামে কর্নেল বার্নাদো গুগলি। ডানে পাধানি, লাজুক ভূত, অসি কালাহান, জ্যাঁ মউরোস; পিটারের বামে ফুরেলা, ডানে পেঁচা ব্রিয়াঁ ফুলজেন্স।

পিটার ভাবছে, ও নিজে, কর্নেল গুগলি, পাধানি আর লাজুক ভূত ছাড়া এই টেবিলের প্রত্যেকে একই দলে কাজ করেছে। শুনেছে, তেরো বছর বয়সে এতিম ফুরেলাকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছিল রেমারিক। এমন কী ওই ছোকরাও সহজ মানুষ নয়। কেউ ঠকিয়ে দেবে, তা হওয়ার উপায় নেই।

ডিনারে যা দেয়া হয়েছে, তা রাজকীয়। খাওয়ার শুরুতে অ্যান্তিপাস্তি, তারপর পাস্তা দেলা ফ্রুট্টা দি মেয়ার। মেইন কোর্সে কার্নিয়া আল ফোরমো। ওটা রাঁধা হয়েছে সাদা ওয়াইন ও জলপাইয়ের তেলে। এ ছাড়া, আছে অন্যান্য খাবার। ডেযার্ট হিসেবে এল শারলোত্তে দে ফ্রাগোলে।

রানার ডানহাতের ব্যাণ্ডেজ লক্ষ করল পিটার। আবারও মনে হলো, আসলে এই কঠোর লোকগুলোর ভেতর স্থান নেই ওর। রানার জায়গায় নিজেকে কল্পনা করল। অসহায় অবস্থায় বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে। পিস্তল তাক করেছে এক মাফিয়া ডন। এবার মেরে ফেলা হবে!

হালকা ভঙ্গিতে আলাপ করছে সবাই, যদিও বিষয় গুরুতর।

অবশ্য ক্যান্টারায়ার বুড়ি মা-র কিডন্যাপিঙের কথা উঠলে হেসে ফেলল পিটারও। লাঠি দিয়ে রামিনের মুখে বাড়ি দিয়েছিলেন মহিলা। ওই কথা মনে করে দুঃখের হাসি হাসল রামিন, একবার স্পর্শ করে দেখে নিল চোয়ালটা। ওখানে এখনও ব্যথা। এরপর জানাল, কী সব গালি দিয়েছেন বুড়ি। আর পরে ছেলের বাড়িতে পৌঁছে দেয়ায় ফোকলা হাসি দিয়ে যেসব মিষ্টি কথা বলেছেন, সেসবের কারণে ম্লান হয়ে গেছে গালির তোড়। তখন উনি দু'হাত তুলে প্রার্থনা করেছেন, যেন তাঁর ছেলেকে মানুষ করার আক্কেল হয় ঈশ্বরের। জিয়ান্নার খুলির ভেতরে সামান্য মগজ দেয়া উচিত ছিল তাঁর, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর, আসলে নাকি সব দোষ ওই নিষ্ঠুর ঈশ্বরেরই।

এরপর সিরিয়াস হয়ে উঠল আলাপ।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ইটালির কোথাও নিরাপদ নয় রানা, জানাল রামিন। অন্যান্য মাফিয়া পরিবারের প্রতিশোধ-স্পৃহা দূর হয়নি। আবারও সুযোগ দিলে তার পরিণতি হবে ভয়ানক।

পিটার ভেবেছিল, রামিনের এসব রুঠা কথা শুনে অপমানিত বোধ করবে রানা। কিন্তু তা না করে নীরবে ছোট ভাইয়ের কথা হজম করল বাঙালি যোদ্ধা। সব শোনার পর শুধু বলল, 'এরপর আগের চেয়ে অনেক সতর্ক থাকব।'

পিটার লারসেনের মনে পড়ল, কী বোকামিই না করেছিল রামিন আর ও। আর কী সহজেই না ওদেরকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়েছিল মার্সেইল্‌স্-এর গুণ্ডা। এরপর দেখার মত ঝটিকা হামলা করে ওদেরকে ছুটিয়ে আনে রানা। এ কারণেই বুঝতে পারছে পিটার, আসলে এই দলের নেতা রামিন নয়, মাসুদ রানা। মুখে কিছু বলছে তা নয়, স্রেফ তার উপস্থিতিই যথেষ্ট— যেন দরবারে মন্ত্রীদের নিয়ে বসেছে রাজা।

এ টেবিলে বসা প্রত্যেকে সাধারণ মানুষের চেয়ে বুদ্ধিমান।

তাদের কারও মগজের ধার ক্ষুরের মত, যেমন কর্নেল গুগলি। আবার রেমারিক, কালাহান, মউরোস, রামিন, পেঁচা শারীরিক বা মানসিক দিক থেকে দারুণ যোগ্য। কিন্তু তারা কেউ ভুলেও নিজের সঙ্গে তুলনা করছে না রানাকে। মানসিক-দৈহিক ক্ষমতা দলের অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি রানার। চুপ করে আছে, কিন্তু ওকে যেন রক্ষা করছে অদ্ভুত কোনও অদৃশ্য প্রভা বা ক্ষমতা। ভবিষ্যতে কখনও হয়তো ওর মত যোগ্য হয়ে উঠবে রামিন। তবে সেজন্যে আরও অনেক পরিশ্রম করতে হবে তাকে।

বামে বসা পেঁচার দিকে চাইল পিটার। একটু আগে বয়স্ক বৃদ্ধ এসে দিয়ে গেছে ডেযার্ট। তারিয়ে তারিয়ে ওটা খাচ্ছে পেঁচা। তাকে ওখানে বসতে দেয়া হয়েছে এমনি এমনি নয়। দীর্ঘ ওই কোপেনহেগেনের যাত্রায় এক মুহূর্তও পিটারের কাছ থেকে দু'গজের বেশি দূরে যায়নি সে। তাকে বলা যেতে পারে জীবন্ত ছায়া। অদ্ভুত এক লোক। আলাপ করে পিটার বুঝতে পেরেছে, অনেক মানুষ খুন করেছে পেঁচা। নিজের কোনও পরিবার নেই— না মা, না বাবা, না ভাই বা বোন। ভালবাসে মাত্র কয়েকজন মানুষকে। তাদের জন্য জান দিতে দ্বিধা নেই তার। নিখুঁত লক্ষ্যভেদ করতে পারে পিস্তল দিয়ে, তিরিশ ফুটের ভেতর যে কারও বুকে গেঁথে দিতে পারে ছোরা। সর্বক্ষণ কানে গুঁজে রেখেছে ইয়ারফোন। জিজ্ঞেস করে পিটার জেনেছে, ক্লাসিকাল মিউযিক পেঁচার ভালবাসা। মুখস্থ তার শুবার্টের বাজনা, বাদ পড়েনি মোযার্টের অপেরা বা বিটোফেনের সিম্ফনি। সবসময় শুনছে কোনও না কোনও বাজনা।

ডিনারের মেইন কোর্স শেষ হওয়ার পর বর্তমান সমস্যার দিকে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করল রানা। খুলে বলল, হ্যাঁ, ক্যান্টারায়া জানিয়েছে, সে আগেও শুনেছে দ্য ডায়মণ্ড রিং সম্বন্ধে। কথা দিয়েছে, আরও খোঁজ নিয়ে যোগাযোগ করবে।

ভবিষ্যতে ক্যাণ্টারায়ার কোড নেম হবেঃ পাপা। মৃদু হেসে বলল রানা, 'ওই নাম পেয়ে খুশি হয়েছে। গড ফাদারের মত শোনায় বলেই।'

এরপর পাধানি জানাল, নেপলস শহরের সামান্য দূরে মস্ত এক ভিলায় বাস করে গিয়ারডিনি ক্যালভেসিও। এদিকে মিলান শহরের বাইরে গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তার ভিলা। এই দু'জনের ভেতর গূঢ় কোনও যোগাযোগ আছে। তথ্য জোগাড় করছে পাধানি। তাদের নাম জানিয়ে দেয়া হবে ক্যাণ্টারায়াকে। নিজের নেটওঅর্ক ব্যবহার করে খবর জোগাড় করবে সে।

এই পর্যায়ে রানা জানাল, এখন থেকে যতটা সম্ভব কারাবিনিয়ারিকে এড়িয়ে চলবে ওদের দল। কোনও দুঃখপ্রকাশ করতে গেল না রানা, স্রেফ সহজ সুরে কর্নেল গুগলিকে বলল, 'এ-ই ভাল। ভুললে চলবে না, আমরা আছি তোমার এলাকায়, চাই না আমাদের কোনও বেআইনী কাজের দায় তোমার ওপর গিয়ে পড়ুক। কর্তৃপক্ষকে এড়িয়ে চলতে হবে। অবশ্য, পাধানি কোনও জরুরি তথ্য পেলে তা জানিয়ে দেবে রেমারিককে ফোন করে। তাতে উপকৃত হব আমরা।'

নীরবে মাথা দোলালেন কর্নেল গুগলি ও সহকারী পাধানি। চেহারা দেখে মনে হলো, হতাশ হয়েছে লাজুক ভূত। ফুর্তির ভেতর ছিল অ্যাকশনে নামতে পেরে।

নিজের অবস্থান সাবধানে ভাবতে শুরু করল পিটার। সে একজন পুলিশ অফিসার। ভিন দেশে বেআইনী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। এরই ভেতর অংশ নিয়েছে সশস্ত্র কিডন্যাপিঙের সময়। এই দলের সবাই আবারও প্ল্যান করছে গোলাগুলি বা খুনের। বেশ কয়েক মিনিট চুপচাপ ভাবল পিটার, তারপর নিল সিদ্ধান্ত। বয়স্ক লোকটা কালো কফি দিয়ে যাওয়ার পর রানার দিকে তাকাল পিটার। 'এবার আমার ফিরে যাওয়া উচিত ডেনমার্কে।'

চুপ করে থাকল দলের সবাই। তারপর মাথা দোলাল রানা। 'বুঝতে পারছি, পিটার। এসবের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে মাফিয়া। দেশে ফিরবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ভালই করেছ। আমাদেরকে সাহায্য করেছ বলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকলাম। সবসময় চাইব তোমার মঙ্গল হোক। কখনও যদি মনে হয় আমাদের সাহায্য তোমার দরকার, দেরি না করে যোগাযোগ করবে।' একবার রামিনকে দেখল রানা। 'পিটারের ফিরে যাওয়ার টাকা বুঝিয়ে দেবে।'

রামিন কিছু বলার আগেই ডানহাত তুলে বাধা দিল পিটার লারসেন, 'দাঁড়াও, শেষ হয়নি আমার কথা। বলেছি ডেনমার্কে ফিরব, তবে আবারও ফিরছি না এমন কথা বলিনি। পরশু দিন আমার মেয়ের জন্মদিন। তার পরের দিনই আবার ফিরছি।' গরম চোখে রানাকে দেখল। তারপর দেখল দলের অন্যদেরকে। 'তোমরা আমাকে কাপুরুষ মনে করো নাকি! এসবের সঙ্গে প্রথম থেকে আছি আমি। শেষ না দেখে ছাড়ছি না।'

কাঁধ ঝাঁকাল পিটার। 'ঠিক, আমি হয়তো তোমাদের মত অত যোগ্য বা দক্ষ নই, কিন্তু ঠিকই আসব কোনও কাজে।' কর্নেল গুগলি ও পাধানিকে দেখাল। 'তোমরা একটু আগে দূরে সরিয়ে দিলে গোয়েন্দাদেরকে। কারণ বুঝতে পারছি। কিন্তু এ-ও বুঝতে হবে, একবার যুদ্ধে নামলে তদন্তের কাজে চাই যোগ্য কাউকে। ওই কাজে ট্রেনিং আছে আমার। এ ছাড়া, আমাদের চাই অপারেশনাল হেডকোয়ার্টার। ওটার মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হবে, যাতে একে অপরের খবর রাখতে পারে। সঠিক পরিকল্পনা আর সংগঠন না থাকলে যুদ্ধে নেমে ভাল করতে পারবে না কেউ। মার্সেইল্‌স্‌-এ রামিন, আর মিলানে লড়াই করেছে রানা।'

টেবিলের সবার উদ্দেশে এবার বলল পিটার, 'হ্যাঁ, জানি, রানা যোগ্য এবং বুদ্ধিমান নেতা। একবার লড়তে শুরু করলে তখন আমার বা অন্যের সাহায্য ওর লাগবে না। কিন্তু তখনও

তদন্তের কাজ করতে কাউকে না কাউকে চাই। আর ওই কাজই করব আমি।' আরেকবার সবার ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিল পিটার। 'আমি গোয়েন্দা... নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যও আছে... আমার কাজ ওই নোংরা মনের লোকগুলোকে খুঁজে বের করা।'

চুপ করে আছে রানা।

পিটারের কথা বুঝতে পেরে, বারকয়েক মাথা দোলাল গুগলি ও পাধানি।

মুচকি হাসছে ফুলজেন্স।

নীরবতা ভাঙলেন কর্নেল গুগলি, 'লারসেন ঠিকই বলেছে। ট্রেনিং আর অভ্যেসের কারণে বিশেষ ধরনের হয়ে ওঠে গোয়েন্দাদের মন। এমন অনেক কিছু লক্ষ করবে, যা কেউ খেয়ালই করবে না। কোনও কাঠকে দেখে তা গাছ বলে ধরে নেবে না গোয়েন্দা, আরও বহু কিছু জানবে। হয়তো পাধানি বা ক্যান্টারায়ার কাছ থেকে তথ্য পাবে, কিন্তু সেসব ঠিকভাবে মিলিয়ে দেখার কাজ একজন গোয়েন্দার। সেসব বুঝে নিয়ে তারপর তথ্য সঠিক লোকের কাছে পৌঁছে দেবে সে। আমার ধারণা, ভাল গোয়েন্দা লারসেন। ওর সাহায্য পেলে উপকৃত হবে তোমরা।' কর্নেল গুগলি থেমে যাওয়ার পর বেজে উঠল সদর দরজায় ঘণ্টি।

ফুরেলা গেল দেখতে।

ওদের সবার মগে কড়া কফি ঢেলে দিল বুড়ো পরিবেশক।

দু'মিনিট পর ফিরল ফুরেলা। হাতে নীল এনভেলপ। ওটা রানার হাতে দিয়ে বলল, 'কালো একটা ল্যান্সিয়া থেকে নেমে আমার হাতে দিয়েছে। দু'জন তারা। পরিষ্কার বুঝলাম মাফিয়ার লোক। তাদের একজন বলল, ওই খাম উমোর জন্যে।'

এনভেলপ খুলে ভেতরের কাগজ বের করল রানা। পড়তে পড়তে বলল, 'পাপার কাছ থেকে এসেছে। লিখেছে: "গুজব

নয়। ওরা আছে। আমার ধারণা, ড্রাগ্‌স্ বা কিডন্যাপিং শুধু নয়, আরও বহু নোংরা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দুনিয়া জুড়ে। আশা করি আগামী কয়েক দিনের ভেতর আরও নতুন তথ্য পাব, তখন আবার যোগাযোগ করব।

–পাপা।"'

কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখল রানা। চিন্তিত চেহারায় দেখল পিটার লারসেনকে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'ঠিক আছে, পিটার, ঘুরে এসো। মেয়ের জন্মদিনে আমাদের সবার তরফ থেকে চুমু রইল।' রামিনকে দেখল। 'তোমাকে যেতে হবে ব্রাসেলসে। ওখানে পৌঁছে দেখা করবে গগলের সঙ্গে। ও এখন ওখানে। মিলানে বা রোমে আমাদের সেফ হাউস চাই। ওখানে রাখতে হবে দরকারী সব রসদ।' কর্নেলিসের দিকে তাকাল। 'এদিকে, সিম, তুমি যাবে রামিনের সঙ্গে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে এসো।' অসি কালাহান ও জ্যাঁ মউরোসকে দেখল। 'তিন বা চার দিন বিশ্রাম নাও, তারপর যোগাযোগ করবে এখানে পিটারের সঙ্গে।' পেঁচাকে বলল রানা, 'কয়েক দিনের জন্যে মার্সেইল্‌স্ ঘুরে আসতে চাও?'

মাথা নাড়ল পেঁচা ফুলজেন্স। একবার দেখল লারসেনকে। 'পিটারের আপত্তি না থাকলে ওর সঙ্গে ঘুরে আসতে পারি কোপেনহেগেন থেকে। ওই শহরটা পছন্দ হয়েছে আমার।'

খুশি মনে মাথা দোলাল লারসেন।

বুড়ো ওয়েটারকে ডেকে কানে কানে কী যেন বলল রানা। সোজা হয়ে মাথা দুলিয়ে রওনা হয়ে গেল লোকটা। ডাইনিং রুমে ফিরল কয়েক মিনিট পর। সঙ্গে মোটা এক বুড়ি মহিলা। পরনে কালো পোশাক। ঘাড়ের কাছে ধূসর খোঁপা।

উঠে দাঁড়িয়ে মহিলাকে আলিঙ্গন করল রানা, অন্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল: 'ইনি সোফিয়া, আমাদের রাঁধুনি।'

ওর মতই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল রেমারিক ও ফুরেলা। অন্তর থেকে প্রশংসা করল ওরা দু'জন।

তাতে খুশি হয়ে আবারও কিচেনে গিয়ে ঢুকল মহিলা।

সবাই বুঝে গেল, খাবারের সময় আরও দারুণ কিছু আসছে।

'এবার কী করবেন, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল রামিন।

'যোগাযোগ করব সোহেলের সঙ্গে,' বলল রানা, 'হয়তো দ্য ডায়মণ্ড রিং সম্বন্ধে আরও তথ্য পেয়েছে। এরপর কথা আছে ইউরোপে রানা এজেন্সির ছেলেদের সঙ্গে। প্রয়োজনে যেন যোগ দিতে পারে যুদ্ধে।' একটু চুপ করে থেকে তারপর বলল রানা, 'ভাবছি, আগামী ক'দিন ঘুরে আসব গোজো থেকে।'

আটচল্লিশ

ওই একই বিএমডাব্লিউ গাড়িতে করে কোপেনহেগেনে গিয়েছিল পাভলোভা পিটার লারসেন আর হুতুম-পেঁচা ব্রিয়াঁ ফুলজেন্স।

ওরা সকালে গাড়িতে করে রওনা হওয়ার আগে মন্তব্য করেছে রানা, 'আমাদের কোম্পানির একান্ত গাড়ি হয়ে উঠেছে এটা। গগল কোনওভাবেই ফেরত নেবে না, তাই পরে বদলে নিতে হবে মালিকানা।'

দীর্ঘ যাত্রায় গাড়ি চালাতে ভালবাসে পিটার লারসেন। এফএম স্টেশন থেকে শুনছে নানান দেশের পপ গান। কোনও বাধা ছাড়াই ইতালির সীমান্ত পেরিয়ে গেল ওরা। প্যাসেঞ্জার সিটে বসে

এমপি থ্রি প্লেয়ারে ক্লাসিকাল মিউযিক শুনছে পেঁচা। তালে তালে টোকা দিচ্ছে ড্যাশবোর্ডে। প্রকাণ্ডদেহী মানুষ নয় বলে ভালভাবেই এঁটে গেছে আরামদায়ক সিটে। মাঝে মাঝে ইয়ারফোন খুলে দেখে নিচ্ছে, কী ধরনের গান শুনছে পিটার। প্রতিবার ঘোঁৎ করে উঠে আবারও কানে আটকে নিচ্ছে ইয়ারফোন। ভাবছে, মানুষ শোনে এসব ফালতু গান! ওদের দু'জনের ভেতর কথা হচ্ছে না বললেই চলে।

আপাতত সুইস সীমান্তের কাছে ছোট এক হোটেলের উদ্দেশে চলেছে পিটার লারসেন। পেট পুরে ডিনার খেয়ে, রওনা হয়ে ভোরে পৌঁছবে কোপেনহেগেনে। ব্রিয়াঁ ফুলজেন্স জোর দিয়ে বলেছে, একবার থামবে ভাল কোনও সুইস গিফ্‌ট্‌ শপে। পিটারের মেয়ের জন্মদিনে উপহার হিসেবে ঘড়ি দেবে, যেটা থেকে বেরোবে কোকিলের শব্দ।

তখনই পিটার বুঝে গেছে, ওদের পারিবারিক বন্ধু হয়ে উঠতে যাচ্ছে হুতুম-পেঁচা।

একই দিনে ছুটির আমেজে ফুরফুরে মন নিয়ে হাইড্রোফয়েলে চেপে ক্যাপ্রির উদ্দেশে রওনা হয়েছে অসি কালাহান আর জ্যাঁ মউরোস। ঠিক করেছে, ভাল দেখে কোনও হোটেলে উঠে ভঙ্গি করবে, ওরা টুরিস্ট। দু'বন্ধু এখনও বিয়ে-থা করেনি, কাজেই ঠিক করেছে, সম্ভব হলে জুটিয়ে নেবে সুন্দরী দুই তরুণীকে।

'কোনও ঝামেলার ভেতর নাক গুঁজবে না,' সাবধান করেছে মউরোস। 'যা করার আমি করব। তোমার ওই কুৎসিত চেহারা দেখলে গর্তে গিয়ে ঢুকবে যে-কোনও মেয়ে।'

জবাবে টিটকারির হাসি হেসেছে কালাহান। ওর চেহারা যেমনই হোক, কেন যেন ওকে পছন্দ করে মেয়েরা। এ দিকে মউরোসের মুখ ভরা হাজার খানেক ক্ষতের দাগ।

জ্যাঁ মউরোস আর কালাহান পুরনো বন্ধু। আগেও একই দলে কাজ করেছে মার্সেনারির। এখন ভাবছে, শরতের কোমল সূর্য গায়ে মেখে শুয়ে থাকবে সাগর-সৈকতে। খিদে লাগলে হোটেলে ফিরে পেট পুরে খাবে দামি খাবার। আর যদি জুটেই যায় সঙ্গিনী, তো আরও ভাল।

হাইড্রোফয়েলে করে যাওয়ার সময় ওদের প্ল্যান নিয়ে আলাপ করল ওরা। একমত হলো, চমৎকার ভারসাম্য আছে ওদের এই দলে। আগেও নানান দেশে ভাল-মন্দ একদল লোকের সঙ্গে মিশেছে মার্সেনারি হিসেবে। ভাল করেই জানে, অযোগ্য কেউ থাকলে সর্বনাশ, যখন-তখন শত্রুপক্ষ বুঝবে, ওদের দলে আছে দুর্বলতা।

বেশ অনেক বছর ধরে সিম কর্নেলিসকে চেনে ওরা, লড়াই করেছে একই পক্ষে। তবে আগে কখনও ওদের দলে ছিল না রামিন। তবুও ওরা সন্তুষ্ট, রানা নিজ হাতে ট্রেনিং দিয়েছে ওই ছেলেকে। এ ছাড়া, আছে পেঁচা। আত্মবিশ্বাসী মানুষ। যেমন অভিজ্ঞ, তেমনি পেশাদার। পাহারা দিয়ে রেখেছে ডেনিশ পুলিশকে। তার বিপদ হলে সামলে নেবে। ওরা আসলে প্রত্যেকেই পছন্দ করে সত্যিকারের ভাল মানুষ ডেনিশ পুলিশ পিটার লারসেনকে। সে ওদের দলে থাকলে ক্ষতি হবে না। আসলে কঠিন সমস্যার ভেতর যারা সময় পার করে, তাদের ভেতর তৈরি হবেই গাঢ় বন্ধুত্ব। তা কখনও নষ্ট হওয়ার নয়। যেমন রানা ও রেমারিকের বন্ধুত্ব। মার্সেনারি দলে লড়াই করেছে আফ্রিকা এবং অন্যান্য মহাদেশে। খুবই দুঃখজনক, স্ত্রীর কাছে কথা দিয়েছিল বলে অবসর নিয়েছে রেমারিক। যুদ্ধে যে-কোনও আর্মির সেরা মেশিন-গানম্যান হওয়ার যোগ্যতা আছে ওর। বউকে ভালবাসত বলে আর বিয়ে করেনি, চুপচাপ চালায় হোটেল।

মউরোস ও কালাহান সন্তুষ্ট, ওরা লড়বে পরিষ্কার অন্তরের একদল লোকের পক্ষে। আর তাই ঠিক করেছে, রানার কাছ থেকে পারিশ্রমিক হিসেবে চার আনা পয়সাও নেবে না ওরা।

রোম হয়ে বিমানে চেপে ব্রাসেলসে পৌঁছবে রামিন ও সিম্‌স কর্নেলিস। রোম এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড ফোন ব্যবহার করে গগলের সঙ্গে কথা বলল রামিন।

ঠিক হলো, বিকেলে দেখা হবে ব্রাসেলসে।

বিমানে করে যাওয়ার সময় কর্নেলিসকে রামিন বলল, কেন উঠে পড়ে লেগেছে দ্য ডায়মণ্ড রিঙের বিরুদ্ধে।

এতিম শিশু টমের অনুরোধ বা জেনির জীবনের কাহিনি অন্তর ছুঁয়ে গেল কর্নেলিসের। চুপ করে শুনল সব। তখনই মনে মনে বলল, 'টম, যে ওই পথে ঠেলে দিয়েছে তোমার মাকে, তাকে শেষ করতে সাধ্যমত করব আমরা। আর জেনির সর্বনাশ করতে চেয়েছে যারা, তাদেরকেও শায়েস্তা করতে ভুল করব না।'

সারারাত মাল্টা যাওয়ার ফেরিতে থাকল রানা। সাগরে ঘুরতে ভাল লাগে ওর। যদিও ওই ফেরি যাত্রীদের জন্য মোটেও আরামদায়ক নয়। রেমারিকের বন্ধু ক্যাপ্টেন, তাই অনায়াসেই ওপরের ডেকে পেয়ে গেছে গোছানো কেবিন। অবশ্য, রাতের বেশিরভাগ সময় রানা কাটাল স্টার্নে, দেখল সাগরের সাদাটে সব ঢেউ। ভাবল, কী দেখবে গোজোতে গিয়ে।

পরদিন ভোরে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে রানা, এমন সময় বিসিআই-এর সুযোগ্য চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার, (অব.) ব্রিগেডিয়ার সোহেল আহমেদের কাছ থেকে এল ফোন।

দু'বন্ধু কুশল বিনিময়ের পর সোহেল বলল, বিসিআই চিফ, মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানকে দ্য ডায়মণ্ড রিং সম্পর্কে

জানিয়েছে ও। এতে ওই সংঘের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্যে দু'জন জুনিয়র এজেন্টকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। রানার বক্তব্য সোহেলের মুখে শুনে ভাবছেন, আলাপ করবেন কি না পুলিশ ও অন্যান্য আইনী সংস্থার প্রধানের সঙ্গে। সেক্ষেত্রে হয়তো সচেতন হয়ে উঠবে বিশ্বস্ত ও দেশ-প্রেমিক একদল কর্মকর্তা ও কর্মচারী। কিন্তু তাতে সমস্যাও আছে, ঘুষখোর বাজে লোকও বুঝবে, যাদের কাছ থেকে এত টাকা পাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে মাঠে নামছে কোনও শক্তিশালী সংগঠন। তাতে লাভ-ক্ষতির পাল্লা কোন্‌দিকে হেলবে, বোঝা কঠিন।

নীল সাগর পাড়ি দিয়ে দুপুরে পাহাড়ি বাগানবাড়িতে পৌঁছে জেনিকে পেল রানা কিচেনে। ব্যস্ত হয়ে লাঞ্চ তৈরি করছে কিশোরী মেয়েটা। দরজার কাছে পৌঁছে সুঘ্রাণ পেয়ে রানা টের পেয়ে গেল, রাঁধা হচ্ছে খরগোশের স্টু, তাতে আছে সাদা ওয়াইন ও রসুন।

রানাকে দেখে দুই গালে দুই চুমু দিয়ে খপ্‌ করে ওর হাত ধরল জেনি, নিয়ে গেল গোসল করাতে।

পনেরো মিনিট পর সুইমিং পুলের পাশে বসে ঠাণ্ডা লাগার বিয়ারে চুমুক দিল রানা। গিয়েছিল কিচেনে সাহায্য করতে, কিন্তু ওকে হাঁকিয়ে দিয়েছে জেনি। তখনই বলেছে, সকালে ওকে নামিয়ে দিয়ে গেছেন অনোরিয়া। তারপর সব শাকসবজি কাটাকাটি শেষ করে রাঁধতে বসেছে। রানা যতদিন দ্বীপে থাকবে, রাঁধার কাজ ওর। সেখানে কারও নাক গলানো চলবে না।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে রানা বুঝে গেছে, মার্সেইল্‌স্‌-এ যে বিপর্যস্ত বাচ্চা মেয়েকে উদ্ধার করেছিল, মাত্র কয়েক দিনেই মানসিকভাবে সুস্থ হয়ে গেছে সে। সব গুছিয়ে নিয়ে প্রবেশ করেছে সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনে।

নীরবে লাঞ্চ সারল ওরা।

দক্ষতার সঙ্গে রাঁধা হয়েছে প্রতিটি খাবার, তেমনই চমৎকার পরিবেশনা। রাঁধা হয়েছে যেসব পদ, প্রতিটি রানার প্রিয়। বহুবার এসব খেয়েছে অনোরিয়ার হাতে। খাওয়ার সময় বার-বার রানার হাতের পাশে রাখা উপহারের প্যাকেজ দেখল জেনি, কৌতূহলী। কখনও দেখল রানার ডান কব্জির ওপরের ব্যাণ্ডেজ।

রামিনের বিষয়ে জানতে চাওয়া ছাড়া অন্য কোনও প্রসঙ্গ তুলল না জেনি। খরগোশের স্টু শেষ হলে পরিবেশন করল তরমুজ দেয়া আইসক্রিম। তারপর রানার আনা নিয়াপলিটান এসপ্রেসো কফি তৈরি করে দিল বড় মগে। কড়া কফিতে চুমুক দিয়ে পাশ থেকে উপহারের বাক্স জেনির দিকে ঠেলল রানা।

বাচ্চাদের মতই উত্তেজিত হয়ে উঠল জেনি।

বাক্স থেকে বেরোল উজ্জ্বল সোনালি ও রুপালি দুটো সিল্কের সারোং ও দুনিয়া-সেরা সব চকলেট।

'হালকা সারোং পরে ঘুমাতে ভাল লাগবে, তাই কিনেছি তোমার জন্যে,' বলল রানা।

মসৃণ সিল্ক স্পর্শ করে দুষ্টুমির হাসি হাসল জেনি। 'আমি তো সবসময় তাই পরি, মাসুদ ভাই। আপনার বেডরুমের ওপরের ড্রয়ারে অনেক আছে।'

কপালে ভুরু তুলল রানা। 'ও? তো বাড়ির সব দেখা শেষ?'

'অবশ্যই,' বলল জেনি, 'খুঁটিয়ে দেখেছি সব। বাদ পড়েনি আপনার সিন্দুকও। এমন কী কমবিনেশন লকের নাম্বারও বের করে ফেলেছি।'

এ কথায় হেসে ফেলল রানা। 'অ্যাই, মিথ্যুক! ওটা নিশ্চয়ই তোমাকে দেখিয়ে দিয়েছে রামিন!'

চট্ করে রানার ডান কব্জির ওপরের ব্যাণ্ডেজ দেখাল জেনি। 'ওখানে কী হয়েছে?'

সাবধানে ব্যাণ্ডেজ খুলল রানা, দেখাল নতুন ওই ক্ষত।

‘আহা রে!’ মুখ কালো হয়ে গেল জেনির। ‘কী করে হলো?’

খুব অল্প কথায় বলল রানা।

সুইমিং পুলের পাশে বসে গল্প করল ওরা। তারপর বিকেলে বাংলাদেশের সেরা বাবুর্চির কাছ থেকে শেখা গরুর কাবাব তৈরি করল রানা। এ ছাড়া, থাকল স্টেক, মুরগির রোস্ট, ল্যামপুকি মাছের টিকিয়া ও নান রুটি। খাবারের সঙ্গে চলল মোযামবিকের পিরিপিরি, যিমবাবুইয়ের বিন সস ও কঙ্গোর সবুজ মরিচের সস।

সারোং পরে সব তৈরি করেছে রানা।

তাতে জেনির মনে হলো, মাসুদ ভাইয়ের মত ওরও সারোং পরা উচিত। নিজের সারোং পরে হাজির হলো। প্রায় বুকের কাছে ওটার ফিতে। বড়দের মতই আলাপ করল ওরা নানান বিষয়ে। যতটা বলা সম্ভব, নিজের সম্পর্কে জানাল রানা।

হাজারো প্রশ্ন জেনির মনে। প্রথমে দ্বিধা নিয়ে জিজ্ঞেস করলেও, পরে সহজ হয়ে গেল দু'জনের সম্পর্ক।

ভেবে নিয়ে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিল রানা। বিশেষ করে ভায়োলা, রেবেকা আর সোহানার প্রসঙ্গ এলে কখনও বুকে জমল কষ্ট।

‘মাসুদ ভাই, সোহানা আপু বুঝলেন না আপনার মন?’ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল জেনি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল রানা, ‘জেনি, আসলে দেশের যে কাজে আমরা ব্যস্ত, তাতে কখনও সুখ হতো না সংসারে। তাই সব বুঝেই সরে গেছে সোহানা। আজও ভালবাসি ওকে, ও-ও আমাকে। কিন্তু আমাদের পথ অনেক আঁকাবাঁকা, বন্ধুর।’

একটা নীরব সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর জানতে চাইল জেনি, ‘আমাকে ওই বিপদ থেকে কেন তুলে আনলেন, মাসুদ ভাই?’

এ কথা শুনে কী যেন ভাবল রানা, তারপর বলল, ‘মিথ্যা বলব না। তোমাকে এনেছি, কারণ তোমার কেউ ছিল না। অন্তত

তেমনই মনে হয়েছে আমার। যদি কোনও সংগঠনের কাছে বা তোমার মা-র কাছে দিয়ে আসতাম, তা হতো তোমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া।'

প্রথমবারের মত মাসুদ রানাকে দেখল জেনি শক্ত বর্ম ছাড়া। নরম, সুন্দর অন্তরটা বুঝে নিল ওর ভেতরের চিরন্তন নারী।

'আমার জীবনে হাজারে হাজারে শিশুকে মরতে দেখেছি,' বলল রানা, 'কেউ মরেছে, কেউ মরছিল। যুদ্ধে সবসময় এমনই হয়। আফ্রিকা বা এশিয়ায় যেখানে চোখ ফেলো, দেখবে অসহায় শিশুদের কেউ নেই। সোমালিয়া, সুদান, মোযামবিক সব জায়গায় একদল লোক বলছে, তারা দেশ-প্রেমিক। কেউ জাতীয়তাবাদী, কেউ রাজনৈতিক নেতা, কেউ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা— তাদের ধারণা, অন্যরা যা বুঝছে না, সেসব বুঝে ফেলেছে তারা। অন্য দেশের মানুষ টিভিতে দেখছে যেসব দৃশ্য, সব এডিট করে তুলে ধরা হচ্ছে তাদের সামনে। পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ বুঝবেই না, আসলে কী ঘটছে। জবাই হচ্ছে শিশু, বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, গুলি করে মারছে বা না খাইয়ে মেরে ফেলছে— আসলে কঠিন মনের ক্ষমতাশালী লোকের তাতে কিছুই যায় আসে না।'

আঁধার নেমে গেছে বলে উঠে গিয়ে পুলের বাতি জ্বেলে দিল রানা। ফিরে এসে দেখল বাকহারা হয়ে চুপ করে বসে আছে জেনি। মেয়েটাকে এসব বলে এখন খারাপই লাগছে রানার।

ওদিকে জেনি টের পেল, পৃথিবীর নির্মম নিষ্ঠুরতা দেখে কতটা অসহায় বোধ করেন মাসুদ ভাই।

চুপ করে বসে রইল ওরা।

কারও মুখে কোনও কথা নেই।

অনেক দূরে গ্রামের টিমটিম করে জ্বলা বাতি দেখছে।

আরও বহুক্ষণ পর টেবিল পরিষ্কার করতে উঠল জেনি।

গত দিনের পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত রানা। জেনির কপালে চুমু

দিয়ে রওনা হয়ে গেল বেডরুমের দিকে। তার আগে কথা দেয়ার সুরে বলেছে, 'সকালে আমরা সাগরে মাছ ধরতে যাব।'

রানা চলে যাওয়ার পর, আরও একঘণ্টা সুইমিং পুলের ধারে বসে থাকল জেনি। বুঝে গেছে, মাসুদ ভাইয়ার চরিত্র। ওর অন্তর চাইল মানুষটাকে সান্ত্বনা দিতে, কিন্তু বুঝল না, তা কীভাবে সম্ভব। কে পারবে অস্থির দেবতার মনকে শান্ত করতে!

মনে পড়ল ওর বাবাকে। ওই মুখ ভাসছে চোখে। হাসছে ওর দিকে চেয়ে। যত নিষ্ঠুরতা দেখেছে নিজ জীবনে, সে জন্য নালিশ করতে চাইল বাবার কাছে। কিন্তু মন বলে দিল, বাবা তো নেই, চলে গেছেন অনেক অনেক দূরে। বাবা নেই, কিন্তু ঈশ্বর বলে কেউ থাকলে, সে পাঠিয়ে দিয়েছে ওর কাছে মাসুদ ভাইয়াকে।

অস্থির একটা মন নিয়ে নিজের বেডরুমে ফিরল জেনি।

আর রাত দুটোর সময় হালকা টোকা পড়ল রানার দরজায়। সচেতন হয়ে গেল রানা, শুনল নিচু, মিষ্টি কণ্ঠ। তারপর খুলে গেল দরজা। বেড ল্যাম্প জ্বেলে দিল রানা।

ঘরে ঢুকেছে জেনি, পরনে ওই সারোং। ওর গালে অশ্রুর দাগ দেখে উঠে বসল রানা। 'কী হয়েছে, জেনি?'

'না... কিছু না... এমনি ঘুমাতে পারি, কিন্তু খুব খারাপ স্বপ্ন...'

পাশে বসতে ইশারা করল রানা।

চুপ করে বসল জেনি।

ওর বাহুতে আলতো চাপড় দিল রানা, কাছে টেনে হাত বুলিয়ে দিল মাথায়।

'ভাইয়া, রাতে তোমার পাশে ঘুমাই?' কাতর হয়ে জানতে চাইল জেনি। 'একটুক্ষণের জন্যে?'

'নিশ্চয়ই, জেনি।' পাশেই বালিশ রেখে ইশারা করল রানা।

শুয়ে পড়ল জেনি।

ভোরে ঘুম ভাঙল রানার। টের পেল, গরম কী যেন সেঁটে আছে পিঠে। এক সেকেণ্ড পর বুঝল, ওকে জাপটে ধরে বুকে একটা হাত রেখে নিশ্চিন্তে গভীর ঘুমে বিভোর জেনি।

খুব সাবধানে হাত সরিয়ে দিল রানা, আরও গোটা কয়েক বালিশ রেখে ওকে ঠেস দিয়ে উঠে পড়ল নাস্তা তৈরি করতে।

উনপঞ্চাশ

‘রামিন ভাইয়াকে যুদ্ধের ব্যাপারে যা-যা শিখিয়েছেন, সেসব আমাকে শেখাবেন না, মাসুদ ভাই?’

ঘুরে জেনিকে দেখল রানা। মনে মনে ভয় পাচ্ছিল, এ কথাই তুলবে কিশোরী।

টা সেন্‌ক্-এর টিলার পাশ দিয়ে হাঁটছে ওরা। সকাল গড়িয়ে চলেছে দুপুরের দিকে। উত্তর আফ্রিকার মরুভূমি থেকে হু-হু করে আসছে তপ্ত হাওয়া।

‘ওর ব্যাপার অন্যরকম ছিল,’ বলল রানা।

‘কোন্‌দিক থেকে?’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। ‘আসলে, জেনি, রামিনের বাবা-মাকে কথা দিই, তাঁদের ছেলেকে দেশ-প্রেমিক হিসেবে কাজ করার সুযোগ করে দেব। তুমি তো সবই শুনেছ।’

‘তা ঠিক,’ বলল জেনি, ‘সবই শুনেছি রামিন ভাইয়ার মুখে। নিজের ছোট ভাইয়ের মত ভালবেসে শিখিয়ে দিয়েছেন অনেক

কিছু, যেগুলো মোটেও জানে না সাধারণ মানুষ। আপনাকে আপন বড় ভাইয়ের মত ভালবাসে রামিন ভাইয়া। দ্বিধা করবে না আপনার কথায় প্রাণ দিতে।'

'হুঁ,' স্বীকার করল রানা। 'আমাদের সম্পর্ক যেমন, আমারও আপত্তি থাকবে না ওর জন্য মরতে।'

চুপচাপ হাঁটছে ওরা।

আরও কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল জেনি।

চমকে গেল রানা।

'আসলে, মাসুদ ভাই, মনে হয়, আপনি হাজার হাজার বাচ্চাকে মরতে দেখেছেন, ঠেকাতে পারেননি তাদের মৃত্যু, তাই অপরাধ বোধ থেকে আমাকে নিয়ে এসেছেন। এমনই কোনও কারণে নিজের মেয়ে হিসেবে আমাকে বেছে নিয়েছেন আঙ্কেল গুগলি। ঠিক না?'

ধুলোময় পথে থমকে জেনির চোখে তাকাল রানা। সামান্য কঠোর হলো কণ্ঠ, 'গুগলি বা আমি এজন্যে কিছুই করিনি।'

আরও দু'পা গিয়ে থামল জেনি। 'হতে পারে, কিন্তু অপরাধ বোধ থেকে রক্ষা পাননি আপনারা। মাসুদ ভাই, গতরাতে বলেছেন, রামিন ভাইয়া, গুগলি আঙ্কেল আর আপনার সঙ্গে যেন কখনও মিথ্যা না বলি। এখন সৎ থাকার চেষ্টা করছি। সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে হলো, যোগ্য দু'জন ভাই আর একজন চাচা আছে আমার। কিন্তু জানা নেই, কী করে বোন বা ভাইঝি হতে হবে।'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

দু'হাত ছড়িয়ে দ্বীপ দেখাল জেনি। 'বাস করার জন্যে পেয়েছি চমৎকার বাড়ি। সোমবার স্কুলে যাব। ফাঁকি দেব না পড়াশোনায়। শিখছি ইটালিয়ান আর মাল্টিয ভাষা। শিখব কীভাবে যোগ্য মেয়ে বা মহিলা হতে হয়। যাতে গর্ব করতে পারেন আপনি, রামিন

ভাইয়া আর গুগলি আঙ্কেল। কিন্তু সারা সকাল ধরে ভাবছি... কয়েক দিন পর চলে যাবেন রামিন ভাইয়ার ওখানে, তারপর লড়বেন একদল মন্দ লোকের বিপক্ষে। জানি, এখানেই থাকতে হবে আমাকে। পছন্দ করি অনোরিয়া আন্টি, পাজেরো আঙ্কেল, টম, নিডো ভাই বা লুসি আপুকে, কিন্তু আমার খুব কষ্ট হবে, আপনারা থাকবেন অনেক দূরে। সর্বক্ষণ বুকে কাঁটার মত বিঁধবে ভয়।'

মৃদু হাসল রানা। 'কয়েক দিন পর বারো বছর হবে, এত চিন্তা কীসের, জেনি?'

হাসল কিশোরী, আবারও হাঁটতে লাগল। ওর পাশে পৌঁছে গেল রানা। 'জেনি, আরও জটিল করে তুলো না পরিস্থিতি।'

'তা করব না,' কথা দিল জেনি, 'কিন্তু আশা করি, আপনারা ফেরার পর আমাকে লড়াই শেখাবেন। যাতে প্রয়োজন হলে রক্ষা করতে পারি নিজেকে।' আবারও থমকে গিয়ে খুব গম্ভীর হয়ে বলল: 'এসব শেখা আমার জন্যে খুব জরুরি, মাসুদ ভাই। আর কখনও অসহায় হতে চাই না।'

হাঁটা বন্ধ করেনি রানা।

ওর পাশে পৌঁছে গেল জেনি। জোর বাতাসের ঝাপটার ওপর দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, মাসুদ ভাই? আমি আর কখনও অসহায় হতে চাই না!'

জেনির হাত ধরে হাঁটতে লাগল রানা, কী যেন ভাবছে নীরবে। বিরক্ত করল না জেনি। কিছুক্ষণ পর ওর চোখে তাকাল বাঙালি গুপ্তচর। 'ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। আত্মরক্ষা শেখাব, কিন্তু মডেস্টি ব্লেইযের মত গুপ্তচর হতে হবে না তোমাকে।'

'ওই মেয়ে কে, মাসুদ ভাই?'

'বইয়ের চরিত্র। তরুণী, দুর্দান্ত সুন্দরী। একজন সঙ্গীকে পাশে নিয়ে চরে বেড়াচ্ছে গোটা দুনিয়া। আর শায়েস্তা হয়ে যাচ্ছে

শত শত ভিলেন।'

'যে কাজ আপনি করেন, তেমন?'

মৃদু হাসল রানা। 'কে বলেছে, আমি এসব করে বেড়াই?'

'তা হলে দ্য ডায়মণ্ড রিঙের পেছনে সময় দিচ্ছেন কেন?'

'কারণ, তোমার মত অনেক লক্ষ্মী মেয়ের ক্ষতি করছে ওরা। আর, জেনি, মস্ত কোনও ভুল না করলে কখনও অপরাধ বোধ জাগে না আমার মনে। তার একটা কারণ: শিশু, কিশোর-কিশোরী বা কোনও মহিলার ক্ষতি করি না আমি।'

পঞ্চাশ

এবার অত্যন্ত সতর্ক থাকল মাসুদ রানা। রোমের লিয়োনার্দো দ্য ভিঞ্চি এয়ারপোর্টের কাস্টম্‌স্ পেরিয়ে গেল, কিন্তু কারও সাধ্য নেই ওকে চিনবে। মাথার ছাঁটা চুল খয়েরি, ঠোঁটের ওপর পেল্লায় খয়েরি গোঁফ। চোখে ভারী ফ্রেমের চশমা, যদিও কাঁচ পাওয়ার হীন। ওভারনাইট লকারে রাখল ছোট্ট ব্যাগ, কালো-নীল ব্রিফকেস হাতে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সি র‍্যাঙ্কে। পরনে গাঢ় নীল সুট, ক্রিম কালারের শার্ট ও মেরুন টাই। এই মস্ত শহরে এক রাতের জন্য যেসব ব্যবসায়ী আসে, যেন তাদেরই একজন রানা। ভ্যাটিকান সিটির পোর্টা ক্যাভালেগ্গেরির ঠিকানা দিল ট্যাক্সি ড্রাইভারকে। একবার হাতঘড়ি দেখে নিয়ে স্যাটালাইট ফোন বের করে কল দিল সোহেলকে।

পাঁচ সেকেণ্ড পর ওদিক থেকে প্রিয় বন্ধুর গম্ভীর কণ্ঠ এল, 'রানা?'

সরাসরি কাজের কথায় এল রানা, 'কী রে, নতুন কিছু জানলি?'

পেরিয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর বলল সোহেল, 'যে ইনফর্মারের কাছ থেকে সামান্য তথ্য পেয়েছি, তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম জুনিয়র এজেন্ট সাব্বির আর কাদিরকে।' চুপ মেরে গেল ও।

'তারপর?' খারাপ সংবাদের জন্য তৈরি হয়ে গেছে রানা।

'গতরাতে গুলশানের রাস্তায় খুন হয়েছে ইনফর্মার আর ওরা দু'জন। পরিষ্কার কথা, বাংলাদেশে গেড়ে বসেছে দ্য ডায়মণ্ড রিং। কাউকে পরোয়া করছে না, হামলা করতেও দ্বিধা নেই।' আর কিছুই বলছে না সোহেল।

'বস্ কী ভাবছেন?' জানতে চাইল রানা।

'স্বাভাবিক, যা করা দরকার করব আমরা,' বলল সোহেল, 'কিন্তু হাতে যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য নেই। ওই ইনফর্মারের কাছ থেকে যা শুনেছি, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও সিলেটের পশ্ এলাকায় আছে এদের ড্রাগসের আখড়া। দেশের নানান এলাকা থেকে সুন্দরী কিশোরী মেয়ে কিডন্যাপ করে তাদেরকে ড্রাগসে অভ্যস্ত করে ভরছে পতিতালয়ে। এ ধরনের জয়েণ্টের তালিকা তৈরি করার আগেই খুন হয়ে গেছে ইনফর্মার, সাব্বির ও কাদির। আমার ধারণা, পশ্চিমাদের নাইট ক্লাবের স্টাইলে গোপনে চালানো হচ্ছে এসব আখড়া।'

'পুলিশ কী করছে?' জানতে চাইল রানা। তিতা মনে হলো ওর গলা।

একটু বিরতির পর বলল সোহেল, 'যা বুঝতে পারছি, নানান দিক থেকে চাপে আছে সৎ পুলিশ অফিসাররা— ক্ষমতাশালী

লোকের ছেলে-মেয়েকে ধরলে চাকরি যাবে। আর ঘুষখোররা গোপন করছে তথ্য। কাজটা পুলিশের, কিন্তু মনে হচ্ছে, আপাতত তাদের সহায়তা চাইলে উল্টো সতর্ক হয়ে উঠবে রিঙের পাণ্ডারা। ফলে উধাও হবে। কিছু দিন পর পরিবেশ ঠাণ্ডা হলে আবারও মাথা চাড়া দেবে। তাতে অপরাধ মোটেও কমবে না, বরং বাড়বে।'

চুপ করে ভাবছে রানা, ওর কথা শুনবে বলে অপেক্ষা করছে সোহেল। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল রানা, 'আমি যাচ্ছি মাফিয়ার এক ডনের সঙ্গে লাঞ্চ করতে। দ্য ডায়মণ্ড রিং সম্পর্কে আলাপ করব। দেখি তার কাছ থেকে নতুন কোনও তথ্য পাই কি না।'

'দ্যাখ,' বলল সোহেল, 'এদিকে বিসিআই থেকে গোপনে খোঁজ নেব আমরা।'

'কিছু জানলে যোগাযোগ করব,' বলল রানা। 'ওদিকে তোরা কিছু পেলে দেরি না করে জানিয়ে দিবি আমাকে।'

'ঠিক আছে।'

'বেশ,' বলে কল কেটে দিল রানা। খাঁ-খাঁ করে পুড়ছে ওর বুক। সাব্বির আর কাদিরকে নিজ হাতে ট্রেনিং দিয়েছিল। বয়স ওদের মাত্র একুশ কি বাইশ। সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। এখন লাশ হয়ে পড়ে আছে মর্গে। মনে মনে শপথ করল রানা: যদি বাঁচি, প্রতিশোধ নেব এসব মৃত্যুর। রক্ষা নেই দ্য ডায়মণ্ড রিঙের কারও।

শরতের মিষ্টি আবহাওয়া যেমনই হোক, রোম কখনও পছন্দের শহর নয় রানার। বড় ব্যস্ত এই শহর, নাগরিকরা বড্ড স্বার্থপর গতরাতে ফোন করেছিল রেমারিক। পাপা, অর্থাৎ জিয়ান্না ক্যাণ্টারিয়া আলাপ করতে চায় রানার সঙ্গে। বলেছে, ভাল হবে পরদিন রোমের ল'ইয়াউ ভাইভ-এ লাঞ্চ করলে। রানা আসতে পারবে কি না, তা পাপাকে একঘণ্টার ভেতর জানিয়ে

দিতে হবে রেমারিকের। আগামীকাল রোমের ফ্লাইট অনেক আগেই বুক করে ফেলেছে অন্যরা। তখন মাল্টার পুলিশের বড়কর্তা পিওতর মেনিনোর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে রানা। অফিশিয়াল ক্ষমতা ব্যবহার করে একটা সিটের ব্যবস্থা করে দিয়েছে সে। এদিকে বলে দিয়েছে রেমারিক, রানার নাম হবে জন হ্যাগার্ড, রেস্তোরাঁয় পৌঁছে খুঁজবে মিস্টার হেলিকে।

আগেও ল'ইয়াউ ভাইভ-এর নাম শুনেছে রানা। ওটা চালান ধার্মিক এক মহিলা। বেশিরভাগ খদ্দের ভ্যাটিকানের যাজক ও কর্মচারী। কী জন্য ওখানে আলাপ করতে চাইছে ক্যান্টারায়া, তা নিয়ে ভাবছে রানা। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের যাত্রায় বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করল। পুরো তিন দিন গোজোয় ছিল, জেনির সঙ্গে চমৎকার কেটেছে সময়টা। রানা বুঝে গেছে, সঠিক সময়ে বড় মনের ভাল এক মহিলা হয়ে উঠবে জেনি। যেমন বুদ্ধিমতী, তেমন সংসারী। এরই ভেতর শিখে গেছে কীভাবে গুছিয়ে রাখতে হয় সব।

ফোনে রেমারিক বলেছে, যোগাযোগ করেছিল ডেনিশ পুলিশ পিটার লারসেন। কোপেনহেগেন থেকে রওনা হয়েছে সে ও হুতুম পেঁচা, আটচল্লিশ ঘণ্টার ভেতর পৌঁছবে রোমে। এদিকে ব্রাসেলসে যোগাযোগ করে জানা গেছে, গগলের কাছ থেকে দরকারী সব অস্ত্র জোগাড় করেছে রামিন ও সিম কর্নেলিস।

ভ্যাটিকান সিটির পোর্টা ক্যাভালেগ্গেরির সামনে ট্যাক্সি থামতেই ড্রাইভারকে পর্যাপ্ত টিপ্‌স্ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রানা। অপেক্ষা করল, তারপর ট্যাক্সি দূরে চলে যাওয়ার পর হাঁটতে শুরু করল বামে। পনেরো মিনিট পর সরু এক গলির ভেতর ঢুকে খুঁজে নিল ল'ইয়াউ ভাইভ রেস্তোরাঁর ছোট্ট সাইন বোর্ড। নির্দিষ্ট দালানের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে চমকে গেল রানা। যা ভেবেছিল, তা নয়, টেবিলগুলো চেক কাপড়ে মোড়া,

ছোট একটা ক্যাফে ওটা। খদ্দেররা বেশির ভাগই অল্প খরচের টুরিস্ট।

মাঝারি ঘরের এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন কুমারী মেরি মা। কিন্তু তাঁর মত নয় ওয়েইট্রেসরা। প্রত্যেকে তারা লম্বা, পরনে দীর্ঘ গাউন। মনে হচ্ছে বটিকের দোকানের মডেল। প্রত্যেকে সুন্দরী, কিন্তু ত্বক কৃষ্ণবর্ণের। চারপাশে চোখ ফেলে কোথাও ক্যাণ্টারায়াকে দেখল না রানা।

সাদা পোশাকে মাঝবয়সী এক মহিলা ওর সামনে থেমে বললেন, 'আমি সিস্টার জিনা। আপনার কোনও কাজে আসতে পারি?'

'আমি জন হ্যাগার্ড, মিস্টার হেলির সঙ্গে কথা বলতে চাই,' বলল রানা।

'ও, হ্যাঁ, আমার সঙ্গে আসুন।'

হালকা মানুষ সিস্টার জিনা, রানাকে নিয়ে এলেন ভারী, সবুজ এক পর্দার সামনে। সরিয়ে দিলেন পর্দা। সামনেই মেহগনি কাঠের মস্ত এক দরজা। টোকা দিলেন মহিলা, তারপর ওটা খুলে পথ দেখালেন রানাকে।

রেস্তোরাঁর বাইরের দিকটায় সাধারণ আসবাবপত্র, কিন্তু এখানে একেবারেই অন্যরকম। ঘরের মাঝে একমাত্র টেবিল ঢেকে রেখেছে দামেস্কের সাদা চাদর। প্রতিটি চেয়ারের সামনে দামি ন্যাপকিন, অ্যান্টিক রুপালি ও সোনালি চামচ; বাসন ও সুপের বাটি। ছাতের ক্রিস্টালের ঝাড়বাতির দীর্ঘ মোমবাতি ছড়িয়ে দিচ্ছে নরম আলো। মনে হলো, ওই ঝাড়বাতির দাম হবে কমপক্ষে পাঁচ লাখ ডলার। টেবিল ঘিরে পিঠ-উঁচু সব কাঠের চেয়ার। তার একটায় বসে আছে জিয়ান্না ক্যাণ্টারায়া। উল্টো দিকে এক যাজক। বয়স হবে ত্রিশ মত। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। গভীর মনোযোগ দিয়ে রানাকে দেখল সে। ভাব দেখে

মনে হলো, দারুণ শৈল্পিক কোনও চিত্রকরের ছবি দেখছে। রানার পেছনে বন্ধ হয়ে গেছে দরজা।

পরিচয় করিয়ে দিল জিয়ান্না ক্যান্টারায়া। 'জন হ্যাগার্ড... ফাদার দি ক্লয়েড।'

সবাই বসার পর পুরু কার্পেটে পায়ের পাশে রাখল রানা ব্রিফকেস। একই সময়ে টিপে দিয়েছে হ্যাণ্ডেলের নিচের নির্দিষ্ট বাটন। যে বিষয়েই আলাপ হোক, সব সংরক্ষিত হবে ডিভিডি রেকর্ডারে।

পাশের ছোট এক টেবিল দেখাল ক্যান্টারায়া। ওখানে ঢেকে রাখা হয়েছে নানান ডিশ। 'সাধারণ বুফে অর্ডার করেছি,' বলল সে। 'কাজেই কেউ এসে ঝামেলা করবে না।' কয়েক পদ খাবার দেয়া হয়েছে, সঙ্গে এক বোতল লাল ওয়াইন। উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের কাছে গিয়ে বলল কাপো, 'অ্যাপারিটিফ হিসেবে কী নেবেন আপনারা? আমি অবশ্য বলেছি পঁয়তাল্লিশ বছর আগের ম্যাকালান স্কচ দিতে।'

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা দোলাল রানা ও যাজক। ড্রিঙ্ক পরিবেশন করল ক্যান্টারায়া। চেয়ারে বসল নিজের গ্লাস হাতে।

'এবার খুলে বলো,' বলল রানা।

খুশি মনে যাজকের দিকে চাইল ক্যান্টারায়া। 'ফাদার দি ক্লয়েড জানেন দ্য ডায়মণ্ড রিং সম্পর্কে আমাদের সমস্যা আসলে কী।' রানার চোখে সতর্ক দৃষ্টি দেখল সে। 'আগেই বলে রাখি, ফাদার দি ক্লয়েড সম্পর্কে: উনি ভ্যাটিকানের ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সদস্য। অনেকে বলে, তাঁরা সিআইএ বা মোসাদের চেয়েও অনেক দক্ষ।'

সামান্য কাঁধ ঝাঁকাল যাজক।

প্রশংসার সুরে বলল মাফিয়া ডন, 'কোল্ড ওঅরের পর ওই ইউনিট রাখার আর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আজও ওটা কাজ

করছে শয়তান বা ব্ল্যাক ম্যাজিকের বিষয়ে।'

টেবিলের আরেক পাশ থেকে যাজকের উদ্দেশে সামান্য মাথা দোলাল ক্যান্টারায়া, খেয়াল করল রানা।

'আপনাদের কেস আগ্রহী করে তুলেছে আমাদেরকে,' বলল যাজক। 'সাধারণত নানানভাবে উপাসনা করা হয় শয়তানের। এসবে জড়িত থাকে মাত্র কয়েকজন নারী ও পুরুষ। তাতে চিন্তিত হওয়ার কোনও কারণ নেই ভ্যাটিকানের।' প্রথমবারের মত হাসল যাজক। মনে হলো মুখ থেকে সরে গেল কালো মেঘ। প্রায় বাচ্চার মত মিষ্টি হয়ে উঠল চেহারা। 'মিস্টার হ্যাগার্ড, হয়তো জানেন না, মধ্য যুগে বা গত শতাব্দীতে যেমন বহু মানুষ কাজ করতেন আমাদের দলে, আজকাল তেমন হয় না। তবে দক্ষিণ আমেরিকা, ক্যারাবিয়ান, আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ায় এখনও চোখ রাখি আমরা।' বুফে টেবিলের দিকে ইশারা করল যাজক। 'আসুন, খাওয়ার ফাঁকে আলাপ করি।'

একান্ন

'ভাবতেও পারিনি, ভ্যাটিকানের বিশেষজ্ঞ কোনও যাজককে ডেকে আনবে ক্যান্টারায়া,' বলল রানা।

হাসল রেমারিক। 'আগেই বোঝার কথা। বহু বছর ধরেই মাফিয়ার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক ভ্যাটিকানের। বিশেষ করে আর্থিক দিক থেকে। বেশি দিন আগের কথা নয়, মাফিয়ার ড্রাগসের কোটি কোটি টাকা রাখা হতো ভ্যাটিকানের ব্যাঙ্কে।'

'শুনেছি,' বলল রানা, 'কিন্তু জানতাম পরে সরে গিয়েছিল দুই পক্ষ।'

মাথা নাড়ল রেমারিক। 'কখনও বিভেদ ছিল না। ভুলে গেলে, ক্ষমতা খুঁজে নেয় তার মত আরও ক্ষমতা?'

রাত এগারোটা। শেষ বিকেলে রোমের বিমান ফ্লাইটে চেপে নেপলসে পৌঁছেছে রানা। একটু আগে টেরেসে বসে রাতের খাবার শেষ করেছে ওরা। বিদায় নিয়েছে রেস্তোরাঁর নিয়মিত খদ্দেররা।

'ওই যাজক... দি ক্লয়েড়,' বলল রানা, 'জেসুইট।'

মাথা দুলিয়ে হাসল রেমারিক। 'বুদ্ধিমানরা তাই হয়।'

'কমবয়সী, বড়জোর ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ। কিন্তু জানে অনেক।'

জানতে চাইল রেমারিক, 'খুলে বলো, কী জানে সে দ্য ডায়মণ্ড রিং সম্পর্কে?'

ভাবতে গিয়ে কথা গুছিয়ে নিল রানা, মৃদু হাসল। বলল, 'প্রথমেই কথা শুরু করার আগে দেখতে চাইল আমার ব্রিফকেসের ভেতরে কী। বেশ বিব্রত হলাম। ভেতরে ডিভিডি রেকর্ডার ছাড়া কিছুই ছিল না।'

মুচকি হাসল রেমারিক। 'তারপর কী হলো?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'প্রথমে যন্ত্রটা দেখে প্রশংসা করল। মাত্র পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, চওড়ায় চার ইঞ্চি। বিশ গজ দূরের শব্দও রেকর্ড করে। এরপর যাজক বলল, আপাতত ওদের ফাণ্ড নেই এমন জিনিস কিনবে। খুব উপকৃত হবে ওই জিনিস হাতে পেলে। আর কিছু করার ছিল না, দিয়ে দিতে হলো ওকে ডিভিডি রেকর্ডার।'

হাসি আরও চওড়া হলো রেমারিকের। 'আর কখনও বোকা ভাবা যাবে না ওই যাজকগুলোকে।'

'সন্দেহ কী!' তিক্ত চেহারা করল রানা। 'ওটার দাম ছিল

কমপক্ষে দু'হাজার ডলার!'

এবার যাজকের কাছ থেকে কী জানল, বলল রানা।

প্রথমেই শয়তান এবং তার উপাসকদের ওপরে দীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে হয়েছে ওকে। এক পর্যায়ে শুনল, কেমন হয় মানুষের মন। তখন ফাদার দি ক্লয়েড বলল, সাইকোলজির ওপরে মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়েছে সে। এরপর রানাকে জানাল, শুভ এবং অশুভ বিষয়ে কয়েকটা থিয়োরি। হাজার হাজার বছর ধরেই অশুভ এবং শুভর ভেতর চলছে চিরকালীন লড়াই। আজও গির্জার হয়ে কাজ করছে ব্যস্ত একদল বিশেষজ্ঞ এক্সোরসিস্ট। নিজেও ফাদার দি ক্লয়েড ওই কাজ করেছে দীর্ঘ তিন বছর। খাবার শেষ করে কফিতে চুমুক দিয়ে জানাল আধুনিক কালো জাদু ও বর্তমান শয়তানের নানান দিক।

যাজকের কথা শেষ হলে রানা জানতে চাইল, এসবের সঙ্গে কুমারী মেয়েদের কিডন্যাপিং, নারী ক্রীতদাসী ও ড্রাগসের সম্পর্ক আছে কি না।

মাথা দোলাল ফাদার ক্লয়েড, জানাল গভীর সম্পর্ক আছে। একদল অশুভ লোক এসব করছে যুগের পর যুগ ধরে। তাদের আছে শয়তান উপাসক যাজক বা যাজিকা। ধর্মের আড়ালে গোপনে লুকিয়ে আছে তারা। অন্ধের মত তাদেরকে অনুসরণ করছে অনেকে। আর এসব গোষ্ঠীর সদস্যদের ওপর অশুভ যাজক বা যাজিকার রয়েছে প্রচণ্ড প্রভাব। যা খুশি করতে পারে তারা। নিয়মিত হচ্ছে কালো জাদুর অনুষ্ঠান। তাতে খরচ হচ্ছে কোটি কোটি ডলার। এবং এসব অর্থ আসছে ড্রাগ্স্, কুমারী নারী পাচারকারী ও পতিতালয় পরিচালকদের কাছ থেকে। অশুভ এসব দলে কারও কারও আছে হাজার কোটি ডলার। তাদের ধারণা, শয়তানের উপাসনার মাধ্যমে মন বিক্রি করেছে বলে পেয়েছে এত সম্পদ।

রানার বক্তব্যের এই পর্যায়ে বলল রেমারিক, ‘কিন্তু এসবের সঙ্গে দ্য ডায়মণ্ড রিঙের কী সম্পর্ক?’

‘সহজ সম্পর্ক,’ বলল রানা, ‘ওরা অধার্মিক, উপাসনা করছে শয়তানের। অন্ধ বিশ্বাস বুকে নিয়ে, সাহায্য করছে একে অপরকে। আর্থিকভাবে হয়ে উঠছে ধনী। কোনও কিছুই তাদের কাছে অশুভ বা খারাপ নয়। মানুষ ধরে বলি দেয়া খুব সহজ। যাজক দি ক্লয়েড বলেছে, আগেও শুনেছে দ্য ডায়মণ্ড রিং সম্পর্কে। তবে মনে হলো না সব খুলে বলল। দেড় শ’ বছরেরও বেশি আগে শুরু হয়েছে ওই কাল্ট। অনুসরণ করেছে মিশরের কপটিক ক্রিসচানিটিকে। সম্পর্ক ছিল ফ্রেঞ্চ ‘‘দ্য ডটার্স অভ দ্য গোট’’ দলের সঙ্গে। কিন্তু উনিশ শ’ চৌত্রিশ সালে ফ্রেঞ্চ কর্তৃপক্ষ গ্রেফতার করল দ্য ডটার্স অভ দ্য গোট দলের বেশির ভাগ সদস্যকে। অনেকে ছিল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা। পরে বাধ্য হয়ে ছেড়ে দেয়া হলো তাদের সবাইকে। আর ইতালিতে দ্য ডায়মণ্ড রিংকে আরও শক্ত অবস্থানে পৌঁছুতে সাহায্য করল ফ্যাসিস্ট সরকার। ভ্যাটিকান ভেবেছিল যুদ্ধের পর তছনছ হয়ে গেছে ওই অশুভ দল। কিন্তু পঞ্চাশ দশকে আবারও ছড়িয়ে পড়ল গুজব— আগের চেয়ে অনেক ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে তারা। কিডন্যাপিং, ব্ল্যাকমেইলিং, মানুষ কেনা-বেচার ব্যবসা, ড্রাগসের আখড়া ও পতিতালয় চালাচ্ছে। কিন্তু ভ্যাটিকানের ইণ্টেলিজেন্স সেকশন থেকে হামলা শুরু হলে সামান্য কাগজপত্র ছাড়া তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি।’

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রেমারিক, ‘সেক্ষেত্রে তাদের খুঁজে বের করে শেষ করার সুযোগ ছিল ইতালিয়ান কর্তৃপক্ষের। তা করল না কেন তারা?’

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ‘তাই জিজ্ঞেস করব কর্নেল বার্নাদো গুগলির কাছে।’

বায়ান্ন

জিজ্ঞেস করতে হলো না রানাকে, শেষ রাতে এল কর্নেল গুগলির ফোন। সকাল আটটার ফ্লাইটে নেপলসে আসছেন তিনি। বলে দিয়েছেন, এয়ারপোর্টে তাঁর সঙ্গে দেখা করা জরুরি রানার জন্য।

কফি শপে কাপুচিনি ও ব্রিয়োচেস সামনে রেখে বসল রানা ও গুগলি। কর্নেলের চোখে চাপা রাগ পরিষ্কার দেখল রানা।

'ভাবছি, দেরি না করে আর্লি রিটায়ারমেণ্ট চাইব।'

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

প্রায় ফাঁকা ঘরে চোখ বুলিয়ে নিচু স্বরে বললেন কর্নেল, 'গতকাল বাসা ছেড়ে রওনা হব, এমন সময় অফিস থেকে ফোন করল কারাবিনিয়ারির অত্যন্ত সিনিয়র এক জেনারেল। আরও কয়েক বছর আগেই অবসর নেয়ার কথা, কিন্তু শক্ত রাজনৈতিক খুঁটি আছে বলে এখনও মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে। বুড়ো ছাগলটা জানতে চাইল, কেন পাধানিকে দিয়ে বিশেষ দু'জন লোকের ওপর চোখ রাখাচ্ছি। তারা গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তা আর গিয়ারডিনি ক্যালভেসিও। ভাবতেও পারিনি এদের বিষয়ে জানতে চাইবে অত ওপরের অফিসার। এ থেকে কী বুঝলে? কোনও কিছুই গোপন রাখার উপায় নেই। ফুটো হয়ে গেছে আমাদের সংগঠন।'

'তুমি কী বললে জেনারেলকে?' জানতে চাইল রানা।

দু'হাত ছড়িয়ে নিজের অসহায় অবস্থা দেখালেন কর্নেল। 'আমার প্রথম কাজ ছিল নিজের রাগ সামলে রাখা। তারপর বুড়ো পেদো ছাগলটাকে বললাম, রাজনৈতিক দুর্নীতির বিষয়ে জরুরি সূত্র পেয়ে কাজে নেমেছি। এরপর একের পর এক প্রশ্ন করল সে। একটা জবাবও দিতে পারলাম না। তাতে আরও রেগে গেল শুয়োরটা। জারি করল দুটো নির্দেশ। প্রথমত, দেরি না করে এখনই বন্ধ করতে হবে গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তা আর গিয়ারডিনি ক্যালভেসিওর ওপর নজরদারী। দ্বিতীয়ত, কেন এ ধরনের তদন্ত করতে গেছি, সে জন্য তার কাছে জমা দিতে হবে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট।'

'দ্বিতীয়টা পারবে?' জানতে চাইল রানা।

তিক্ত হাসলেন গুগলি। 'হ্যাঁ, তা পারব। ওই রিপোর্ট হবে খুব সংক্ষিপ্ত। জানিয়ে দেব, জেনারেলের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ হওয়ার কারণ আছে। যাই হোক, সার্ভেইল্যান্সের কাজটা বন্ধ করতে হয়েছে। যে ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে এসব করি, আপাতত সেটা দেখছে ওই বুড়ো ছাগল।'

কফিতে চুমুক দিয়ে বলল রানা, 'আমি বোধহয় জানি কেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে জেনারেল।' এবার খুলে বলল ল'ইয়াউ ভাইভ রেস্তোরাঁর মিটিঙের কথা।

চুপচাপ সব শুনে নিচু স্বরে বললেন কর্নেল গুগলি, 'রানা, তুমি বা আমি যা ভেবেছিলাম, তার চেয়েও অনেক গভীর কিছুর ভেতর নাক গলিয়ে দিয়েছি। তোমাকে একটা কথা বলিনি, রোমের নামকরা এক রেস্তোরাঁ থেকে বেরোবার সময় গুলি খেয়ে মরেছে মাফিয়া ডন জিয়ান্না ক্যান্টারায়া। একটা গাড়ি থেকে দু'বার গুলি করা হয় ওর হৃৎপিণ্ডে।'

'দলীয় লড়াই?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়লেন গুগলি। 'তা মনে করি না। ওই সংগঠনের

ভেতর ভাল অবস্থানে ছিল সে। আরও কথা আছে। সে একমাত্র লোক নয়, যাকে মারা হয়েছে। আরও একজন খুন হয়েছে। ক্যান্টারায়ার দলের বুড়ো এক লোক। নাম বেনেটো ম্যাসোরো। এক সময়ে পাকা চোর ছিল।' আরও নিচু হয়ে গেল কর্নেলের কণ্ঠ: 'টাইবার নদী থেকে তার লাশ তুলেছে পুলিশ। ভয়ঙ্কর অত্যাচার করে মারা হয়েছে। কপাল পুড়িয়ে ছাপ দেয়া হয়েছে উল্টো ক্রুশের। ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে যৌনাঙ্গ।'

তেপ্পান্ন

'এরা শুধু শয়তানের উপাসক তা নয়, ডুবে আছে পাপের গভীর সাগরে,' বলল রানা। 'ড্রাগ্‌স্‌ বা নারী ব্যবসা তাদের কাছে কিছুই নয়। বন্ধ করে দিয়েছে হাই লেভেলের কারাবিনিয়ারির তদন্ত। একই সময়ে নিজ এলাকায় খুন হয়েছে ডন জিয়ান্না ক্যাণ্টারায়া। বুঝতেই পারছ, যাদের বিরুদ্ধে লড়তে চাই, তারা কতটা চতুর ও ক্ষমতাশালী।'

প্রেযো ফিসো বোর্ডিং হাউস অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্টের টেরেসে সেই একই ডিম্বাকৃতির টেবিল ঘিরে বসে আছে ওরা। গত কয়েক দিনে কী হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে, তা নিয়ে গত বিশ মিনিট ধরে ব্রিফ করেছে রানা। গোপন করেনি কোনও কিছুই। বর্তমান অবস্থায় দল ছেড়ে চলে যেতে পারে যে কেউ, খুলে দিয়েছে সে-পথ।

প্রথমেই রেমারিককে বলল রানা, 'জেসমিনের কাছে কথা দিয়েছিলে, আর কখনও অস্ত্র হাতে নেবে না। পরে আমার বিপদে শপথ ভেঙেছ। সেই কারণে মনে তোমার পাপবোধ আসতে পারে। ভবিষ্যতে আবারও অস্ত্র হাতে নেবে, তা চাই না। কাজেই, আমাদের দলের হেডকোয়ার্টার এখান থেকে সরিয়ে নেব।'

আন্তরিক হাসল রেমারিক, তারপর মাথা নাড়ল। 'আমি কখনও জেসমিনকে এই কথা দিইনি যে, আত্মরক্ষা করব না। বা আমার বন্ধুদের বিপদে সাহায্য করব না। আপাতত হোটেলে আছে মাত্র চারজন গেস্ট। তাদের দু'জন জার্মান দম্পতি, চলে যাচ্ছে কাল সকালে। অন্য দুই ব্রিটিশ টুরিস্ট কবে যাবে তা জানায়নি। আগামীকাল সকালে পরিচিত আরেকটা হোটেলে ওদের তুলে দেব। আমাদের হেডকোয়ার্টার হবে এই হোটেল। ব্যস্!'

ফুরেলা বুঝে গেছে কী বলতে চেয়েছে রানা। রাগী সুরে বলল তরুণ, 'আমিও কারও কাছে কথা দিয়ে বসে নেই। আমার ওস্তাদের সঙ্গে হেডকোয়ার্টার পাহারা দেব।'

ডেনিশ পুলিশ লারসেনের দিকে চাইল রানা। 'পিটার, সামনে মস্ত বিপদে পড়তে পারি। শুধু যে ঝুঁকি নিতে হবে, তা নয়, গরম বুট পায়ে হাঁটতে হবে পাতলা বরফের ওপর দিয়ে। বুঝতে পারছি, দ্য ডায়মণ্ড রিঙের নেতারা ভাবছে, বন্ধ করে দিয়েছে তথ্য সংগ্রহের সব পথ। এ-ও ধরে নিচ্ছি, তারা তেমন কিছুই জানে না আমাদের সম্পর্কে। কিন্তু আমার এ ধারণা ভুলও হতে পারে।'

'আমার মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক,' বলল পিটার। 'ক্যাণ্টারায়া বা ওই বুড়ো লোক মুখ না খুলে থাকলে আমাদের ব্যাপারে কিছুই জানে না তারা।'

'তবুও মারাত্মক ঝুঁকি রয়ে গেছে,' বলল রানা, 'তোমার ভাবতে হবে পরিবারের কথা। তা ছাড়া, তুমি পুলিশ অফিসার,

সৈনিক নও।'

মাথা দোলাল লারসেন। ওকে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড কী যেন ভাবল সে, তারপর বলল, 'গতকাল রাতে কোপেনহেগেনে মারগিটের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। যতটা বিপদ হবে বলে ভাবছি, তার চেয়ে অনেক গুণ বাড়িয়ে বললাম ওকে। জবাবে বলেছে, তোমাদের সঙ্গে থাকা উচিত আমার। ও জানে, নিজের কাজকে কতটা গুরুত্ব দিই। কর্নেল গুগলি আর পাধানি দল থেকে চলে যাওয়ায়, পুলিশ অফিসার বলতে রয়ে গেছি শুধু আমি। আর সে কারণে আমার কাজের গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে।' রানার দিকে চেয়ে হাসল পিটার। 'আমি থাকছি।'

ফুলজেন্সের দিকে চাইল রানা।

বিরক্তির চোখে ওকে দেখল পেঁচা। 'আমিও আছি।'

অন্যদের বিষয়ে মুখ খোলার আগেই সবার তরফ থেকে নীরব জবাব পেয়ে গেল রানা। এইমাত্র অসি কালাহান আর জ্যাঁ মউরোসের দিকে চেয়েছে সিম কর্নেলিস। দেরি না করে নড করেছে ওরা। কর্নেলিস বলল, 'রানা, মুখ খরচ করে অযথা সময় নষ্ট করবে? দেখা যাক না সামনে কী হয়?'

প্রথমবারের মত মুখ খুলল রামিন: 'আমাদের প্রথম টার্গেট গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তো আর গিয়ারডিনি ক্যালভেসিও। তাদের অন্তত একজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'আরও কথা আছে,' বলল রানা, 'কর্নেল বার্নাদো গুগলির সার্ভেইল্যান্স বন্ধ হওয়ার আগে কারাবিনিয়ারির লোক পিছু নিয়েছিল গিয়ারডিনি ক্যালভেসিওর। রোম এয়ারপোর্ট থেকে বিমানে করে রওনা হয়েছে তিউনিস। এটা দু'দিন আগের কথা।' পিটারের দিকে চেয়ে হাসল রানা। 'বেশ, গোয়েন্দা, তুমি পেয়ে গেছ তোমার কাজ।'

মাথা দোলাল লারসেন। পাশ থেকে নিল ব্রিফকেস। ওটা থেকে বেরোল হলদে আইনী প্যাড ও সোনালি পার্কার কলম। খুব সাবধানে সামনে প্যাড রাখল সে, তারপর কলমের খাপ খুলে মৃদু হেসে বলল, 'বাবা-মার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছি এক মেয়েকে, তাই পেয়েছি এই উপহার। আমার যা বেতন, তাতে জীবনেও এসব ব্যবহার করতে পারতাম না।' আবারও হাসল পিটার। 'অনেকের চোখ কপালে উঠবে, যখন দেখবে কোপেনহেগেনের রাস্তায় সাঁই-সাঁই করে যাচ্ছি নতুন বিএমডাব্লিউ গাড়ি চালিয়ে।'

প্যাডে চোখ রাখল পিটার। 'ঠিক আছে, প্রথম থেকে শুরু করা যাক।' পাশেই রামিন। ওর দিকে তাকাল গোয়েন্দা। 'প্রথমে টমের মৃতপ্রায় মা-র কাছ থেকে দ্য ডায়মণ্ড রিঙের কথা শুনল রামিন। এরপর যোগাযোগ করল সুসি গোল্ডার সঙ্গে। নিশ্চিত হলো ওই দল আছে। এরপর আমার সঙ্গে রামিনের পরিচয় হলে ঠিক হলো, আমরা যাব মার্সেইল্স্-এ। কিন্তু ওখানে গিয়ে সব ভজকট করে ফেললাম আমরা। যে ধরে নিয়ে গিয়েছিল আমাদেরকে, সে দ্য ডায়মণ্ড রিঙের অনেক দূরের এবং নিচু পদের লোক। ওই বিপদ থেকে আমাদের দু'জনকে উদ্ধার করল রানা। সেই সঙ্গে পাওয়া গেল দুই মেয়েকে। তারা এখন বিপদ থেকে অনেক দূরে। এরপর এই দল তৈরি করল রানা। আর এসব করতে না করতে নিজেই ধরা পড়ল মাফিয়ার হাতে। ওর কব্জির ওপরে সামান্য মাংস দিয়ে আসতে হলো, বদলে পেল সুন্দর, দামি এক সিল্কের রুমাল। আর এসব হলো বলে আমরা জানলাম, সামনে কী ধরনের বিপদ হবে। বুঝলাম, একদল লোক কত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। যাজক দি ক্লয়েডের কাছ থেকে জানা গেল, এরা সাধারণ কেউ নয়। ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে সেই ফ্যাসিস্ট আমলে। ওই একই কাজ করেছিল হিটলার। শয়তানের উপাসনা করত তার তৈরি এসএস বাহিনী। অদ্ভুত ছিল সব

শপথ।' হলদে প্যাডে জরুরি কিছু কথা লিখে রাখল পিটার।

ঝুঁকে প্যাড দেখল রামিন। তাতে ওর দিকে চোখ সরু করে দেখে নিল পিটার, তারপর আবারও বলল, 'আমার ধারণা, দুই বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে দ্য ডায়মণ্ড রিং। প্রথমত, মেয়ে কেনা-বেচা করা। দ্বিতীয়ত, নানান ড্রাগ্স্ বিক্রি, ব্ল্যাকমেইলিং ও বড়লোকদের জন্যে পতিতালয় চালানো।' সবার ওপর দিয়ে ঘুরে এল পিটারের চোখ। 'তাদের চাই দুটো জিনিস: টাকা ও ক্ষমতা। হাতে হাত রেখে চলে ওগুলো। অবশ্য, অনেকের কাছে ক্ষমতা হাতে পাওয়া বেশি আকর্ষণীয়। আমার মনে হচ্ছে, এসব লোকের ক্ষমতা আর টাকার দিকে চোখ দেয়া আমাদের জন্যে জরুরি।'

'তা করব কীভাবে?' জানতে চাইল রামিন।

কাঁধ ঝাঁকাল পিটার। 'আমি স্ট্র্যাটেজিস্ট নই, তদন্তকারী অফিসার।' রানাকে দেখিয়ে দিল। 'কীভাবে ওই দলে ফুটো তৈরি করবে, তা দেখবে দলনেতা।'

চুপ করে কী যেন ভাবছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর চোখ তুলে পিটারকে দেখল। তারপর একে একে সবাইকে। 'আমরা ধরে নিচ্ছি, ওরা আমাদের সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি। বড়জোর ভাবছে, তথ্য জোগাড় করতে চাইছে কেউ। কিন্তু এত বছর গোপনে ব্যবসা চালাবার পর মনে দম্ভ জাগার কথা। ভাবছে, তাদের ক্ষমতা প্রায় অসীম। কাজেই ভাবছি, পেছন থেকে তাদের ওপর হামলা করব।'

'কীভাবে?' জানতে চাইল রেমারিক।

মৃদু হাসল রানা। 'আমাদের লোক ঢুকে পড়বে দ্য ডায়মণ্ড রিং-এ। এমন কেউ, যে বই পড়ে জেনে নেবে, কীভাবে সাধনা করতে হয় শয়তানের। তারপর যোগ দেবে ওই দলে।'

নীরব সময়। চুপ করে আছে সবাই।

কয়েক সেকেণ্ড পর নীরবতা ভাঙল অসি কালাহান। 'ভয়ঙ্কর

ওসব বিষাক্ত সাপের গর্তে ঢুকবে কে?'

সরাসরি রামিনের দিকে চেয়ে আছে রানা।

চুয়ান্ন

রঙিন এক জগতে প্রবেশ করেছে রামিন রেযা।

সকালে নাস্তা সারতে না সারতেই ওকে পাকড়ে ধরে খুব নামকরা এক দর্জির কাছে নিয়ে গেলেন কর্নেল গুগলি। রামিনকে দেখে ভয়ঙ্করভাবে কুঁচকে গেল বয়স্ক, অভিজাত চেহারার দর্জির মস্ত, লালচে নাক। তিনবার ওকে বাঘের মত চক্কর কাটল সে, আরেকবার দেখল পা থেকে মাথা পর্যন্ত, তারপর ঝড়ের গতিতে কর্নেল গুগলির উদ্দেশে কী যেন বলতে লাগল।

ধৈর্য ধরে সব শুনে মুচকি হাসলেন কর্নেল বার্নাদো গুগলি। রামিনকে বললেন, 'আমাদের প্রিয় সেনর জিয়োভানি বলছেন, তোমার চেয়েও অনেক করুণ কেস আগেও তাঁর হাতে এসেছে। তোমার দরকার কমপক্ষে ছয়টা সুট, এক ডজন শার্ট, দুই ডজন সিল্কের টাই, দশ জোড়া দামি জুতো... আর অভিজাত টাইপের মেয়েদের বিছানায় সন্তুষ্ট করতে হলে, তোমার অবশ্যই চাই কমপক্ষে এক শ'টা দামি আণ্ডার প্যান্ট।'

কর্নেলের কথা শুনে ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ল লাজুক রামিন। পরক্ষণে ওকে হাতের মুঠোয় পুরল দর্জি জিয়োভানি। বেচারা বাঙালি তরুণকে সটান দাঁড় করিয়ে ফিতা দিয়ে কষতে

লাগল এক শ' রকমের হিসাব।

গত রাতে রোমে পৌঁছুতেই রামিনকে এয়ারপোর্ট থেকে তুলে তাঁর বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গেছেন গুগলি। যাওয়ার পথে খুলে বলেছেন, ভবিষ্যতে ওর জন্য কেমন হবে ইতালির সমাজ।

সব শিখতে মাত্র দু'সপ্তাহ পাবে, তারপর রোমান সমাজের উঁচু পর্যায়ের অনেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে ওকে। জোরালো সম্ভাবনা আছে, তাদের কেউ কেউ দ্য ডায়মণ্ড রিং-এর সদস্য। রামিনের কাভার হচ্ছে: মস্ত বড়লোক এক আরব শেখের অবৈধ সন্তান ও। স্বাভাবিক কারণেই ওকে পরিবারে রাখতে পারেননি শেখ। তাই বলে দায়িত্ব পালনেও ভুল করেননি। রামিনকে লেখাপড়া করিয়েছেন ইংল্যাণ্ডের সেরা বোর্ডিং স্কুলে। আপাতত ইতালির সংস্কৃতি ও সমাজ থেকে জ্ঞান নেয়ার জন্যে ওকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে রোমে। ছয় মাস পর ভর্তি হবে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে।

ভেবেচিন্তে রামিনের জন্য উপযুক্ত কাভার তৈরি করেছে রানা ও গুগলি কিন্তু স্থির হয়নি কীভাবে জোগাড় হবে বিপুল অর্থ। এদিকে কয়েক দিন আগে রানার খোঁজ নেয়ার জন্যে ফোন করেছিলেন সিনেটর ফ্রান্সিস জেফ্রি। নানান প্রসঙ্গের ভেতর কথা উঠেছিল দ্য ডায়মণ্ড রিং সম্পর্কে। পরদিন আবারও ফোন করলেন তিনি, বললেন তাঁর কাছ থেকে জানতে পেরেছে সিআইএ চিফ: দ্য ডায়মণ্ড রিঙের বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছে রানা এবং ওর দলের লোক। তাতে উৎসাহী হয়ে উঠেছে সিআইএ চিফ। বেশ কয়েক মাস ধরেই ওই গুপ্তসংঘের বিষয়ে তথ্য চাইছে তার সংগঠন। কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারেনি কেউ। এমনও হয়েছে, খোঁজ নেয়া শুরু করতেই বেঘোরে খুন হয়ে গেছে সৎ অফিসার। এমনও হতে পারে, অসৎ সহকর্মীই শেষ করে দিয়েছে তাকে। সিআইএর

চিফ বুঝে গেছে, এত বেশি পরিমাণে ঘুষ দেয়া হয় পুলিশ, এফবিআই এবং অন্যান্য আইনী সংস্থার ঘুষখোর অফিসারদেরকে, হারাতে রাজি নয় তারা সোনার ডিম পাড়া হাঁস দ্য ডায়মণ্ড রিংকে। গোপন করা হচ্ছে সব সূত্র ও তথ্য। অথচ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রের সমাজ ঘুণ পোকার মত ধসিয়ে দিচ্ছে নোংরা ওই গোপন দল। আরও ক্ষতি করার আগেই ঠেকাতে হবে, আর সেই কাজই করছে রানা ও তার দল। তাই কিলার এজেন্টদের কাছে বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছে সিআইএ চিফ: আপাতত বাতিল করা হলো বিসিআই এজেন্ট এম.আর.নাইনের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ।

তাতে যে সতর্কতা হ্রাস পাবে রানার, তা নয়।

ওর কাজের বিষয়ে সিআইএ চিফের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করেছেন সিনেটর। রানাকে জানিয়ে দিয়েছেন, রামিন রেযার জন্য তৈরি ব্যাকগ্রাউণ্ড বা আর্থিক দিক নিয়ে ওকে ভাবতে হবে না। আপাতত সেসব দেখবে সিআইএ। কেউ খোঁজ নিলে জানবে, এরই ভেতর বসন্তকালীন সেমিস্টারে পলিটিকাল সায়েন্স বিভাগে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে আসাদ বিন আমিরুল্লা।

এ ছাড়া, সিআইএর কাছ থেকে পাওয়া বিশ মিলিয়ন ডলার আসাদ বিন আমিরুল্লার অ্যাকাউণ্টে জমা করে দিয়েছেন সিনেটর। ইউনাইটেড এমিরাতের একটি ব্যাঙ্ক থেকে ট্র্যান্সফার করা হয়েছে ওই টাকা। ম্যানেজার নিজে রোমের ব্যাংকো দি রোমার প্রধান শাখার ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাস্টোমার আসাদ বিন আমিরুল্লার বাবা, কাজেই বিত্তবান তরুণ চাইলে যেন দেরি না করে দিয়ে দেয়া হয় যে-কোনও পরিমাণের টাকা। বিল পাওয়া মাত্র তরুণের বাবার কাছ থেকে টাকা বুঝে নিয়ে তা পরিশোধ করা হবে ব্যাংকো দি রোমাকে।

‘এত টাকা?’ গুগলি টাকার অঙ্ক বলতেই বিড়বিড় করেছে রামিন।

মৃদু হেসে বলেছেন কর্নেল, ‘আজকাল যথেষ্ট টাকা না থাকলে ভেড়ে না হাঙরের দল। টাকার কথা যদি বলো, রোম এখনও রয়ে গেছে ছোট কোনও গ্রামের মত। সবার পেটেই আছে সবার হাঁড়ির খবর। যে মুহূর্তে সমাজে চাউর হবে, তোমার টাকার অভাব নেই, আর ভবিষ্যতে পাবে লাখ লাখ ডলার, তখনই তোমার ওপর চোখ পড়বে সবার। নতুন মডেলের ফেরারি গাড়ি ভাড়া নেব, এ ছাড়া স্প্যানিশ স্টেপস-এ বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট। আরও আছে, তোমার থাকবে দু'জন চাকর। একজন রাঁধুনি, অন্যজন বাটলার।’ আবারও হাসলেন কর্নেল। ‘বাটলারকে ভাল করেই চেনো তুমি।’

‘তাই? আমি তো...’ বলতে গেল রামিন।

কথা শেষ করলেন গুগলি, ‘জ্যাঁ মউরোস।’

‘মউরোস?’

মুচকি হাসলেন কর্নেল। ‘হ্যাঁ। এতে সম্মান বাড়বে। রোমে ফ্রেঞ্চ বাটলার রাখা মানেই ওই লোকের টাকার অভাব নেই। মউরোস যে শুধু বাটলার, তা নয়, শত কাজের কাজী। ও তোমার ড্রাইভার, সেই সঙ্গে বডিগার্ডও।’

‘বডিগার্ড?’

‘অবশ্যই,’ জোর দিয়ে বললেন কর্নেল গুগলি, ‘রোমে এটা স্বাভাবিক। ক'দিন পর পর কিডন্যাপ হয়ে যাচ্ছে টাকার কুমিররা। এক কথায়, বিত্তবান তরুণ নিজের নিরাপত্তার জন্যে অবশ্যই রাখবে বডিগার্ড। যে নামেই ডাকা হোক— বাটলার বা ড্রাইভার— কিন্তু আসলে তার মূল কাজ বডিগার্ডের। খুব ভাল মানিয়ে যাবে জ্যাঁ মউরোস। জীবন শুরু ওই কাজ দিয়েই। ইতালিতে বডিগার্ড সরবরাহকারী কয়েকটি এজেন্সিতে ওর রেজিস্ট্রেশনও আছে।

চমৎকার জানে ইতালিয়ান ভাষা। দেখলেই বোঝা যায় অভিজাত বংশের সন্তান। বজায় রাখে নিজের সম্মান। ইতালিয়ান সামাজিক আঙিনায় অভ্যস্ত। চমৎকার মিক্স করতে পারে ককটেল, সবচেয়ে বড় কথা: যে মহিলার বাড়িতে যাবে, সুযোগ পেলে তার নিতম্বে চিমটি কাটবে না।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন গুগলি। 'এক সময়ে আমারও এমন এক বাটলার বা বডিগার্ড ছিল। কিন্তু, এক ডাচেসের পিছনে বেমক্কা চিমটি কেটে... যাক গে, আরেকটা জরুরি বিষয় হচ্ছে: মউরোসের বডিগার্ড হিসেবে পুলিশেও রেজিস্ট্রি আছে। সঙ্গে রাখতে পারবে আগ্নেয়াস্ত্র।'

'এটা কাজে আসতে পারে,' চিন্তিত স্বরে বলল রামিন।

'ঠিক,' সায় দিলেন কর্নেল গুগলি, 'এবার মনোযোগ দিয়ে শোনো। নামকরা কারও পার্টিতে ডাকা হবে তোমাকে। ফলে আমন্ত্রণ আসবে অন্য সব পার্টি থেকেও। অপূর্ব সুন্দরী সব মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হবে। তখন তাদের কাউকে কাউকে ডিনারে নেবে রোমের সেরা রেস্তোরাঁয়। খুব দামি সব উপহার দেবে। সুযোগ তৈরি করে বলবে: ভাবছ শত শত কোটি ডলারের একটা অংশ বিনিয়োগ করবে বিনোদন ব্যবসায়। বিশেষ করে সিনেমায়।' চট্ করে রামিনকে দেখে নিলেন গুগলি। 'তোমাকে কাছে টানতে চাইবে মেয়েরা। আড়াল করে রাখবে না নিজেকে। ফুর্তি করো, কিন্তু ভুলবে না সতর্কতা। সবসময় মনে রেখো, ইংরেজি বলবে ইংরেজদের সুরে। কারণ লেখাপড়া করেছ ইংল্যাণ্ডের স্কুলেই। আরবি ভাষায় থাকবে সামান্য লেবানিয টান। এটা হয়েছে কারণ, ছোট বেলায় ওই দেশি শিক্ষকের কাছ থেকে শিখেছ আরবি। অতিরিক্ত মদ্যপান করো এমন ভঙ্গি নেবে, যদিও বাস্তবে থাকবে হুঁশিয়ার। যাদের সঙ্গে পরিচয় হবে, তাদের কেউ কেউ টাকা ধার চাইবে। দেবেও তুমি। সেজন্যে কখনও লিখিত কিছু নেবে না। সবাই বুঝবে, পাওয়া গেছে দারুণ ধোড়। অনেকে ভাববে, এবার

গলায় হাত বুলিয়ে জবাই করতে পারবে।'

মৃদু হাসল রামিন। ভাবছে, ইতালির সেরা সুন্দরী সব মেয়ে পিছু নেবে ওর। মন্দ কী?

পঞ্চান্ন

প্রথমে ওই সাক্ষাৎকার হলো বড্ড অস্বস্তিকর।

শেষ দুপুরে তিউনিসে পৌঁছে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে হিলটন হোটেলে গেল গিয়ারডিনি ক্যালভেসিও। ওখানে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি ব্যবসায়িক মিটিঙে যোগ দিল। সন্ধ্যা সাতটায় কালো একটা মার্সিডিয তাকে তুলে নিয়ে পৌঁছে দিল শহর থেকে বিশ মাইলে দূরের এক নির্জন ভিলায়।

ওয়েটিং রুমে পাক্কা আধঘণ্টা বসে ক্যালভেসিওর মনে হলো, ওর ওপর খেপে আছে দ্য ডায়মণ্ড রিঙের সর্বোচ্চ যাজক। তাকে কিশোর বয়সে দেখেছে, তখন ভাবেওনি ওই ছোকরা এত কম বয়সে দখল করবে এত মস্ত বড় পদ। অবশ্য বলেই বা কী হবে, তার সদ্যমৃত বাবার হাজার হাজার কোটি ডলার ও রাজনৈতিক ক্ষমতা তাকে এগিয়ে দিয়েছে এত দূর।

এসব ভাবতে ভাবতে একসময় ডাক পড়ল ক্যালভেসিওর। মস্ত অফিসে ঢুকে প্রথম দর্শনে যুবক রোমিও কোসেলিকে সফল ও হাসি-খুশি ব্যবসায়ী মনে হলো তার।

প্রকাণ্ড মেহগনি কাঠের টেবিলের পেছনে বসে আছে সুদর্শন

যুবক। সামনেই কাঠে জটিল সব নক্সা। ক্যালভেসিওর সম্মানে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল না। হাতের ইশারা করল চেয়ারে বসতে। টেবিলের ডান পাশ থেকে তুলে নিল সরু ফাইল।

নীরবে চেয়ারে বসে অপেক্ষা করল ক্যালভেসিও। এয়ারকুল্ড ঘরে ঘামছে দুশ্চিন্তায়। ওই যুবক তার বাপের মতই নিষ্ঠুর ও লম্পট। বাপ-ব্যাটার তুলনায় ওরা নিজেরা শিশু। মাত্র কয়েক বছর আগেও মেয়েদের ভাগিয়ে নিয়ে ড্রাগসে অভ্যস্ত করে পতিতালয়ের দালালের হাতে তুলে দিত যুবক। ওটা ছিল ওর সামান্য খেলা। স্রেফ মজার জন্য অসহায় মানুষকে ধরে খুন করা ওর আনন্দ। লেখাপড়া করেছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে, কিন্তু দুনিয়া-সেরা ওই মহাশিক্ষালয়ের সামান্য শিক্ষার ছাপও পড়েনি তার ওপর।

কোটের ভেতরের পকেট থেকে সোনালি ক্রস পেন বের করল রোমিও কোসেলি। রিপোর্টে কয়েকটা সংক্ষিপ্ত নোট লিখে চোখ তুলে দেখল ক্যালভেসিওর চোখে।

'ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না আমার।' যুবকের কণ্ঠ চড়া। যেন দ্রুতগামী বুলেটের মত গতি। 'বহু বছর পর আবারও তদন্ত হচ্ছে আমাদের ব্যাপারে। এবং সেটা করা হয়েছে দুই জায়গা থেকে। একবার মাফিয়া থেকে। আরেকবার কারাবিনিয়ারি থেকে। অল্প কয়েক দিনের ভেতর।'

'মনে হয় এসব কো-ইনসিডেন্স,' বলল ক্যালভেসিও। 'বুড়ো বেনিটো ম্যাসোরো কিছুই জানত না। নির্যাতনের এক পর্যায়ে মারা গেছে। তার কয়েক দিন আগে কাপো ক্যান্টারায়ার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। তেমন কিছুই বলতে পারেনি। তবুও ঝুঁকি না নিয়ে জিয়ান্না ক্যান্টারায়াকে বিদায় করে দিয়েছি। সবাই ভাববে, দলীয় লড়াইয়ের কারণে খুন হয়েছে। আমাদের সম্পর্কে তার কোনও আগ্রহ তৈরি হয়ে থাকলে, তার সঙ্গেই বিদায় নিয়েছে

সেটা।'

'ওটাই প্রথম ভুল,' আবেগহীন কণ্ঠে বলল কোসেলি। 'উচিত ছিল ক্যাণ্টারায়াকে তুলে এনে জিজ্ঞেসাবাদ করা।'

অস্বস্তি নিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল ক্যালভেসিও। 'আমরাও প্রথমে ভেবেছি, তাই করব। কিন্তু কঠিন ছিল সিনিয়র কোনও কাপোকে তুলে আনা। তখন ঠিক হলো, তার মুখ বন্ধ করে দিলেই হবে।'

সামনে ঝুঁকল কোসেলি। 'এসবের আগে আমার সঙ্গে আলাপ করা উচিত ছিল না?'

'জী, তা ঠিক,' সায় দিল ক্যালভেসিও, 'আমরা যোগাযোগ করেছি, কিন্তু বলা হলো, আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্যে আপনি আছেন প্রভুর ধ্যানে। জলদি করতে হবে, এমনই ছিল পরিস্থিতি।'

আগের চেয়ে নরম হলো কোসেলির কণ্ঠ, 'দুর্গম এলাকায় জরুরি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি।' অতীত স্মৃতি রোমন্থন করে মৃদু হাসল। 'কী দেশ আলবেনিয়া! যেমন দারিদ্র্য, তেমনি অশিক্ষা। ভবিষ্যতে ওই দেশ থেকে অনেক ভক্ত পাব।'

'মহান যাজক, কেমন চলছে ওই এতিমখানা?' সাহস করে জিজ্ঞেস করে ফেলল ক্যালভেসিও।

'সদস্য বাড়ছে, তবে খুব সতর্ক থাকতে হচ্ছে। কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা সন্দেহের বাইরে আছে। কাগজপত্র সব পরিষ্কার। প্রতি কামরায় রাখব তিরিশ থেকে চল্লিশজন ছেলে-মেয়েকে। আগামী এক বছরে তাদের সংখ্যা হবে পাঁচ শ'র বেশি। সরাতে পারব সামনের মাস থেকে।' হাতের ইশারায় প্রসঙ্গ শেষ করল কোসেলি। ফাইলে কলম দিয়ে টোকা দিল। 'এবার কাজের কথায় আসা যাক। জানতে হবে, কে তদন্ত করেছিল কারাবিনিয়ারি থেকে। অ্যাকটিভ অফিসার ছিল মেজর পাধানি। তার সুপিরিয়র অফিসার কর্নেল বার্নাদো গুগলি।'

মাথা দোলাল ক্যালভেসিও। 'আপনি জানেন, যিনি আমাদের

তথ্য দিয়েছেন, তিনি বড় কর্মকর্তা। দেরি না করে ওই তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন।'

'কথা তা নয়,' কড়া সুরে বলল রোমিও কোসেলি। 'আমার মনে হয় না, ওই কর্নেল গুগলি নিজে তদন্ত করতে চেয়েছে। তাকে হয়তো ব্যবহার করছে ইতালিয়ান ইন্টেলিজেন্স।'

মাথা নাড়ল ক্যালভেসিও। 'আমার তা মনে হয় না, মহান যাজক। ওখানেও আমাদের লোক আছে।'

'হয়তো আপনার কথাই ঠিক, কিন্তু ওটার মত দুর্নীতিগ্রস্ত সংগঠনে কে কী করছে, বোঝা মুশকিল। হয়তো তদন্ত করতে বলা হয়েছে বাইরে থেকে। আমাদেরকে জানতে হবে, আসলে খোঁজ নিতে চেয়েছে কে।' পুরো একমিনিট চুপ করে ভাবল সে, আবারও দেখল ফাইল, তারপর জানতে চাইল, 'আপনার কি মনে হয়, মার্সেইল্স্-এ পওলো ক্যালভির সঙ্গে এসবের কোনও সম্পর্ক আছে?'

আবারও মাথা নাড়ল ক্যালভেসিও। 'তা মনে করি না। তার সঙ্গে খুব সতর্কভাবে লেনদেন করেছে গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তা। তাকে সন্দেহ করতে পারবে না কেউ। ...যদিও জানি না, ওই মেয়ে কোথায় গেল। আপনি কিছু জানতে পেরেছেন, মহান যাজক?'

চিন্তিত সুরে বলল রোমিও কোসেলি, 'এ খুব দুঃখজনক। আমাদের কাজ নিখুঁত ছিল। কেউ বের করতে পারত না ওর খোঁজ। আপনার কী ধারণা, কী হয়েছে ওর?'

'কিছুই জানি না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্যালভেসিও। 'স্রেফ উধাও হয়েছে।'

সামনে ঝুঁকে ডেস্কের একটা বাটন টিপল কোসেলি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল সাদা আলখেল্লা পরা এক ভৃত্য। হাতে তামার ট্রে। দু'জনের সামনে নামিয়ে দিল কফির কাপ ও কয়েক

রকমের সুস্বাদু মিষ্টি। তার সামনেই আলাপ করতে দ্বিধা করল না দ্য ডায়মণ্ড রিঙের সর্বোচ্চ যাজক। তার এই ভৃত্য কালা ও বোবা। বাটন টিপলে কয়েক রকমের বাতি জ্বলে তার সামনের প্যানেলে। তখন মালিকের কী লাগবে বুঝতে পেরে সেই অনুযায়ী কাজ করে সে।

'আগেও সবাইকে বলেছি, দেরি না করে জোগাড় করতে হবে নতুন কাউকে,' বলল ক্যালভেসিও। 'আমাদের অভিষিক্ত সদস্য তৈরি, তাকে বেশি দেরি করিয়ে দেয়া ঠিক হবে না। আপাতত ঘোরের ভেতর আছে, বুঝতে পারছে না ধরা পড়েছে জালে।'

সায় দিয়ে মাথা দোলাল কোসেলি। 'তিন সপ্তাহের ভেতর জোগাড় করতে হবে। চেষ্টা করব এতিমখানা থেকে কাউকে নিতে। তাকে হতে হবে কিশোরী বয়সের অতি সুন্দরী। প্রথম দফায় যাদেরকে সুযোগ করে দেয়া হয়েছে, তাদের দেখিনি। কাউকে পছন্দ না হলে বাধ্য হয়েই কোনও মেয়েকে কিডন্যাপ করতে হবে। তাতে আবার আছে বাড়তি ঝুঁকি। তা হোক। সেক্ষেত্রে নেপলস বা আরও দক্ষিণের কোনও শহর থেকে জোগাড় করব। বুঝতেই পারছেন, তা হলে রং ব্যবহার করে সোনালি করতে হবে মাথার চুল।' চকচক করে উঠল যুবকের চোখ। একবার দেখল সামনে বসা সিনিয়র সদস্যকে। 'তবে সত্যিকারের সোনালি চুলের মেয়ে সবসময় সেরা।' এক চুমুক কফি নিয়ে প্রসঙ্গ বদল করল সে, 'আমাদের প্রথম কাজ হবে, কে খোঁজ নিচ্ছে, তা বের করা। আমার মনে হয় না এসব করা হয়েছে কর্নেল গুগলির ব্যক্তিগত আগ্রহে। সে বা তার সহকারীর সঙ্গে আলাপ করা হলে মন্দ হয় না। আপনি কী মনে করেন?'

'জী, ঠিকই বলেছেন, মহান যাজক,' বলল ক্যালভেসিও।

ছাপ্পান্ন

কিছু দিন আগে দেহে এসেছে যৌবন, যেমন কচি, তেমনি সজীব চেহারা। পরনে চমৎকার, দামি পোশাক। কিন্তু কিছুক্ষণ নজর দিলে যে-কেউ বুঝবে, জটিল এই সমাজে ওরা অনেক অভিজ্ঞ। চোখ-মুখে ভবিষ্যতে কিছু করার প্রতিজ্ঞা ও এক হাজার একটা হিসাব-নিকেশ। তাদেরই একজনের মাথার চুল সোনালি, চোখ নীল। ওর পাশে সুন্দরী কালো চুলের আরেক মেয়ে, চোখ সবুজ। মাথার চুল, চোখের রং বা মুখ বাদ দিলে এই দুই মেয়ের দৈহিক গঠন প্রায় একই রকম। প্রকাণ্ড হলরুমের আরেক মাথায় রামিনকে দেখছে, চোখে ক্ষুধার্ত সিংহীর দৃষ্টি। যেন খায়নি কতকাল!

'সত্যিই, দেখার মতই সুন্দর,' বিড়বিড় করল সোনালি চুলের মেয়েটা।

'দেবতার মতই নিখুঁত,' কয়েক সেকেণ্ড পর সায় দিল কালো চুলের সবুজ নয়না। 'ফালতু লোক না। যারা একটু সুযোগ পেলেই এ-ধরনের পার্টিতে ঢুকে পড়তে চায়, তাদের মত নয়। দেখেছ, ওর হাতঘড়িটা? সত্যিকারের পাটেক ফিলিপ! আঙটির রুবি পাথরটাও আসল। ভুল না হয়ে থাকলে ওই সুট এসেছে জিয়োভানি'য থেকে। গায়ের পোশাক, আর অন্য সবকিছুর দাম হবে কমপক্ষে এক লাখ ডলার।' ইতালিয়ান ভাষায় কথা বলছে

মেয়েটা, কিন্তু টাকার কথা এলে এরা সবসময় হিসাব কষে ডলারে।

দুই তরুণীর কথা শুনে ফেলেছে এক বয়স্ক লোক, একেবারে তাদের পিছনে গিয়ে থামল সে, ঠোঁটে বাঁকা হাসি। পরনে নতুন সিল্কের ডিনার কোট। কিন্তু আরও দশবার প্লাস্টিক সার্জারি করলেও চিরকালীন বাঁকা চেহারা বদলে যাওয়ার নয়। সরু ঠোঁট মুড়ে হেসে বলল, 'সেনোরিনে, হাতের মুঠোয় ওকে পেলে সবই পাবে। রিসো ডেলোর্স বলেছে, কিছু দিন আগে ওই ছেলে ব্যাংকো ডি রোমায় অ্যাকাউন্ট খুলেছে। প্রাথমিকভাবে জমা দিয়েছে বিশ মিলিয়ন ডলার।'

হঠাৎ হিংস্র বাঘিনীর শ্যেন দৃষ্টি নিজ চোখে জ্বেলে নিয়ে লোকটার দিকে ঘুরে চাইল দুই তরুণী।

'রিসো ডেলোর্স আপনার বন্ধু?' জানতে চাইল সোনালি চুল।

বয়স্ক লোক মাথা নাড়ল। 'না, ক'দিন আগে পরিচয়।'

'সে কী করে জানল ওই খবর?'

আবারও হাসল লোকটা। নিজের দিকে মেয়েদের মনোযোগ আটকে রাখতে পেরে খুশি। 'রোমে এমন কিছু ঘটছে না, যেটা জানবে না ডেলোর্স।'

'আর কী জানে সে?' জানতে চাইল কৃষ্ণকেশী।

অনেক প্র্যাকটিস করা বক্তৃতার মত বুড়োর মুখ থেকে বেরোল তথ্য: 'ওর নাম আসাদ বিন আমিরুল্লা। বয়স বাইশ বছর। মস্ত বড়লোক এক আরব শেখের অবৈধ সন্তান। ওর মা ছিল ইংলিশ। লেখাপড়া করেছে ইংল্যাণ্ডে। ইতালিতে এসেছে ছয় মাস রোমান সংস্কৃতি ও অভিজাত সমাজের হালচাল বুঝতে। ইচ্ছা আছে কয়েক কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে এ দেশে। ভাড়া নিয়েছে স্প্যানিশ স্টেপ্স্-এ প্রকাণ্ড এক অ্যাপার্টমেন্ট। সঙ্গে বাটলার আর কুক। ব্যবহার করে ফেরারি গাড়ি।'

নীরবে ঘুরে হলরুমের শেষ মাথায় রামিন রেযাকে দেখল দুই তরুণী।

খসে পড়বে পোশাক বা হাত-গলা থেকে অসংখ্য ঝিকমিকে সাদা, নীল, হলদে হীরা, এমন এক বয়স্কা মহিলার সঙ্গে আন্তরিক আলাপে ব্যস্ত আরব শেখের অবৈধ সন্তান রামিন। সুদর্শন তরুণ ও সুন্দরী তরুণীদের পার্টিতে ডেকে ফুর্তির ব্যবস্থা করে দেয়ায় নাম আছে রোমান সমাজে এই বুড়ি মহিলার।

খুব সহজেই তাঁর মা-র অকল্পনীয় কানেকশন ব্যবহার করে এই পার্টিতে রামিনের আমন্ত্রণ পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কর্নেল গুগলি। দেরি হয়নি ওর নতুন পরিচয় নিখুঁত করতে। সঠিক পার্টি বেছে নিয়েছেন কর্নেল। এখানে হাজির হয়েছে কমপক্ষে পঞ্চাশজন অতিথি। তাদের অনেকে ফিল্ম, টেলিভিশন বা মিডিয়ায় পরিচিত মুখ। এ ছাড়া, রয়েছে অভিজাত বংশের লোক। তাদের ভেতর রয়েছে ড্রেস ডিযাইনার, সন্দেহ করা হয় এমন এক ব্যাঙ্কার ও কয়েকজন সুদর্শন বা সুন্দরী তরুণ-তরুণী।

মস্ত ঘরে ধীরে ধীরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় রামিনকে নিয়ে চলেছে বয়স্কা অতিথি-সেবিকা মহিলা। সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় তরুণ রামিনের কনুই ধরে রাখছেন, যেন ছেড়ে দিলে মহা দামি কিছু হারিয়ে বসবেন।

এদিকে অধৈর্য হয়ে উঠেছে দুই সুন্দরী তরুণী, অস্থির লাগছে ওদের। ওদিকে এক টেলিভিশন এগযিকিউটিভ ও এক সুন্দরী কিন্তু ক্লান্ত তারকার সঙ্গে আলাপ জুড়েছে আসাদ বিন আমিরুল্লা।

এ-ও কি সহ্য হয়?

প্রোডিউসার ও তারকা তাদের কার্ড দিল ধনী তরুণকে।

দম আটকে গেল দুই তরুণীর, যখন দেখল বুড়িটা সুদর্শন তরুণকে নিয়ে থেমেছে এক নায়িকার সামনে।

দাঁতে দাঁত পিষল দুই তরুণী।

তাদের একজন বিড়বিড় করে বলল, ‘ওই বেটির আসল বয়স কমপক্ষে পঁয়তাল্লিশ!’

‘কতবার প্লাস্টিক সার্জারি করেছে, তা জানো?’ কৃষ্ণকেশী তরুণী বলল, ‘ওই ঠোঁট পুরো নকল! ওই জন্যেই তো ওকে দেখতে মনে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ বছরের। কিন্তু...’

‘কোনও চিন্তা কোরো না,’ দুই তরুণীর পেছন থেকে নিচু স্বরে বলল বুড়ো ভাম। ‘শুনেছি কমবয়সী মেয়েই পছন্দ করে ও।’

মাঝরাত হয়ে যাওয়ার পর সোনালি ও কালো চুলের মেয়ে দুটোকে বগলে নিয়ে পার্টি ত্যাগ করল রামিন রেযা।

সাতান্ন

রোমান উঁচু সমাজের কলিজার মধ্যে ঢুকে পড়েছে রামিন রেযা, এদিকে বসে নেই মাসুদ রানাও। রেমারিকের হোটেলে ওদের হেডকোয়ার্টারে তথ্যের জন্যে ওত পেতে অপেক্ষা করছে পিটার লারসেন ও ব্রিয়াঁ ফুলজেন্স। এদিকে গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তার ওপর চোখ রাখতে মিলানে গেছে সিম কর্নেলিস ও অসি কালাহান। নেপলসে গিয়ারডিনি ক্যালভেসিওর ওপর চোখ রাখছে রানা।

ফাঁকা হোটেলের ছোট একটা ঘর দখল করেছে লারসেন। ফ্যাক্স, টেলেক্স তো আছেই, রয়েছে ইণ্টারনেটের সব সুবিধা। ব্যবহার করছে আধুনিকতম ল্যাপটপ কমপিউটার।

দলের সবাই যে যার কাজ নিখুঁতভাবে সারছে বুঝতে পেরে সন্তুষ্ট রানা।

মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার ভেতর যত তথ্য ওরা পেতে পারত, সবই জোগাড় করেছে পিটার লারসেন। প্রতিটি তথ্য তুলনা করে তারপর সেসব সত্য কি না, তা নিশ্চিত হয়ে ফাইলে তুলছে।

মাঝে মাঝে গোজোয় ফোন করে টম ও জেনির খোঁজ নিচ্ছে রানা। কিশোরী মেয়েটা চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে নতুন স্কুলে। অনোরিয়া বলেছেন, কল্পনাও করতে পারেননি এত দ্রুত মাল্টিয ভাষা শিখবে জেনি। স্কুলের নানরা বলেছেন, বয়সের তুলনায় অনেক বুদ্ধিমতী, তেমনই ওর সততা। অবশ্য, রানাকে বলেছেন অনোরিয়া, কখনও কখনও খুব চুপচাপ হয়ে যায় জেনি। তখন বার-বার জিজ্ঞেস করে, কোনও খবর এল কি না রানা ভাই বা রামিন ভাইয়ার কাছ থেকে।

রানা বুঝতে পারছে, ওদেরকে কাছে না পেয়ে অধৈর্য হয়ে উঠছে বাচ্চা মেয়েটা। অন্তর দিয়ে ভালবাসে ওদের দু'জনকে। ওদের বিপদের কথা ভাবতে গিয়ে মন খারাপ থাকে ওর— নিজে কিছুই করতে পারছে না, তাই।

প্রতিদিন ফোন করবে, ভেবেছিল রানা। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছে, তা ঠিক হবে না। একবার অভ্যেস হয়ে গেলে ফোন না পেলে খুব দুশ্চিন্তা করবে জেনি। এসব ভেবেই এক দিন বা দু'দিন পর পর ই-মেইলে ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে রানা। একই কথা বলেছে রামিনকে। সে যেন সময় করে ভেবেচিন্তে ই-মেইল পাঠায়। রানা জানে, কখনও কখনও সংক্ষিপ্ত চিঠিও হয়ে উঠতে পারে দীর্ঘ ফোনালাপের চেয়ে ভাল।

ফোনের দিকে চোখ গেলে রানার মনে পড়ছে জেনির দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখ। বুঝতে পারে, কতটা পছন্দ করে মেয়েটাকে।

ওদিকে ফোনে ওর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে সোহেল।

প্রতিদিন নতুন তথ্য পাচ্ছে ওরা।

বাংলাদেশের কয়েকটি বড় শহরে অতীতের আর্থিক দৈন্য থেকে রাতারাতি অনেক ওপরে উঠে এসেছে একদল লোক। দামি সব গাড়ি, একাধিক বিলাসবহুল বাড়ি ও প্রচুর টাকার বহর দেখে বিসিআই বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত হয়েছে, এরা হঠাৎ করেই হয়ে উঠেছে উচ্চ-উচ্চবিত্ত। গোপনে পরীক্ষা চলছে তাদের কাগজপত্র। খোঁজখবর করে জানা গেছে, এদের কারও কারও মাধ্যমেই ড্রাগ্‌স্ ও নারী ব্যবসা চালাচ্ছে দ্য ডায়মণ্ড রিং।

রানাকে জানিয়েছে সোহেল, হঠাৎ অস্বাভাবিক বড়লোক হয়ে ওঠা এসব টাকার কুমিরকে সঠিক সময়ে জালে পুরে ডাঙায় তুলবে ওরা।

ওদিকে ইউরোপ থেকে জানিয়ে দিয়েছে রানা, আর ক'দিন পর নামবে ময়দানে।

আটান্ন

ধুলোময়, কাঁচা পথ ধরে ছুটে আসছে দামি, নীল মার্সিডিয বাড়ি। ওটার দিকে চেয়ে আছেন নান। তাঁর পেছনে নিচু, দীর্ঘ দালান। মাত্র দু'মাস আগে ওটা ছিল ফসল রাখার গুদাম।

মাল্টার অগাস্টিনীয় মতবাদের যাজকদের তরফ থেকে দায়িত্ব নিয়ে এ দেশে এসেছেন সিস্টার অ্যানি হাউডরিস। আসলে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন দেশে। বহু বছর কাটিয়েছেন মিশনারি ও

শিক্ষকতার কাজে। মিশনারি হিসেবে গেছেন কেনিয়ায়। অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল সে-কাজ। তবে সন্তুষ্টিও পেয়েছেন অঢেল। কিন্তু তারপর পুরো ছয় বছর মাল্টায়, নিজ দেশে বাস করে কেমন যেন কমে গেল তাঁর ধৈর্য। তারপর মাস দুয়েক আগে তাঁকে ডেকে নতুন দায়িত্ব দিলেন মাদার সুপিরিয়র, তখনও জানতেন না, আজও প্রচুর সেবা দেয়ার সুযোগ আছে আলবেনিয়ায়।

বহু আগে শেষ হয়েছে কমিউনিস্ট আমল। বার-বার আইএমএফ সতর্ক করলেও, নতুন সরকার কিছুই না মেনে যে ভুল আর্থিক পরিকল্পনা করল, এর ফলে দেশ জুড়ে এল ভয়ঙ্কর বিপর্যয়। সাধারণ মানুষ টাকা ফেরত চাইলে সরকারের নির্দেশে তাদের বুকে গুলি চালাল সশস্ত্র বাহিনী। ফলে নিজেরাই বিভক্ত হয়ে গেল তারা। দেশ জুড়ে যুদ্ধ আরম্ভ হলে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করল প্রধানমন্ত্রী এবং পরে প্রেসিডেন্ট। নির্বাচন করে ক্ষমতায় এল নতুন সরকার। অনেকটা সামলে নিল তারা। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা হ্রাস পেলেও এখনও নিরাপদ নয় কেউ। সবাই যেন নেমে পড়েছে বড়লোক হওয়ার প্রতিযোগিতায়। সরকার বা কারও নজর নেই অসহায় এতিম শিশুদের বিষয়ে।

আর এসব এতিম শিশু লালন-পালনের কাজে মন দিয়েছেন সিস্টার অ্যানি হাউডরিস। গত দু'মাসে বারকয়েক দেখেছেন, তাঁর এতিমখানাকে পাশ কাটিয়ে গেল আর্মির কনভয়। কখনও খাবার চাইলেও নানদের ক্ষতি করেনি তারা।

বাদামি লাইমস্টোনের পাথুরে দেশ মাল্টার মানুষ সিস্টার অ্যানি হাউডরিস অন্তর থেকে ভালবাসছেন নীরব এ এলাকা। চারপাশে প্রকাণ্ড সব গাছের ঘন সবুজ অরণ্যের মাঝ দিয়ে বহু দূরে চলে গেছে সরু, মেঠো রাস্তা।

এই এতিমখানা চালাচ্ছেন তাঁরা পাঁচজন নান মিলে। অ্যানি মাল্টিয এবং দলের প্রধান। অন্যদের একজন আইরিশ বয়স্কা

সিস্টার, অন্য তিনজন ইতালিয়ান নান। তাতে কোনও সমস্যার ভেতর পড়েননি অ্যানি, অনর্গল বলতে পারেন ইংরেজি ও ইতালিয়ান ভাষা।

কয়েকটি দাতব্য সংস্থার আর্থিক সহায়তায় চালু করা হয়েছে এই এতিমখানা। তাদের ভেতর প্রধান অর্থ প্রদানকারী রোমের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। মাল্টায় মাদার সুপিরিয়র অ্যানিকে বলেছেন, আসলেই অবাক কাণ্ড, ওই সংস্থা চালাচ্ছেন কয়েকজন ধনী লোক মিলে। অথচ সবসময় চেয়েছেন গোপন থাক তাঁদের নাম। অবশ্য, সিস্টার হাউডরিস জানেন, ছুটে আসা ওই গাড়ির ভেতর রয়েছেন মস্ত মনের ওই বড়লোকদের একজন।

গত দু'মাস এতিমখানা গুছিয়ে নিতে খুব ব্যস্ত সময় কেটেছে নানদের। এরই ভেতর প্রথম চালানে এল প্রায় পঞ্চাশজন মেয়ে। তাদের বয়স চার থেকে তেরো। আগেই সিস্টারদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল, ভাঙা পরিবারের সন্তান বা বাড়ি থেকে পলাতক কোনও মেয়েকে রাখা হবে না এতিমখানায়। সুযোগ পাবে শুধু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যক্ত বা ফেলে যাওয়া শিশুরা।

সিস্টার হাউডরিসের পাশে থামল মার্সিডিয। ওই গাড়ির অ্যালবেনিয়ান ড্রাইভারকে চেনেন তিনি। পেছনের সিটে বসে আছে এক যুবক নায়কের মত চেহারা তার। ওদিকে চোখ পড়তেই মনে মনে হোঁচট খেলেন অ্যানি। মাথা নাড়লেন আনমনে।

গাড়ি থেকে নেমে এল যুবক। পরনে কালো সুট।

পথ দেখালেন অ্যানি। বলে দিলেন, একঘণ্টা পর ডাইনিং রুমে লাঞ্চের জন্য অপেক্ষা করবে সবাই। পুরো এতিমখানা ঘুরিয়ে দেখালেন যুবককে।

ভদ্রলোক বলল, বাচ্চাদের দেখভালের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হবে ছয়জন অ্যালবেনিয়ান মহিলা। এ কথা শেষ করেই জানতে

চাইল, এ দেশের ভাষা নিজে অ্যানি জানেন কি না।

জবাবে অ্যানি বললেন, গত ক'দিনে কাজ চালাবার মত অ্যালবেনিয়ান ভাষা শিখতে পেরেছেন। আশা করছেন, দ্রুতই আরও শিখে নিতে পারবেন।

যুবক জিজ্ঞেস করল, নানদের জন্য যথেষ্ট আরামদায়ক ঘর তাঁরা পেয়েছেন কি না।

জবাবে মিষ্টি করে হেসে বললেন সিস্টার অ্যানি, 'আমাদের জন্যে যথেষ্ট।'

এতে হাসল যুবক, প্রশংসা করে বলল, 'সত্যিই, আপনারা যা করছেন বাচ্চাদের জন্য, সে জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করছি।'

সাধারণ খাবার দেয়া হলো লাঞ্চে। খেতে বসে আলাপ হলো। অ্যানি বললেন, তাঁরাও কৃতজ্ঞ যে বাচ্চাদের জন্যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের মত বড় মনের মানুষ।

টেবিলে নীরবে খাচ্ছে সবাই। তাদের একজনের বয়স প্রায় বারো বছর। ডাকাতের হামলায় খুন হয়ে গিয়েছিল ওর বাবা-মা। মেয়েটির নাম সিমোনা। মাথার চুল সোনালি। ফ্যাকাসে সাদা চেহারা, কিন্তু চোখদুটো অদ্ভুত সুন্দর।

লাঞ্চ শেষ করার পর বাচ্চারা চলে যাওয়ার আগে দু'হাতে ধরে মেয়েটার মুখ তুলে কাছ থেকে দেখল যুবক। আলতো চুমু দিল গালে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সিস্টার অ্যানিকে বলল, 'মিষ্টি এই পরীর জন্যে খুঁজে দিতে হবে সত্যিকারের ভাল কোনও পরিবার। জানি, তাতে আমাদের সবার হৃদয় ভরে উঠবে স্বর্গীয় আনন্দে।'

বাচ্চারা চলে যাওয়ার পর ডাইনিং রুমেই সিস্টার অ্যানি হাউডরিস ও অন্যান্য নানকে নিয়ে মিটিঙে বসল যুবক। একটু দূরের টেবিলে বসে লাঞ্চ করছে কাজের লোকরা। যুবকের কথায় মনোযোগ দিলেন নানরা।

'আমরা সবাই জানি, আকাশে অবশ্যই একজন আছেন। যে লোক এ-কথা মানবে না, সে আসলে আছে বোকার স্বর্গে। প্রতিটি ধর্মের বই খুঁটিয়ে পড়েছি। বাদ পড়েনি ছোট সব ধর্মের বইও। মিথ্যা বলব না, কোনও একটি ধর্মের সব কথা অন্তর থেকে মেনে নিতে পেরেছি, তা-ও নয়।'

যুবক থেমে যাওয়ায় জানতে চাইলেন অ্যানি, 'আপনি কি তা হলে অধার্মিক?'

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল যুবক। 'ঠিক তা নয়, সিস্টার। বরং অনেকের চেয়ে অনেক বেশি বিশ্বাস করি।'

'সত্যিই নির্দিষ্ট কোনও ধর্মে বিশ্বাস না থাকলে, আমাদের আর্থিকভাবে সহায়তা করছেন কেন?' জানতে চাইলেন ইতালিয়ান সিস্টার লরেডা।

তাঁর দিকে ফিরল যুবক। 'আমাদের সংস্থা পৃথিবী জুড়ে নানান দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অর্থ ব্যয় করে। আর গত কয়েক বছরে আমরা বুঝে গেছি, অসহায় বাচ্চাদের সাহায্য করতে চাইলে, পাশে ধার্মিক মানুষ না পেলে, সে-কাজ বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। আর, এ কথা ঠিক, এ কাজ করতে গিয়ে আমাদের কাউকে যে অতিরিক্ত ধার্মিক হতে হবে, তা-ও নয়।' মিষ্টি হেসে হাতের ইশারা করে নানদের দেখাল যুবক। 'আমরা যেমন আরবের রেড ক্রিসেন্টকে সাহায্য দিই, তেমনি একই কাজ করে আন্তর্জাতিক আরও বেশ কিছু সংস্থা। আমরা অগাস্টিনীয় মতবাদের আপনাদেরকে অ্যালবেনিয়ায় সাহায্য করছি, কারণ এ দেশে আছে মাল্টিয অনেক মেয়ে বাচ্চা।'

'পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, আমরা কী কাজ করতে পারব, আর কী করতে পারব না,' বললেন সিস্টার হাউডরিস। 'চার থেকে তেরো বছর পর্যন্ত মেয়ে রাখব আমরা। বলতে পারেন, কেন তা করা হয়েছে?'

সামান্য কাঁধ ঝাঁকাল ধনী যুবক। 'এটা স্বাভাবিক। খুব সতর্ক হয়ে হিসাব কষতে হয়েছে। ফাণ্ড অফুরন্ত নয়। মনে রাখতে হবে, আমাদের সবার পরিশ্রমের পাই পাই পয়সার হিসাব কষতে হয়েছে। যেন চার আনাও নষ্ট না হয়। বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, এই দেশের এতিম মেয়েরা অনেক বেশি অবহেলিত। যাক সেসব, ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, চোদ্দ বছর হয়ে যাওয়ার পর যে-কোনও মেয়েকে ধরে নিতে পারি, সে সাবালিকা হয়ে গেছে। নিজের জীবন চালিয়ে নেয়ার ক্ষমতা এসে গেছে তার। কাজেই চোদ্দ বছর হওয়ার পর তাদের বিষয়ে আর্থিক সহায়তা আমরা দেব না।'

'চোদ্দ বছর হলেই...'

প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন সিস্টার হাউডরিস, কিন্তু তার আগেই জানতে চাইল যুবক, 'আপনারা কি ভাবছেন, আগামী দু'সপ্তাহের ভেতর ব্যবস্থা করতে পারবেন ওদের প্রাথমিক শিক্ষার? বা আরও মেয়ে রাখতে পারবেন?'

দৃঢ় ভাবে মাথা দোলালেন সিস্টার অ্যানি। 'পারব। এরই ভেতর লেখাপড়া শেখাচ্ছি ওদের। আগামী কয়েক দিনের ভেতর পৌঁছে যাবে আরও এক শ' বেড আর দরকারী জিনিসপত্র। তখন আরও মেয়েকে সুযোগ দিতে পারব। ওরা তো বলছে সব পৌঁছে দেবে আগামী শুক্রবার।'

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা দোলাল ধনী যুবক। 'গুড। নিশ্চয়ই জানেন, আমরা চাইব বেশিরভাগ মেয়েকে ইতালিয়ান দম্পতিদের হাতে তুলে দিতে। ইতালি অনেক কাছে। সেটা একটা সুবিধা। এরই ভেতর বারিতে অফিস খোলা হয়েছে। ওটা দত্তক নেয়ার বিষয়ে কাজ করবে। আগামী কয়েক দিনের ভেতর ওই সংস্থার ডিরেক্টররা দেখে যাবেন এই এতিমখানা। আন্তর্জাতিক বেশ কিছু রিসার্চের ওপর ভিত্তি করে কাজ করছি আমরা। মনে করি না

বাচ্চাদের বেশি দিন এতিমখানায় রাখা উচিত। তাতে চাপ তৈরি হয় তাদের মনে। ওদের জন্যে সবসময় জরুরি স্থায়ী বাসস্থান। কাজেই দত্তক নিতে আগ্রহী দম্পতির জন্যে দরজা খুলে দেয়া হবে ওই সংস্থা থেকে। বলতে পারেন, আপনাদের এই এতিমখানা হয়ে উঠবে বাচ্চাদের যার যার বাড়িতে চলে যাওয়ার আগের স্টেশন। আশা করি, এক বা দুই সপ্তাহের ভেতর প্রথম মেয়েকে তার নতুন বাবা-মার হাতে তুলে দিতে পারব আমরা।' সিস্টার অ্যানি হাউডরিসের চোখে তাকাল যুবক। একটু কড়া সুরেই বলল, 'কাজেই, একটা কথা মনে রাখবেন, আপনাদের কর্মীরা, বা আপনারা কোনও মতেই মানসিকভাবে কোনও বাচ্চার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়বেন না। আমরা জানি, মা-র মত ভালবেসে ফেলতে পারেন আপনারা ওদের কাউকে। কিন্তু তাতে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই হবে না। আশা করি, আপনারা এসব দিকে খেয়াল রেখে চলবেন।'

মাথা দোলালেন সিস্টার সুপিরিয়র। 'আমাদের জন্যে কঠিন ওদের না ভালবেসে থাকা। কিন্তু ঠিকই বলেছেন, আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত। তাতে শুধু কষ্টই পাব আমরা। যত দ্রুত সম্ভব ওদের জন্যে ভাল পরিবার খুঁজে দিতে হবে। তাতে আরও অনেক মেয়েকে সাহায্য করতে পারব। আসলে কত এতিম মেয়ে যে বিপদের ভেতর আছে এ দেশে, ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়।'

'ওরা অসংখ্য,' বিড়বিড় করল রোমিও কোসেলি।

উনি ঠিকই বলেছেন, ভাবলেন অ্যানি। দাতা মানুষটা যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি বিবেচক। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে আরও নানান রকম সহায়তা পাবেন। কিন্তু এসব ভাবলেও, মন থেকে অ্যানি দূর করতে পারলেন না সেই অস্বস্তি— আগে কোথাও দেখেছেন তিনি এই যুবককে।

উনষাট

তীক্ষ্ণ আঁচড় লাগতেই দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সামলে নিল রামিন রেযা। ক্ষিপ্ত সাপের মত হিসহিস করছে উন্মত্ত মেয়ে, চিরে দিচ্ছে ওর পিঠ। ওই দু'হাত খপ্ করে ধরে বালিশ চাপা দিল রামিন। কিলবিল করছে সুন্দরী। অদ্ভুত বিকৃত মুখ। বিস্ফারিত চোখ। মুক্তোর মত ঝিকমিকে দাঁতে কামড়ে ধরেছে লাল লিপস্টিক মাখা ঠোঁট। ছিঁড়েখুঁড়ে দেবে বালিশের তুলো। কিন্তু রামিনের হাত থেকে ছুটে গেল তার ঘর্মাক্ত কব্জি, আবারও হামলা এল পিঠের মাংসে। এবার ব্যথায়, রাগে ঘোঁৎ করে উঠল প্রেমিক-প্রবর, কষে চড় লাগাল অপরূপার গালে। তখনই দেখল প্রেমিকার মুখে তৃপ্তির হাসি। রামিন বুঝে গেল, একই সময়ে পৌঁছে গিয়েছিল ওরা স্বর্গে।

আধঘণ্টা পর নতুন প্রেমিকাকে বিদায় দিয়ে জ্যাঁ মউরোসের সাহায্য চাইল রামিন। ওর পিঠে অ্যান্টিসেপটিক মলম মাখাতে মাখাতে জানতে চাইল ফ্রেঞ্চ মার্সেনারি, 'এসবে লাভ হবে?'

মস্ত বেডরুমের বাথরুমে টুলে বসে আছে বিধ্বস্ত রামিন। খুশি, বাড়ি ছেড়ে গেছে ভয়ানক ডাইনী। কমোডের ঢাকনির ওপর বসে ওর পিঠে মেডিকেশন দিচ্ছে মউরোস।

'আর উপায় আছে?' বিড়বিড় করল রামিন, 'ছয়টার বেশি পার্টিতে গেছি, চরম কষ্ট পেলাম আজ। কিন্তু ওই ক্যাথেরিনা

ক্যাপরেস খুলে দিতে পারে দ্য ডায়মণ্ড রিঙের দরজা।'

'আহা রে!' রামিনের ক্ষতে আরও মলম দিল মউরোস। ওর কণ্ঠও নরম মলম: 'ওই সুন্দরীর জন্যে আরেকটু হলে জানই বেরিয়ে যাচ্ছিল! দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কত ঝুঁকিই না নেয় সাহসী পুরুষ! আহা, আমি তোমার জন্যে গর্বিত, রামিন!'

'রাখুন আপনার ঠাট্টা!' খেপে গেল রামিন, 'শালী চেঁছে তুলে নিয়েছে আমার পিঠের সব মাংস!' কিছুক্ষণ মন খারাপ করে চুপচাপ বসে থাকল, তারপর পরমতত্ত্ব পাওয়া জ্ঞানী লোকের মত বলল, 'যাক সেসব... আজ হাড়ে-মাংসে বুঝলাম, ফুর্তি করতে গেলে চাই কঠিন ব্যথার জন্য মানসিক প্রস্তুতি!'

আজ নিয়ে পুরো আট দিন রোমে উদয় হয়েছে রামিন। ব্যস্ত কেটেছে সময়। প্রথম পার্টির পর থেকে একের পর এক নিমন্ত্রণ পেয়েছে। সমাজে হয়ে উঠেছে নতুন আকর্ষণ। সবাই চাইছে তাদের পার্টিতে হাজির হোক। পুরুষ চায় ওর কান, যাতে টাকা ধারের কথা বলতে পারে; কিন্তু ওর দেহ চায় আরেক দল। ফলে প্রায় প্রতিদিন একাধিক মেয়ের সঙ্গে শুতে হচ্ছে। সবই নীরবে সইছে রামিন। শুনছে বা দেখছে সব। কখনও বলছে, টাকা বিনিয়োগ করবে ইতালিতে। বুঝিয়ে দিচ্ছে, আরও কোনও আনন্দ রয়ে গেলে, তা-ও চেখে দেখতে চায়। এরই ভেতর টেনে দেখেছে গাঁজা, বাদ পড়েনি ড্রাগ্স্ দেয়া কোক বা অন্যান্য পিল। উলঙ্গ এক পার্টিতে অংশ নিয়ে হয়েছে সেরা পারফর্মার। ওই পার্টির সবার মন্তব্য হচ্ছে: তরুণ আসাদের যেমন দুর্দান্ত স্টাইল, তেমনি স্ট্যামিনা। এসব শেষে পাঁচজনকে বাছাই করেছে ও। এরা বোধহয় দ্য ডায়মণ্ড রিঙের সদস্য। আজ রাতে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে তাদেরকে পার্টিতে ডেকেছিল। নিমন্ত্রণ করেছিল অন্তত আরও বিশজনকে।

গত ক'দিন খুব কাজে এসেছে জ্যাঁ মউরোস। চাইলে হতে

পারত মস্ত বড় অভিনেতা। নিখুঁত অভিনয় করেছে আরব শেখের অবৈধ সন্তানের চাকরের। কারও সাধ্য নেই ভাববে, এ আসলে বাটলার নয়। এতই দক্ষ, রামিন রোম থেকে উধাও হলে ওকে চাকরি দেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবে অন্তত দশজন গেস্ট। ভাল করেই জানে, মউরোসের আরেক গুণ, সে পেশাদার বডিগার্ড। তাতে রামিনের পেখমে যোগ হয়েছে নতুন পালক।

আজ রাতের পার্টির জন্য দুর্দান্ত কোল্ড বুফে তৈরি করেছিল রাঁধুনি। হার মানবে যে-কোনও নামকরা রেস্তোরাঁ। ব্যবস্থা ছিল পুরনো, দামি শ্যাম্পেন ও নানান ড্রাগের। সবার পর এসেছে ক্যাথেরিনা ক্যাপরেস। আগে তার সঙ্গে দেখা হয়নি রামিনের। পরিচয় করিয়ে দিয়েছে নতুন বন্ধু রিসো ডেলোর্স। মাত্র দু'দিন আগে ওই লোকের সঙ্গে ডিনার করেছে স্যান সৌসিতে।

ওরা দু'জন ছাড়া কেউ ছিল না টেবিলে। ডিনার শেষ করে কফি ও স্কচ উইস্কি নেয়ার পর লোকটাকে কথা দিল রামিন, নতুন নাইট ক্লাব তৈরির জন্য আপাতত পঞ্চাশ মিলিয়ন লিরা ধার দেবে। ভাল করেই জানে, ফিরে পাবে না ওই টাকা। তা যাক, কিন্তু রোমের কালো সমাজের সবই চেনে ডেলোর্স। কথায় কথায় জানিয়ে দিয়েছে রামিন, রোমের গুপ্ত সব অকাল্টের বিষয়ে ওর আছে গভীর আগ্রহ। মাঝবয়সী লোক রিসো ডেলোর্স, জীবন পার করছে বোকা মানুষের হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের টাকা ক্লিন মেরে দিয়ে। বাজে পরিবারের কুসন্তান, হেন কুকীর্তি নেই যা করেনি। নোংরা ড্রেনে ভেসে যাওয়া কোনও ছেঁড়া পাতা যেন। টের পেয়ে গেছে, কচি এই তরুণের টাকার অভাব নেই। তাই রামিনের চারপাশে ঘুরছে বুভুক্ষের মত।

রেস্তোরাঁর বিল মিটিয়ে কয়েক ব্লক দূরে জ্যাকি ও'য ডিস্কোয় গেছে ওরা। বার-এ নিয়েছে নেগ্রোনিয। তখনই ড্যান্স ফ্লোরে আঙুল তাক করে ক্যাথেরিনা ক্যাপরেসকে দেখিয়ে দিয়েছে

ডেলোর্স। কালো, পাতলা পোশাকে ঝিকমিক করছিল ফর্সা মেয়েটা।

'ক্যাথেরিনা ক্যাপরেস,' ফিসফিস করে রামিনের কানে বলেছে ডেলোর্স। 'ওই মেয়ে আপনাকে নিয়ে যাবে যা খুঁজছেন, সেখানে। কিন্তু, বন্ধু, খুব সতর্ক থাকুন। রোমে যদি ডাইনী বলে কেউ থাকে, তো সে ওই মেয়ে।' ক্যাথেরিনা ক্যাপরেস সম্পর্কে সংক্ষেপে রামিনকে বলেছে সে।

ক্যাথেরিনার বয়স পঁচিশ। মুসোলিনির ঘনিষ্ঠ এক ফ্যাসিস্ট জেনারেলের নাতনি। ওর মা ছিল মাঝারি মানের অভিনেত্রী। বেশি ড্রাগ্স্ নিয়ে দশ সালে মারা পড়েছে। জীবনে কাজ বলতে কিছুই করেনি ক্যাথেরিনা। তার প্রথম স্বামী ছিল মস্ত বড়লোক এক ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের তৃতীয় সন্তান। অতিরিক্ত মদ্য পান করে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা পড়ে সে। কেউ কেউ বলে, স্ত্রীকে তিন প্রেমিকের সঙ্গে বিছানায় দেখে মগজ বিগড়ে গিয়েছিল ছেলেটার। দ্বিতীয় স্বামী ছিল ক্যাথেরিনার চেয়ে বিশ বছরেরও বেশি বয়সের এক ব্যবসায়ী। বিছানায় মারা যায়। পরে পুলিশ পেল তার বেডরুমের মেঝেতে ভাঙা বোতল ও অ্যামাইল নায়েট্রাইট। ধারণা করা হলো: ক্যাথেরিনার দৈহিক চাহিদা আর ড্রাগসের চাপ সহ্য করতে পারেনি তার হৃৎপিণ্ড। ওই দুই বিয়ের জন্য ক্যাথেরিনার ধনী হওয়ার কথা, কিন্তু প্রতিবার ছুটল সে মণ্টে কার্লোয় জুয়া খেলতে। মারাত্মক ওই নেশার কারণে উড়িয়ে দিয়েছে সব।

'ওর ছদ্মনাম ''শূন্য'',' হেসে বলেছে ডেলোর্স।

'এ নাম কেন?' বোকা বোকা চেহারা করে জিজ্ঞেস করেছে রামিন।

'কারণ ওর জীবন ভরা শূন্য। বিশেষ করে রুলেত খেললে হারবেই সে।'

'এখন কী করে?' জানতে চাইল রামিন।

আবারও হেসে ফেলল ডেলোর্স। 'আপনি যে পথে যেতে চাইছেন, সেই দরজা খুলে দেয়ার কাজ ওর।'

'আমার সঙ্গে ওকে পরিচয় করিয়ে দিন,' আগ্রহ দেখাল রামিন।

তাতে মাথা নাড়ল ডেলোর্স। 'উচিত হবে না। এখানে নয়।'

'তা হলে তার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে?'

'চলুন, বাইরে যাই,' বলল ডেলোর্স। 'বেরিয়ে গিয়ে তারপর বলব।'

নাইট ক্লাব জ্যাকি ও'য-এর এণ্ট্র্যান্স দীর্ঘ এক ছাউনি দেয়া ওয়াকওয়ে। ওটার শেষমাথায় রাস্তার কাছে পৌঁছে থামল ডেলোর্স। জায়গাটা অন্ধকার মত। ইতালিয়ান লোকটার চোখে চোখ রাখল রামিন।

'আসাদ, ডিনারে যে চুক্তি নিয়ে কথা হলো, তাতে বড়লোক হয়ে যাব আমরা,' বলল ডেলোর্স। 'অবশ্যই আপনাকে ব্যবসার পঞ্চাশভাগ মুনাফা দেব। আপনি তরুণ, কিন্তু আশা করি বুঝতে পারছেন, এসব লাভজনক চুক্তি চট্ করে সেরে ফেলা উচিত। আপনার ক'দিন লাগবে আমার অ্যাকাউণ্টে পঞ্চাশ মিলিয়ন লিরা ট্র্যান্সফার করতে?'

আবছা আলোয় লোকটার চোখে লোভ ও শঙ্কা দেখল রামিন। দেরি না করে বলে দিল, 'ইউএস ডলার দিলে হবে?'

'অবশ্যই... সে তো আরও ভাল!'

কোটের ভেতরের পকেটে হাত দিল রামিন, বের করে আনল পুরু বাণ্ডিল। ঝটপট দক্ষতার সঙ্গে গুনতে লাগল নোট। আটচল্লিশটা নোট আলাদা করে বাড়িয়ে দিল ডেলোর্সের দিকে।

বিস্ময় নিয়ে রামিনের দিকে চাইল লোকটা। সামান্য ফাঁক হয়ে গেছে মুখটা।

'প্রতিটা নোট বিশ হাজার ডলারের,' হালকা সুরে বলল

রামিন। ‘এক্সচেঞ্জ রেট দেখিনি, কিন্তু মোটামুটিভাবে ওই পঞ্চাশ মিলিয়ন লিরার সমানই হবে।’

খুব সাবধানে হাতে নোটগুলো নিল ডেলোর্স। গুনে দেখল না। প্যান্টের পেছনের পকেটে রেখে বিড়বিড় করে বলল, ‘পরে রিসিট কেটে দেব। আমার উকিল অত্যন্ত বিশ্বস্ত।’

মাথা নেড়ে বলল রামিন, ‘রিসিট পাঠাতে হবে না, রিসো। লিখিত চুক্তি না থাকাই ভাল।’

প্রায়-অন্ধকারে রামিনের সাদা দাঁত দেখতে পেয়ে নিজেও খুশিতে হেসে ফেলল ডেলোর্স। ‘আমি অবশ্যই দেখব যেন আপনার পার্টিতে যায় ক্যাথেরিনা।’

পার্টিতে দেরি করে এল মেয়েটা, একা।

আগেই মউরোসকে বলে রেখেছিল রামিন। ক্যাথেরিনার নাম শুনেই প্রভুর ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল ফ্রেঞ্চ বডিগার্ড।

যুবতীর গায়ে টাইট ফিটিং কালো লিওটার্ড ও নিচে সংক্ষিপ্ত উলের সাদা স্কার্ট। মস্ত খোঁপা মাথার ওপর। দু'হাতের আট আঙুলে সোনার আংটি। কণ্ঠে সাধারণ সোনার নেকলেস। কানে দুল নেই।

রামিন দেখল, ক্যাথেরিনার স্কার্টের মতই ধবধবে সাদা তার গা। টের পেল, ওর বুকে ভয় নেই, কিন্তু বোধ করছে চাপা উত্তেজনা।

মেয়েটাকে পৌঁছে দিয়ে জানতে চাইল মউরোস, ‘মাস্টার, শ্যাম্পেইন?’

রামিন কিছু বলার আগেই মাথা নাড়ল ক্যাথেরিনা। ‘আপনি কি জানেন কাকে বলে বুলশট?’

মাথা দোলাল মউরোস। ‘জী, সেনোরা। আধাআধি করে দেব?’

বডিগার্ডের চেহারা ভাল করে দেখে নিল ক্যাথেরিনা। ‘না।

তিন ভাগের এক ভাগ বুল, অন্য দুই ভাগ শট।'

অবাক হয়ে শুনছে রামিন। জিজ্ঞেস করল, 'কী অর্ডার দেয়া হলো?'

মিষ্টি হাসল মেয়েটা। শাঁখার মতই পরিষ্কার দাঁত, মানানসই। সেগুলোর ওপর বুলিয়ে নিল লাল জিভ। এত নিচু স্বরে কথা বলছে যে, কান পেতে শুনতে হয়।

'বুলশট মানে অর্ধেক বিফ কনসোমে, অর্ধেক ভোদকা; বেশিরভাগ গ্লাসে ঢালা হবে সমান সমান করে। রামিন, তোমার বাটলারকে বেশি করে ভোদকা দিতে বলেছি।' মাথা কাত করে তরুণের দিকে চাইল ক্যাথেরিনা। মন দিয়ে দেখছে। খসখসে কণ্ঠে বলল, 'ওরা ঠিকই বলেছে।'

'কী বলেছে ওরা?' জানতে চাইল রামিন।

'দেবী ভেনাসকে ফেলে এ শহরে এসেছে অ্যাডোনিস... কিন্তু অ্যাডোনিস তার পার্টিতে কেন চাইল আমাকে?'

বিমান থেকে রোমে নামার পর এই প্রথম নিজেকে বোকা মনে হলো রামিনের। বুঝে গেল, ওর যথেষ্ট বয়স হয়নি, আর তাই প্রচুর বই পড়া হয়ে ওঠেনি। তা ছাড়া, লেখাপড়ার বই আর অস্ত্র বা মার্শাল আর্ট নিয়ে কাটিয়ে দিতে হয়েছে বেশিরভাগ সময়। আগেও মানুষ খুন করেছে, তাতে বুক কাঁপেনি, কিন্তু এবার সত্যিই ভয় পেল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য অনিশ্চয়তায় ভুগল ও, তারপর চট্ করে সামলে নিল। আশা করল, ওর দ্বিধা ও ভয় বুঝতে পারেনি ক্যাথেরিনা।

'ওরা আমাকে বলেছে তোমার ছদ্মনাম শূন্য।'

মিষ্টি হাসল সুন্দরী মেয়েটা। 'ডেলোর্স বেশি কথা বলে। আর কী কী বলেছে আমার নামে?'

'বলেছে তুমি খুব বিপজ্জনক।'

হাসি চওড়া হলো ক্যাথেরিনার। 'আর তাই আমাকে পার্টিতে

ডেকেছ?’

‘অবশ্যই!’

মাথা কাত করে হাসল ক্যাথেরিনা। কণ্ঠের মতই তার হাসিও খসখসে।

লাউঞ্জের ভিড়ের ভেতর দিয়ে এসে ট্রে নিয়ে তার সামনে থামল মউরোস। গ্লাসটা তুলে নিল ক্যাথেরিনা। বুফে টেবিলের দিকে ইশারা করল মউরোস। তাতে মাথা নাড়ল রূপসী। ঠোঁটে গ্লাস তুলে বলল, ‘এ জিনিস আরও নেব, ওতেই ডিনার হয়ে যাবে।’ এখনও মউরোসের দিকে চেয়ে আছে। জানতে চাইল, ‘অন্য গেস্টরা কখন বিদায় নেবে?’

একটু অবাক হয়েছে মউরোস, চট্ করে দেখল রামিনকে।

পাটেক ফিলিপ দেখে নিল রামিন। বাটলারকে উদ্দেশ করে মৃদু মাথা দোলাল। ‘ঠিক আছে, একঘণ্টা পর ওদের বিদায় করে দিয়ো।’

বাথরুমের টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রামিন, ব্যথায় কুঁচকে ফেলল মুখ। আড়মোড়া ভাঙল।

ওর সঙ্গে উঠে দাঁড়াল মউরোস, এখনও হাসছে। জানতে চাইল, ‘এবার কী?’

তাকে ঘুরে দেখল রামিন। ‘পরের কাজ আগামীকাল রাতে। ওই ডাইনীর সঙ্গে ডিনারে যাব একা। রাতের খাবার শেষ করার পর আমাকে নিয়ে যাবে শহর ছেড়ে দূরের এক গ্রামে।’

‘আবারও তোমার বারোটা বাজাবে,’ বলল মউরোস।

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল রামিন। ‘বুকে ভীষণ ভয় নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল, এর চেয়েও জরুরি কাজ আছে।’ খেয়াল করল, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে মার্সেনারি। তাকে শঙ্কামুক্ত করতে গিয়ে বলল রামিন, ‘চিন্তা করবেন না। না গিয়ে উপায়ও

নেই। সামান্য ঝুঁকি তো নিতেই হবে।'

'আঁচ করতে পেরেছ ওই পার্টি কোথায় হবে?' জানতে চাইল মউরোস।

মাথা নাড়ল রামিন। 'না। কিন্তু এটা বলেছে, এখান থেকে ওই জায়গা আধঘণ্টার গাড়ির পথ। আমার ধারণা, শহরের সামান্য বাইরে ওটা। ভাববেন না, মউরোস। কেউ সন্দেহ করছে না আমাকে। আসল বিপদ আসবে পরে।'

ষাট

শেষে কী রূপকথার বুড়িদের মত হাড় মুড়মুড়ি ব্যারাম ধরে বসল আমাকে, ভাবল রানা। ধীরে সুস্থে ভাঙল আড়মোড়া। পুরো চার ঘণ্টা গোলাকার এই টিলার মাথায় বেকায়দা ভঙ্গিতে বসে আছে। চোখ রেখেছে নীচে, এক কিলোমিটার দূরের ওই ভিলার ওপর।

চারপাশের হাই-গ্রেড এরিয়াল ফোটো সংগ্রহ করেছে ভিটেলো রেমারিক। এ কারণেই এখানে এসে আরও নিশ্চিত হয়েছে রানা, ওই মস্ত ভিলার বাইরে উঁচু স্টিলের জালের মত বেড়া। সব মিলে আট শ' গজেরও বেশি বৃত্তাকার এলাকা, মাঝে ভিলা।

কালো চামড়ার জ্যাকেটের পকেট থেকে ট্রাইলক্স নাইট-সাইট নিয়ে ওদিকটা দেখছে রানা। স্টিলের জালের বেড়ায় একটু পর পর লোহার পোক্ত খুঁটি। রানা আঁচ করেছে, ওখানে সংযোগ দেয়া আছে সফেসটিকেটেড অ্যালার্ম সিস্টেম। এ ছাড়া, ওই বেড়া

সম্ভবত ইলেকট্রিফায়েড। তবে খরচ কমাতে সাগরের দিকে বেড়া দেয়নি গিয়ারডিনি ক্যালভেসিও। বেড়া দেয়া উচিত ছিল টিলার ওপর আর পেছনের দিকেও। টিলার চূড়া থেকে পরিষ্কার দেখছে ভিলার প্রবেশদ্বার। বাড়ি থেকে কেউ বেরিয়ে এলে, এখানে বসে তাকে গেঁথে ফেলতে পারবে আধ-পাকা স্নাইপারও।

এখানে এসে ভিলার প্রবেশদ্বারের কাছে দুটো গাড়ি দেখেছে রানা। পরের আধঘণ্টায় এল আরও চারটে গাড়ি। ওগুলো থেকে নামল সব মিলে ছয়জন পুরুষ ও চারজন মহিলা। প্রবেশ-পথের আলোয় দেখা গেল, তাদের পোশাক দামি ও আধুনিক। ডিনার পার্টি বোধহয়। ইতালিয়ান সমাজে প্রায় সবাই অনেক দেরি করে রাতের খাবার সারে।

ভিলাটা দোতলা, সাদা রঙের, ছাতে লাল টাইল্‌স্‌। শুধু এক তলায় জ্বলছে বাতি। আবছা শুনছে রানা ক্লাসিকাল মিউযিক। ভিলার পেছনের খোলা টেরেসে বোধহয় দেয়া হয়েছে ডিনার। ওদিকে গিয়ে চোখ রাখার উপায় নেই।

রাতের শীতল হাওয়া বইছে সাগর থেকে। শীত শীত লাগছে রানার। সকালে সোহেলের পর পরই ফোন করেছিল মউরোসও। শুধু বলেছে, কাজে এগোতে পেরেছে রামিন। নতুন তথ্য পাবে আগামী কয়েক দিনের ভেতর। রামিনকে বিপদে ঠেলে দিয়ে অধৈর্য লাগছে রানার। নিজে প্রায় কিছুই করছে না। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। দ্য ডায়মণ্ড রিঙের ভেতর ঢুকে পড়ার এই গুরু দায়িত্ব অসুস্থ শরীরে পালন করতে পারত না।

রানা ভাবতে চাইল, এখন কী করছে রামিন। নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে আছে কোনও রোমান সুন্দরী। আছে বিছানায়, অথবা ওদিকেই গড়াচ্ছে পরিস্থিতি। তাতে সামান্যতম খারাপ লাগল না ওর। মনে পড়ল অসি কালাহান আর সিম কর্নেলিসের কথা। রানার মতই একই কাজে ব্যস্ত ওরা। নজর রাখছে গ্যালিলিও

জিয়োরোল্লি লাফাত্তার ভিলার ওপর। সামনে দুই ট্রাইপড। সিম দেখছে শক্তিশালী বিনকিউলার দিয়ে, কালাহানের অস্ত্র টেলিফোটো লেন্স সহ দূরপাল্লার নাইকন ক্যামেরা।

গত দু'ঘণ্টা ধরে কেউ এলে বা বেরিয়ে গেলে তাদের ফোটো তুলছে কালাহান। এখন পর্যন্ত ভিলায় ঢুকেছে মাত্র চারজন। বেরোয়নি কেউ। অত্যন্ত বিরক্তিকর কাজ, কিন্তু এতে ওরা অভ্যস্ত। অতীতে বডিগার্ড হিসেবে কাজ করেছে। তারও আগে ছিল মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে।

জোরালো ঢেঁকুর তুলল অসি কালাহান। দুঃখ প্রকাশ করল।

তাতে হাসল কর্নেলিস। বিকেলে এক কড়াই স্প্যাগেটি অল ভোনগোল রেঁধেছিল। ওদের মুখ থেকে এখনও ভুসভুস করে বেরোচ্ছে রসুনের দুর্গন্ধ।

ভিলার গেটে থামল কালো এক দীর্ঘ লিমাযিন। খুলে গেল প্রবেশ-পথের ইলেকট্রিক গেট। গাড়ি গিয়ে থামল বাড়ির সামনে। ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে পড়ল চালক, খুলে দিল পেছনের দরজা।

বিনকিউলার নতুন করে ফোকাস করল সিম। গাড়ি থেকে নেমে এসেছে দীর্ঘ এক লোক, পরনে কালো ওভারকোট। সিম শুনতে পেল নাইকনের মোটর ড্রাইভ-এর গুঞ্জন।

আবারও ঢেঁকুর তুলল কালাহান, বিড়বিড় করল, 'এবারের গন্ধটা কেয়ান্তির। অত লাল ওয়াইন দেয়া ঠিক হয়নি।'

ভিলা থেকে গেস্টদেরকে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা। তারা এতই দূরে, তা ছাড়া আলোও কম, ফলে তাদের চেহারা চিনতে পারল না ও। অবশ্য বোঝা গেল, সবাই হ্যাণ্ডশেক করল টেকো এক লোকের সঙ্গে। সে-ই বোধহয় গিয়ারডিনি ক্যালভেসিও।

দ্বিতীয় গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার পর তৃতীয় গাড়ির পিছু নেবে, ভাবল রানা। টিলা থেকে নেমে চেপে বসল ঝোপঝাড়ে রাখা কালো ফিয়াটে।

দশ মিনিট পর সামনে দিয়ে গেল গাড়ির আলো। ওটা ফ্যাকাসে নীল একটা ল্যান্সিয়া। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা, তারপর পিছু নিল। নেপলস শহর পর্যন্ত পনেরো কিলোমিটার অনুসরণ করল। ভিয়া স্যান মার্কোর এক ম্যানশনের সামনে থামল ল্যান্সিয়া। খুলে গেল বাড়ির গেট, ভিতরে ঢুকে পড়ল গাড়ি। ধীর গতি তুলে ম্যানশন পেরিয়ে চলে গেল রানা। আগেই মনে গেঁথে নিয়েছে গাড়ির নম্বর ও বাড়ির ঠিকানা।

রাত তিনটের পর পৌঁছল রানা প্রেযো ফিসো বোর্ডিং হাউস অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্ট-এ। এখনও পোকার খেলছে সবাই। মুখ তুলে দেখল না কেউ। ব্যস্ত যার যার তাসে। পট-এ জমা হয়েছে নোটের বড় স্তূপ। এক চক্কর কেটে সবার তাস দেখল রানা। পিটার লারসেনের হাতে দুটো কুইন ও দুটো দশ। ফুরেলার হাতে ফুল হাউস, দুটো গোলাম ও দুটো আট। ফুলজেন্সের হাতে হার্টের ফ্লাশ। রেমারিকের হাতে কালো পানের ফ্লাশ।

সবার আগে অশ্লীল ডেনিশ গালি দিয়ে হাতের তাস নামাল পিটার। আরও দুই রাউণ্ড টিকে গেল ফুরেলা, তারপর ফেলে দিল হাতের তাস। বাঘের দৃষ্টিতে পরস্পরকে দেখছে ফুলজেন্স আর রেমারিক। রানার মনে হলো, চুরি করে ভর-পেট খাওয়া হুলো বেড়ালের মত সন্তুষ্টচিত্তে বসে আছে রেমারিক। কিছুক্ষণ পর কল দিল ফুলজেন্স, আর তখনই দুঃখিত হেসে টেবিলে নিজের তাস নামাল রেমারিক।

বিড়বিড় করে গালি দিল ফুলজেন্স।

পট-এর টাকা পকেটে পুরল রেমারিক। চোখ তুলে দেখল রানাকে। হাসি-হাসি মুখে বলল, ‘দরকার হলে সারারাত খেলব,

তোমাদের আপত্তি না থাকলে। হোটেল বা রেস্তোরাঁ থেকে এর চেয়ে কম পয়সা পাই। টুরিস্টগুলো কোনও কাজেরই না।'

মুচকি হেসে ওর সামনে একটা কাগজ রাখল রানা। 'এখানে ল্যান্সিয়ার নম্বর আর ভিয়া স্যান মার্কোর একটা বাড়ির ঠিকানা আছে। সকালে খোঁজ নিয়ো।'

কাগজটা তুলে নিয়ে চোখ বোলাল রেমারিক, মাথা দুলিয়ে বলল, 'খেলতে চাও, রানা?'

চট্ করে মাথা নাড়ল রানা। 'আরেব্বাপ! তার চেয়ে আগুনে ঝাঁপ দেয়া অনেক ফুর্তির।'

একষট্টি

চুপচাপ ডিনার শেষ করল জেনি। অনোরিয়া খেয়াল করেছেন, বরাবর যতটুকু খায় মেয়েটা, ততটা খায়নি। আনমনে কী যেন ভাবছে গভীরভাবে। এ বাড়িতে আসার পর নিয়মিত পর্যাপ্ত খাবার খেয়েছে জেনি। যেন ওর ডিউটি ওটা। দেখতে না দেখতে সুস্থ হয়ে উঠছিল। হঠাৎ আবার কী হলো মেয়েটার?

আজ শনিবার রাত। নিডো ও লুসি ডিনারে এসেছে। প্রথমে হালকা মনে সবার সঙ্গে কথা বলছিল জেনি। কিন্তু বিকেলের পর সবাই বার-বার তুলল রেমারিকের কথা। বলল, জেসমিন মারা যাওয়ার পর কেমন ছিল গোজোতে তার সময়।

জেসমিনকে বিয়ে করার পর থেকে প্রতি মাসে শ্বশুরবাড়িতে

কিছু কিছু টাকা পাঠায় রেমারিক, জেসমিন মারা যাবার পরও বন্ধ করেনি। প্রথম দিকে বাড়ির সবাই প্রতিবাদ জানিয়েছিল, কারণ তাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ নয়। কিন্তু রেমারিককে থামানো যায়নি, এখানে টাকা পাঠালে নাকি তার বোঝা কমে ইনকাম ট্যাক্সের। সেই টাকা দিয়েই পুরনো বাড়ি সংলগ্ন দোতলা একটা বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। রেমারিক বা ওর বন্ধুরা বেড়াতে এলে আরাম করে নিরিবিলিতে থাকতে পারবে। সেই খুদে দোতলার সবটুকু ছেড়ে দেয়া হয়েছে জেনি ও টমকে।

বার-বার উঠল রেমারিকের প্রেযো ফিসো বোর্ডিং হাউস অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্ট-এর কথা। জেসমিন মারা যাওয়ার পর ফুরেলাকে সঙ্গে নিয়ে ওই ব্যবসা চালাচ্ছে রেমারিক। এরই ভেতর জেনে গেছে জেনি, ওখানেই হেডকোয়ার্টার করেছে রানা ও রামিন।

পরে জেনির মনের ওপর চাপ পড়ছে বুঝতে পেরে অন্য প্রসঙ্গে সরে গেলেন অনোরিয়া।

ডিনারের পর বরাবরের মতই বাসন ও হাঁড়ি পরিষ্কারে হাত লাগাল জেনি। কাজটা শেষ করে ওদেরকে বলল, ভীষণ মাথা ধরেছে, গিয়ে শুয়ে পড়তে চায়। সবার গালে চুমু দিয়ে গুডনাইট বলে চলে গেল দোতলায় নিজের ঘরে।

প্রশস্ত ঘরে চওড়া, মস্ত খাট। একটু পর এসে ঘুমিয়ে পড়বে টম। কিন্তু ঘুমাতে পারবে না জেনি। ভাবছে রানার কথা। হঠাৎ ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল মানুষটার মুখ। নীরবে কাঁদতে লাগল জেনি। কিছুক্ষণ পর দরজায় মৃদু টোকা পড়তেই দু'হাতে মুছে ফেলল চোখের অশ্রু। ঢোক গিলে বলল, 'আসুন।'

দরজা খুলে যেতেই দেখা গেল অনোরিয়াকে, পাশে টম। কী করে যেন বাচ্চা ছেলেটা বুঝে গেছে, জেনি আপুর মন খারাপ। বাথরুমে গিয়ে দাঁত মেজে এসে চুপচাপ শুয়ে পড়ল খাটে।

জেনির পাশে এসে বসেছেন অনোরিয়া, এক হাতে জড়িয়ে

ধরলেন মেয়েটার কাঁধ। নরম সুরে বললেন, 'আমি জানি, তুমি ওদেরকে খুব মিস করছ। আমাদের বোঝা উচিত ছিল। এত কথা বলা ঠিক হয়নি।'

মাথা নাড়ল জেনি। 'না... ঠিক আছে... খুব যে মিস্ করি, তা-ও নয়। কিন্তু... আসলে... জানি না ওঁরা কী করছেন। খুব দুশ্চিন্তা হয়। স্কুলে ভাল থাকি, বইয়ে মন দিতে পারি, কিন্তু পরে একা হলে...' চুপ হয়ে গেল জেনি।

সহজ সুরে বললেন অনোরিয়া। 'তুমি ওদের মিস করবে, এ স্বাভাবিক। কিন্তু বেশি ভাববে না, জেনি। ওরা কঠোর ট্রেনিং পাওয়া যোদ্ধা। বিশ্বাস করো, ওরা হেরে যাওয়ার লোকই নয়। বলো তো, লক্ষ্মী মেয়ে, তোমার জন্যে কী করতে পারি? আগামীকাল চলো কোথাও থেকে ঘুরে আসি? কালকে তো রবিবার। নিডো যাবে ওর বন্ধুদের সঙ্গে মাছ ধরতে। যেতে চাও ওর সঙ্গে?'

মাথা নাড়ল জেনি, হেসে ফেলল। 'না, যাব না। ওরা আমাকে নেবে, কিন্তু মেয়েদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে মাছ ধরতে অপছন্দ করে ছেলেরা। ওদের ধারণা, তাতে কপাল মন্দ হয়।'

মাথা দোলালেন অনোরিয়া। 'কথা ঠিক। এই দ্বীপ ভরা সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোক। চলো, অন্য কোথাও থেকে ঘুরে আসি?'

'খুব ভাল হয়, যদি একদিনের জন্যে ঘুরে আসি রানা ভাইয়ার বাড়ি থেকে? ওখানে সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে পারব। হয়তো একাই পিকনিক করলাম?'

'তুমি ওখানে একা থাকতে চাও?'

'ভাল লাগত। আপনার আপত্তি না থাকলে ঘুরে আসতাম।'

হাসলেন অনোরিয়া। 'কোনও আপত্তি নেই। বুঝতে পারছি, অস্থির লাগছে তোমার মন। পাজেরোকে বলব, গাড়িতে করে ওখানে পৌঁছে দেবে। বিকেলে তুলে আনব আমি।'

পরদিন সকাল দশটায় প্রকাণ্ড চাবি দিয়ে বাগানবাড়ির দরজা খুলল জেনি। হাত তুলে ইশারা করল পাজেরোর উদ্দেশে। খুশি মনে ফিরতি পথে গাড়ি নিয়ে রওনা হলেন প্রৌঢ়।

প্যাশিয়ো পার করে সুইমিং পুলের পাড়ে থেমে এক মুহূর্ত ভাবল জেনি, তারপর চোখ রাখল ঢেউ খেলানো সবুজ পাহাড়ে। দূরে নীল সাগরের বুকে দ্বীপ। হঠাৎ করেই শান্ত হয়ে গেল ওর মন। কিচেনে গিয়ে অনোরিয়ার দেয়া লাঞ্চ তুলে রাখল ফ্রিযে। পোশাক পাল্টে পরে নিল সুইম সুট।

শরতের তপ্ত দিন। পানিতে নেমে পুরো বিশবার এপার ওপার করল জেনি, তারপর গা মুছে ব্যাগ থেকে বের করল বই। রোদে বসল চেয়ারে। পুরো একঘণ্টা চর্চা করল মাল্টিয ভাষার।

আরও কিছুক্ষণ পর মনে পড়ল, রামিনের বেডরুমে খাটের পাশেই আছে সনি ডিভিডি প্লেয়ার। বাড়িতে ঢুকে পছন্দের ডিভিডি বাছাই করল, তারপর শুনতে বসল ডিস্কো মিউযিক।

দশ মিনিট পর সুইমিং পুলের পাড়ে বাজতে লাগল ওই বাজনা। নাচের কৌশল শিখছে জেনি। যাওয়ার আগে রামিন বলেছে, ফিরে এসে ওকে ডিস্কোয় নিয়ে যাবে। শুধু কি তাই, ওর সঙ্গে নাচবেও। কাজেই বড় ভাইকে ডুবিয়ে দিতে পারে না ও। অন্তত একঘণ্টা নাচ প্র্যাকটিস করল জেনি। নানান বাজনার সঙ্গে শিখে নিতে চাইল পা ফেলার নানান কৌশল। তারপর কিচেনে ফিরে ফ্রিয থেকে লাঞ্চ বের করে গরম করে নিল।

অনোরিয়া তিনজন পুরুষ খেয়ে শেষ করতে পারবে না এত খাবার দিয়েছেন। এক কেজির বেশি ধোঁয়া দিয়ে রাঁধা চাপড়া ধরা স্যামন, আধ কেজি ল্যামপুকি পাই, চারটে সেদ্ধ ডিম, স্থানীয় আলুর সালাদ আর মস্ত বড় এক টুকরো পাউরুটি।

খাওয়ার ফাঁকে ওর চোখ পড়ল গুহার দিকে। বুকে টের পেল রামিনের জন্য অদ্ভুত পবিত্র ভালবাসা। ভাইয়ের জন্য ওই

অনুভূতি জাগে ভাল বোনদের মনে।

খাওয়া শেষ হলে দোতলায় উঠে ঢুকল রানার স্টাডি রুমে। তাকের পর তাক ভরা বই। কোনওটা পুরনো, কোনওটা নতুন। মানুষটা বই পড়ার সময় পায় কোথায়, ভাবল জেনি। কিছুক্ষণ কয়েকটা বই ঘেঁটে বিরক্ত হয়ে ঢুকে পড়ল রানার বেডরুমে। ঘরে বড় দুটো জানালা। একটা দিয়ে দেখা যায় যেবুকের টিলা। অন্য জানালার পাশেই দরজা, সামনে ব্যালকনি। ওখানে দাঁড়িয়ে দেখল গোজো দ্বীপের সবুজ খেত, জঙ্গল। নিজেকে আবারও বড় একা মনে হতে লাগল ওর।

ফিরে চাইল মস্ত বেডের দিকে। চোখ পড়ল দেয়ালে। ওখানে আছে রানার সিন্দুক। বিছানা ঘুরে দেয়ালের সামনে থামল জেনি। টাইল সরিয়ে কমবিনেশন লক ব্যবহার করে নীরবে খুলে ফেলল সেফের ধূসর দরজা। একবার চোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবল, তারপর আবার গিয়ে বসল খাটে। দ্বিধার ভেতর পড়ে দুলছে ওর মন।

একটু পর উঠে আবারও সিন্দুকের সামনে হাজির হলো জেনি। অনেকক্ষণ ধরে ঘাঁটল রানার রাখা সব ফাইল। তারপর নীচের তাকের ড্রয়ার খুলে বের করে নিল কয়েক বাণ্ডিল নোট। বেছে নিল ইতালিয়ান নোট। সব মিলে দশ মিলিয়ন লিরা আর দু'হাজার ইউএস ডলার। সিন্দুক থেকে খুঁজে নিল ওর পাসপোর্ট। দরজা বন্ধ করে আবারও আটকে দিল কমবিনেশন লক। আগের মত করে রাখল দেয়ালের টাইল্স্। নেমে এসে কিচেনে পেয়ে গেল টেলিফোন ডিরেক্টরি।

সন্ধ্যা ছয়টায় জেনিকে নিতে এলেন অনোরিয়া। বাগানের দরজা খুলে দেখলেন লাউঞ্জ চেয়ারে গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে মেয়েটা। পরনে জিন্স ও টি-শার্ট। পাশেই ওর ব্যাগ। অনেকক্ষণ ওখানে

চুপ করে জেনিকে দেখলেন অনোরিয়া, তারপর নরম সুরে ডাকলেন।

কয়েক সেকেণ্ড পর জাগল জেনি। চোখে ভীষণ ভয়। কিন্তু চট্ করেই বুঝে গেল কে এসেছে।

'কেমন কাটল দিন?' জানতে চাইলেন অনোরিয়া।

'খুব দারুণ,' হাসল জেনি, 'আবারও আসতে পারব তো, আণ্টি?'

'অবশ্যই!'

বাষট্টি

দশ ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি সব ছবি দেখছেন কর্নেল বার্নাদো গুগলি। মিলানের নামকরা এক রেস্তোরাঁর কেবিনে সিম কর্নেলিস ও অসি কালাহানের মুখোমুখি বসে আছেন। শেষ ছবির ওপর চোখ পড়তেই আড়ষ্ট হয়ে গেল তাঁর চেহারা। অন্তত আধ মিনিট বিড়বিড় করে কাকে যেন অভিশাপ দিলেন। বার-বার দেখছেন শেষ ছবিটা।

'এই লোক কে?' জানতে চাইল সিম কর্নেলিস।

তিক্ত কণ্ঠে বললেন গুগলি, 'জেনারেল গামেল ব্যারেস্টে। নরকে পচে মরুক শালা।' কর্নেল আরও কিছু বলবে সে জন্য চুপ করে অপেক্ষা করছে সিম ও কালাহান। বিরক্তি নিয়ে আবারও ছবি দেখছেন গুগলি। ক'মুহূর্ত পর বললেন, 'কারাবিনিয়ারিতে

আমার উপরের অফিসার সে। অন্যদের মতই, ওর আগের চোদ্দ গুষ্টি ছিল ফ্যাসিস্ট। এ শালাও একই মাল। এর কারণেই গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তা আর গিয়ারডিনি ক্যালভেসিওর বিষয়ে তদন্ত বন্ধ করতে হয়েছে আমাকে।'

সামনে ঝুঁকে বলল কালাহান, 'এই লোক যে লাফাত্তার ভিলায় গেছে, তাতেই অবশ্য তাকে অপরাধী ধরে নেয়া যাবে না।'

'দশ হাজার ডলার বাজি ধরব, এই লোক একদল বদমাসের সঙ্গে জড়িত খারাপ কোনও কিছুর ভেতর,' বললেন কর্নেল।

'অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, তাই না?' জানতে চাইল সিম।

খুব গম্ভীর হয়ে গেল কর্নেল বার্নাদো গুগলির চেহারা। 'হ্যাঁ, প্রচুর ক্ষমতা। রাজনৈতিক, সামাজিক, মিলিটারি ও ইণ্টেলিজেন্স কমিউনিটিতেও সে পরিচিত মুখ।'

প্যাডে তথ্যটা লিখে নিল কালাহান। কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'যেহেতু মোবাইল ফোন ব্যবহার করব না, ফোন বুথ থেকে কল করে তথ্যটা জানিয়ে দেব পিটারকে।'

'ফিরে এসে কী খেতে চাও?' জানতে চাইল কর্নেলিস। 'অর্ডার দেব।'

'এক প্লেট স্প্যাগেটি,' বলল কালাহান, 'ওপরে থাকবে বাদামি সস।'

একবার হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন কর্নেল গুগলি। মৃদু হাসল কর্নেলিস।

সন্ধ্যা ছয়টার সময় প্রেযো ফিসো বোর্ডিং হাউস অ্যাণ্ড রেস্টুরেণ্ট-এ ফিরল রেমারিক। ছোট্ট বার-এ বসে আছে রানা, পিটার ও ফুলজেন্স। সবার সামনে নিগ্রোনিয। বার-এর পেছনে সার্ভ করছে ফুরেলা। মাথার ইশারা করতে রেমারিকের জন্য ড্রিঙ্ক দিল সে—

শ্রিভাস রিগাল ও সোডা।

বুক পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে রানার সামনে রাখল রেমারিক। 'ওই গাড়ি ও বাড়ির মালিকের নাম।'

কাগজের লেখা পড়ল রানা। রেমারিকের দিকে তাকাল। 'ম্যানুয়েল য্যারাফা। চেনো একে?'

'ব্যক্তিগতভাবে নয়,' বলল রেমারিক, 'কিন্তু স্থানীয় পুলিশে আমার বন্ধু আছে। তারা আবার জড়িত মাফিয়াদের সঙ্গেও। তাদের কাছ থেকে শুনলাম, অদ্ভুত এক চরিত্র ম্যানুয়েল য্যারাফা। ওর মা ইটালিয়ান, বাবা ফরাসি। বারো বছর আগে স্থায়ী হয়েছে নেপলসে। তখন যৌন-নিপীড়নকারীদের এক দলে যোগ দিয়ে ধরা পড়ে। কী করে যেন ফস্কে যায় আদালতের রায় থেকে। আমার সোর্স বলেছে, এরপর নিজেকে প্রমাণ করেছে ঈশ্বর-ভক্ত হিসেবে। পরবর্তী সময়ে তার নামে আর কোনও অভিযোগ ওঠেনি। পরিষ্কার রেকর্ড। ফেরেস্তা বলতে পারো। বেশ কয়েকটা দাতব্য সংস্থার বোর্ড ডিরেক্টর। কেউ পুব ইউরোপ থেকে ইতালিতে আশ্রয় নিতে পালিয়ে এলে, তাদেরকে সহায়তা করে আইনীভাবে। বিশেষ করে কেউ আলবেনিয়া থেকে এলে।'

'আর কিছু?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল রেমারিক। 'আমি এখনও মাটি খোঁড়ায় ব্যস্ত। কিছু পাওয়া গেলে তখন বলব।'

কাগজের টুকরো তুলে নিয়ে দেখল পিটার, রওনা হয়ে গেল নিজের অফিসের দিকে। 'এসব তথ্য কমপিউটারে তুলে নেব। জেনারেল গামেল ব্যারেস্টের ফাইলের পরের ফাইলটাই হবে এর।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে পিটার, এমন সময় বলল রেমারিক, 'ও, আরেকটা কথা, যেসব চ্যারিটি অর্গানাইযেশনের সঙ্গে ম্যানুয়েল য্যারাফা আছে, তার একটার হেড সে নিজে; আর সেই

সংস্থা কয়েক দিন আগে বারিতে অফিস খুলেছে। তাদের কাজ আলবেনিয়ার এতিম মেয়েদের ইতালিতে পুনর্বাসন করা।'

'বারি?' জিজ্ঞেস করল পিটার।

'হ্যাঁ,' বলল রেমারিক, 'ওটা আলবেনিয়ার সবচেয়ে কাছের ইতালীয় বন্দর। প্রচুর সময় দিচ্ছে সে ওখানে।'

তেষট্টি

কিছু মানুষ হয় অন্তর্মুখী, বাস করে মনের গভীরে। পৃথিবীতে বাস করেও সবার সঙ্গে মিশতে বড্ড অস্বস্তি। তেমনই একজন মেজর কোসিমা পাধানি। সবসময় ভয়, এই বুঝি মস্ত কোনও ভুল করে ফেলল। মেনেও নিয়েছে, সে দৈহিকভাবে আকর্ষণীয় নয়। কাজেই কোনও মেয়ে ভালবাসবে না কখনও। আসলে মনের ভয় ছোট করে রেখেছে তাকে।

মাঝারি আকারের মানুষ হলেও ওর ধারণা, সে বেঁটে, একটু মোটা। যতই ডায়েট করুক, যেন পিছু নিয়েছে চর্বির তাল। মাথায় অল্প চুল, খসখসে— এত কালো নয় যে দেখতে ভাল লাগবে। কত দামি শ্যাম্পু ব্যবহার করল, কোনও কাজেই এল না ওসব।

সেই নয় বছর বয়স থেকে একাধিক নাপিত ওকে বলেছে, এই ক'টা চুল থাকলেই কী, আর না থাকলেই বা কী! বুকে অনেক আশা নিয়ে ছেলেকে নানান নাপিতের দোকানে নিয়ে গেছেন

পাধানির মা। বিশেষ করে এক মহিলা নাপিতের দোকানের কথা কখনও ভুলবে না কোসিমা। ওই সুন্দরী মহিলা তিনবার চক্কর কেটে ওকে দেখল, তারপর বলে দিল, 'যা বুঝতে পারছি, হয় পুরো ন্যাড়া করে দিতে হবে, নইলে যে ক'টা এখনও রয়ে গেছে, সেগুলো দিয়ে টাক ঢাকার ব্যবস্থা করতে হবে।'

এতে পাধানির মা এতই রেগে গেলেন, ওই দোকান থেকে ছেলেকে নিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এলেন। সেদিন দুঃখে কেঁদে ফেলেছিল ও। পরে ভেবে দেখল, দেখতে ভাল নয়, কাজেই ওকে হতে হবে বুদ্ধিমান। আর সেই কাজে নিয়োজিত করল নিজেকে। কিছু দিন পর বুঝতে পারল, বেশিরভাগ ছেলের চেয়ে ওর বুদ্ধি অনেক পাকা। প্রতিযোগীরা নানান টিটকারি দিত, তুই তো কোনও খেলায় কিছুই হতে পারিস না! মেয়েরাও পাত্তা দিত না। কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষা ঘনিয়ে এলে সবাই এসে ভিড়ত ওর কাছে। দরকার ভাল নোট, বা কোন্ সব প্রশ্ন আসবে পরীক্ষায় সেই সাজেশন। তাদেরকে সাহায্য করত পাধানি। কিন্তু পরের ক্লাসে উঠে যাওয়ার পর আবারও সেই আগের অবস্থা। কেউ মিশতে চাইত না।

এভাবেই স্কুল-জীবন পেরিয়ে এল পাধানি। স্কলারশিপ পেয়ে ভর্তি হলো রোম ইউনিভার্সিটিতে, সোশাল সায়েন্স-এ। খুব ভাল রেযাল্ট করে মাস্টার্স পাশ করে সুযোগ পেল কারাবিনিয়ারির সবচেয়ে প্রতিভাবান ক্যাডারদের ডিপার্টমেন্টে। তাদের কাজ সমাজের ভাবচক্কর বুঝে রিপোর্ট করা। এ ছাড়া, অ্যানালাইয করতে হবে অপরাধীর মন। কাজ শুরু করার কয়েক বছর পর ওর সঙ্গে পরিচয় হলো কর্নেল বার্নাদো গুগলির। চুপচাপ বসে মাফিয়ার বিষয়ে গবেষণার সুযোগ করে দিলেন তিনি ওকে।

নিজের জীবন নিয়ে ভাবতে গেলে সবসময় পাধানি বলবে, ওকে প্রভাবিত করতে পেরেছেন মাত্র দু'জন মানুষ। তাঁদের

একজন কর্নেল গুগলি। অন্যজন, মাসুদ রানা। সত্যি অন্তর থেকে ভালবাসে সে ওই দু'জনকে।

ট্র্যাসটাভারের ছোট এক অ্যাপার্টমেন্টে থাকে পাধানি। সরু খাটের ওদিকে বাথরুম, উল্টোদিকে কিচেনেট। ডাইনিং ও টিভি রুমের দেয়ালের তাক ভরা হাজার হাজার বই। ছোট্ট টেবিলে কমপিউটার। আর আজকাল ওটাই ওর পৃথিবী।

অনেক আগেই কোসিমা পাধানি বুঝে গেছে, চাইলেও হতে পারবে না আকর্ষণীয় সুপুরুষ। তবুও মাঝে মাঝে কর্নেল গুগলির কিছুটা অনুকরণ করে না, তা-ও নয়। তবে ওই পর্যন্তই। ভাল কোনও রেস্তোরাঁয় গিয়ে ডিনার, তারপর বাড়ি ফিরে ঘুম।

আজও রাত দশটার সময় শুয়ে পড়েছে পাধানি। কিন্তু ঘুম আসছে না। এপাশ ওপাশ করতে করতে পার করে দিল একঘণ্টা। তারপর বিরক্ত হয়ে উঠে চালু করল কমপিউটার।

আর তখনই এল ওরা।

মৃদু টোকার আওয়াজ হলো দরজায়।

প্রথমে পাধানি ভাবল, হাজির হয়েছে ওপর তলার ভাড়াটে। মাঝে মাঝে আসে ওই বুড়ো। বউ মারা গেছে অনেক আগে। কেউ নেই তার। প্রতিবার এসে বলে, তাকে এক কাপ চিনি দেয়া যায় কি না। আসল উদ্দেশ্য, বকবক করা। পাধানি ভেবে দেখেছে, অন্তত এক হাজার কেজি চিনি নিয়ে গেছে বুড়ো। খোঁজ নিয়ে জেনেছে, কড়া ডায়াবেটিস তার... ভুলেও চিনি খায় না। এ থেকে পাধানি বুঝে গেছে, একদিন ওজনের কারণে ভেঙে পড়বে মাথার ওপরের ছাত, আর চিনির নিচে চাপা পড়ে মরবে ও।

কোডেড ইনফর্মেশন ফাইল বন্ধ করে কমপিউটার অফ করল পাধানি, গিয়ে খুলল দরজা। সামনে পরিচিত বুড়ো নেই। দুই লোক, পরনে কালো সুট, হাতে দুই পিস্তল। তাক করেছে ওর বুকে।

তারা পাধানিকে ওভারকোট পরার সুযোগ দিল, তারপর পিস্তলের মুখে নিয়ে গেল বাইরে। যা বুঝবার বুঝে গেল পাধানি। ওকে মেরে ফেলা হচ্ছে। বেঁধে নেয়নি চোখ। তার মানেই ফিরতে পারবে না। বেশ কয়েক বছরের জ্ঞান ওকে বলে দিল, এরা মাফিয়ার লোক নয়। আরও বড় কোনও সংগঠন থেকে এসেছে।

গাড়িতে তুলে হাত-পা বাঁধা হলো। ফোসেন-এর একটা সেলারে ওকে নিয়ে গেল তারা। একবারও বাধা দেয়ার চেষ্টা করল না পাধানি। বুঝে গেছে, কোনও লাভ হবে না। সেলারে নামার পর খুলে নেয়া হলো ওর সব পোশাক। একটা টেবিলের সামনে চেয়ারে বসিয়ে বাঁধা হলো হাত-পা। কিছুই জানতে চাইল না পাধানি। দশ মিনিট পর দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তা। ফোটোর কারণে তাকে চিনে ফেলল পাধানি। টেবিলের ওদিকের চেয়ারে বসল লাফাত্তা। বুক পকেট থেকে ছোট প্যাড ও দামি কলম বের করে টেবিলে রাখল। সরাসরি পাধানির চোখে চোখ রেখে বলল, 'তুমি গিয়ারডিনি ক্যালভেসিও নামের এক লোকের বিষয়ে তদন্ত করছিলে। ...কেন?'

'ওটা আমার দায়িত্ব ছিল,' জবাব দিল কোসিমা।

মাথা নাড়ল লাফাত্তা। 'ওটা তোমার দায়িত্ব ছিল না। তোমাকে ওই কাজ দিয়েছিল কর্নেল গুগলি। কিন্তু ওই কাজ কেউ দেয়নি তাকেও। জানতে চাই, আসলে তদন্ত করতে গিয়েছিলে কার হয়ে?'

কাঁধ ঝাঁকাল পাধানি। গলা নিচু করে বলল, 'আমি তোমাকে চিনি, কী ধরনের কাজের সঙ্গে জড়িত, তা-ও জানি। তুমি পৃথিবীর নোংরাতম আবর্জনা। আমার কাছ থেকে এর বেশি আর কিছুই জানতে পারবে না।'

চার ঘণ্টা নির্যাতন করল তারা কোসিমা পাধানিকে। রক্তাক্ত

হয়ে গেল সে, ভেঙে পড়ল দৈহিকভাবে। এক এক করে উপড়ে নেয়া-হলো সবক'টা আঙুলের নখ। ভাঙা হলো নয়টা দাঁত। ফেটে গেল নাক ও চোয়াল। পিষে দেয়া হলো অণ্ডকোষ। কিন্তু নিজের দেহে বাস করে না পাধানি। মনের গভীরে ডুব দিয়ে পার করে দিল নরকের কষ্ট। চার ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পর লাফাত্তার দিকে চেয়ে অসুস্থ হাসি হাসল পাধানি। তাতে ভয়ঙ্কর রেগে গেল লোকটা। বুঝে গেছে, কোনওভাবেই হার মানাতে পারবে না এই দুর্বিনীত লোককে।

যা বোঝার বোঝা হয়েছে তার। অত্যন্ত ধৈর্যশীল লোক সে। আড়ালে নিয়ে যুবক এক সদস্যকে নির্দেশ দিল।

সে চলে গেল সেলার ছেড়ে।

লাফাত্তা ও অন্য যুবক খুলে দিল পাধানির বাঁধন, ওর ভাঙাচোরা দেহ তুলল টেবিলের ওপর। বাধা দেয়ার শক্তি বা সাধ্য কোসিমার নেই। আনমনে হাসল। ওর মুখ থেকে একটা কথাও বের করতে পারবে না এরা।

কয়েক মিনিট পর সেলারে ফিরল যুবক, হাতে ছোট একটা ব্রিফকেস। ওটা রাখল পাধানির মাথার পাশে। ডালা খুলতেই ওটার ওপর শকুনের মত ঝুঁকে এল লাফাত্তা। ওখান থেকে একটা সিরিঞ্জ বের করে নিল যুবক।

মাথা দুলিয়ে তাকে বলল লাফাত্তা, 'বিশ মিলিগ্রাম... তার বেশি নয়। খুব সাবধান। কম হলে চলবে না, আবার বেশি হলে মরবে।' পাধানির বিকৃত, বিধ্বস্ত চেহারা দেখল সে। খুব নরম সুরে বলল, 'দৈহিক সব কষ্ট সহ্য করতে পারো। কাজেই এবার দেখব তোমার মন কী করে। কয়েক সেকেণ্ড পর আর কোনও কষ্ট থাকবে না, সেখানে থাকবে শুধু ফুর্তি। তোমাকে দিচ্ছি নিখাদ ভ্যালিয়াম। মহিলারা যেমন সামান্য সব ট্রমা এড়াতে ব্যবহার করে, ঠিক সেই নিউরোটিক ডোয দেব না। তোমার মগজ

বেড়াতে যাবে অদ্ভুত আনন্দময় অভিযাত্রায়। কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে, ওই স্বর্গ থেকে ফিরে আর না-ও আসতে পারো।'

সিরিঞ্জের সামান্য খোঁচা টের পেল কোসিমা পাধানি। পেরিয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর হঠাৎ করেই ও বুঝল, ফিরে গেছে ছেলেবেলায়। খেলছে দাদুর বাগানে। ওই তো চাচাতো বোন। ঝেড়ে দৌড় দিল। ওকে ধরতে হবে। ধরে ফেলবে, এমন সময় দেখা গেল ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছেন মা। ধমক দিলেন। সোফিয়াকে ধাক্কা দেয়া উচিত হয়নি। তারপর সাদা, নীল ও সবুজ মেঘে কোথায় যেন ভেসে গেল পাধানি। চারপাশে নিচু স্বরে মিষ্টি সব কথা।

'ঘুমিয়ে পোড়ো না, সোনা। কে তোমাকে বলেছে দ্য ডায়মণ্ড রিঙের বিষয়ে খোঁজ নিতে?'

পুরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট পাধানির ছেলেবেলার গল্প শুনল লাফাত্তা। কি কষ্টকরই না ছিল কৈশোর। কত হতাশা। কত ভয়। তা হলে কি কিছুই হতে পারবে না ও?

পঞ্চাশ মিনিট পর লাফাত্তা বুঝল, বিশ মিলিগ্রাম ভ্যালিয়াম যথেষ্ট নয়। বুকে ভয় নিয়ে নির্দেশ দিল, ইনজেক্ট করতে হবে আরও দশ মিলিগ্রাম। তারপর লাফাত্তা শুনল, কত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পাধানির বুকে দু'জন পুরুষের প্রতি। কিন্তু কী কারণে যেন তাদের নাম মুখে উচ্চারণ করল না সে।

'ওরা কোন্ এলাকা থেকে এসেছে?' হিসহিস করে জানতে চাইল লাফাত্তা। পুরোপুরি হতাশ।

ভাঙা মুখে অদ্ভুত হাসি কোসিমার। ফিসফিস করল, 'তাদের একজন এসেছে রোম থেকে।'

কোসিমার মুখের কাছে কান নিল লাফাত্তা। 'অন্যজন? সে কোথা থেকে? কোথা থেকে এসেছে সে? বলো?'

'পাহাড়ের ওপরের বাগানবাড়ি থেকে,' মনে হলো আনমনে

হাসছে পাধানি।

দুই যুবকের দিকে তাকাল লাফাত্তা। তারাও মনোযোগ দিয়ে শুনছে। ঝুঁকে পড়েছে পাধানির মুখের কাছে।

'কোথা থেকে এসেছে?' নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল লাফাত্তা। 'কোন্ পাহাড় থেকে?'

এবার স্পষ্ট কথাটা শুনতে পেল ওরা তিনজন।

'অবশ্যই... গোজো থেকে। ...গোজো...' একবার ফুলে উঠল কোসিমার বুক। গলায় ঘড়-ঘড় আওয়াজ। পরক্ষণে চিরকালের নারী ভালবাসা বঞ্চিত, দুঃসাহসী এক পুরুষ বিদায় নিল এই নোংরা জগৎ ছেড়ে।

চৌষট্টি

মেজর কোসিমা পাধানির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় থাকল শুধু তার ডাক্তার বোন, কর্নেল বার্নাদো গুগলি আর যাজক। অফিসের সবাই আসতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে মানা করে দিয়েছেন গুগলি।

গর্তে নামিয়ে দেয়া হলো কফিন।

প্রার্থনা শুরু করলেন যাজক।

এক মুঠো মাটি তুলে ভাইয়ের কফিনের ডালায় ফেলল পাধানির বোন, কাঁদছে নীরবে।

একঘণ্টা পর এসে গর্ত বুজে দেবে কবর খোদকরা। পাধানির মাথার কাছে থাকবে সাধারণ এক হেডস্টোন।

হু-হু হাওয়া বইছে কবরস্তানে। প্রায়-ন্যাড়া সব গাছ থেকে খসে পড়ছে শুকনো পাতা, ভেসে যাচ্ছে এদিক ওদিক। কিছুক্ষণ পর পাধানির বোনকে বিদায় দিয়ে চুপ করে কবরের সামনে বসলেন কর্নেল। একহাতে কালো ওভারকোট ও সিল্কের স্কার্ফ। একঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ওখানে থম মেরে বসে থাকলেন তিনি। দুঃখে ভেঙে পড়া বা ভাগ্যকে মেনে নেয়ার লোক নন। চুপচাপ বসে দেখলেন সবুজ ঘাস। প্রতিটি মুহূর্তে টের পেলেন, বুকের ভেতর তৈরি হচ্ছে ভয়ঙ্কর এক আক্রোশের ঝড়। নারীর ভালবাসা কখনও অন্তরে অনুভব করেননি। যাদের প্রতি রয়েছে ভালবাসা, তারা মাত্র কয়েকজন। আর আজ তাদের একজন পড়ে আছে খোলা কবরে কফিনের ভেতর, ক্ষত-বিক্ষত। এখন বুঝতে পারছেন কর্নেল, কী হারিয়ে বসেছেন। পাধানি ছিল আপন ভাই, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সত্যিকারের সহকর্মী— যার ওপর ভরসা রাখা যেত। তার চেয়েও বড় কথা, তাঁকে অন্তর থেকে ভালবাসত মানুষটা।

শীতল হাওয়া কাঁপিয়ে দিয়ে গেল তাঁকে। হাড়ে হাড়ে টের পেলেন হিম ঠাণ্ডা। আরও কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে দেখলেন, খোলা কবরের ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। পরনে তার জিন্স, ডেনিম জ্যাকেট ও কালো পোলো শার্ট। ক্রু-কাট চুল, চোখের মণি কুচকুচে কালো। সরাসরি কবরে চোখ রেখে কী যেন ভাবছে সে।

উঠে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন গুগলি। মুখ তুলে তাঁকে দেখল লোকটা। নীরবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করল দু'জন। ছোটবেলার পর আর কখনও কাঁদেননি গুগলি। আজ ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললেন। অনেকক্ষণ তাঁকে বুকে ধরে রাখল লোকটা, তারপর নিচু স্বরে বলল, 'চাইলে আগামীকাল কারাবিনিয়ারি থেকে পদত্যাগ করতে পারো। সিম কর্নেলিস আর অসি কালাহানকে পাঠিয়ে দেব তোমার কাছে। নরকে পৌঁছে দেয়া হবে

জেনারেল গামেল ব্যারেস্টেকে। আমরা সব গুছিয়ে নিয়ে কাজ শুরু করলে ওর দলের অন্যরাও পৌঁছবে ওর কাছে।' আবারও কবরে চোখ গেল, শীতল বাতাসের চেয়েও অনেক ঠাণ্ডা হয়ে উঠল রানার কণ্ঠ: 'তুমি যখন ক্লান্ত, রক্ত শীতল হলে, বা হেরে যাবে ভাবলে একবার মনে কোরো পাধানির মুখ। তোমার জন্য দেখবে ওর চোখে অগাধ শ্রদ্ধা আর গভীর ভালবাসা। ওই দু'চোখ আমিও দেখব। নতুন করে বুঝব কী করতে হবে। আমরা হারিয়ে যেতে দেব না ওর স্মৃতি।'

নীরবে মাথা দোলালেন কর্নেল বার্নাদো গুগলি।

পঁয়ষট্টি

মিলানে গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তা, নেপলসে গিয়ারডিনি ক্যালভেসিও, এদিকে তিউনিসে রোমিও কোসেলি— টেলিফোন কনফারেন্স হলো তাদের তিনজনের ভেতর।

কোসিমা পাধানির কাছ থেকে কী জেনেছে, তা খুলে বলল লাফাত্তা। একটা জায়গা গোজো, কাজেই ওটার কথা তুললে অন্য দু'জন উত্তেজিত হয়ে উঠবে, তা মনে করার কোনও কারণ নেই। সে নিজে শোনেওনি ওই জায়গার নাম। যা ভেবেছিল, চুপ করে থাকল গিয়ারডিনি ক্যালভেসিও। কিন্তু তখনই মন্তব্য করল রোমিও কোসেলি, 'ওটা মাল্টিয দ্বীপমালার ছোট একটা দ্বীপ।'

'এবার কী করব আমরা, মহান যাজক?' নরম সুরে জিজ্ঞেস

করল গিয়ারডিনি ক্যালভেসিও।

রোমিও কোসেলি বলল, 'দেরি না করে কাউকে পাঠাব খোঁজ নিতে।'

'কাকে পাঠাব আমরা, হাই প্রিস্ট?' জানতে চাইল লাফাত্তা।

'ওই তথ্য দেব ম্যানুয়েল য্যারাফাকে। আশা করি তার কাছ থেকে নতুন খবর পাব। আপাতত নেপলসে আছে সে। আজ মঙ্গলবার। আগামীকাল নেপলস থেকে মাল্টার ফেরি ছাড়বে। তাকে বলে দেব, সে যেন ওই দ্বীপে যায়। চোখ-কান খোলা রাখবে।'

আধ মিনিটের জন্য স্থগিত হলো কনফারেন্স।

যে যার মত ভাবছে।

সবার আগে মুখ খুলল লাফাত্তা, 'তাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। এদিকে অভিষিক্ত সদস্যের দীক্ষার কাজটা সেরে ফেলতে হবে। আমার তো মনে হয় এই সপ্তাহেই এটা করে ফেলা উচিত। অন্তত পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারের মামলা। পাকা ফল, উঁচু গাছ থেকে পড়ে নষ্ট হোক, আমরা কেউ চাই না। জরুরি হয়ে উঠেছে ওর জন্যে বলিদান।'

'আমার ধারণা উপযুক্ত একজনকে পেয়েছি,' বলল রোমিও কোসেলি। 'আপনারা তো জানেন, ক'দিন আগে ঘুরে এসেছি আলবেনিয়ায় আমাদের এতিমখানা থেকে। ওখানে উপযুক্ত একটা মেয়ে আছে। দত্তক নেয়ার কাগজপত্র ঠিকঠাক করতে বলব ম্যানুয়েল য্যারাফাকে। সে গোজো থেকে ফিরলেই আগামী কয়েক দিনের ভেতর মেয়েটাকে নিয়ে আসব বারি-তে। ওই মেয়ের নাম সিমোনা। পুরো সাবালিকা নয়, বয়স প্রায় বারো। সোনালি চুল। চমৎকার মিষ্টি চেহারা। আগামী রোববার রাতে ব্যবস্থা করুন অনুষ্ঠানের।'

সন্তুষ্ট হয়ে চুপ করে থাকল অন্য দু'জন।

ছেষট্টি

একহাজার একটা যুক্তি ত্যাগ করে মনের তাগিদ অনুসরণ করছে রামিন। বুঝে গেছে, বিছানায় এই মেয়ের কাছে হারলে চলবে না। ডাইনী শুধু চায় হাতে নিয়ন্ত্রণ তুলে নিতে। এবার তা হতে দেবে না ও। হার মানিয়ে দেয়ার পর হয়তো দেখবে, সত্যিই খুলে গেছে দ্য ডায়মণ্ড রিঙের দরজা।

পরের পাঁচ মিনিট ঝড়ের বেগে পেরিয়ে গেল। তারপর তীক্ষ্ণ এক চিল চিৎকার ছেড়ে নেতিয়ে পড়ল ক্যাথেরিনা ক্যাপরেস। মনে হলো জ্ঞান নেই তার।

বিছানা ছেড়ে বাথরুমে গেল রামিন, গরম পানির ট্যাপ খুলে তোয়ালে ভিজিয়ে আবার ফিরল বেডরুমে। একদম উধাও হয়েছে সুন্দরীর মুখের মেক-আপ। তাতে আগের চেয়েও অনেক রূপসী মনে হচ্ছে। ভেজা তোয়ালে দিয়ে ওর শরীর মুছে দিল রামিন, তারপর ছুঁড়ে ফেলল ওটা দূরে। শুয়ে পড়ল মেয়েটার পাশে।

'তুমি অদ্ভুত,' বলল ক্যাথেরিনা। 'এত কিছু শিখলে কী করে অ্যাত্তো কম বয়সে?'

মৃদু হাসল রামিন। 'গত দু'রাত এনে দিয়েছে দু'হাজার রাতের অভিজ্ঞতা।'

খুশিতে হেসে ফেলল মেয়েটা। ওর ধারণা, নিজের হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে তরুণকে। ধরেই নিয়েছে, প্রশংসা করলে মুগ্ধ

হবে রামিন।

'আগে কখনও এত ভাল লাগেনি। মনে হচ্ছে, চিরকাল ধরে তোমার দাসী হয়ে থাকি। এত কিছু দেয়ার আছে তোমার!'

বোকার সন্তুষ্ট হাসি হাসল রামিন, মনে মনে গুছিয়ে নিল কী করবে। আহ্লাদের ভঙ্গিতে বলল, 'আমি আরও বহু কিছু শিখতে চাই, ক্যাথেরিনা। গতরাতে বলেছিলে খুলে দেবে নিষিদ্ধ দরজা। ঠাট্টা করোনি তো? সবকিছুর চূড়ান্ত যেখানে, সেখানে নেবে না আমাকে?'

চুপ করে কী যেন ভাবতে লাগল ক্যাথেরিনা ক্যাপরেস। ঝুঁকি আর লাভ— হিসাব কষছে দুটোরই। কিছুক্ষণ পর বলল, 'চাইলে নিয়ে যেতে পারি... সহ্য করার সেই সাহস তোমার আছে। কিন্তু নিয়ে যেতে চাইলে অনেক অনুরোধ করতে হবে। মস্ত ঝুঁকিও নিতে হবে। ভুল করে ফেললে খুনও হয়ে যেতে পারি।'

'কত টাকা হলে ঝুঁকি নেবে?' সরাসরি জানতে চাইল রামিন।

ওর দেহের গোপন অংশে ঘুরছে ক্যাথেরিনার হাত। আবছা আলোয় হাসছে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'যে ঝুঁকি নিতে হবে, তাতে মনে হয় আমার পাওয়া উচিত অন্তত পঞ্চাশ হাজার ডলার।'

সাতষট্টি

সবাই ঘুমিয়ে গেছে, একা জেগে রানা। অস্থির লাগছে ওর। সবসময় সামলে রাখে নিজেকে, কখনও মনে হয়নি কারও সঙ্গে

আলাপ না করলে হালকা হবে না মনের ভার। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ঘনিষ্ঠ কোনও বন্ধু পাশে থাকলে ভাল হতো।

ওর প্রিয় জায়গা প্রেযো ফিসো বোর্ডিং হাউস অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্ট-এর টেরেসে চুপ করে বসে আছে।

অনেক রাত। একটু আগে তিনবার ঢং-ঢং শব্দ তুলে থেমে গেছে দূরের গির্জার ঘড়ি।

রানার পাশে আধ খালি জনি ওয়াকার ব্ল্যাক লেবেল উইস্কির বোতল। দূরে উপসাগরের তীরে ছোট-বড় সব বাতি। কুচকুচে অন্ধকারে ডুবে আছে সাগর।

পেছনে দরজা খোলার মৃদু আওয়াজ পেল রানা। টেরেসের এক পাশে গিয়ে থামল কেউ। চেয়ে আছে দূরে। আকাশে এক ফালি রুপালি চাঁদ। সেই দুর্বল আলোয় পিটার লারসেনকে চিনতে পারল রানা। ওকে দেখেনি মানুষটা।

পেরিয়ে গেল পাঁচ মিনিট, তারপর নিচু স্বরে বলল রানা, 'ডেনরা উইস্কি খায়?'

বিস্মিত হয়ে ঝাঁকি খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল পিটার। রানার মতই নিচু স্বরে বলল, 'এমন বিষণ্ন রাতে যে-কোনও মদ গেলে ডেনরা... দিলে হেমলকও।'

আবছা অন্ধকারে মৃদু হাসল রানা। 'এসে বোসো। আপত্তি না থাকলে বলবে কেন জেগে আছ?'

নিঃশব্দে রানার পাশের চেয়ার টেনে বসল পিটার। গ্লাসে মদ ঢেলে চুমুক দিল।

নীরবে পেরিয়ে গেল কিছুক্ষণ, তারপর বলল রানা, 'সবাইকে বলেছ, কী কারণে তুমি এখানে। ব্যাখ্যা করেছ তোমার কাজ কী বা উদ্দেশ্য কী। মারগিটও চেয়েছে তুমি আমাদের পাশে থেকে ঝুঁকি নাও। কিন্তু আগে কখনও বলোনি, আসলে কেন আছ।'

নতুন করে গ্লাস ভরে নিল পিটার। কয়েক ঢোকে শেষ করল

সোনালি তরল। আরও কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল, তারপর বলল, 'আসলে কেন আছি, তা বুঝতে হলে প্রথমে তোমাকে বুঝতে হবে ডেনমার্কের মানুষের মনোভাব। আমরা আসলে যুক্তির ধার ধারি না। সব যদি যুক্তি দিয়ে বিচার করি, এক দৌড়ে ফিরব কোপেনহেগেনে। সেখানেও থাকব না, সরে যাব আরও দূরে। থামব না, ঠেকব গিয়ে উত্তর মেরু বিন্দুতে। তারপর আমার মনে হবে স্পেসশিপ দরকার, যাতে পালিয়ে যেতে পারি মঙ্গল গ্রহে।'

মৃদু হাসল রানা। 'তাই? তা হলে রয়ে গেলে কেন?'

উইস্কির গ্লাসটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল পিটার। হালকা সুরে বললেও তাতে থাকল ওর অন্তরের ছোঁয়া। 'মাত্র একহাজার বছর আগেও আমার পূর্বপুরুষ ভাঙা সব নৌকা সাগরে নামিয়ে বেরিয়ে পড়ত চেনা-অচেনা সব জায়গা জয় করতে। আমাকে হয়তো ঠিক ভাইকিং বলে মনে হবে না, কিন্তু আমি ঠিক তাই। জানি, আছি মস্ত বড় বিপদে। যখন-তখন আসবে মৃত্যু। তাতে কাজে মনোযোগ বাড়ছে আমার। বেড়ে গেছে হৃৎস্পন্দন। আর এটা আমার ভালও লাগছে।'

হাসল রানা। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না।'

আবারও নীরবতা নামল। থমথম করছে চারপাশ।

কিছুক্ষণ পর বলল পিটার, 'এখানে আছি তিনজনের জন্যে। প্রথমজন রামিন। জীবনে এসে ঢুকে পড়ল আমার পরিবারে, তারপর এক হ্যাঁচকা টানে নিয়ে গেল মার্সেইল্স্-এ। ও আমার ছোট ভাইয়ের মত। দ্বিতীয়জন তুমি। যখন মার খেতে খেতে মৃত্যুর জন্য তৈরি হয়ে গেলাম, তখনই এলে তুমি। শত্রুদের মেরে সাফ করে উদ্ধার করে নিয়ে গেলে। আর তৃতীয়জন? আমি ওই বাচ্চা মেয়ের চোখে দেখেছি নরকের কষ্ট। তুমি আর রামিন ওকে সরিয়ে নিয়ে গেলে, ফিরিয়ে দিলে ওকে স্বাভাবিক জীবন। আর

এসব করার পরেও জানতে চাইছ, কেন তোমাদের পাশে আছি?'

ওদের অনেক নিচে উপসাগরের বন্দর ছেড়ে সাগরে বেরিয়ে গেল বড় এক ক্রুয লাইনার। মনে হলো ক্রিসমাস ট্রির মত ঝলমলে। ওদিকে চেয়ে রইল ওরা। ধীরে ধীরে দিগন্তে মিলিয়ে যেতে লাগল সব বাতি। রানার কাছে নিজের প্রশ্ন তুলল পিটার: 'তুমি কেন এখানে, রানা? কী করে সম্ভব নানান ধরনের মানুষ ঘিরে রাখবে তোমাকে? ওরা যেন বাতির চারপাশে ঘুরন্ত পোকা। তোমার জন্যে মরতেও ওদের দ্বিধা নেই— এটা কেন?'

দেরি না করে জবাব দিল রানা, 'কারণ, ওরা ভাল করেই জানে; আমি নিজেও ওদের জন্যে মরতে রাজি আছি।'

কথাটা মনের ভেতর উল্টেপাল্টে দেখল পিটার, তারপর বলল, 'যোগ্য নেতার নেতৃত্ব কি এমনই? ...না, আরও কিছু আছে!'

'আছে, আরও কিছু আছে,' দৃঢ় সুরে বলল রানা। 'ওরা শুধু আমার জন্যে ঝুঁকি নিচ্ছে না। সিম, কালাহান, মউরোস, তুমি, রামিন, রেমারিক, গুগলি, ফুরেলা বা সুস্থ মগজের যে-কেউ একই কাজ করবে। ঠেকাতে চাইবে একদল লোভী, নিষ্ঠুর শয়তানকে। তোমার কি মনে হয়, ভাইকিং— শুধু আমার জন্যে কাজ করছে ওরা?'

ক্রুয লাইনারের শেষ আলোও মিলিয়ে গেল দূর দিগন্তে।

'গোজোয় টম বা জেনি বা অন্যদের ব্যাপারে কী করবে ভাবছ?' বলল পিটার, 'আমার ধারণা মারা যাওয়ার আগে মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছে কোসিমা।'

'কয়েক জায়গায় ফোন করেছি,' বলল রানা, 'আগামী চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর ওখানে পৌঁছবে সিম কর্নেলিসের ক্যালিবারের পাঁচজন মার্সেনারি, সর্বক্ষণ পাহারা দেবে তাজা পরিবারের সবাইকে। এটা করেছি সাবধান হওয়ার জন্যে, তবে আমার

ধারণা, টুঁ শব্দও করেনি পাধানি। রিপোর্টে লিখেছে প্যাথোলজিস্ট, প্রথমে প্রচণ্ড নির্যাতন করা হয়েছে ওকে। ওর মুখ থেকে কোনও তথ্য বেরোয়নি। তখন কুকুরগুলো মুখ খোলাতে চেয়েছে ভ্যালিয়ামের ম্যাসিভ ডোয দিয়ে। নিজের ভেতর ছিল না, তখন মুখ খুলেও থাকতে পারে। এরপর মারা যায় ও।'

রানার মন বুঝতে চাইছে পিটার, কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'পাধানির মৃত্যুর পর এখন কী ভাবছ? শোধ নেবে কীভাবে?'

সামনে থেকে সোনালি তরলের গ্লাস সরিয়ে দিল রানা, কথা বলে উঠল নিচু স্বরে, তাতে তিক্ততা ও রাগ: 'পাধানির মৃত্যু চুরমার করে দিয়েছে গুগলির বুকটা। আসলে পাধানির ওই মৃত্যুর চেয়েও বেশি ঝাঁকি খেয়েছি আমি গুগলির কান্না দেখে।' অন্ধকারে সামনে ঝুঁকে পিটারের বাহুতে হাত রাখল রানা। 'পিটার, অনেক মৃত্যু দেখেছি, চিরকাল ধরে হাঁটছি বিশাল কোনও কবরস্তানে। মৃত্যু আমার কাছে নতুন কিছু নয়। এ নিয়ে খুব ভাবি, তা-ও নয়। কিন্তু আমার প্রিয় কাউকে মেরে ফেলা হলে, অবশ্যই প্রতিশোধ নেব। ...কথাটা বুঝতে পেরেছ?'

মাথা দোলাল পিটার। 'এবার কী করবে, রানা?'

চুপ করে থাকল রানা।

'হঠাৎ করে গতিময় হয়ে উঠছে সব,' বলল পিটার, 'তোমার নির্দেশে জেনারেল গামেলকে তুলে আনবে গুগলি, সিম আর কালাহান?'

'হ্যাঁ। এদিকে দ্য ডায়মণ্ড রিঙে ঢুকে পড়বে রামিন। কারা ওই সংগঠন চালায়, তা মোটামুটিভাবে আমরা জানি। দু'এক দিনের ভেতর তাদের ওপর হামলা করব।'

'কিন্তু যে চালাচ্ছে পুরো সংগঠন, তার নাম আমাদের জানা নেই।'

‘সে জালের মাঝে-বসা মাকড়সা,’ বলল রানা। ‘তার জালসহ তাকে পুড়িয়ে দেব আমরা। কিন্তু তার আগে বুঝে নেব, দেশে দেশে তার স্যাঙাতদের আস্তানা কোথায় আছে।’

আঁধার সাগরের দিগন্তে চেয়ে রইল রানা ও পিটার।

কিছুক্ষণ পর বলল ডেন, ‘জানি, ওই মাকড়সাটাকে মেরে ফেলব। আর তারপর আবারও বাড়ি ফিরে দায়িত্ববান স্বামী ও বাবা হয়ে উঠব, নতুন করে যোগ দেব পুলিশ হেডকোয়ার্টারে।’

আটষট্টি

একই রাতে আলাদা দুটি অভিযাত্রায় চলল দুই মেয়ে।

গোজো দ্বীপে অনোরিয়াকে হাঁড়ি পরিষ্কার করতে সাহায্য করছে জেনি, একটু পর পর হাই তুলছে।

একবার ওকে দেখে নিয়ে হাসলেন অনোরিয়া। ‘একেই বলে সাগরের তাজা হাওয়া। চট্ করে চলে আসে ঘুম।’

আজ শনিবার রাত।

সকালে নিডো ও তার বন্ধুদের সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়েছিল জেনি। হোঁচট খেয়েছে সবার কুসংস্কার। দশ বাক্স ল্যামপুকি মাছ ধরে নৌকা ভরে ফেলেছে ওরা। নিজে জেনিও ধরেছে বেশ কিছু মাছ। এসব কারণে হৈ-হৈ করে ওকে ঘিরে নেচেছে সবাই, সেই সঙ্গে ছিল পিঠ চাপড়ে দেয়া। গ্লিনঈগল বন্দরে পৌঁছে নৌকা রাখার পর নিডোর এক বন্ধু বলেছে, ‘ওস্তাদ মেয়ে তুমি, জেনি,

যখন খুশি আমাদের সঙ্গে যেতে পারো।'

বারটেণ্ডার কনি সব শুনে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে জেনিকে। শুধু তাই নয়, নিজের তৈরি এক গ্লাস ওয়াইনও দিয়েছে। মাথা দুলিয়ে বলেছে, 'তুমি হলে গিয়ে সত্যিকারের জেলে।'

'জেলেনি,' শুধরে দিয়েছে জেনি।

তাতে গম্ভীর চেহারা করে মাথা নেড়েছে বারটেণ্ডার। 'না। ভুল হলো। তুমি দ্বীপে নতুন জেলে। যদিও পরনে স্কার্ট আর ঠোঁটে লিপস্টিক।'

হঠাৎ করেই জেনির মনে হয়েছে, বড় হয়ে উঠেছে ও।

এইমাত্র শেষ বাসন মুছে তুলে রাখল কাবার্ডে। অনোরিয়াকে বলল, 'আগামীকাল রোববার। দেরি করে ঘুমাতে পারি, আণ্টি?'

'কেন নয়,' বললেন অনোরিয়া। 'দরকার হলে দুপুরের আগ পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকো, মানা করছে কে! কিন্তু ভুলে যেয়ো না, দুপুরে আমাদের এখানে লাঞ্চ করবে নিডো। ল্যামপুকি মাছের পাই রাঁধবে ওর বউ লুসি। প্রায় আমার মতই রান্নার হাত ওর।'

ঘরে ফিরে জেনি দেখল, এখনও জেগে আছে টম।

মিষ্টি করে হাসল ছেলেটা। 'আপু, আজ আরেকটা রূপকথা শোনাবে? কালকে তো রবিবার। ছুটি। দেরি করে ঘুমাব।'

জেনির কণ্ঠে ঝরল আদরঃ 'ভাইয়া, আমাকে যে যেতে হবে বহু দূরে?'

'কোথায়?' চোখ বড় বড় করল টম।

'পরে বলব, ভাইয়া।'

'না, এখনই, আপু!'

'তুমি কাউকে বলে দেবে না তো?' জেনি ভাল করেই জানে, খুব ভালবাসে টম ওকে। কথা দিলে মুখ বন্ধ রাখবে।

নড়েচড়ে শুল টম। 'না, কাউকে কিছু বলব না। কিন্তু আমাকেও নিয়ে যেতে হবে। রাতে পিকনিক, তাই না, আপু?'

'না, জরুরি কাজ।'

'বলো না, আপু!'

'বলব, কিন্তু তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারব না।'

'কোন্ সে জায়গা, যে আমাকে নিতে পারবে না?'

একটু ভেবে নিয়ে বলল জেনি, 'ইতালি, যেখানে আছেন মাসুদ ভাই আর রামিন ভাইয়া।'

'আমিও সঙ্গে যাই?' চকচক করছে টমের দুই চোখ।

'তোমার তো পাসপোর্ট নেই, ভাইয়া,' নরম সুরে বলল জেনি, 'ঢুকতেই দেবে না ওই দেশে। আটকে দেবে জেলে।'

'তাই?' ভড়কে গেল টম। 'তোমার পাসপোর্ট আছে?'

'হ্যাঁ। কয়েক দিন আগে হাতে পেয়েছি।'

'ও।' একটু মুষড়ে পড়ল টম।

'ভাইয়া, আমি চলে গেলে কাউকে বলবে না, ঠিক আছে?' টমের মাথার চুল এলোমেলো করে দিল জেনি। 'কেউ সকালে জিজ্ঞেস করলে বলবে, ঘুম থেকে উঠে আমাকে দেখেছ বিছানায়। ...পারবে না, ভাইয়া?'

'পারব। কিন্তু পরে বকা খেতে হবে।'

'এইটুকু আমার জন্যে করো, ভাইয়া,' টমের গালে চুমু দিল জেনি। এবার টোপ ফেলল সামনে। 'একটু আগে রূপকথার কথা বলেছিলে, মনে নেই? তার চেয়েও দারুণ জিনিস আছে আমার কাছে।'

'তাই? সেটা কী, আপু?' বিছানায় উঠে বসল টম।

ঘরের কোণ থেকে ক্যানভাস ব্যাগ এনে ভেতরের একটা পকেট থেকে টাকা বের করল জেনি। টমকে ধরতে দিল অদ্ভুত ছাপ দেয়া নোট। কড়কড় করছে। খুব খুশি হলো টম। তারপর ওর হাতে নিজের পাসপোর্ট দিল জেনি। টাকা গুছিয়ে রেখে দিল পার্সে।

'সত্যিই, তোমার ছবিও তো আছে এখানে!' খুশি হয়ে জেনির পাসপোর্ট দেখছে টম।

'বড় হলে তোমারও পাসপোর্ট হবে,' বলল জেনি। ওয়ারড্রোব থেকে নিল দরকারী পোশাক, ভরে রাখল ক্যানভাস ব্যাগে। টমের হাত থেকে পাসপোর্ট নিয়ে মোতি বসানো সস্তা পার্সে রাখল ওটা। কাপড়-চোপড়ের ওপর থাকল জিনিসটা। এবার খাটে বসে বলতে শুরু করল ছোট একটা রূপকথা:

'এক দেশে ছিল খুব ভাল, লক্ষ্মী এক রাজকুমার। কিন্তু তাকে দেখে ভীষণ হিংসা হলো এক দুষ্টু বামন লোকের...'

পাঁচ মিনিট পেরোবার আগেই ঘুমিয়ে গেল টম।

একা চুপ করে বসে থাকল জেনি। আগে ঘুমিয়ে যাক বাড়ির সবাই, তারপর নিঃশব্দে বেরোবে বাড়ি ছেড়ে। কুকুরে ধাওয়া করবে, সে-ভয় নেই। টম ঘুমিয়ে যাওয়ার পর গত দুই গভীর রাতে বাইরে গেছে জেনি। বাড়ির কুকুর মাল্টার তাল-ফেনেক। দক্ষ শিকারি জাত, পাহাড়ি এলাকায় ছুটে গিয়ে ধরে খরগোশ।

রাতে জেনির পেছনে নিঃশব্দে হাজির হয়েছিল ওরা, বারকয়েক শুঁকে চিনে গেছে মানুষটা আসলে কে। খুশিতে লেজ নেড়ে কুঁই-কুঁই করতেই ওদের মাথা চাপড়ে দিয়েছে ও।

কিন্তু সমস্যা করবে পেছনের উঠানে ঝগড়াটে মোরগটা। পঞ্চাশ গজ দূরে পুরনো এক ক্যারব গাছের খোঁড়লে আস্তানা গেড়েছে। কাছ দিয়ে কেউ গেলেই দুনিয়ার মানুষকে জানিয়ে দেয়, সে দেখে ফেলেছে শত্রুকে।

এসব ভেবেই সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেনি। সরু কাঁচা পথে নেমে যাবে সাগরের দিকে। আর একবার সমতলে নামলেই রওনা হবে বন্দরের উদ্দেশে।

চুপচাপ বসে অনোরিয়া ও পাজেরোর জন্যে চিঠি লিখল জেনি। ব্যাখ্যা করে জানাল, বিপদ যতই হোক, ও থাকতে চায়

মাসুদ ভাই আর রামিন ভাইয়ার পাশে।

মনে মনে হাসল। তাজারা যখন এই চিঠি পাবেন, ততক্ষণে ও পৌঁছে গেছে রোমে। বাগানবাড়ির ফোন ব্যবহার করে রোমে যাওয়ার বিমানের টিকেট বুক করেছে। প্রথমে ভোর চারটের ফেরিতে পৌঁছবে মাল্টায়। ওখান থেকে বাস ধরে ভ্যালেট্টা। আরেক বাস ধরে এয়ারপোর্ট। হাতে সময় থাকবে সকাল সাতটার বিমানে ওঠার। রোম এয়ারপোর্টে পৌঁছবে আশি মিনিটে। তারপর অন্য কোনও বিমান বা রেলগাড়ি ধরে হাজির হবে নেপলসে। আগেই লিখে নিয়েছে প্রেযো ফিসো বোর্ডিং হাউস অ্যাণ্ড রেস্টুরেণ্ট-এর ঠিকানা।

এটা ঠিক, ভীষণ খেপে যাবেন মাসুদ ভাই আর রামিন ভাইয়া। কিন্তু যেভাবেই হোক ওদেরকে সামলে নেবে ও। রাঁধবে ওদের জন্যে, আর সব কাজও গুছিয়ে রাখবে। আর এ কথা ভুললে তো চলবে না, ও শিশু নয়, পুরো সাবালিকা মেয়ে। ওর নিজের একটা ইচ্ছা বলে কিছু থাকতে পারে না?

রাত দুটোর সময় বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল জেনি, কাঁধের পেছনে ক্যানভাসের ব্যাগ। কিছুই টের পেল না কুচুটে মোরগ। কিন্তু এক শ' গজ যাওয়ার আগেই পেছনে দেখা দিল দুই কালো ছায়া। থেমে দুই কুকুরের মাথা চাপড়ে দিল জেনি। ওর ঝুঁকে আসা গাল চেটে দিল কুকুরগুলো।

'যা, বাড়ি ফিরে যা,' ফিসফিস করল জেনি।

ফলাফল নিরেট পাথরের উদ্দেশে কথা বলার মত হলো। জেনির পিছু নিল ওরা। তীরে পৌঁছে হাঁটতে হাঁটতে হাজির হলো ছোট্ট বন্দরে। যেন সাট করেছে, জেনির সঙ্গে পালাবে ওরাও!

রাত তিনটের সময় ভ্যালেট্টা গ্র্যাণ্ড হার্বার-এ ভিড়ল নেপলসের ফেরি। কাস্টম্‌স্‌ ও ইমিগ্রেশন পেরিয়ে দেরি না করে ট্যাক্সি নিল

ম্যানুয়েল য্যারাফা। ড্রাইভারকে বলল, ‘সঠিক সময়ে কার্কেওয়ায় পৌঁছে দিতে পারবে? আমার ধরতে হবে গোজোর ফেরি।’

‘সমস্যা নেই,’ খুশি মনে বলল ড্রাইভার, ‘গ্যাঁট মেরে বসে থাকুন।’

কাউণ্টার থেকে টিকেট কেটে ফেরিতে চেপে বসল জেনি। অনেকেই উঠেছে, এখনও উঠছে। বেশিরভাগ মানুষ খামার-মালিক ও জেলে। যে যার মাল নিয়ে বিক্রি করবে মাল্টার বাজারে।

আধঘণ্টা পর ফেরি ভিড়ল কার্কেওয়ায়। সবার আগেই নেমে পড়তে চাইল জেনি। র‍্যাম্প বেয়ে তীরের দিকে চলেছে, এমন সময় ওকে মনোযোগ দিয়ে দেখল এক লোক। আবারও দশ ফুট যাওয়ার পর থমকে গেল। ঘুরে দেখল মেয়েটা চলেছে সবুজ রঙের এক বাসের দিকে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা, সামনে যেতে দিল বেশ কয়েকজনকে, তারপর পিছু নিল। এইমাত্র বাসে উঠেছে মেয়েটা।

বাসের পাশেই এইমাত্র থামল এক ট্যাক্সি। ওটা থেকে বেরোল ঘুমহীন কয়েকজন উস্কোখুস্কো চুলের টুরিস্ট।

রওনা হয়ে গেছে বাস।

একহাতে ট্যাক্সি ড্রাইভারের কনুই খপ্ করে ধরে জিজ্ঞেস করল ম্যানুয়েল য্যারাফা, ‘ওই বাস কোথায় যাচ্ছে?’

জবাব এল, ‘ভ্যালেট্টা।’

‘পিছু নাও,’ লাফ দিয়ে ট্যাক্সির পেছনের সিটে উঠল ম্যানুয়েল য্যারাফা।

অ্যালিটালিয়া কাউণ্টারে টাকা পরিশোধ করে বুক করে রাখা টিকেট নিয়ে এয়ারপোর্টের ভেতরে ঢুকে গেল জেনি। পেছনে রয়ে

গেল য্যারাফা। খেয়াল করে দেখল, ক্যাফেটারিয়ায় ঢুকে চা ও টোস্ট অর্ডার দিল মেয়েটা। প্রায় উড়তে উড়তে অ্যালিটালিয়ার কাউণ্টারে গিয়ে নিজের জন্য বিমানের টিকেট কিনল য্যারাফা, তারপর ফোন দিল গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তাকে।

'হ্যাঁ... সেই মেয়ে... কোনও ভুল নেই... ফেরিতে উঠব, এমন সময় দেখি নেমে এল ওটা থেকে। পিছু নিয়ে চলে এসেছি এয়ারপোর্টে... টিকেটও কিনে ফেলেছি। একই ফ্লাইটে আসছি। রোম। ফিউমিসিনোয় কয়েকজন রাখুন। ...না... চিনতে পারেনি... আগে যখন দেখেছে, তখন তো টর্র্ হয়ে ছিল হেরোইনে। মার্সেইল্স্-এ তো? ...হ্যাঁ... মাত্র একবার দেখেছে। ...না... ভুল করছি না। দেবীর মত চেহারা... জীবনেও ভুলতে পারব না... হ্যাঁ... তা তো বটেই। আটটা বিশ মিনিটে এয়ারপোর্টে পৌঁছবে বিমান। ঠিক পেছনেই থাকব। সামনে আপনার লোক রাখুন।'

খুব কচি বয়সে রাস্তায় ফেলে গেছে মেয়েটার মা। নিজের বাবা-মা-র নাম ওর জানা নেই। সিমোনার বংশ পরিচয় নেই। এমন কী যে ডাক নাম, তা দিয়েছে আগের এতিমখানার কর্তৃপক্ষ। মাসখানেক আগে অর্থের অভাবে বন্ধ হয়েছে তাদের সংগঠন।

যে-কোনও পরিবেশেই মানিয়ে নিতে পারে সিমোনা। আর তাই দত্তক দেয়ার সময় ওর নাম আসায় খুশি হয়েছেন সিস্টার হাউডরিস। আজ দুপুরে বাচ্চা মেয়েটাকে তৈরি করে দেয়ার কাজে নামলেন তিনি। প্রথমেই ভাল করে ধুলেন সিমোনার দীর্ঘ সোনালি চুল, পরিয়ে দিলেন জিন্স ও টি-শার্ট। দান হিসেবে মাল্টা থেকে এসেছে এসব নতুন পোশাক। নরম সুরে বার-বার আশ্বাস দিলেন। বাচ্চা মেয়েটাকে খুশি করতে বললেন: 'জীবনে প্রথমবারের মত চাপবে জাহাজে, আর পৌঁছে যাবে ইতালি নামের

এক অদ্ভুত সুন্দর দেশে। ওখানে অপেক্ষা করছেন নতুন বাবা-মা। তাঁরা তোমাকে নিয়ে যাবেন চমৎকার এক বাড়িতে। এতই ভালবাসবেন, কল্পনাও করতে পারবে না। ভাল স্কুলে লেখাপড়া করবে। আর বড় হওয়ার পর ইচ্ছে হলে এসে দেখে যাবে বুড়ি সিস্টার হাউডরিস আর অন্য নানদেরকে। তখন আমাদের জন্যে ইতালিয়ান চকলেট আনতে যেন ভুলে যেয়ো না।'

চকলেটের কথা শুনে হাসল সিমোনা। মাথা দুলিয়ে বলল, 'সিস্টার, দেখবেন, একদিন বড় হয়ে দেখা করতে আসব। আর এত এত চকলেট আনতেও ভুল করব না।'

উনসত্তর

রোববার নিডো আর লুসির বিলাসের দিন। বরাবরের মত ভোর ছয়টায় উঠে তৈরি হতে হবে না অফিসের জন্য। আরাম করে ঘুমাবে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত, তারপর ধীরে-সুস্থে উঠে নাস্তা শেষ করবে। এগারোটায় সবার সঙ্গে গির্জায় যাবে প্রার্থনা করতে। তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে দুপুরের খাবার সারবে নিডোর বাবা-মা-র খামারবাড়িতে।

কিন্তু আজ রোববার ভোর সাড়ে ছয়টায় ঘুম চটে গেল নিডোর। মনে পড়ল, ক'জন ইংরেজ বন্ধু বেড়াতে এসেছিল, নিজেদের বাড়ি ফিরতে সকাল সাতটার ফেরি ধরবে তারা।

নিডোর মনে হলো, বন্ধুরা চলে যাচ্ছে, তাই একবার দেখা

করে আসা উচিত। লুসিকে ঘুমে রেখে লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়ল সে। পরের তিন মিনিটে ল্যাণ্ড-রোভার নিয়ে রওনা হয়ে গেল বন্দরের দিকে।

বিদেশি বন্ধুদের বিদায় জানিয়ে বন্ধু জোয়ির দোকানে থামল নাস্তা ও কফির জন্য। প্রথম চুমুক দিয়েছে কফিতে, এমন সময় জোয়ি বলল, 'ওই যে, যে মেয়ে আঙ্কেল-আন্টির বাড়িতে...'

'তো কী?' সতর্ক হয়ে উঠেছে নিডো।

'আজ গভীর রাতে মাল্টায় গেছে সে।'

ঝট্ করে মুখ তুলে বন্ধুকে দেখল নিডো। 'পাগল নাকি তুমি! কী বলো এসব!'

'ভুল বলিনি, ওই মেয়েই,' বলল জোয়ি, 'আমি মাত্র খুলেছি ঝাঁপ, তখনই দেখলাম গিয়ে উঠল ভোর চারটের ফেরিতে। কাঁধে ক্যানভাসের ব্যাগ। খেয়াল করতাম না, কিন্তু ওর সঙ্গে ছিল আঙ্কেলের দুই তাল-ফেনেক।' হাসল জোয়ি। 'ওরাও উঠতে চেয়েছিল ফেরিতে। কিন্তু তাড়া দিয়ে ওদেরকে ভাগিয়ে দিয়েছে মেয়েটা। কী আর করে, বাধ্য হয়ে টিলা বেয়ে আবারও বাড়ি ফিরেছে কুকুরদুটো। তার একটু পরেই ছেড়ে গেল ফেরি।'

হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ কফির কাপে চোখ রেখে কী যেন ভাবল নিডো, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঠিক দেখেছ তো, জোয়ি?'

মাথা দোলাল যুবক। 'ভুল হওয়ার উপায় নেই। আগে মাত্র একবার দেখেছি, কিন্তু ওই রূপ... দশ বছর পরেও ওকে যে কোনখানে দেখে চিনব। এমন সুন্দরী মহিলা হয়ে উঠবে ও, যে...'

শুনতে বসে নেই নিডো, লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল দোকান ছেড়ে। ঝেড়ে দৌড় দিল ল্যাণ্ড-রোভারের উদ্দেশে।

একটু আগে ঘুম থেকে উঠেছেন অনোরিয়া। রান্নাঘরে ব্যস্ত হয়ে নাস্তা তৈরি করছেন, এমন সময় অবাক চোখে দেখলেন এক দৌড়ে হুড়মুড় করে কিচেনে ঢুকল নিডো।

'এত সকালে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন অনোরিয়া।

'ওসব পরে... জেনি কোথায়?'

'ঘুমাচ্ছে। গতকাল রাতে বলল দেরি করে উঠবে। কেন?'

'এইমাত্র ফেরির ঘাটে ছিলাম,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল নিডো, 'জোয়ির দোকানে যেতেই বলল, রাত চারটের ফেরিতে উঠেছে জেনি। ওর সঙ্গে কুকুরগুলোও ছিল।'

'যাহ্, কী বলিস!' অবাক হয়ে বললেন অনোরিয়া, 'কুকুর তো এখানেই আছে!'

'হ্যাঁ, ফিরে এসেছে,' বলল নিডো, 'জেনি চলে যাওয়ার পর! মা, দেখো তো জেনি ঘরে আছে কি না!'

প্রায় দৌড়ে অতিথিদের জন্যে তৈরি দোতলায় উঠলেন অনোরিয়া। পেছনে ছেলে। জেনি ও টমের ঘরের দরজা খুলে ফেললেন তিনি, ঢুকে পড়লেন ভেতরে।

মস্ত বিছানায় বেঘোরে ঘুমিয়ে আছে টম।

জেনি নেই।

বেডসাইড টেবিলে চোখ যেতেই থমকে গেলেন অনোরিয়া। কয়েক সেকেণ্ড পর সামনে বেড়ে কাঁপা হাতে তুলে নিলেন টেবিলের ওপর থেকে কাগজটা। নিচু স্বরে পড়লেন:

'আন্টি, দয়া করে দুশ্চিন্তা করবেন না। খুব ভাল ছিলাম এখানে। কিন্তু মনটা বলছে, মাসুদ ভাই আর রামিন ভাইয়ার পাশে থাকা উচিত। ওরা ফিরে আসবে, সে জন্য অপেক্ষা করতে পারলাম না। হয়তো ওদের কাজে আসব। জানি ওরা কোথায়। আপনারা যখন চিঠি পড়ছেন, ততক্ষণে চলে গেছি ইতালিতে। সঙ্গে টাকা আছে, আর সতর্ক হয়ে পথ চলব। ভালবাসা রইল

আপনাদের জন্যে।

জেনি।'

অবাক চোখে পরস্পরের চোখে তাকাল দু'জন। কয়েক মুহূর্ত পর জিজ্ঞেস করল নিডো, 'টাকা পেল কোথা থেকে?'

'রানার বাগানবাড়ি,' চাপা স্বরে বললেন অনোরিয়া। 'গত রোববার সারাদিন ওখানে ছিল জেনি। অনেক টাকা থাকে রানার বেডরুমের সিন্দুকে। রানা বা রামিন দেখিয়ে দিয়েছে কীভাবে ওটা খুলতে হয়।'

'টম!' ডাক দিল নিডো। 'ভাইয়া, ওঠো তো!'

একবার চোখ মেলল টম, তারপর পাশ ফিরে আবারও ঘুমিয়ে গেল।

'অ্যাই, ওকে ঘুম থেকে তুলছিস কেন!' ধমক দিলেন অনোরিয়া। 'ঘুমাচ্ছে ঘুমাক!'

'কিন্তু...'

'কোনও কিন্তু না! কাউকে ঘুম থেকে তুলতে হয় না!'

'কিন্তু, মা...'

'আহ্! চুপ কর্! বাচ্চাটা ঘুমাচ্ছে!'

উঁচু গলার আওয়াজ শুনে দোতলায় উঠে এলেন পাজেরো। 'কী হচ্ছে এখানে?'

অনোরিয়া আর নিডোর কাছ থেকে তিন মিনিটের ভেতর সবই জেনে গেলেন তিনি। চট্ করে ঘড়ি দেখলেন।

সাতটা পনেরো মিনিট।

'সাতটার ফ্লাইটে রোমে যাচ্ছে,' বললেন পাজেরো। 'ওই বিমান কখনও কখনও লেট করে। হয়তো জেনিকে নামিয়ে আনতে পারব।'

দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন ওরা তিনজন। দায়িত্ব বুঝে নিলেন অনোরিয়া। ফোন করলেন স্বামীর ভাই পিওতর মেনিনোর

বাসার নম্বরে।

ফোন ধরল পুলিশের বড়কর্তার স্ত্রী। জানিয়ে দিল, হেড-কোয়ার্টারের দিকে রওনা হয়ে গেছে মেনিনো।

লাইন কেটে এবার মেনিনোর মোবাইল ফোনে কল দিলেন অনোরিয়া। দেবর ধরতেই সংক্ষেপে বললেন কী হয়েছে।

মেনিনো বলল, 'ভাবী, অপেক্ষা করেন, একটু পর যোগাযোগ করছি।'

কিচেন টেবিলের চেয়ারে বসলেন তিন তাজা। নতুন তাজা খবর এখনও হজম হয়নি। চোখ থাকল ফোনের ওপর।

তিন মিনিট পর বেজে উঠল ফোন।

মেনিনো জানাল, 'হ্যাঁ, ইমিগ্রেশন কমপিউটার অনুযায়ী, জেনি গুগলি নামের এক মেয়ে অ্যালিটালিয়া ফ্লাইটে গেছে রোমে। ওই বিমান রওনা হওয়ার কথা ছিল সাতটের সময়। কিন্তু সতেরো মিনিট পর আকাশে উঠেছে।'

একবার হাতঘড়ি দেখলেন অনোরিয়া। ওই বিমান ল্যাণ্ড করবে আটটা চল্লিশ মিনিটের দিকে।

'রোমে যোগাযোগ করতে পারি,' বলল পিওতর মেনিনো। 'সেক্ষেত্রে পুলিশ অপেক্ষা করবে ওর জন্যে। পরের ফ্লাইটে পাঠিয়ে দেবে এখানে।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন অনোরিয়া, তারপর বললেন, 'না, তার দরকার নেই। নেপলসে রেমারিকের ওখানে আছে রানা। কথা বলে দেখি কী করতে চায়। পিওতর, কিছুক্ষণ পর তোমাকে ফোন দেব।'

সত্তর

নাস্তার মাঝে ফোনের আওয়াজ শুনল রানা। কিচেন থেকে কল রিসিভ করল রেমারিক। কী যেন বলছে। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর গলা চড়ে গেল ওর। 'রানা! এসো তো! জলদি!'

নাস্তা ফেলে কিচেনে গিয়ে ঢুকল রানা। রেমারিক নীরবে রিসিভারটা ওর হাতে ধরিয়ে দেয়ায় বলল, 'হ্যালো।'

পরের কয়েক মিনিট অনোরিয়ার মাপা কথা শুনল রানা, তারপর 'একমিনিট,' বলে তাকাল রেমারিকের দিকে। সংক্ষেপে বলল বর্তমান পরিস্থিতি। একই সময়ে হাতঘড়ি দেখল দুই বন্ধু।

'হাতে বড়জোর একঘণ্টা,' বলল রেমারিক, 'আরও বিশ বা ত্রিশ মিনিট ধরো ইমিগ্রেশন বা কাস্টমসে। রানা, পিওতর মেনিনোকে বলবে, যাতে রোমের পুলিশ সুপারকে ফোন করে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না। এসব থেকে দূরে রাখব পুলিশকে। এখন কথা হচ্ছে, চিঠিতে যা লিখেছে, সেটা ঠিক কি না। অন্য কিছুও হতে পারে।'

'যেমন?' ভুরু কুঁচকে বন্ধুকে দেখল রেমারিক।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমরা নিশ্চিত নই যে, ড্রাগসের ঘোরে পাধানি মুখ খুলেছে কি না। সেক্ষেত্রে তারা হয়তো পৌঁছে গেছে গোজোতে। এদিকে আমার লোক ওখানে পৌঁছবে বিকেলে।'

সন্দেহ নিয়ে বলল রেমারিক, 'আমরা জানি, একা ফেরিতে

উঠেছে জেনি। কিডন্যাপ বলে মনে হচ্ছে না।'

'কথা ঠিক,' সায় দিল রানা। 'কিন্তু কে নিশ্চয়তা দেবে যে রোমের এয়ারপোর্টে তাদের লোক থাকবে না? বাচ্চা মেয়ে, ওকে হয়তো কোনওভাবে ফাঁদে ফেলেছে।'

আরেকবার হাতঘড়ি দেখে নিয়ে বলল রেমারিক, 'তা হতে পারে। কিন্তু রোমে আছে রামিন আর মউরোস। গত রাতে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সিম আর কালাহান।'

নিজেও হাতঘড়ি দেখল রানা। 'রামিনকে এসবে জড়াব না। সাফল্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। চাই না ওর কাভার নষ্ট হোক। সিম আর কালাহানকে পাঠাব। আড়াল থেকে কাভার দেবে মউরোস।'

'রামিনের অ্যাপার্টমেন্টের ফোন নম্বর...' রানার দিকে তাকাল রেমারিক।

কিচেনে ঢুকতে গিয়েও দরজায় হেলান দিয়ে শেষ কিছু কথা শুনেছে পিটার। রানার মতই তারও রয়েছে ফোটোগ্রাফিক মেমরি। একই সময়ে সংখ্যা বলতে শুরু করল দু'জন।

পরে কথা বলবে জানিয়ে অনোরিয়ার ফোন কেটে দিল রানা। ডায়াল করতে লাগল রামিনের নাম্বারে।

কয়েক সেকেণ্ড পর ওদিক থেকে রিসিভার তোলা হলো। ঘুম জড়ানো কণ্ঠ রামিনের। কিন্তু সচেতন হয়ে গেল প্রথম দু'চার কথা শুনেই। রানার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুনে চট্ করে দেখল হাতঘড়ি। 'মাসুদ ভাই, ব্যবস্থা করছি। মউরোস এখানেই আছেন। আর একটু দূরের এক হোটেলে সিম আর কালাহান। সকাল এগারোটায় কর্নেল গুগলির সঙ্গে দেখা করার কথা তাঁদের। প্ল্যান তৈরি করে দেয়ার পর আবারও আপনার সঙ্গে কথা বলছি।'

একাত্তর

দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে এতই উত্তেজিত, বিমানে দেয়া খাবার মুখে তুলতে পারল না জেনি। বার-বার ভাবছে, কখন দেখা হবে মাসুদ ভাই আর রামিন ভাইয়ার সঙ্গে! ওকে কী বলবেন ওঁরা, কে জানে!

বিমান আধ-খালি। পাশাপাশি তিনটি সিটের একটিতে একা বসে আছে জেনি। এক স্টুয়ার্ডেস এসে দ্বিতীয়বারের মত ওকে কফি দিল। জেনির একটু দূরে বসল সুন্দরী। একটু অবসর পেয়েছে বলে জুড়ল আলাপ। জানালা দিয়ে দেখিয়ে দিল দূরে।

আজ সোনা-ঝরা সকাল। আকাশে মেঘ নেই। বহু নিচে সবুজ খেত, নীল জলাধার ও আকাশ ফুঁড়ে উঠে আসা অ্যাপেনিন পবর্তমালা।

'আগে কখনও রোমে এসেছ?' জানতে চাইল স্টুয়ার্ডেস।

'না। জীবনে এই প্রথমবার।'

'নিশ্চয়ই কেউ এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে যাবে?'

'না, দুপুর বারোটার ট্রেনে চেপে নেপলসে যাব। রেলওয়ে স্টেশন কি এয়ারপোর্টের কাছে?'

হাসল স্টুয়ার্ডেস। 'না, অন্তত একঘণ্টা লাগবে শহরে পৌঁছুতে। তবে আধঘণ্টা পর পর এয়াপোর্ট থেকে বাস ছাড়ে। সোজা থামবে রেলস্টেশনে। তোমার সঙ্গে যথেষ্ট টাকা থাকলে

ট্যাক্সিও নিতে পারো।'

মিষ্টি হেসে মাথা নাড়ল জেনি। 'না, আমি বাসে যাব।'

উঠে দাঁড়িয়ে স্কার্ট ঝেড়ে নিয়ে বলল স্টুয়ার্ডেস, 'তা হলে কাস্টম্‌স্ থেকে বের হয়ে সোজা বামে যাবে এক শ' গজ মত, তারপর দেখবে ট্র্যান্সপোর্ট ডেস্ক। ওখানে বাসের টিকেট বিক্রি করে। বাইরেই অপেক্ষা করে বাস। নেপলসে খুব সাবধান। কমবয়সী মেয়েদের জন্য খুব বিপজ্জনক শহর ওটা।'

হাসল জেনি। 'চিন্তা করবেন না। আমার দুই ভাই আছে ওখানে।'

ইমিগ্রেশন এলাকা পেরিয়ে জেনিকে অনুসরণ করে কাস্টমসের গ্রিন লেন-এ চলে এল ম্যানুয়েল য্যারাফা। মনে মনে শয়তানের কাছে প্রার্থনা করল, যেন স্পট চেকের জন্য আটকে না দেয়া হয় ওকে। বিমানের পেছন দিকের এক সিটে বসে ছিল, বুঝে গেছে ওই মেয়ে ওকে চিনতে পারেনি। আর বিমান থেকে নেমেও অ্যারাইভাল হল-এ ওকে দেখেনি।

জেনির তিরিশ ফুট পেছনে হেঁটে কাস্টম্‌স্ এরিয়া থেকে বেরিয়ে এল সে। একটু থেমে দেখে নিল চারপাশ। বহু লোক এসেছে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও ব্যবসায়িক অংশীদারকে শহরে নিতে। থমকে দাঁড়িয়ে গেছে ওই মেয়েও। কিন্তু ভিড়ের ভেতর কাউকে খুঁজছে না। চোখ বামদিকে।

এভিস কার হায়ার কাউন্টারের পাশে নিজের লোক দেখতে পেল য্যারাফা। পরস্পরের চোখে চোখ পড়ল তাদের। পরক্ষণে মাথার ইশারা করে জেনিকে দেখিয়ে দিল য্যারাফা। খোলা জায়গায় বেরিয়ে হাঁটতে লাগল জেনি। পেটের ভেতর মুচড়ে উঠল য্যারাফার। আরেহ্, কেউ তো আসেনি ওই মেয়েকে নিতে! দ্রুত হেঁটে জেনির পাশে পৌঁছে গেল সে। মেয়েটার ডান কাঁধে ঝুলছে

ক্যানভাসের ব্যাগ।

'হাই,' খুশি মনে বলল য্যারাফা। 'মনে হলো মাল্টার প্লেনে তোমাকে দেখেছি?'

মুখ তুলে তাকে দেখল জেনি। 'হ্যাঁ। ওই ফ্লাইটেই এসেছি। কিন্তু আপনাকে তো দেখিনি?'

চওড়া হাসল য্যারাফা। 'আমি ছিলাম বিমানের পেছনে। তুমি কি রোমে থাকো?'

মাথা নাড়ল জেনি। 'না, যাব রেলওয়ে স্টেশনে। এবার বাসে উঠব।'

'তাই? তোমার টিকেটের পয়সা বাঁচিয়ে দিতে পারি,' বলল য্যারাফা। 'আমিও রেলওয়ে স্টেশনে যাব।' একটু দূরে এক লোককে দেখাল। 'ওই যে, আমার বন্ধু এসেছে নিতে। ওর গাড়িতে যেতে পারো আমার সঙ্গে রেল স্টেশনে।'

ঘুরে দেখল জেনি, ওদের দিকে আসছে এক লোক। বয়স পঁচিশ মত। লম্বা, কালচে মুখ। হেঁটে আসতে আসতে গম্ভীর চোখে দেখছে ওকে। সামনেই বাসের টিকেট কাউন্টার। ওদিকে তাকাল জেনি। আর তখনই বুকের ভেতর বেজে উঠল সতর্ক ঘণ্টি। কিছু দিন আগে এমনই এক লোক এসে ওকে নিয়ে গিয়েছিল নরকে।

'না, ধন্যবাদ, আমি বাস ধরব,' বলে দিল জেনি।

'এত টাকা নষ্ট করবে?' ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত বলল য্যারাফা, 'তা ছাড়া, বাসে গেলে অনেক সময় লাগবে।' জেনির কাঁধ থেকে ব্যাগ তুলে নিল সে।

খপ্ করে ব্যাগ আঁকড়ে ধরল জেনি, ঘন ঘন মাথা নাড়ল। 'না! আমি বাসে যাব!'

তখনই আকাশ ফুঁড়ে হাজির হলো আরেক লোক। বয়স বত্রিশ কি তেত্রিশ। মাথা জুড়ে টাক। গোল মুখ। দেহটা

চারকোনা বাক্সের মত। 'যাক, পৌঁছে গেছ, জেনি,' খুশি খুশি স্বরে বলল সে। 'একটু দেরি হয়ে গেল। কী করব, যে জ্যাম!' নিখুঁত ইংরেজি বলে লোকটা, কিন্তু উচ্চারণে অস্ট্রেলিয়ার টান। টেকো ঘুরে দেখল য্যারাফাকে। 'আর ভাবতে হবে না, মাইট! এই মেয়ে আমার সঙ্গে যাবে!'

মেয়েটার চোখে ভয় ও দ্বিধা দেখল য্যারাফা। খপ্ করে ওর কনুই ধরল সে। কড়া সুরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি চেনো এই লোককে? রোমে সতর্ক থাকতে হয়।'

কথাটা মাত্র শেষ করেছে য্যারাফা, এমন সময় বিদ্যুদ্বেগে সব ঘটতে লাগল। ফ্রিযের মত চারকোনা আকৃতির টেকো লোক ঝট্ করে সামনে বাড়ল, তারপর ডানহাতে প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিল য্যারাফার পেটে।

ব্যথায় কাতরে উঠে মেয়েটার কনুই ছেড়ে দিল য্যারাফা, পরক্ষণে নিজেও ডানহাতি ঘুষি মারল টেকোর নাক লক্ষ্য করে। কিন্তু তার ঘুষি গেল বাক্সের মাথার ওপর দিয়ে। নিচু হয়ে গেছে বাক্স, আর তখনই মেঝেতে ভারী তোয়ালে যেভাবে থ্যাপ আওয়াজ করে পড়ে, সেরকম আওয়াজ শুনল জেনি। ছিটকে পেছনে গিয়ে পড়েছে য্যারাফা। কে যেন চিৎকার করে নির্দেশ দিল। টেকো জড়িয়ে ধরল জেনির কোমর, পরক্ষণে ওকে তুলে নিয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল রেলগাড়ির ইঞ্জিনের মত। বড় করে দম নিয়ে চিৎকার দিতে হাঁ করল জেনি, কিন্তু তখনই শুনতে পেল টেকোর কথা: 'রানা পাঠিয়েছে আমাকে। চুপ করে থাকো।'

আবারও জেনিকে নামিয়ে দেয়া হলো। ওর হাত ধরে দৌড়াতে লাগল বাক্স। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে পৌঁছে গেল এণ্ট্র্যান্সে। ডানদিকে কালো মুখের এক লোককে ছুটে আসতে দেখল জেনি।

জ্যাকেটের ভেতর হাত ভরে দিয়েছে লোকটা। বের করেও

ফেলল পিস্তল। কিন্তু পেছন থেকে তার ঘাড়ে নামল ভয়ঙ্কর এক রদ্দা। ওই ভীষণ দ্বিধার ভেতরেও রদ্দার মালিককে চিনে ফেলল জেনি। ওই মুখ দেখেছে রানার সিন্দুকের ফাইলে। ওপরে লেখা ছিল: সিম কর্নেলিস।

ভাল দলের একজন!

টেকো ফ্রিযের সঙ্গে দৌড়ে চলেছে জেনি। তারই ভেতর দেখল, মস্ত এক কালো পিস্তল বের করে চারপাশ দেখতে দেখতে ছুটছে সিম কর্নেলিস। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এল ওরা। আর তখনই সামনে থামল কালো একটা গাড়ি।

জেনিকে তুলে নিয়ে ঠুসে দেয়া হলো পেছনের সিটে। পরের সেকেণ্ডে আরেকটু হলে চ্যাপ্টা হয়ে যেত ও। ওকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলল কে যেন। দড়াম আওয়াজ তুলে বন্ধ হয়ে গেল দরজা, পরক্ষণে গাড়ির চাকা ঘষটে তুমুল বেগে রওনা হয়ে গেল ওরা।

কে যেন গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'চুপচাপ শুয়ে থাকো, জেনি। উঠতে যেয়ো না। আমরা রানার বন্ধু।'

চাপা পড়ে শুয়ে থাকা ছাড়া উপায়ও নেই, বুঝল জেনি। ওর ওপর শুয়ে আছে টেকো বাক্স। ঢাকনি বা মুখ খোলা বলে ভেতর থেকে বেরোচ্ছে রসুনের বেদম দুর্গন্ধ।

সামনের প্যাসেঞ্জার সিট থেকে কে যেন বলে উঠল, 'ঠিক আছে। একমিনিট পর গাড়ি পাল্টে নেব।'

বোঝা সরে গেল জেনির ওপর থেকে। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে বসল বেচারি।

ড্রাইভারের পাশের সিটে আছে সিম কর্নেলিস, হাতে এখনও পিস্তল। পেছনের কাঁচের ভেতর দিয়ে ওদিকে চোখ বোলাল, তারপর ওর চোখ স্থির হলো মেয়েটার চোখে। 'আমি সিম কর্নেলিস।' পিস্তল দিয়ে দেখাল জেনির পাশের জনকে। 'ও অসি

কালাহান। আর ড্রাইভার জ্যাঁ মউরোস। আমরা রানা আর রামিনের বন্ধু।'

নিজেকে সামলে নিয়ে বিড়বিড় করে বলল জেনি, 'আপনার নাম জানি। আসলে কেন... কী হলো?'

'অপেক্ষা করো,' বলল সিম। 'পরে বলব।'

একটা ফাঁকা জায়গায় রাখা হয়েছে এক কালো গাড়ি, ওটার পাশে স্কিড করে থামল ওদের গাড়ি। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে নতুন গাড়িতে উঠল ওরা, তারপর দুই মিনিট পর অটোস্ট্রাডা ছেড়ে রওনা হয়ে গেল শাখা রাস্তা ধরে।

জ্যাকেটে পিস্তল রেখে দিল সিম কর্নেলিস, মউরোসকে বলল, 'ওদের অন্তত বিশ মিনিট লাগবে রোড ব্লক করতে। ততক্ষণে আমরা হাওয়া।'

'কী হলো আসলে?' আবারও জানতে চাইল জেনি।

ওর পাশে অসি কালাহান বলল, 'তুমি বোকামি করলে যা হয়, তাই হয়েছে। খেপে বোম হয়ে যাবে তোমার দুই ভাই আর চাচা। আশা করি চাপড়ে তোমার লাল পাছা আরও লাল করে দেবে ওরা।'

ঘুরে টেকো বাক্সের চোখে তাকাল জেনি। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোন্ দেশের লোক, উচ্চারণ এমন কেন?'

'অস্ট্রেলিয়ানরা এভাবেই কথা বলে,' ধমকের সুরে বলল কালাহান।

মাথা দোলাল জেনি, ভাব দেখে মনে হলো বুঝে গেছে, কেন এত অসভ্য এই লোক।

বাহাত্তর

সত্যি খুব উত্তেজিত সিমোনা। আগে কখনও সাগর বা জাহাজ দেখেনি। এখন চোখ ভরে দেখছে। মস্ত বড় নীল সাগর। জাহাজও বিশাল, সাদা। খুশিতে হাসছে ও। ওর সঙ্গে হাসছেন সিস্টার হাউডরিস ও সিস্টার লরেডি।

সিমোনার প্লাস্টিকের ব্যাগে ওর সারাজীবনের সব: দুটো আণ্ডারপ্যান্ট, দু'জোড়া মোজা, একটা কমলা ড্রেস, দুটো টি-শার্ট ও একটা জিন্সের প্যান্ট। এ ছাড়াও ওর সঙ্গে আছে আরেকটা বড় টয়লেট ব্যাগ। ওটার ভেতর একটা সাবান, নেইল কাটার, একটা টুথ পেস্ট ও টুথ ব্রাশ।

খুব সাবধানে ওর কাগজপত্র দেখল ইমিগ্রেশন অফিশিয়াল। কোথাও কোনও খুঁত চোখে পড়ল না তার। নোটারাইয ও সই দেয়া হয়েছে সব সঠিক জায়গায়।

বারি বন্দরে চ্যারিটির ডিরেক্টর এবং নতুন অভিভাবকের হাতে সিমোনাকে তুলে দেবেন সিস্টার লরেডি। এটা করার নিয়ম, কারণ ভবিষ্যতে তাঁরা খোঁজখবর নিতে পারবেন।

প্লাস্টিকের ব্যাগ হাতে জাহাজে চাপল সিমোনা। ওর পাশে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ও নার্ভাস বোধ করছেন সিস্টার লরেডি।

গাড়িতে উঠে এতিমখানার দিকে রওনা হয়ে গেলেন সিস্টার হাউডরিস। বন্দর থেকে ফিরে যাওয়ার পথে কেমন খচ-খচ

করছে সিস্টারের মন। কেন যেন সন্তুষ্টি আসছে না মনে। আসলে দ্বিধা এসেছে সেদিন এতিমখানায় ওই যুবককে দেখার পর থেকেই। অনেক করেছেন তিনি ওঁদের সংগঠনের জন্য। তাঁর যুক্তিও পোক্ত। কথা বলেছেন জোর দিয়ে। বিশেষ কোনও ঈশ্বরকে মোটেও বিশ্বাস করেন না, কিন্তু ভাল চান অসহায় বাচ্চাদের। আছেন না এমন অনেকে, বিশ্বাসকে পাত্তা না দিয়ে যুক্তি নির্ভর হন? মানুষের জন্য বহু কিছু করবেন, কিন্তু যুক্তির বাইরে যাবেন না।

এই যে কোটি কোটি ডলার খরচ করছেন অসহায় বাচ্চাদের জন্যে, তাতে কেন মনে হবে না রোমিও কোসেলি ধর্ম না মানলেও শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য! নির্দিষ্ট কোনও ধর্ম না মেনেও সবার মঙ্গলের জন্যে কাজ করছেন!

এতিমখানায় ফিরে আবারও যুবকের মুখ ভেসে উঠল সিস্টার হাউডরিসের মনে। কী অদ্ভুত সুদর্শন। গম্ভীর কণ্ঠ। দায়িত্ববান। তবুও অস্বস্তি লাগছে সিস্টারের। কী যেন মনে পড়ছে না। কিন্তু পড়ার কথা। কী সেটা?

বাচ্চারা অনেকক্ষণ আগে রাতের খাবার শেষে শুয়ে পড়েছে ডরমেটরিতে। নিজেও শুয়ে পড়বেন সিস্টার হাউডরিস, তার আগে ঠিক করলেন, এক চক্কর ঘুরে আসবেন ওখান থেকে।

গত পনেরো দিন ধরে দেবে দেবে বলেও সংযোগ দেয়নি বিদ্যুৎ ডিপার্টমেন্ট। অথচ ফসল রাখার ডিপোয় আগে সব লাইন ছিল। আসলে ঘুষ না দিলে গা নড়াতে চায় না কেউ। ডরমেটরিতে ঢুকে দুটো জ্বলন্ত মোম দেখলেন সিস্টার হাউডরিস। লালচে আগুন আবছা আলো ফেলেছে দীর্ঘ ছাতে।

বেশিরভাগ বাচ্চা ঘুমিয়ে গেলেও জেগে আছে একজন। ঘরের শেষ মাথায় ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নীরবে বেডগুলোর ভেতর দিয়ে গিয়ে আওয়াজের কাছে থামলেন অ্যানি। উপুড় হয়ে শুয়ে

কাঁদছে হেনা। আজই এসেছে দূরের এক শহর থেকে। পাঁচ বছর বয়স। ওর মা মারা গেছে ওর এক বছর বয়সে। বাবা ধর্ষণ করেছিল ওকে। ধরা পড়ে আত্মহত্যা করে। আত্মীয়-স্বজন নেই বলে কেউ রাখেনি ওকে। বাচ্চাটার ওপর দিয়ে কী গেছে ভাবতে গিয়ে মন ভিজে গেল সিস্টারের। অনেক আদর করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে হবে এই শিশুকে।

বিছানার পাশে বসলেন সিস্টার অ্যানি হাউডরিস, টেনে কোলে তুলে নিলেন হেনাকে। ওঁর বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল মেয়েটা। মনে হলো না জগতের কোনও দিকে খেয়াল আছে। খুব ধীরে ধীরে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন সিস্টার। গুনগুন করে গাইতে লাগলেন বাচ্চাদের পছন্দ হবে এমন গান। কিছুক্ষণ পর থামল হেনার কান্না। আরও কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে গেল।

গভীর রাত পর্যন্ত বাচ্চা মেয়েটাকে কোলে নিয়ে চুপ করে বসে থাকলেন সিস্টার অ্যানি হাউডরিস। ভাবলেন, কেমন লাগত তাঁর নিজের সন্তান থাকলে? নিজেকে বললেন, আমার নিজের সন্তান নেই, কিন্তু এই বাচ্চারাও তো আমার সন্তানের মতই। আলতো করে হেনাকে বিছানায় শুইয়ে বালিশ ঠিক করে গায়ে টেনে দিলেন কম্বল। বুঝলেন, নিজের সন্তান থাকলে স্বার্থপর হয়ে উঠতেন। এখন বুকে অনেক বাচ্চার জন্যে ভালবাসা। বেশিরভাগ মা তা পারে না।

আবারও বেডগুলোর মাঝে দিয়ে ফিরতি পথ ধরলেন তিনি। খুব শান্ত লাগল মন। সত্যিকারের বাড়ি পেল সিমোনা। এরপর একের পর এক মেয়ে পাবে পরিবার, বাড়ি ও সমাজ। নিজের কাজ ঠিক মত করতে পারলেই স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন, ভাবলেন তিনি। মনে মনে ঠিক করলেন, আর দেরি করবেন না, আগামীকালই ফিরবেন মাল্টায় তাঁর কনভেন্টে। অনেক ছুটি

পাওনা আছে, বিশ্রামও দরকার। আবারও বাগানে গিয়ে বসবেন, দেখবেন চোখের সামনে বড় হয়ে উঠছে গাছের লেবু। তারপর ছুটি ফুরিয়ে গেলে আবারও ফিরবেন এখানে বাচ্চাদের মাঝে।

সিস্টার অ্যানি হাউডরিসের ঘর খুব ছোট, বিছানাও চওড়ায় বড়জোর দু'ফুট। নানের পোশাক পাল্টে সাধারণ কাপড় পরে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিলেন। দাঁত মেজে নিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। এমনিতে শুতে না শুতে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন, কিন্তু আজ যেন তাঁর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে ঘুম। বার-বার এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন। একটু পর পর চোখে ভাসল একটা দৃশ্য: বড় বড় চোখে ওঁকে দেখছে সিমোনা। একহাতে ধরেছে ওঁর কব্জি। আর তাঁরা ভেসে যাচ্ছেন সাদা ওই জাহাজে চেপে।

আবছা ঘুমের ভেতর সিস্টার অ্যানি হাউডরিসের মনে হলো, ট্রাক থেকে একে একে নামছে বাচ্চারা। চোখে ভয় ও দ্বিধা। আর তাঁরা নানরা আদর করে জড়িয়ে ধরছেন ওদেরকে।

ছেঁড়া-ছেঁড়া ঘুমের ভেতর পেরিয়ে গেল অনেকক্ষণ, তারপর তাঁর ছোট্ট ঘরের ছাতে চুমু দিল কচি, সোনালি রোদ। তখনই সিস্টার দেখলেন, কালো গাড়ির পেছনের সিট থেকে উঁকি দেয়া রোমিও কোসেলির মুখ।

বেদম ঝটকা খেয়ে চোখ থেকে উধাও হলো সিস্টার অ্যানি হাউডরিসের সব ঘুম।

হ্যাঁ, চিনে গেছেন ওই যুবককে! পাঁচ বছর আগের কথা!

কম্বল দিয়ে একটা বাচ্চাকে মুড়িয়ে গির্জার সিঁড়ির ধাপে রেখে গিয়েছিল এক মেয়ে!

ভাবতে গিয়ে থরথর করে কেঁপে গেলেন সিস্টার। দরদর করে বেরোতে লাগল সারা শরীরের রোমকূপ থেকে ঘাম।

মেয়েটা গিয়ে গাড়িতে উঠতেই চলে গিয়েছিল ওই কালো গাড়ি। কী ভীষণ অসহায় ছিল মেয়েটার চোখ। আর হাসছিল

লোকটা!

হ্যাঁ, এসব আজ থেকে পাঁচ বছরের বেশি হবে না! কক্ষণো ভুলবেন না ওই যুবকের নিষ্ঠুর হাসি আর কঠোর চোখ!

তেয়াত্তর

গাড়ি রেখে রাস্তার পাশের ক্যাফেতে ঢুকেছে ওরা। কফি আর পেস্ট্রির অর্ডার দিয়ে সব বুঝে নিয়ে টেবিলে ফিরেছে সিম কর্নেলিস। অসি কালাহানের কোলে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে জেনি।

মার্সেনারিদের ধৈর্যের অভাব হয় না, চুপচাপ বসে খাওয়ার ফাঁকে অপেক্ষা করল ওরা। পরে আবারও কফি নিল। নিজেদের ভেতর আলাপ শুরু হলো নিচু স্বরে।

'সামনের কোনও রাতে বড় খেলা,' মন্তব্য করল কালাহান।

'খেলা না কচু, বাতাসে সামান্য ধোঁয়া,' বলল মউরোস।

'হতবাক হবে গুগলি,' বলল সিম কর্নেলিস।

'হ্যাঁ, কিন্তু সে-ই আমাদের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়,' বলল কালাহান।

'ঝুঁকি নিতে হবে ওকে,' বলল মউরোস।

'তা ঠিক,' কেকে কামড় দিল সিম কর্নেলিস।

হাসল কালাহান। 'দারুণ কিছু করছি। এত মজা পাইনি বহু দিন।'

'বিপজ্জনক খাল বেয়ে আরও এগোল রামিন?' মউরোসের

কাছে জানতে চাইল সিম, চোখে নির্লজ্জ হাসি।

'তীরের কাছে,' মুচকি হাসল মউরোস, 'চারপাশে বিকট ভীতিকর চিৎকার। মরণের ঝুঁকি নিয়ে ভয়ঙ্কর পশুর সঙ্গে লড়ছে ছেলেটা। সত্যি বলতে, ওকে গভীর শ্রদ্ধা করতে লেগেছি!'

জানালা দিয়ে বাইরে চোখ যেতেই পরিচিত বিএমডাব্লিউ দেখল সিম। গাড়ির জানালা দিয়ে জুলজুল করে ওদেরকে দেখছে হুতুম-পেঁচা ব্রিয়াঁ ফুলজেন্স।

হাত তুলে ইশারা করল কালাহান, তারপর দুই আঙুলে টিপে ধরল জেনির নাক। দম নিতে না পেরে মুখ হাঁ করল জেনি, খুলে গেছে চোখ। ঝুঁকে ওর কপালে চুমু দিল কালাহান, মুচকি হেসে বলল, 'তিন ভাইকে অকূল সাগরে ভাসিয়ে চলে যাচ্ছ যাও, কিচ্ছু বলব না। হ্যালো বোলো মাসুদ, ভিটেলা আর ফুরেলা ভাইয়াকে। এবার কোল ছাড়ো।'

উঠে বসে চোখ কচলে নিল জেনি। জানালা দিয়ে দেখল বিএমডাব্লিউ গাড়ি। ঘুম-ঘুম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কারা?'

'ওদেরকে চেনো তুমি,' বলল কর্নেলিস, 'এবার সোজা চলে যাবে নেপলসে।'

বিল মিটিয়ে ক্যাফে ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা। গাড়ির পেছনের দরজা খুলে দিল কালাহান। ভেতরে ঢুকে ঠাণ্ডা হাওয়া টের পেল জেনি। শেয়ালের মত মুখ বাড়িয়ে ওর গালে চুমু দিল কালাহান, তারপর সিম কর্নেলিস ও জ্যাঁ মউরোস।

মেঝে থেকে ব্যাগ তুলে নিয়ে কালাহানের ঠোঁটে আঙুল স্পর্শ করে হেসে বলল জেনি, 'চিন্তা করবেন না, মাইট! পরের স্টেশন প্রেযো ফিসো বোর্ডিং হাউস অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্ট!'

তিন সেকেণ্ড পর ছিটকে রওনা হয়ে গেল বিএমডাব্লিউ।

নিজেদের গাড়িতে উঠল সিম, কালাহান ও মউরোস।

'কঠিন বাচ্চা,' পেছন সিট থেকে মন্তব্য করল কালাহান।

‘সন্দেহ কী,’ সায় দিল সিম। ‘কিছুক্ষণের ভেতর পটিয়ে ফেলল তোমাকে!’

‘মিআউওঁওঁওঁ!’ বেড়ালের ডাক দিল মউরোস।

পেছনের সিটে শুয়ে পড়ে বিড়বিড় করল কালাহান, ‘শালারা ঠিকই বলেছে!’

চট্ করে সিম কর্নেলিসকে দেখল মউরোস।

গম্ভীর সিম বলল, ‘আমাদের অসি শালা একা না, আমরাও ধরা খেয়েছি! কী করে যেন পটিয়ে ফেলে ওই মেয়ে!’

ছিয়াত্তর

সদর দরজার সামনে কুচকুচে কালো এক মুখ। আকারে এতই বড় লোকটা, যেন পর্বত। ছাতের কাছে মুখটা দেখে বললেন অনোরিয়া, ‘রানা পাঠিয়েছে?’

কালো মস্ত মুখে দেখা দিল সাদা দাঁতের দারুণ এক ঝিলিক। ‘শিওর, ম্যাম! বলেছে, আপনার চেয়ে সেরা খরগোশের স্টু কেউ কোনদিন রাঁধতে পারেনি, বাকি জীবনেও পারবে না!’ তার হাতে মাঝারি এক কালো স্যামসোনাইট সুটকেস।

দরজা ছেড়ে পিছিয়ে গেলেন অনোরিয়া, একটু খুশি।

দুলতে দুলতে ভেতরে ঢুকল কালো মানুষ। মেঝেতে সুটকেস রেখে চট্ করে দেখে নিল চারপাশ। নরম সুরে জিজ্ঞেস করল, ‘ম্যাম, কত দিনের বাড়ি?’

‘এ ঘর? চার শ’ বছরেরও বেশি। তবে পরে আরও বড় করে

নেয়া হয়েছে। চা বা কফি দেব? বা এক গ্লাস ওয়াইন?'

'চা খাব না। মা বলতো চা খেলে কালো হয়ে যাব।'

মুলোর দোকানটা আবারও খুলে সারি সারি সাদা মুলো দেখিয়ে বলল কালা-পাহাড়, 'কফি দিলেই হবে, ম্যাম। কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে, আমি আবার ওই জিনিস একটু বেশিই খাই।'

কিচেনে ঢুকে কাঁধের ওপর দিয়ে বললেন অনোরিয়া, 'তুমি কি আমেরিকান?'

'ঠিকই ধরেছেন, ম্যাম। এসেছি মেমফিস থেকে। জায়গাটা টেনেসির একাংশে। কিন্তু বেশ কয়েক বছর হলো ওই দেশে ফেরা হয়নি।' কিচেনে ঢুকে পড়েছে দৈত্য।

ঘুরে বললেন অনোরিয়া, 'ওই ''ম্যাম'' না বললেও হবে। আমার নাম অনোরিয়া। আর স্বামীর নাম পাজেরো।'

প্রায় হাঁটু পর্যন্ত নিচু হয়ে বাউ করে আবারও সোজা হলো দানব। 'পরিচিত হয়ে খুশি হয়েছি, অনোরিয়া। আমার নাম হাকলবেরি।'

মুচকি হাসলেন অনোরিয়া। তাতে হাসল দৈত্যও।

'আমার আসল নাম সোলোমন, কিন্তু ছোটবেলা থেকে সবাই বলে হাকলবেরি।'

মস্ত বড় কফি পট নামিয়ে টেবিল দেখিয়ে দিলেন অনোরিয়া। 'তোমরা ক'জন?'

বেতের চেয়ারে মড়মড় আওয়াজ তুলে বসল কালা-পাহাড়। খুশি খুশি সুরে বলল, 'রাত হতে না হতে আমরা হব পাঁচজন।'

'সবাই তোমরা এখানে ঘুমাবে?' চমকে গেছেন অনোরিয়া।

মাথা নেড়ে হাসল হাকলবেরি। 'না, ম্যাম। থাকব শুধু আমি। আরেকজন থাকবে উপত্যকার ওদিকে আপনার ছেলে আর ছেলে বউয়ের পাহারায়। অন্য তিনজন চক্কর কাটবে।'

'কোথায় চক্কর কাটবে?' কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন

অনোরিয়া।

জানালার দিকে হাতের ইশারা করল দৈত্য। 'চারপাশে। চারপাশ দেখতে হবে না, এত সুন্দর দেশ!'

হাসি মুখে দানবের উল্টো দিকের চেয়ারে বসলেন অনোরিয়া। 'হাকলবেরি, আমাদের দ্বীপ খুবই ছোট। তিনজন লোক ঘুরে বেড়াতে শুরু করলে, তৈরি হবে গুজব।'

মাথা নাড়ল কালা-পাহাড়। 'তা হবে না, মাম। আমরা কেন এসেছি তা ব্যাখ্যা দিতে পারব।'

'কী সেই ব্যাখ্যা?'

বিখ্যাত হাসি দিল হাকলবেরি। 'আমরা হচ্ছি পক্ষী বিশারদ আর গবেষক। আমাদের তো পাখি দেখতেই হবে।'

হো-হো করে হেসে ফেললেন অনোরিয়া।

তাতে মনে হলো মনে কষ্ট পেয়েছে কালো দৈত্য।

এবার বললেন অনোরিয়া, 'দ্বীপে পাখি নেই বললেই চলে। শিকারিরা রেখেছে নাকি! কিছু নড়লেই গুলি করে!'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল হাকলবেরি, 'আপনি ভুলে যাবেন না, ম্যাম, আমরা আবার জীবন উৎসর্গিত লোক। আমাদের ফাঁকি দিয়ে একটা পাখিও এদিক ওদিক যেতে পারবে না।'

'আর রাতে?' জানতে চাইলেন অনোরিয়া। 'রাত বিরেতেও ঘুরে বেড়াবে তোমরা?'

'সন্দেহ কী! রাতের পাখি দেখা সেরা কাজ!'

'আচ্ছা?'

আবারও দেখা গেল ঝিকমিকে, বড় বড় সাদা দাঁত। 'কিন্তু আমরা তখন দেখব পেঁচা। অনোরিয়া ম্যাম, আপনি নিশ্চিত থাকুন, এদিকে কোনও পাখি এলে আমরা ঠিকই দেখব।'

হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন অনোরিয়া। পট থেকে মগে ঢেলে

দিলেন কফি। 'নাও, বাবা। দুধ বা চিনি দেব?'

'না, ম্যাম। আমার মতই কালো হতে হবে কফি।'

এক চুমুক বিষের মত তরল গিলতে না গিলতে বেজে উঠল কিচেনের ফোন। ওটার রিসিভার কানে তুললেন অনোরিয়া।

যোগাযোগ করেছে নিডো।

কথা শুনে বললেন অনোরিয়া, 'না, আমারটা আমেরিকান। আমার দেয়া কফির মত কালো।' নিডোর কথায় হাসলেন। ফোন রেখে বললেন, 'আমার ছেলে বলেছে, এক চাইনিয গিয়ে হাজির হয়েছে ওর বাড়িতে।'

'ভিয়েতনামিয,' বলল হাকলবেরি, 'জওয়াং। ওর নাম আমরা দিয়েছি বুইড়া ভাম।'

'ভিয়েতনামিয পক্ষী পর্যবেক্ষক?' ভুরু কুঁচকে ফেললেন অনোরিয়া।

'অবশ্যই!' আবারও দেখা গেল ঝিকমিকে হাসি।

'অন্য তিনজন কোথা থেকে এসেছে?'

'দু'জন ব্রিটেন থেকে, অন্যজন নিউ যিল্যাণ্ড থেকে। খুবই ভাল লোক। নিরাপদে থাকবে আপনার পরিবার। আমরা বেশি এদিক ওদিক ঘুরব না। মাত্র কয়েক দিনের ব্যাপার। দেখবেন আমাদের দেখতেই পাবেন না।'

চিন্তিত মুখে মাথা দোলালেন অনোরিয়া। 'তোমরা থাকবে অতিথিদের কোয়ার্টারে। আমাদের সঙ্গেই খাবে। মনে করবে না বেড়াতে এসেছ। আগামীকাল খরগোশের স্টু করব। আর আজ রাতে বাচ্চা ভেড়ার মাংস।' চট্ করে আরেকটা চিন্তা এল তাঁর মনে। 'কিন্তু বলো তো, সবাইকে এসবের ব্যাখ্যা দেব কী করে? আমাদের এখানে আগে কোনও কালো আমেরিকান বেড়াতে আসেনি।'

'বলবেন আমি রেমারিকের পুরনো বন্ধু, কথা তো মিথ্যা না।'

আরেকবার মুলোর দোকান খুলল হাকলবেরি।

'ভাল করে চেনো তো ওকে?' সন্দেহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন অনোরিয়া।

'খুব ভাল করে, ম্যাম,' বলল কালা-পাহাড়। গম্ভীর হয়ে গেল চেহারা। 'ম্যাম, জেসমিনকেও চিনতাম। কখনও কখনও গিয়েছি নেপলসে, দু'দিন ছিলামও ওদের বাসায়, অনেক আদর-যত্ন করেছিল। খুবই ভাল মেয়ে ছিল ও... খুব ভাল। এতই ভাল, আজকাল এমন হয় না।'

কিচেনে নেমে এল থমথমে নীরবতা।

কিছুক্ষণ পর বললেন অনোরিয়া, 'যত দিন ইচ্ছে তুমি এ বাড়িতে থাকতে পারো, হাকলবেরি।'

পঁচাত্তর

'উনি কি খুব রেগে গেছেন?'

রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে জেনিকে একবার দেখে নিল পিটার লারসেন। পাশের সিটে কুঁকড়ে বসে আছে মেয়েটা। চোখে দুশ্চিন্তা, দ্বিধা ও ভয়। পেছনের সিটে পেঁচা ফুলজেন্স, কানে ইয়ারফোন। মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে দেখছে পেছনের দিক। বিশ মিনিট পর নেপলসে পৌঁছবে ওরা।

'যেমন তেমন রাগ নয়,' মন্তব্য করল পিটার।

আত্মরক্ষা করতে চাইল জেনি, 'কিন্তু কেন? আমি তো শুধু

সাহায্য করতে চাই। মানে... সবার জন্যে রাঁধব, হাঁড়িকুড়ি ধোয়া, কাপড়চোপড় পরিষ্কার করা... এসবই তো ভাল মেয়েরা...'

'আমরা আছি মস্ত ঝামেলায়, জেনি,' বড় করে দম নিল পিটার। 'যে-কোনও সময়ে যা খুশি হয়ে যাবে। কিন্তু সব ফেলে যেতে হলো তোমাকে উদ্ধার করতে। আবার তোমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল ওরা। গতবার তোমাকে দেখেছি মার্সেইল্‌স্‌-এ। পড়ে ছিলে বিছানায়। কী যে হাল ছিল, মুখে বলার নয়। ওই একই দশা হতো আবারও। আমরা যদি মাত্র পাঁচ মিনিট পর পৌঁছতাম এয়ারপোর্টে, আবার ফিরতে নরকে। সিম আর কালাহান জটিল মিশনে ব্যস্ত, এমন সময় ওদেরকে ডেকে নিয়েছে রানা। রামিনের কাছ থেকে সরিয়ে নিতে হয়েছে মউরোসকে। নিরাপত্তা হারিয়ে বসেছে রামিন, যখন তখন খুন হতো। এদিকে ফুলজেন্স আর আমাকে হেডকোয়ার্টার ছেড়ে যেতে হয়েছে তোমাকে আনতে। ওদিকে গোজোর সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে দুশ্চিন্তায়। আমরা তোমাকে রেমারিকের ওখানে পৌঁছে দেয়ার পর, ফোনে ওদেরকে জানিয়ে দেবে রানা, তুমি নিরাপদ। হ্যাঁ, সঙ্গত কারণেই ভয়ঙ্কর খেপেছে রানা তোমার ওপর।'

রেমারিকের প্রেযো ফিসো বোর্ডিং হাউস অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্ট-এর ছোট্ট এক ঘরে শুয়ে গভীর রাতেও বন্ধ হলো না জেনির অশ্রু। রানা ওকে বকা দিয়েছে বা রাগারাগি করেছে, সে জন্য কাঁদছে না। আসলে একটা কথাও বলেনি রানা। একবার চোখে চোখ রেখেই অন্য দিকে ফিরিয়ে নিয়েছে মুখ। ওই বিরক্ত চোখ দেখে ভীষণ কষ্ট পেয়েছে জেনি। দেরি না করে বলেছে, কাউকে বিরক্ত করবে না, আজই ফিরবে গোজো দ্বীপে।

কিন্তু মাথা নেড়েছে রানা। গম্ভীর কণ্ঠে বলেছে, 'চাইলেও আবার অনোরিয়া বা পাজেরোর ওপর তোমার দায়িত্ব চাপিয়ে

দিতে পারি না। তাঁদের নিজেদের জীবনেই অনেক দুঃখ। নতুন করে আরও ভোগাতে চাই না।'

নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকেছে জেনি। খাবারের জন্যে ডাক এলেও দরজা খোলেনি। বিছানায় চুপ করে উপুড় হয়ে কেঁদেছে। ওর মনে হয়েছে, দুঃখে ফেটে যাবে ওর ছোট্ট বুক। কোথায় উধাও হয়েছে ঘুম। মাঝরাত হওয়ার পর বিছানা ছেড়ে সরু ঘরে পায়চারি করতে লাগল। কিছুক্ষণ ভেবে ঠিক করল, ভোরে অন্য সবার আগেই বিছানা ছাড়বে, যে-কারণে এসেছে, সেই কাজে ব্যস্ত হবে।

ছিয়াত্তর

দক্ষ শিকারি কারাবিনিয়ারির পদস্থ অফিসার জেনারেল গামেল ব্যারেস্টে। খুবই ভালবাসে পাখি, হরিণ বা বুনো শুয়োরের পিছু নিতে। শিকার করেছে স্কটল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও বতসোয়ানা ল্যাণ্ডে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভালবাসে সেপ্টেম্বরের হালকা শীতে পাহাড়-টিলায় ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ডানপন্থী উকিল ম্যারিনো মিনিকুচ্চির সঙ্গে তিতির শিকারে যেতে। দু'জনই তারা রোম-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত; অভাব নেই নামডাক, টাকা বা ক্ষমতার।

প্রতি বছর সেপ্টেম্বরের পনেরো তারিখে ম্যারিনো মিনিকুচ্চির

রেঞ্জ-রোভার জিপে চেপে বসে দুই বন্ধু। গাড়িতে থাকে প্রচুর পরিমাণে সুস্বাদু খাবার, দামি ওয়াইন আর বছরের সেরা স্টাইলিশ হান্টিং পোশাক। যে যার বউয়ের গালে চুমু দিয়ে জিপ নিয়ে রওনা হয়ে যায় বহু দূরের পাহাড়ি কোনও নির্জন কেবিনের উদ্দেশে। প্রতি বছরই কোনও না কোনও বিলাসবহুল কেবিন ভাড়া করে তারা। কদাচিৎ দেখা হয়ে যায় অন্য শিকারির সঙ্গে, নয়তো একেবারে নিরিবিলি, নির্ঝঞ্ঝাট। নিজেরা রাঁধে পাস্তা, তৈরি করে পছন্দমত সস, সঙ্গে তো আছেই শুয়োরের মাংস, পনির ও দুনিয়া-সেরা ওয়াইন। জীবনে আর কী লাগে?

ভোরে সূর্য উঠবার একটু আগেই উঠবে, বন্দুক ও রাইফেল নিয়ে রওনা হবে পাহাড়-জঙ্গলে। ফিরবে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে। দু'জনই ডানপন্থী, দুপুরে থেমে খাওয়া শেষ করে ড্রিঙ্ক হাতে উদ্ধার করবে নশ্বর এই পৃথিবীকে। খুব কমই বিরক্ত করবে তাদের মোবাইল ফোনের অত্যাচার। এই নির্যাতনও সহ্য করতে হতো না, কিন্তু বেয়াড়া ওই যন্ত্র সঙ্গে নেবেই ম্যারিনো মিনিকুচ্চি। অবশ্য, বেশিরভাগ সময় পড়ে থাকে ওটা কেবিনেই।

কারাবিনিয়ারি জেনারেল গামেল ব্যারেস্টের অভ্যেস ভাল করেই জানে কর্নেল বার্নাদো গুগলি। আর এ কারণেই বিস্তারিতভাবে আলাপ করল কর্নেলিস ও কালাহানের সঙ্গে বসে।

সাতাত্তর

নিজেকে এমন এক জেনারেল বলে মনে হচ্ছে রানার, যে বসে

আছে নিরাপদ বাঙ্কারে। এদিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তার সৈনিকরা। নিজে তেমন কিছু করছে না, ফলে চাপ পড়ছে ওর স্নায়ুর ওপর। মউরোস ও রামিনের কাছ থেকে নিয়মিত ফোন পাচ্ছে। আলাপ করছে গোজোয় অনোরিয়া ও হাকলবেরির সঙ্গে। বুঝতে পারছে, চাইলেও ওখানে হামলা করতে পারবে না দ্য ডায়মণ্ড রিঙের কেউ।

এদিকে সোহেলের সঙ্গে কথা হয়েছে রানার।

ওরা ইউরোপে ওই দলের ওপর হামলার আগে যেন বাংলাদেশে তাদের বিরুদ্ধে কিছু না করে বিসিআই বা অন্যান্য সংস্থা।

বেশি দিন নেই, সব গুছিয়ে নেবে ওরা। সঠিক সময় ইতালিতে হাজির হবে রানা এজেন্সির ছেলেরা।

জেনি ইতালিতে চলে আসায় প্রথমে ওর ওপর খুব খেপে গিয়েছিল রানা, কিন্তু ঘটেছে অদ্ভুত এক ঘটনা। যেদিন মেয়েটা এল, তার পরদিন কালো এক ল্যান্সিয়া নিয়ে এল মাফিয়ার দুই লোক। রানার হাতে দিল দুটো এনভেলপ। লোকদুটো বিদায় নেয়ার পর প্রথম খাম থেকে কাগজ বের করে চোখ বোলাল রানা। ওটা এসেছে মৃত মাফিয়া ডন জিয়ান্না ক্যান্টারায়ার কনসিলিয়ারির কাছ থেকে।

লোকটা লিখেছে: গত কিছু দিন সংগঠনের অন্যান্য কাজ গুছিয়ে নেয়ার কারণে জিয়ান্না ক্যান্টারায়ার ডেস্কের দিকে চোখ দেয়ার সময় তার ছিল না। কিন্তু আজ ভোর থেকে ডনের ডেস্কের কাগজপত্র পড়ছি। আর সে কারণে মাফিয়া ডনের চিঠিটা পাঠিয়ে দিচ্ছে বিশ্বস্ত লোকের মারফতে।

দ্বিতীয় খাম থেকে চিঠি বের করল রানা।

তারিখ কয়েক দিন আগের। সেই দিনেই খুন হয়ে গিয়েছিল ক্যান্টারায়া। লোকটা লিখেছে:

উমো,

বলিনি, আমার সংগঠনের বয়স্ক এক লোক দেখা করেছিল, নাম বেনিটো ম্যাসোরো। এক দুর্গে ঢোকে চুরি করতে। সরিয়ে ফেলে দ্য ডায়মণ্ড রিঙের সর্বোচ্চ নেতার ডায়েরি। বুঝে ফেলে, ওটা শুধু ডায়েরি নয়, ওখানে আছে সংগঠনের অনেক জরুরি তথ্য। ডায়েরিটা নিয়ে বেরোতে পারবে না বুঝে লুকিয়ে রাখে দুর্গেরই লাইব্রেরিতে।

বিশ্বাস করিনি তার কথা। কয়েক দিন পর খোঁজ নিলাম, ওই এলাকায় আসলে কোনও দুর্গই নেই। সে মিথ্যা বলেছে, কাজেই শাস্তি দেব, কিন্তু আজ আবারও এল সে। ক্ষমা চাইল, দিয়ে ফেলেছে ভুল তথ্য। না, দ্য ডায়মণ্ড রিঙের নেতার ডায়েরি যে লাইব্রেরিতে আছে, ওটা কোনও দুর্গ নয়, বিশাল এলাকা নিয়ে মস্ত বড় এক ভিলা। নাম গুচ্চি ভিলা।

একতলায় লাইব্রেরিতে ঢুকে দরজা বরাবর সামনে গেলে ঘরের ওপাশের দেয়ালের বুকশেলফে আছে ওই ডায়েরি।

আশা করি কাজে আসবে এই তথ্য। আরও কিছু জানলে যোগাযোগ করব।

কাপো ক্যান্টারায়া।

দৈব কিছু বিশ্বাস করে না রানা, কিন্তু মনের ভেতর একবার ঘুরে গেছে চিন্তাটা: জেনি আসতেই যেন ভাল দিকে মোড় নিচ্ছে ঘটনা।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে প্রেযো ফিসো বোর্ডিং হাউস অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্ট আর ওদের সবার খাবার, পোশাক অন্যান্য সব কিছুর দায়িত্ব যেন তুলে নিয়েছে জেনি নিজ কাঁধে।

সেই ভোর থেকে পরিষ্কার করে কিচেন, তারপর একে একে অন্য সব ঘর হয়ে ওঠে ঝকঝকে তকতকে। বিকেলে জানালার কাঁচ ও মেঝে হয় নতুনের মত।

প্রথম প্রথম ওরা অবাক চোখে দেখছিল জেনিকে। কিন্তু তার পর বুঝে গেল, এসব কাজ নিজের বলে ধরে নিয়েছে মেয়েটা। ওকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হচ্ছে সবাই। কাজে নিখুঁত, ফাঁকি দেয়ার মনোভাব একেবারেই নেই বাচ্চা মেয়েটার।

পরের কয়েক দিনে রানা, রেমারিক, ফুলজেন্স, ফুরেলা বা পিটারের স্বাভাবিক জীবনের বড্ড জরুরি অংশ হয়ে উঠল জেনি। ওর সামনে কথা বলতে আর দ্বিধা থাকল না ওদের। আলাপ করল কীভাবে হামলা করবে, বা তাতে কোন্ ধরনের সমস্যা হবে। চুপচাপ ওদের পাশে থাকে জেনি। রানা টেলিফোনে কথা বললে বা কাউকে নির্দেশ দিলে কান পেতে শোনে। বাইরের কেউ মনে করত, পরিবেশ স্বাভাবিক। কিন্তু জেনি ঠিকই টের পাচ্ছে, ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে পরিস্থিতি। আগের চেয়ে অনেক সতর্ক হয়ে এই বাড়ি বা চারপাশ পাহারা দিচ্ছে রেমারিক ও ফুরেলা।

রানা একা বসে আছে, এমন সময় বাড়ির নিরাপত্তার প্রসঙ্গ তুলল জেনি।

মাথা দোলাল রানা। 'এমন অপারেশনে আগে যোগ দেয়নি ফুরেলা। ওর জানা নেই কী ঘটতে পারে। কিন্তু রেমারিক এসব ভাল করেই বোঝে। আমাদের মতই উত্তেজিত ও চিন্তিত সে।'

ডিনারে বসবে সবাই, এমন সময় এল কর্নেল গুগলির ফোন। নিজের ঘর থেকে কল রিসিভ করল রানা।

'না, ঠিক করেছি রিযাইন দেব না,' বলল গুগলি। রানার প্রতিক্রিয়া বুঝবার জন্য অপেক্ষা করল। বন্ধু চুপ করে আছে দেখে বলল, 'কারাবিনিয়ারির ভেতরে থাকলে অনেক কিছুই কানে আসবে। আর গামেল ব্যারেস্টে বিদায় নিলেও ওর মত অন্যদের ব্যাপারে কাজ করতে পারব। ঠিক করেছি, একটা লিস্টি করব ওর মত লোকগুলোর।'

'দীর্ঘ হবে ওই লিস্ট,' মন্তব্য করল রানা।

‘তা হবে। কিন্তু সঠিক সময়ে তাদের নরকে পাঠিয়ে দিতে পারব।’

‘নিজেকে আড়াল করে কীভাবে তথ্য বের করবে গামেলের পেট থেকে?’ জানতে চাইল রানা।

জেনারেলের শিকারের অভ্যেসের কথা বলল কর্নেল গুগলি। জানাল, সিম আর কালাহানকে নিয়ে স্থির করে নেবে কখন কাজে নামবে।

কিছুক্ষণ ভাবার পর বলল রানা, ‘তুমি পাবে ওই দরকারী ড্রাগসগুলো?’

‘পাব। উপযুক্ত লোকের সঙ্গে কথা হয়েছে। ওকে চেনো তুমি। গগল। মাঝে থাকবে আরও দুই লোক।’

‘গগলের দেয়া জিনিস ঠিকই কাজ করবে।’

‘ভুল যাতে না হয়, তাই জেনারেলের বয়স আর মেডিকেল হিস্টোরি গগলকে জানিয়ে দিয়েছি।’

‘গুড,’ বলল রানা, ‘বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে রোমে ফেরার আগেই যা করার করতে হবে।’

‘সহসা ফিরবে না,’ বলল গুগলি, ‘আর ফিরলেও ব্যাক-আপ প্ল্যান রেখেছি। মাঝ রাস্তায় কিডন্যাপ করব। পরে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনায় মরবে। পাহাড়ি ওই রাস্তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। বিশেষ করে রাতে।’

নানান দিক ভাবছে রানা। ওর জানা আছে, কর্নেল বার্নাদো গুগলির মগজ ক্ষুরের মতই ধারাল। তা ছাড়া, এসব বিষয়ে সত্যিকারের দক্ষ সিম কর্নেলিস ও অসি কালাহান। জানতে চাইল রানা, ‘তোমাদের ভেতর কে ফেলবে ওই ছোট্ট বোমা?’

‘এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে,’ বলল গুগলি। ‘ওই কাজ করার জন্যে ভাড়াটে লোক নেব ভেবেছি, কিন্তু আপত্তি তুলেছে সিম আর কালাহান। ওদের কথা হচ্ছে, নতুন কাউকে এসবে না

জড়ানোই ভাল।'

'ওরা ঠিকই বলেছে।'

'ঠিক আছে। বলেছি, যাতে কাজটা করে মউরোস। কিন্তু মানা করল ওরা। তাতে এই পর্যায়ে নষ্ট হবে রামিনের কাভার।'

'ওরা ঠিক কথাই বলেছে,' বলল রানা, 'রামিন পৌঁছে গেছে দরজার কাছে। ...তা হলে ওই কাজ কে করবে?'

'আমি করতে চেয়েছি, কিন্তু হাসল ওরা। আলাপ করে ঠিক করল, ওই দায়িত্ব নেবে কালাহান। ছোট ফ্র্যাগমেণ্ট গ্রেনেড ব্যবহার করবে। কম আওয়াজ হবে, কিন্তু কাজ করবে ঠিকভাবে।'

মৃদু হাসল রানা। 'ঠিক আছে। ওই কাজে তোমার চেয়ে অনেক দক্ষ কালাহান। কিন্তু সঠিক সময় বুঝবে কী করে?'

'তাতে সমস্যা নেই। আজ বিকেলে পাহাড়ে যাব সিম আর আমি। পৌঁছতে দু'ঘণ্টা, চোখ রাখব ওই কেবিনে। রাত আটটার সময় গ্রেনেড ফেলবে কালাহান, তারপর ফিরবে আমাদের কাছে। আমার কাছে মোবাইল ফোন থাকবে। বন্ধুর সঙ্গে রোমে ব্যারেস্টে ফিরতে চাইলে, সঠিক জায়গায় রোড ব্লক করবে সিম। ওর পরনে থাকবে কারাবিনিয়ারির ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্ম। রেঞ্জ-রোভারের পিছু নেব আমরা। চিন্তা কোরো না, রানা। সব গুছিয়ে নিয়েছে সিম আর কালাহান। মনে হলো খুব ফুর্তিতে আছে ওরা।'

'সন্দেহ কী,' একটু হতাশা নিয়ে বলল রানা, 'এদিকে আমার কাজ বুড়ির মত ফোনের কাছে বসে থাকা— এক দিন বাড়ি ফিরবে ছেলে। ...ঠিক আছে, বার্নাদো, যোগাযোগ রেখো। গুড লাক।'

আটাত্তর

উকিল ম্যারিনো মিনিকুচ্চির মনে হলো, হরিণকে বোকা বানিয়ে দেয়ার জন্যে তৈরি গামেলের হ্যাট সত্যিই হাস্যকর। অবশ্য এ বিষয়ে কিছু বলল না সে। জীবনের বেশিরভাগ জিনিসের বিষয়ে অত্যন্ত স্পর্শকাতর জেনারেল ব্যারেস্টে। সবসময় বাছাই করে পোশাক পরে সে। আপাতত দু'জনের পরনে টুইড কোট, প্যান্টের শেষ অংশ গুঁজে রেখেছে গোড়ালির মোজার ভেতর।

লাখে লাখে ইতালীয় শিকারির চেয়ে অনেক ওপরের স্তরের মানুষ বলে নিজেদের মনে করে তারা। আর এ কারণেই তাদের অস্ত্র অনেক বেশি দামি। জেনারেল গামেল ব্যারেস্টের হাতে বারো বোরের সাইড-বাই-সাইড হল্যাণ্ড অ্যাণ্ড হল্যাণ্ড শটগান। বারো বছর হতেই জন্মদিনে তার বাবা ওই বন্দুক দিয়েছিল তাকে। সুযোগ পেলে সবাইকে শুনিয়ে বেড়ায়, আজকাল আর এসব বন্দুক পাওয়াই যায় না। আর দাম? লাখ ডলারেরও বেশি। আর এদিকে দশ বছর আগে লণ্ডনে পার্ডির শো-রুমে গিয়েছিল মিনিকুচ্চি। তখনই অর্ডার করেছে ওই গানস্মিথদের সেরা মডেলের বন্দুক। পাঁচ বছর অপেক্ষা করার পর গর্ব করে সবাইকে বলেছে, হ্যাঁ, সত্যিই পেয়ে গেছে সে পৃথিবীর সবচেয়ে নামকরা দোনলা ওভার-আণ্ডার বন্দুক পার্ডি।

আজ দুই শিকারির জন্যে ভাল দিন নয়। যেন দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে তিতিরের দল। সন্ধ্যার আবছা আলোয় কেবিনের দিকে ফিরতি পথ ধরল ম্যারিনো মিনিকুচ্চি ও গামেল ব্যারেস্টে।

কাঁধে চামড়ার ব্যাগ, ভেতরে মাত্র চারটে তিতির। তা যাক, আবহাওয়া অফিস বলেছে, ঝলমলে দিন হবে আগামীকাল। কেবিনের দিকে যাওয়ার পথে কয়েন দিয়ে টস্ করল তারা। হেরে গেল গামেল ব্যারেস্টে। ডিনার রাঁধতে হবে তাকে। তাতে তার আপত্তি নেই। নিজেকে সেরা রাঁধুনি বলে বড়াই করে সে; আর সেটা একেবারে অসত্যও নয়।

আঁধার নামতে না নামতেই কেবিনে পৌঁছল তারা। ছোট কেবিন, কিন্তু অত্যন্ত বিলাসবহুল। ভেতরে দুটো বেডরুম, দুটো টয়লেট, আধুনিক কিচেন। ছোট ডাইনিং রুম বা কমপ্যাক্ট লাউঞ্জে বড়সড় পাথুরে ফায়ারপ্লেস। দক্ষিণমুখী প্যাশিও।

শিকারিদের পোশাক পাল্টে গরম পানির শাওয়ার নিল তারা, তারপর বিশেষ ডিযাইনারের তৈরি উষ্ণ ট্র্যাকসুট পরে বেরিয়ে এল বাথরুম ছেড়ে। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালল গামেল, আর ওদিকে নিগ্রোনিয মিক্স করল ম্যারিনো। কেবিনে সরকারী বিদ্যুতের সংযোগ নেই। বাতি, তাপ, স্টোভ ও ফ্রিয চলছে বোতলজাত গ্যাসে।

ফায়ারপ্লেসে পুট-পুট আওয়াজ তুলছে কাঠ-পোড়ানো আগুন। ওটার সামনে বসে পড়ল ম্যারিনো মিনিকুচ্চি। ওদিকে কিচেনে রাতের খাবার রাঁধার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল গামেল ব্যারেস্টে।

হাঁড়ি ভরা পাস্তা টেবিলে রেখেছে জেনারেল, এমন সময় ম্যান্টলপিসে বেজে উঠল মোবাইল ফোন।

বিড়বিড় করে অভিশাপ দিয়ে বাটন টিপে মোবাইল ফোন কানে তুলল মিনিকুচ্চি। ধমকে উঠল, 'কী!' কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডে ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার চেহারা।

তাড়াতাড়ি তার পাশে এসে জিজ্ঞেস করল জেনারেল ব্যারেস্টে, 'কী হয়েছে, কে ফোন করল, ম্যারিনো?'

হাত তুলে ইশারা করে ফোনে বলল উকিল, 'ঠিক জানো

তো? ...হ্যাঁ। গুড। না, আমি জানব কী করে... শান্ত হও। দাঁড়াও, একমিনিট।' জেনারেল ব্যারেস্টের দিকে ফিরল সে। 'পনেরো মিনিট আগে আমার বাড়িতে বোমা মেরেছে কে যেন।'

'হায় ঈশ্বর! কেউ আহত হয়নি তো!'

'না, বাড়িতে ছিল শুধু অ্যাগনেস। জায়গায় জায়গায় পুড়ে গেছে সদর দরজা। ভেঙে গেছে একটা জানালার কাঁচ। এক দৌড়ে পাশেই আমার ছেলের বাড়িতে গেছে অ্যাগনেস। এখন ওখানেই আছে আমার ছেলের বউ আর নাতনি। দেরি না করে পুলিশে যোগাযোগ করেছে এবেল। তারপর ফিরে গেছে বাড়িতে।'

এবার দায়িত্ব বুঝে নিল জেনারেল ব্যারেস্টে। ফোন নিয়ে অ্যাগনেসকে বলল, দেরি না করে কারাবিনিয়ারি হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করুক এবেল। এবার ফোন কেটে যোগাযোগ করল কারাবিনিয়ারি হেডকোয়ার্টারে, নির্দেশ দিল কী করতে হবে। কাজটা শেষ করে কনুই ধরে বন্ধুকে নিয়ে গেল ডাইনিং টেবিলে। 'আমরা ফিরতে পারি। কিন্তু আগে ডিনারটা সেরে নেয়া উচিত। কারাবিনিয়ারির ওরা দক্ষ। আমাদের বম স্কোয়াডের চিফ, কর্নেল ফিন ব্যক্তিগতভাবে দেখবে ব্যাপারটা। সাইট থেকে যোগাযোগ করবে সে। কপাল ভাল, কেউ আহত হয়নি।'

ধপ্ করে চেয়ারে বসল ম্যারিনো মিনিকুচ্চি, আর তার বাসনে স্তূপের মত পাস্তা দিল ব্যারেস্টে। পাশেই রাখল ওয়াইন। 'বলো তো, কে করতে পারে এ কাজ?' জিজ্ঞেস করল নরম সুরে।

মাথা নাড়ল মিনিকুচ্চি। 'জানি না। কিন্তু তুমি, তো জানো, অনেকেই হিংসা করে, শত্রু ভাবে। এসব ভাবলে চলে না।'

'তা ঠিক,' সায় দিল ব্যারেস্টে। 'কিন্তু ওই কাজ যে বা যারা করেছে, তাকে বা তাদেরকে ভুগতে হবে। বোধহয় জানে না আমরা পরস্পরের বন্ধু। আর তাই শাস্তি পেতে হবে।'

চুপচাপ খেতে বসল তারা। কিছুক্ষণ পর আবারও বেজে উঠল ফোন। বাড়ি থেকে কল করেছে মিনিকুচ্চির ছেলে এবেল। জানাল, ওই বোমা ছিল ছোট আকারের কোনও গ্রেনেড। বড় কোনও ক্ষতি হয়নি। এলাকা ভরে গেছে কারাবিনিয়ারি ও পুলিশের লোকে। তার পাশেই আছে এক কর্নেল। সে কথা বলতে চাইছে জেনারেল ব্যারেস্টের সঙ্গে।

মিনিকুচ্চি বন্ধুর হাতে ফোন ধরিয়ে দিয়ে মনোযোগ দিল খাবারে। এদিকে নীরবে শুনল জেনারেল, তারপর একের পর এক প্রশ্ন তুলল। জবাব শুনে নতুন কয়েকটা নির্দেশনা দিল।

মিনিকুচ্চির একটু খারাপই লাগল। দেশের এখানে-ওখানে প্রতিদিন বিস্ফোরিত হচ্ছে শক্তিশালী বোমা, সে তুলনায় এই ঘটনা আসলে সামান্য। কিন্তু মাথার ঘায়ে পাগল এক কুকুরের মত সব ফেলে ছুটতে হচ্ছে এক কর্নেলকে।

আবারও তাকে ফোন দেয়ার পর ছেলেকে বলল মিনিকুচ্চি, আগামী তিন ঘণ্টার ভেতর রোমে পৌঁছবে সে।

মিনিকুচ্চি ফোন রাখার পর তাকে বলল জেনারেল ব্যারেস্টে, 'অবশ্যই বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে এই বোমার ঘটনাকে। বন্ধু আছেই তো এ-কারণে।' চট্ করে হাতঘড়ি দেখে নিল সে। 'আধঘণ্টার ভেতর রওনা হয়ে যাব আমরা।'

হাত ওপরে তুলে মানা করল মিনিকুচ্চি। 'না, বাদ দাও। একাই যেতে পারব। ছুটি বাদ দিয়ে যেতে হবে না তোমাকে। ঈশ্বর জানেন, ছুটিই নাও না তুমি! বড় কিছু ঘটেনি। আর যা দরকার তার সবই করেছ। আমার যদিও ফিরতেই হবে, নইলে খেপে বোম হবে অ্যাগনেস। অবশ্য, কালই ফিরে আসতে পারব। এক দিন বা দু'দিন।' মোবাইল ফোনের দিকে তাকাল সে। 'আমার মোবাইলটা তোমার কাছে রেখে যাব, সেক্ষেত্রে যোগাযোগ করতে পারবে। কিন্তু আবারও বলছি, আমার জন্যে

নষ্ট করার দরকার নেই তোমার ছুটি।'

আরও কয়েক মিনিট চাপাচাপি করল জেনারেল ব্যারেস্টে, তারপর হাল ছেড়ে দিল।

'যাক,' বলল মিনিকুচ্চি, 'অ্যাগনেস ঠিক করেছিল বেড়াতে যাবে ফ্লোরেন্সে বোনের বাড়িতে। কাজেই ধরে নিতে পারো, দু'দিনের ভেতর ফিরব। বড়জোর বুধবার পর্যন্ত। দোস্ত, আমার জন্যে জঙ্গলে দু'চারটে শিকার রেখো।'

কথা ফুরিয়ে গেল তাদের। আধঘণ্টা পর আলিঙ্গন শেষে রেঞ্জ-রোভারের ড্রাইভিং সিটে চেপে বসল ম্যারিনো মিনিকুচ্চি। দুই মিনিট পেরোবার আগেই অন্ধকারে হারিয়ে গেল তার জিপ।

আবারও কেবিনে ফিরল জেনারেল ব্যারেস্টে। বাসন ও হাঁড়িকুঁড়ি ধুয়ে রেখে দিল কাবার্ডে। কনিয়্যাকের গ্লাস হাতে বসল ফায়ারপ্লেসের সামনে। কিন্তু কয়েক চুমুক দিতেই বেদম ঘুম এল। পাহাড়ি এলাকায় সারা দিন হেঁটে ক্লান্ত। তার ওপর জাদু করছে পাহাড়ি হাওয়া। ম্যান্টলপিস থেকে মোবাইল ফোন নিয়ে বেডরুমে ঢুকে যন্ত্রটা রাখল বেডসাইড টেবিলে। পোশাক ছেড়ে পরে নিল সিল্কের পায়জামা। বিছানায় শুয়ে পড়ার তিন মিনিট পর গুরুগম্ভীর আওয়াজে ডাকতে শুরু করল তার নাক।

উনআশি

রাত দশটার পর ফোন করল রামিন রেযা।

প্রেযো ফিসো বোর্ডিং হাউস অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্ট-এ একটু আগে ডিনার শেষ করেছে ওরা সবাই, প্রায় সবার হাতে এসপ্রেসো বা

কমলার গন্ধ মেশানো মদ।

একটু আগে ঘুমাতে চলে গেছে জেনি।

কল রিসিভ করল রানা। কথা হলো সংক্ষেপে।

আগামী রবিবার রাতে জমায়েত হবে শয়তান পূজারীরা। ওই সভা কোথায় হবে, তা জানে না রামিন। শুধু এটা জানতে পেরেছে, গাড়িতে করে একঘণ্টায় পৌঁছে যাওয়া যায় ওখানে। একা যেতে হবে ওকে। অস্ত্র বা ট্র্যান্সমিটারের খোঁজে সার্চ করা হবে। ডাইনী মেয়েলোকটাকে রামিন কথা দিয়েছে, ওই সভায় যাওয়ার আগেই অর্ধেক টাকা পরিশোধ করবে, বাকি টাকা পরের দিন।

রামিনকে বলল রানা, কয়েকটা প্ল্যান নিয়ে কাজ করছে ওরা। অবশ্য, কয়েক ঘণ্টা পর জেনারেল ব্যারেস্টের পেট থেকে কী খবর বের করবে গুগলি, সে জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আগামীকাল সকালে রামিনের সঙ্গে কথা বলবে।

ফোন রেখে জানাল রানা, 'ওই সভা কোথায় হবে, তা জানা খুব জরুরি। নইলে বাধ্য হয়ে পিছু নিতে হবে রামিন বা ওই মেয়ের। পিশাচ সাধকরা খুব সতর্ক থাকবে। কঠিন হবে তাদের ওপর হামলা করা।'

রানার পাশেই আছে পিটার। টেবিলে ইয়ারফোন কানে ফুলজেন্স। স্ট্র্যাটেজি নিয়ে মাথা-ব্যথা নেই তার। বার-এর আরেক দিকে রেমারিক, পরিষ্কার করছে একটা গ্লাস। সে বলল, 'অস্ত্র ছাড়া ওখানে যাওয়া উচিত বলে মনে করছি না। এ ছাড়া, পিঠের দিকে কারও নজর থাকা জরুরি।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'যুদ্ধের ময়দানে ব্যস্ত হয়ে ওই একই কাজ করতে দেখেছি তোমাকে।'

মুচকি হাসল রেমারিক।

আধঘণ্টা পর দুই পেগ শেষ হয়েছে, এমন সময় আবারও

বাজল ফোন। এবার কর্নেল বার্নাদো গুগলি।

ভাল করেই জানেন, মোবাইল ফোনে বিস্তারিত আলাপ মস্ত ভুল। শুধু বললেন, 'এখন পর্যন্ত সব ঠিক। আমাদের বন্ধু চলে গেছে। নিভে গেছে বাতি। একটু পর রওনা হবে ছেলেরা। কাজ শেষ হলে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব। আর তারপর রওনা হব।'

'এখন মূল কথা, রবিবার রাতে কোথায় হবে ওই সভা,' বলল রানা। 'জায়গাটা চেনা দরকার।'

'বুঝলাম,' জবাবে বললেন গুগলি।

ক্লিক আওয়াজ শুনল রানা। ফোন রেখে গ্লাসে চুমুক দিল। একবার হাতঘড়ি দেখে নিয়ে বলল, 'কাজে নেমে পড়েছে সিম আর অসি। প্ল্যান মত বাড়ি ফিরছে উকিল। নতুন তথ্য পেলে ফোন করবে গুগলি। তাতে লাগবে কমপক্ষে একঘণ্টা।'

ঘুম তাড়াতে স্ট্রেগার বোতল হাতে তুলে নিল রেমারিক।

আশি

সামান্য শব্দে চট্ করে ভেঙে যায় জেনারেল গামেল ব্যারেস্টের ঘুম, কিন্তু আজ একটু আওয়াজও শুনল না। অবশ্য, একটু পর চোখের পাতার ওপর আলো পড়তে চটে গেল ঘুম। চোখ মেলল। কিন্তু উজ্জ্বল সাদা কিরণে দেখতে পেল না কিছুই। মাথা কাত করে ফেলল, মনে এল দ্বিধা। সচেতন হয়ে গেছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না কোথায় আছে। আলো সরে যেতে বুঝল, ওটা টর্চের রশ্মি।

ঘুরে-ফিরে নড়ছে আলো। পড়ল কাঠের দেয়ালে। তখনই জেনারেল বুঝল, পাহাড়ি কেবিনে নিজের বিছানায় শুয়ে আছে সে। ধড়মড় করে উঠে বসল। পরিষ্কার হচ্ছে মগজ। মনে পড়ল, রোমে যাবে বলে রওনা হয়ে গিয়েছিল মিনিকুচ্চি। আবারও বোধহয় ফিরেছে। দ্বিধা নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ম্যারিনো... তুমি?'

আলো আবারও ধাঁধিয়ে দিল তার চোখ। বাধ্য হয়ে চোখের পাতা বুজে ফেলল জেনারেল।

'না, ম্যারিনো মিনিকুচ্চি নই,' বলল গম্ভীর এক কণ্ঠ। 'চুপ করে বসে থাকো। মাথার দিকে তাক করা আছে পিস্তল।'

মাথা সরিয়ে নিল জেনারেল ব্যারেস্টে। ভয় পেয়েছে। বড় করে দম নিল। কাঁপা স্বরে বলল, 'তুমি কে?'

জবাবে এল ধমক, 'একদম নড়বে না!'

মগজ খেলাতে চাইল জেনারেল।

এরা চোর?

এদের অত্যাচার প্রাচীনকাল থেকেই চলছে পাহাড়ে। গত বছর এখান থেকে দক্ষিণে দুটো ডাকাতিও হয়েছিল।

'আমি কারাবিনিয়ারির জেনারেল,' রাগতকণ্ঠে বলল গামেল ব্যারেস্টে, 'কোথাও পালাতে পারবে না।'

'চুপ,' বলল লোকটা, অদ্ভুত সুরে বলছে ইতালীয় ভাষা।

কোন্ এলাকার লোক বুঝতে চাইছে গামেল, এমন সময় কেবিনে ঢুকল আরেক লোক। সঙ্গে আলো। ওই প্রভা নরম।

টর্চ সরে যেতে চোখ মেলল জেনারেল।

দুই চোরের পরনে কালো পোশাক। বয়স ত্রিশের মত হবে। একজনের মাথা জুড়ে টাক, গোল মুখ। একহাতে সাইলেন্সার ফিট করা কালো এক পিস্তল, অন্য হাতে টর্চ। পিস্তলের মাযল তাক করা গামেলের কপাল বরাবর। অন্য লোকটার চুল একটু কোঁকড়া। একহাতে গ্যাস ল্যাম্প। ওটা চিনল গামেল। নিয়ে

আসা হয়েছে কিচেন থেকে। লোকটার অন্য হাতে ক্যানভাসের ব্যাগ। দু'জনের নড়াচড়া বা চেহারা গামেলকে বুঝিয়ে দিল, এরা পেশাদার লোক।

অদ্ভুত, কিন্তু এরা পেশাদার বলেই একটু স্বস্তি পেল সে। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'কেবিনে টাকা বা দামি কিছুই নেই।' তখনই মনে পড়ল হল্যাণ্ড অ্যাণ্ড হল্যাণ্ড বন্দুকের কথা। ওটার দাম এক লাখ ডলারেরও বেশি। একটু দূরের দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা। বামহাত থেকে এক গজ দূরেই। চট্ করে ওদিকে তাকাল জেনারেল।

'ওটার কথা ভুলে যাও, জেনারেল,' বলল টেকো। এবার ইংরেজিতে বলল, 'ঠিক আছে, এসো, কাজ শেষ করি।'

ইংরেজি শুনে হড়বড় করে বলল জেনারেল ব্যারেস্টে, 'কারা তোমরা? কী চাও আমার কাছে?'

বিছানার কাছে থামল বাক্স আকৃতির টেকো। অন্যজনের হাত থেকে নিয়ে বেডসাইড টেবিলে রাখল ল্যাম্প।

তার সঙ্গী মেঝেতে ফেলল ক্যানভাসের ব্যাগ।

টেকো চলে গেল বিছানার আরেক পাশে। জেনারেলের চোখ থেকে দেড় ফুট দূরে স্থির হলো সাইলেন্সারের মাযল।

হেডবোর্ডে পিঠ ঠেকিয়ে দিল জেনারেল। বুক কাঁপছে ভীষণ ভয়ে। যদিও চেহারায় তা প্রকাশ পেতে দিল না।

সহজ সুরে বলল টেকো, 'তুমি সহযোগিতা করলে কিছুই বলব না, নইলে মরবে।' স্বাভাবিক বাচনভঙ্গি শুনে মনে হবে, পানির কল মেরামত করতে এসেছে মিস্ত্রি।

মুখ খুলতে চাইল জেনারেল ব্যারেস্টে, কিন্তু তখনই তার কপালের এক ইঞ্চি দূরে থমকে গেল সাইলেন্সারের নল। গামেল খেয়াল করল, কালো গ্লাভ্স্ পরা হাত একেবারেই নিষ্কম্প।

কঠিন হয়ে উঠল টেকোর কণ্ঠ: 'মুখ বন্ধ। যা বলব, তাই

করবে। নইলে মরবে।'

মুখ বন্ধ করে বড় একটা ঢোক গিলল জেনারেল ব্যারেস্টে। এক গজ দূরে পিছিয়ে গেল পিস্তল।

মেঝে থেকে প্লাস্টিকের ব্যাগ তুলে ওখান থেকে কটন্ উল নিল টেকোর সঙ্গী। এরপর বড় এক রোল কালো মাস্কিং টেপ। ইংরেজিতে বলল, 'দুই কব্জি এক করে বাড়িয়ে দাও।'

দ্বিধা এল জেনারেল ব্যারেস্টের মনে।

তখনই আবারও কপালের কাছে চলে এল পিস্তল। দু'কব্জি জড় করে সামনে বাড়িয়ে দিল সে। মৃদু কাঁপছে হাত।

বিছানার সামনে থামল লোকটা, কটন উল থেকে ছিঁড়ে নিল এক ফালি, জেনারেলের দুই কব্জির মাঝে রাখল ওটা।

অবাক চোখে কাজ দেখছে ব্যারেস্টে।

মাস্কিং টেপ থেকে লম্বা একাংশ ছিঁড়ে নিল লোকটা। কয়েকবার পেঁচিয়ে আটকে দিল ব্যারেস্টের কব্জি। একই কাজ করল পায়ের গোড়ালিতে। হাত বা পা নাড়ার উপায় থাকল না।

পিছিয়ে গেল পিস্তলঅলা লোকটা। অস্ত্রের নল থেকে খুলল সাইলেন্সার, রেখে দিল চামড়ার কালো জ্যাকেটের পকেটে। বাম কাঁধের হোলস্টারে ঘুমাতে গেল পিস্তল। এবার চাদর ও কম্বল সরিয়ে জেনারেলের সিল্কের পায়জামা দেখল সে।

ব্যাগ থেকে পুরু কয়েক রোল রাবার-ফোম বের করল টেকোর সঙ্গী। কাজ করছে নীরবে। জেনারেলের বাম উরু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত জড়িয়ে দিল রাবার-ফোম দিয়ে। একই কাজ করা হলো ডান পায়ে। এরপর দুই হাতেও। কব্জি থেকে বগল পর্যন্ত ঢাকা পড়ল রাবার-ফোমের নীচে।

ভীষণ ভয় তো আছেই, তার চেয়েও জেনারেল বেশি বোধ করছে কৌতূহল। জিজ্ঞেস করতে হাঁ করল, কিন্তু পরক্ষণে টেকোর ঠাণ্ডা, নিষ্ঠুর চোখ দেখে খপ্ করে বন্ধ করল মুখ।

রাবার-ফোম কেটে জেনারেলের মাথা ও ঘাড়ে পেঁচিয়ে দিল অন্য লোকটা। চোখের ওপরের কপালে কয়েকবার জড়ানো হলো টেপ। এরপর কপালের টেপের সঙ্গে যুক্ত হলো কব্জি ও গোড়ালির টেপ। সামান্য নড়ারও সাধ্য থাকল না ব্যারেস্টের।

পিছিয়ে গেল লোকটা। নিজ কীর্তি দেখে বলল, 'মনে হচ্ছে কাজ ফ্রান্সের স্বয়ং মিশেলিন টায়ার কোম্পানির দুই ভাই আঁদ্রে আর এডোয়ার্ডের।'

মাথা দোলাল টেকো। 'ঠিক, এবার আভনে তুলে দিলেই হয়ে উঠবে মোটা চাকা।'

খোলা দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল লোক দু'জন। কয়েক সেকেণ্ড পর জেনারেল গামেল ব্যারেস্টে শুনল টেকোর কথা: 'হ্যাঁ, এবার নাও তোমার মাল। কিছু লাগলে হাঁক ছেড়ো।'

পেরিয়ে গেল দশ সেকেণ্ড, আর এই সময়ে নিজেকে শান্ত করতে চাইল জেনারেল। একটু সফলও হলো। আর তখনই এল তৃতীয় লোকটা। গায়ে কালো পোশাক। হাতে কালো গ্লাভস।

প্রথমে আবছা আলোয় তাকে চিনল না গামেল ব্যারেস্টে। কিন্তু লোকটা চেয়ার টেনে সামনে বসতেই চমকে গেল। হতভম্ব হয়ে বলল, 'গুগলি! হায়, ঈশ্বর! কী হচ্ছে এসব?'

দীর্ঘ সময় তার চোখে চেয়ে রইলেন কর্নেল বার্নাদো গুগলি, তারপর সামনে ঝুঁকে বসলেন। কথা বললেন খুব নিচু স্বরে, সে কণ্ঠে ভীষণ ঘৃণা: 'মেজর কোসিমা পাধানি। ওর ওপর প্যাথোলজিস্টের রিপোর্ট পড়েছ। ভাল করেই জানো, খুন করার আগে কী করেছ ওর ওপর। আমার ধারণা: আগামীকাল ওই একই প্যাথোলজিস্ট মন দিয়ে পরীক্ষা করবে তোমার লাশটাও। কারাবিনিয়ারির জেনারেল, কাজেই মরলে বাদ দেয়া হবে না অটোপসি। কিন্তু তোমার দেহে নির্যাতনের চিহ্ন দেখবে না কেউ। এমন কী আঁচড়ও না।' জেনারেল ব্যারেস্টের হাত-পা ও ঘাড়

দেখালেন গুগলি। 'যতই ছটফট করো, আঘাতের ছাপ পাবে না প্যাথোলজিস্ট।'

'পকেট থেকে ছোট প্লাস্টিকের বাক্স বের করলেন কর্নেল গুগলি। ওটা খুলে দেখালেন ভেতরের জিনিস। ছোট একটা সিরিঞ্জ, ওটাকে আটকে রেখেছে পুরু ইলাস্টিক ব্যাণ্ড। পাশেই পানির মত স্বচ্ছ প্লাস্টিকের বোতল। তাতে সাদা সব বড়ি। ব্যাখ্যা দিলেন গুগলি, 'এগুলো অ্যামিওডারোন। প্রতিটা এক হাজার সি.সি.-র। মুখে খেলে একটা বড়ি তোমাকে দেবে ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। আর সিরিঞ্জের ভেতরে ডিগোক্সিন। ইনজেক্ট করলে একই কাজ করবে। কেউ বুঝবে না কী হয়েছে। কোনও চিহ্ন ছাড়াই দেহে মিশে যাবে ড্রাগ্‌স্। সন্দেহ করবে না কেউ। ছয় বছর আগে মৃদু হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। তিন বছর পর বড় একটা। আট মাস ছুটি ভোগ করেছ। ডাক্তাররা বলে দিয়েছিল, যেন অবসর নাও। কিন্তু বন্ধুদের চাপে রয়ে গেলে কারাবিনিয়ারিতে। এবার আর কষ্ট করে অবসর নিতে হবে না। তুমি জানতে চাইলে বলব, বড়ি মুখে নেয়াই তোমার জন্য ভাল। নইলে দক্ষ কোনও প্যাথোলজিস্ট হয়তো দেখে ফেলবে সুঁইয়ের দাগ। যদিও ইঞ্জেক্ট করব আসলে তোমার গুহ্যদ্বারের ভেতরে।'

চোখ বুজে ফেলল জেনারেল গামেল ব্যারেস্টে। অস্থির লাগছে। পাঁজরে ধুপ-ধাপ বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। আবারও শুনল কর্নেল গুগলির কণ্ঠ: 'জানতে নিজের ছোট ভাইয়ের মত দেখি পাধানিকে। চতুর লোক, কিন্তু করে ফেললে মস্ত ভুল। ভেবেছিলে কেউ বুঝবে না, তাই না?'

চোখ মেলল জেনারেল ব্যারেস্টে, চেহারা দেখে মনে হলো অনুভব করছে বুকে ব্যথা। আপত্তির সুরে বলল, 'এসবের কোনও কিছুর সঙ্গেই আমি জড়িত না, গুগলি।'

তার গালে নামল চড়, বাজ পড়বার মত কড়াৎ আওয়াজ

তুলল। গুগলি শান্ত স্বরে বললেন, 'দ্যাখো কাণ্ড, ভুল করতে শুরু করেছি! তোমার গায়ে টোকাও দেয়া যাবে না! হ্যাঁ, পাধানির খুনের সঙ্গে গভীরভাবেই জড়িত তুমি! আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছিলে ওকে। এ-ও জানতে, কুকুরগুলো কী করবে। দ্য ডায়মণ্ড রিঙের ভেতরে তোমার বন্ধু গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তা, গিয়ারডিনি ক্যালভেসিও বা অন্যরা খুব পিঠ চাপড়ে দিয়েছে, তাই না? অন্ধকার নরকের কীটের মতই জীবন পার করলে, ব্যারেস্টে। মরবেও নিকষ রাতে। তবে তুমি একা নও, দেখা করবে তোমার সঙ্গে তোমার প্রাণের বন্ধুরাও।'

ছাতে চোখ রেখে চুপ করে আছে জেনারেল ব্যারেস্টে। কিন্তু হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে সরাসরি তাকাল গুগলির চোখে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'আমার কিছুই করার ছিল না। সেই প্রথম থেকেই ওরা ছিল আমার ঘাড়ের ওপর। নিজের পরিবারের কথা ভাবতে হয়েছে, নইলে মেরে ফেলত সবাইকে। ...গুগলি, আমাকে ছেড়ে দাও, ভাই! যেভাবে পারি তোমাকে সাহায্য করব!'

আবারও সামনে ঝুঁকলেন গুগলি, থুতু ছুঁড়লেন জানোয়ার লোকটার চোখে-মুখে। 'মৃত্যুর খুব কাছে পৌঁছে গেছ, মিথ্যা না-ই বা বললে!' চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করলেন গুগলি। শীতল, কঠিন সুরে বললেন, 'ড্রাগস নিলে যে মৃত্যু হবে, তাতে রক্ষা পাবে তোমার আত্মীয়রা।'

মাফিয়া কোড অনুযায়ী একটা কথাও মিথ্যা বলছেন না।

দলের সঙ্গে বেঈমানি করলে কোনও মাফিয়োসোকে সুযোগ দেয়া হয়: আত্মহত্যা করো, নইলে খুন হবে। নিজেকে শেষ করলে মাফ করে দেয়া হবে তোমার পরিবারকে। তা না করলে খুন হবে তোমার পরিবারের সবাই।

মাফিয়ার ওপর গবেষণা করতে গিয়ে বিস্মিত হয়ে জেনেছিলেন গুগলি: শত লোক হাতের রগ কেটে আত্মহত্যা করে,

কারণ তারা জানে, নিয়ম ভেঙেছে প্রতিজ্ঞা বা ওমের্তার। কাজেই নিজ পরিবারকে বাঁচাতে তার সামনে একমাত্র উপায় আত্মহত্যা করা।

ওই কোড জানে জেনারেল ব্যারেস্টে, কিন্তু ইনিয়ে বিনিয়ে কাতর অনুরোধ করতে লাগল লোকটা।

তাতে আরও রেগে গেলেন গুগলি। দ্রুত হলো পায়চারি। কিছুক্ষণ পর বিধ্বস্ত জেনারেলের দিকে তাকালেন। 'তোমার বউ মরেছে আজ দশ বছর। সে জন্য তোমার মনে কষ্টও নেই। অবহেলিত কুকুরের মত তাকে ব্যবহার করেছ। বেচারি মরলেও পাত্তা দাওনি। ব্যস্ত ছিলে উপপত্নী আর পতিতা নিয়ে। কিন্তু তোমার স্ত্রী উপহার দিয়েছিল তোমাকে তিনটে ছেলে আর এক মেয়েকে। সবাই তারা বিবাহিত। নয়টা নাতি-পুতির দাদা তুমি। আগামী মাসে তোমার মেয়ের তরফ থেকে দশ নম্বর নাতি আসছে পরিবারে।' খোলা দরজা দেখিয়ে দিলেন গুগলি। 'যারা তোমাকে বাঁধল, তারা খুব নরম মনের লোক। অনেকে আবার অতটা দয়ালু নয়। পাধানিকে আপন ভাইয়ের মতই জানতাম। ওর প্রতি ছিল শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। যারা একটু আগে বাইরে গেল, তাদের নেতার মনোভাবও আমার মতই। নাতিপুতিরা জানে না, মরবে তোমার কারণে। ওদের মৃত্যু হবে খুব নিষ্ঠুরভাবে। আর তা ঠেকাতে পারো তুমি। মরার আগে কিছু প্রশ্নের জবাব দিলে পাপও কমবে। মাফ পাবে তোমার ছেলে-মেয়ে আর নাতিপুতি।' খাটের পায়ের কাছে থামলেন গুগলি। আপত্তির দৃষ্টিতে দেখলেন মোটা লোকটাকে।

ছাতে চেয়ে আছে ব্যারেস্টে। পেরিয়ে গেল কিছুক্ষণ, তারপর খসখসে কণ্ঠে বলল, 'আর কী জানতে চাও?'

জ্যাকেটের পকেট থেকে ছোট নোটবুক ও বলপয়েন্ট কলম বের করলেন কর্নেল গুগলি। আবারও বসলেন চেয়ারে। গম্ভীর

কণ্ঠে বললেন, 'প্রথম থেকে বলো, কীভাবে জড়িয়ে গেলে দ্য ডায়মণ্ড রিঙে। কিছু যেন বাদ না পড়ে। আগে জানতে চাই, আগামী রোববার রাতে কোথায় হচ্ছে শয়তান পূজারীদের সভা।'

ময়লা শাঁখের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল জেনারেলের মুখ।

নিষ্ঠুর চোখে তাকে দেখলেন কর্নেল। বুঝে গেলেন, মৃত্যুর জন্য তৈরি এখন ব্যারেস্টে। এ ছাড়া উপায়ও নেই তার।

'গোড়া থেকেই সব বলব, যদিও মনে করি না এসব বিশ্বাস করবে,' বলল জেনারেল, 'সব ছিল অবিশ্বাস্য।'

একাশি

নেপলসে পোকার খেলছে ওরা, কিন্তু টাকা দিয়ে নয়, ব্যবহার করা হচ্ছে ম্যাচের কাঠি। কিন্তু বেশিরভাগ ম্যাচের কাঠি দখল করার পর রেমারিক যখন ইতালির গোলাবারুদের কারখানায় বারুদ সাপ্লাই দেয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গেল, খুব বিরক্ত হয়ে কফি মেশিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। অনেক আগেই স্ট্রেগা গেলা বন্ধ করেছে ওরা।

রানার দিকে আপত্তির চোখে তাকাল পিটার। 'জানতাম পোকারে যে জিতবে, তার জন্যে ভদ্রতা হচ্ছে, না উঠে চুপচাপ খেলা। কিন্তু ওই লোক পাছা ঘুরিয়ে উঠে চলে গেল!'

মুচকি হাসল রানা। 'কথা ঠিক। খুবই অভব্য লোক ওই রেমারিক।' খেলার দিকে মনোযোগ নেই ওর। মন পড়ে আছে বহু দূরে গোজোর এক কেবিনে।

কেবিনের ছাতে বসে আছে হাকলবেরি। চোখ কোমিনো চ্যানেলে। দেখছে সাগরে জেলে-নৌকার বাতি। অন্ধকারে স্কুইড শিকার করবে বলে রওনা হয়েছে মানুষগুলো। ওদিকে চোখ রেখে দক্ষ হাতে সাবমেশিন-গান পরিষ্কার করে নিল সে। ভাবছে, কাজ আছে আর বড়জোর ক'দিন। বড্ড ভাল হতো অনন্তকাল এই দ্বীপে রয়ে যেতে পারলে। এ এলাকার মানুষ মাটির মতই খাঁটি। যাদের পাহারা দিচ্ছে, তাদের তো কোনও তুলনাই হয় না। আর বাকি জীবন জিভে লেগে থাকবে অনোরিয়ার তৈরি খাবার। এই দ্বীপে মলমের মত বাতাস, এ-ও খুব মিস করবে ও। দূরের অন্ধকারে মাঝে মাঝে কর্কশ আওয়াজ তুলছে বড়সড় পেঁচা। তখন মুচকি হাসছে হাকলবেরি। ওর মতই চারপাশে চোখ রেখেছে ওর বন্ধুরা।

রোমের অভিজাত এলাকার এক অ্যাপার্টমেন্টে চুপচাপ বসে জিন রামি খেলছে রামিন রেযা ও জ্যাঁ মউরোস। জেতার মুডে আছে ফ্রেঞ্চ মার্সেনারি। দাঁত বের করে দেখিয়ে দিল হাতে ফুল জিন। 'ব্যাঙ্কে সিআইএ-র দেয়া টাকার অভাব নেই তোমার, অত চিন্তা কীসের? খেলে যাও খেলারাম!'

ক্লান্ত সুরে বলল রামিন, 'খেলব না, চুরি করেন আপনি!' চট্ করে দেখে নিল হাতঘড়ি। পাশ থেকে তুলে নিল ফোন। ওর মন চলে গেছে অনেক দূরে।

জেনারেল গামেল ব্যারেস্টের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য ভরা নোট-বুক বন্ধ করলেন কর্নেল বার্নাদো গুগলি।

পাশের টেবিলে বসে হান্টিং ম্যাগাযিন ঘাঁটছে কালাহান। মুখ তুলে নিচু স্বরে বলল, 'সব ঠিক তো?'

কর্নেল গুগলির মুখ ফ্যাকাসে। নোট-বুক দেখিয়ে বললেন, 'যা বলেছে, দম আটকে আসছে আমার। এরা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দুনিয়ায়!' বুড়ো আঙুল দিয়ে দেখালেন বেডরুম। 'বড়ি বেছে নিয়েছে আমাদের শ্রদ্ধেয় জেনারেল।'

'গুড,' খুশি মনে বলল কালাহান। মনে হলো, এইমাত্র স্পিনিচ খেতে রাজি হয়েছে কোনও শিশু, আর তাই মা খুশি। 'দাও শালাকে খাইয়ে!'

নোট-বুক রেখে আপত্তির সুরে বললেন কর্নেল, 'তোমার খুব কষ্ট হবে কাজটা করলে?' অপরাধী চেহারা করেছেন। 'এখনও নিশ্চিত নই... এ-ও ঠিক, ওই বড়ি ওকে দিলে কমবে আমার মনের কষ্ট। কিন্তু বুঝেছি, কুকুরটাকে ওভাবে মারতে পারব না। যদি ওখানে যাই, স্রেফ পিটিয়ে মেরে ফেলব।'

গম্ভীর মুখে মাথা দোলাল অসি কালাহান। 'ঠিক আছে, ওই কাজ নেব সিম বা আমি। ...তোমাকে কফি দেব?'

মাথা নাড়লেন কর্নেল। 'লাগবে না।' ফায়ারপ্লেসের পাশের টেবিলে রাখা নোট-বুকের ওপর চোখ। পাশেই দামি এক বোতল কনিয়্যাক। ওটা তুলে নিলেন তিনি। কর্ক খুলে বোতল মুখে ঠেকিয়ে ঢকঢক করে গিললেন সোনালি তরল। গলায় বেধে যেতে খক-খক করে কাশলেন। বোতলে কর্ক আটকে টেবিলে রেখে বললেন, 'যত দ্রুত সম্ভব বেরিয়ে যেতে চাই এই কেবিন থেকে।'

'অসুবিধে কী,' বলল কালাহান, 'সিমকে ডাক দেব। বাইরে হাঁটাহাঁটি করো, তাজা বাতাস কাজে আসবে।' সদর দরজায় গিয়ে নিচু শিস দিল সে।

অন্ধকার থেকে ফিরল একই শিস। কয়েক সেকেণ্ড পর হাজির হলো সিম কর্নেলিস।

সংক্ষেপে পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিল কালাহান।

মাথা দোলাল কর্নেলিস, ইতালিয়ান কর্নেলের কাঁধে আলতো

ঘুষি দিয়ে বলল, 'যথেষ্ট করেছ, বার্নাদো। পরের কাজ আমরা করব। বাইরে থেকে ঘুরে এসো।'

মাথা দুলিয়ে উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল, পরক্ষণে আলিঙ্গন করলেন সিম কর্নেলিসকে।

কর্নেলের কাঁধের ওপর দিয়ে হাসতে হাসতে বলল সিম, 'ইতালিয়ানরা একটু আবেগপ্রবণই হয়।'

'মায়ের দুধের সঙ্গেই ওটা ওদের রক্তে মেশে,' মন্তব্য করল অসি কালাহান।

কর্নেলিসের কাছ থেকে আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে বিড়বিড় করে অকথ্য গালি দিতে দিতে কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন কর্নেল গুগলি। অবশ্য, তার আগে নিয়েছেন নোট-বুক। দরজার কাছ থেকে বললেন, 'ভাগছি না!' কণ্ঠে আবেগ তাঁর।

পরস্পরের দিকে তাকাল দুই মার্সেনারি বন্ধু।

কর্নেলিস বলল, 'যা জেনেছে, তা হতবাক হওয়ার মত। ওকে আর বিব্রত করব না।'

'ঠিক,' সায় দিল কালাহান, চোখ বেডরুমে। টিটকারির সুরে বলল, 'আগে কোনও জেনারেলকে খুন করেছ, সিম?'

মাথা নাড়ল সিম। 'না, বড়জোর মেজর পর্যন্ত দৌড়। ...তুমি, অসি?'

মাথা নাড়ল কালাহান। 'কখনও মনে হয়েছে দু'চারটাকে খুন করাই উচিত। ...যাক গে, এসো কাজটা শেষ করি।'

কিচেন থেকে এক গ্লাস পানি নিল কালাহান, তারপর বেডরুমে ঢুকল দুই বন্ধু।

কেউ আসবে মৃত্যু-দূতের মত, সে জন্য তৈরি জেনারেল গামেল ব্যারেস্টে। লোক দু'জনের চোখে সামান্য দয়াও দেখল না সে। যমের মত কঠিন মুখ করে রেখেছে তারা।

সাবধানে জেনারেলকে তুলে বসাল ওরা। বিছানার পাশের

টেবিলে বোতল ভরা পিল, সিরিঞ্জ আর এক পাশে মোবাইল ফোন। দুটো বড়ি নিয়ে বিছানায় বসা কালাহানের হাতে দিল সিম। নিজের হাতে পানি ভরা গ্লাস।

দুই মার্সেনারির চোখ থেকে চোখ সরিয়ে যেন বহু দূরে তাকাল জেনারেল। তার ঘাড় শক্ত করে ধরল কালাহান, অন্য হাতে বড়ি। হালকা সুরে বলল, 'হাঁ করো। বড়ি ফেলব জিভের পেছনে। আমার বন্ধু তোমাকে পানি দেবে। বড় করে ঢোক গিলবে।'

দেয়ালে চোখ রাখল জেনারেল। সরু হয়ে গেল দুই ঠোঁট।

গম্ভীর হলো কালাহান। 'তোমার যা খুশি। সেক্ষেত্রে তোমার পোঁদের ভেতরে ইনজেক্ট করব। তারপর যাব তোমার গুষ্টির সব ক'টাকে খুন করতে। তাতে কোনও আপত্তি নেই, বাড়তি টাকা পাব। অনেক টাকা।'

মণি নড়ে উঠল জেনারেল ব্যারেস্টের, দুই মণি স্থির হলো কালাহানের চোখে। পেরোল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর হাঁ করল মুখ। আবারও বুজে ফেলল। ঠোঁট খুলল তিন সেকেণ্ড পর। ফিসফিস করল, 'অনেকক্ষণ লাগবে মরতে?'

'না, চট্ করে নরকে গিয়ে হাজির হবে,' বলল কালাহান।

'কিছুই বুঝবে না,' নিশ্চয়তা দিল কর্নেলিস। 'কে জানে, হয়তো স্বয়ং শয়তানও বুঝবে না পৌঁছে গেছ তার রাজ্যে।'

ধীরে ধীরে হাঁ করল ব্যারেস্টে। বুজে ফেলেছে দু'চোখ।

'আরও বড় হাঁ করো তো,' ডাক্তারের ভঙ্গিতে বলল কালাহান, সামনে ঝুঁকে গেছে।

কুমিরের মত মস্ত এক হাঁ মেলল লোকটা।

দু'আঙুলে বড়ি দুটো ধরে ব্যারেস্টের জিভের পেছনে ফেলল কালাহান। পরক্ষণে লোকটার মুখে গ্লাস ধরল সিম। দু'ঢোক পানি গিলল জেনারেল। থুতনি বেয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা তরল।

খেয়াল করেছে কালাহান, দু'বার নড়ে উঠেছে জেনারেলের অ্যাডাম্'স্ অ্যাপ্‌ল্। আগের চেয়ে জোরে শক্ত করে ঘাড় ধরল সে। মুখ হাঁ করিয়ে দেখে নিল পেটে গেছে বড়ি। সন্তুষ্ট হয়ে সিমের দিকে চেয়ে মাথা দোলাল। খুব আস্তে করে জেনারেলকে বিছানায় শুইয়ে দিল দু'জন। পিছিয়ে গেল বিছানা ছেড়ে।

চুপ করে শুয়ে আছে গামেল ব্যারেস্টে, চোখ বন্ধ।

চট্ করে হাতঘড়ি দেখল সিম কর্নেলিস।

নব্বুই সেকেণ্ড পর প্রথমবারের মত ঝটকা খেল জেনারেল। গলা দিয়ে বেরোল কর্কশ আর্তনাদ। ছটফট করতে লাগল বিছানা জুড়ে। গলগল করে হলদে বমি করতেই ভিজে গেল দামি চাদর।

নীরবে অপেক্ষা করল দুই মার্সেনারি।

মৃত্যু ওদের চেনা বন্ধু।

কিছুক্ষণ পর স্থির হয়ে গেল জেনারেলের দেহ।

এবার সরিয়ে ফেলতে হবে কটন উল ও টেপ।

সামনের বেড়ে জেনারেলের ঘাড়ের পাল্‌স্ দেখল কালাহান।

আধ মিনিট পর একবার পরস্পরকে দেখে মাথা দোলাল।

'কুফা,' সোয়াহিলি ভাষায় বলল সিম।

অর্থাৎ: ''মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে।''

মৃতদেহ থেকে রাবার-ফোম ও টেপ সরিয়ে ফেলল ওরা। সিল্কের পায়জামা ও জ্যাকেট ভরে গেছে বমির তরল আবর্জনায়। মৃত জেনারেলের বামহাত বেডসাইড টেবিলে রাখল কালাহান। তাতে মনে হবে, সে ধরতে চেয়েছিল মোবাইল ফোন। রাবার-ফোম, মাস্কিং টেপ বা আর সব ক্যানভাস ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখল কর্নেলিস। ওর কাজ শেষ হওয়ার আগেই কিচেনে গিয়ে জেনারেলের গ্লাস ধুয়ে শুকিয়ে কাবার্ডে রাখল কালাহান। আবারও সঠিক র‍্যাকে স্থান পেল হান্টিং ম্যাগাযিন।

দুই শ' গজ দূর থেকে কর্নেল বার্নাদো গুগলি দেখলেন, নিভে গেল কেবিনের সব বাতি। হাতে মোবাইল ফোন। দেরি না করে কল দিলেন। কয়েক সেকেণ্ড পর শুনলেন রানার কণ্ঠ: 'কাজ শেষ?'

'হ্যাঁ। দরকারী সবই পাওয়া গেছে। কয়েক ঘণ্টা পর দেখা হবে।'

'বেশ, আপাতত বিদায়।'

বিরাশি

মাঝরাতে পৌঁছে গেল আলবেনিয়া থেকে আসা জাহাজ। বিক্ষুব্ধ পরিবেশে সি-সিকনেস-এ আক্রান্ত হয়েছে সিস্টার লরেডি ও সিমোনা। সামনেই বারি বন্দরের আলো দেখে একটু স্বস্তি বোধ করল ওরা।

জাহাজ ভেড়ার একটু পর কোনও ঝামেলা ছাড়াই ঢুকে পড়ল ইমিগ্রেশন ও কাস্টম্‌স্‌ এরিয়ায়। এমনিতে যাত্রীদের বহু সময় নষ্ট করে ইতালিয়ান অফিশিয়াল, তাই একটু অবাকই হতে হলো সিস্টার লরেডিকে। বিদেশি এতিম মেয়েকে এ দেশে স্থান দিচ্ছে, যতটা পারে ঝামেলা করবে না?

কিন্তু ইমিগ্রেশনের লাইনে দাঁড়াতেই দূর থেকে এল এক অফিসার। হয়তো সিস্টারের সাদা পোশাকের কারণেই। নিজের নাম ও পদবী জানাল, তুলে নিল সিস্টারের সুটকেস ও বাচ্চা

মেয়েটার ব্যাগ। পেরিয়ে গেল ওরা ইমিগ্রেশন এরিয়া। বিশেষ ইমিগ্রেন্টদের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট রুম, ওখানে বসতে দেয়া হলো ওদেরকে। গত দুপুরে এতিমখানার কাছের জঙ্গল থেকে বুনো ফুল সংগ্রহ করেছিল সিমোনা, সেগুলো রাখল হাতে। যাত্রা শেষে ওর মতই নেতিয়ে গেছে হরেক রঙের ফুল।

ঘরে সিস্টার ও সিমোনার জন্য অপেক্ষা করছে তিনজন মানুষ— ম্যানুয়েল য্যারাফা ও দামি পোশাক পরনে মধ্যবয়স্ক এক দম্পতি। চেয়ার ছেড়ে সিস্টারের দিকে এগিয়ে এল য্যারাফা, খুশিতে চকচক করছে চোখ। নিজের পরিচয় দিল সে।

সিস্টার লরেডিকে আগেই বলে দেয়া হয়েছে, তার সঙ্গে দেখা করবেন এক ভদ্রলোক।

এবার সিস্টারের সঙ্গে দম্পতির পরিচয় করিয়ে দিল ম্যানুয়েল য্যারাফা। তারা সেনর ও সেনোরা সিনডোনা, সিমোনার নতুন বাবা-মা।

স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশ হয়ে উঠল আড়ষ্ট। বলতে গেলে ইতালিয়ান ভাষা বোঝেই না সিমোনা। অবশ্য ওর দিকে চেয়ে নার্ভাস হাসল দম্পতি। তাতে সিমোনা বুঝল, তারা কারা। এগিয়ে গেল তাদের দিকে। মহিলার দিকে বাড়িয়ে দিল জঙ্গল থেকে তুলে আনা বুনো ফুল। সেনোরা সিনডোনা লম্বা ও মোটা মহিলা। বাচ্চা মেয়েটার চোখে চোখ রেখে হাসল। জড়িয়ে ধরল ঝুঁকে। ফলে দু'জনের মাঝে পিষে গেল ফুল। হাসছে মহিলার স্বামী, বারকয়েক মাথা নাড়ল।

সিস্টার লরেডির দিকে ফিরে বিস্তৃত হাসল ম্যানুয়েল য্যারাফা। 'আমাদেরকে একটু বদলাতে হয়েছে প্ল্যান। আপনাদের অগাস্টিয়ান কনভেন্ট থেকে সিমোনাকে না তুলে নিয়ে সরাসরি আজই বারি থেকে ওকে নেবেন ওর নতুন বাবা-মা।' কাঁধ ঝাঁকাল। 'এঁরা আসলে এতই অস্থির হয়ে গেলেন... যাক্,

ভোরের ফ্লাইটে রোমে নিজেদের বাড়িতে চলে যাবেন তিনজন।'

অনিশ্চয়তা দেখা দিল সিস্টারের মুখে। দেখলেন সিমোনাকে জড়িয়ে ধরল নতুন বাবা। সিমোনার দিকে চেয়ে মা-র মত মিষ্টি হাসছে ভদ্রলোকের স্ত্রী।

ম্যানুয়েল য্যারাফা বলল, 'চিন্তা করবেন না, আমার সঙ্গে বিকেলে কথা হয়েছে মাদার সুপিরিয়রের। তিনি সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিয়েছেন আপনার হাতে।'

'সিমোনার সঙ্গে কথা বলে দেখি,' বলল সিস্টার লরেডি। 'বুদ্ধিমতী মেয়ে, সিদ্ধান্ত নিজেই নেবে, তা-ই চাই।'

বড় এক হ্যাণ্ড ব্যাগ থেকে উপহারের প্যাকেট বের করেছে সেনোরা সিনডোনা। সিস্টারের দিকে চেয়ে বলল, 'সিস্টার, ওকে কি বলবেন, নতুন বাড়িতে চলেছে বলে ছোট্ট এই উপহার?'

অ্যালবেনিয়ান ভাষায় সিমোনার জন্য তরজমা করলেন সিস্টার। প্যাকেটের দিকে চোখ যেতে হাসল মেয়েটা। হাত বাড়িয়ে জিনিসটা নিয়ে ঘুরে দেখল সিস্টারকে। তাতে হেসে মাথা দোলাল সিস্টার।

প্যাকেট খুলতেই দেখা গেল ভেতরে চমৎকার লাল কাশ্মিরী সোয়েটার। বুকে কয়েক রঙের সিল্কের কারুকাজ। খুব নরম উল। খুশিতে হেসে ফেলল সিমোনা, জড়িয়ে ধরল নতুন মাকে।

'ঠিক আছে, মন্দ হয় না ওর নতুন বাড়িতে সিমোনা চলে গেলে,' বলল সিস্টার। মেয়েটাকে খুলে জানাল একটু এদিক ওদিক করা হয়েছে প্ল্যান।

নিজের পুরনো ধূসর সোয়েটার খুলে নতুনটা পরে নিল সিমোনা। নতুন কোনও মেয়ের জন্য সিস্টারকে দিয়ে দিল আগেরটা। নতুন মা-র হাত ধরে রেখেছে। বড়দের কথা শুনছে, কিন্তু বুঝছে না প্রায় কিছুই।

একবার ওকে আলিঙ্গন করল সিস্টার লরেডি, তারপর সেনর-

সেনোরা সিনডোনার উদ্দেশে বলল, 'দশ দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি, তারপর আবার ফিরব আলবেনিয়ায়। আগামী সপ্তাহে রোমের কাছে আমার বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে যাব। সেসময় একবার দেখে যাব কেমন মানিয়ে নিচ্ছে সিমোনা।'

'খুবই ভাল হতো দেখা হলে,' বলল সেনর সিনডোনা, 'কিন্তু আগামী পরশু ফ্লোরিডায় বেড়াতে যাচ্ছি আমরা। ওখানে থাকে আমার ভাই। আমার ভাতিজির বয়সও সিমোনার সমানই হবে। আশা করি ওখানে ভাল লাগবে ওর।'

ম্যানুয়েল য্যারাফা খেয়াল করল, আবারও অনিশ্চয়তায় ভুগছে সিস্টার লরেডি।

'হঠাৎ করেই প্ল্যান করেছেন,' একটু আপত্তির সুরে বলল সিস্টার। 'সিমোনা এখনও ইটালিয়ান ভাষা শিখতেই পারেনি। ইংরেজিও জানে না। ওর ভাল লাগবে?'

সেনোরা সিনডোনা হাসল। 'ওই কথা আমরাও ভেবেছি। আর তাই আমার দেবর ভাল বংশের এক অ্যালবেনিয়ান মহিলাকে রেখেছে কাজের মানুষ হিসেবে। ভাষা কোনও বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। আমাদের মনে হয়েছে, সিমোনার ভাল লাগবে ঝলমলে রোদের দেশ।' মেয়েটার কাঁধ চাপড়ে দিল সে। 'সূর্যস্নান করবে সৈকতে। তা ছাড়া, ওখানে সমবয়সী ছেলে-মেয়েও পেয়ে যাবে।'

সিমোনা সত্যিই সৌভাগ্যবতী, ভাবল সিস্টার। জানতে চাইল, 'আপনারা ফিরবেন কবে?'

'অন্তত তিন সপ্তাহ,' বলল সেনর সিনডোনা, 'অবশ্য, সেনর য্যারাফার সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে। সিস্টার, আবার যখন এ দেশে ফিরবেন, তখন সিমোনার সঙ্গে দেখা হবে আপনার। আর তখন কিন্তু আমাদের বাড়িতে থাকতে হবে।'

'খুবই খুশি হব,' আন্তরিক সুরে বলল সেনোরা সিনডোনা।

বন্দর-অফিস থেকে বেরিয়ে শোফার চালিত মার্সিডিয গাড়ির

পাশে পৌঁছে গেল সবাই। শেষবারের মত সিমোনাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে দিল সিস্টার। এরপর তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিমোনাকে সঙ্গে করে গাড়িতে উঠে পড়ল দম্পতি। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সিস্টার লরেডি। মনে মনে বলল, 'হে, ঈশ্বর, নতুন জীবনে সুখী হোক বাচ্চা মেয়েটা।'

কনভেন্ট পর্যন্ত তাকে লিফ্‌ট্ দিল য্যারাফা। যাওয়ার পথে হাসতে হাসতে বলল, 'আশা করি সিস্টার হাউডরিস খুশি হবেন, ভাল বাড়ি পেল প্রথম মেয়েটা।'

'সিস্টার হাউডরিসকে চেনেন?' জিজ্ঞেস করল সিস্টার।

'নাম শুনেছি শুধু। জানি, কত ভাল কাজই না করছেন। আসলে আপনারা সবাই ঈশ্বরের কাজে ব্যস্ত।'

'দেবীর মত মানুষ,' বিড়বিড় করল সিস্টার লরেডি। একটু অন্যমনস্ক। 'আজ সকালে ফিরবেন মাল্টায়।'

চট্ করে তাকে দেখে নিল য্যারাফা। 'তাই?'

'হ্যাঁ। খুব পরিশ্রম করেন। ছুটি দরকার ছিল তাঁর। আপনি তো জানেন, কঠোর পরিশ্রম করি আমরা।'

'তা তো বটেই,' সায় দিল য্যারাফা। 'কবে ফিরছেন তিনি?'

'এক সপ্তাহ বা আরেকটু বেশি।'

'আবার যখন ফিরবেন, দয়া করে আমার শ্রদ্ধা তাঁর কাছে পৌঁছে দেবেন,' বলল য্যারাফা।

মানুষটাকে একবার দেখে নিয়ে সিস্টার বলল, 'অবশ্যই!'

তিরাশি

কনভেন্টের উত্তর প্যাশিয়োতে বসে আছেন নান হাউডরিস, সামনেই সেন্ট পল-এর নীল উপসাগর। আপাতত খুব বিক্ষুব্ধ সাগর। তা ঝড়ের জন্য নয়। আসছে-যাচ্ছে দ্রুতগামী স্পিডবোট, ক্রুযার ও সেইলিং ইয়ট। অশান্ত সাগর বা ঝড়ের মতই অস্থির হাউডরিসের মন। তাঁকে জেরা করেছেন মাদার সুপিরিয়র। খুব কঠোর মনের মানুষ, বয়সও অনেক, প্রচুর অভিজ্ঞতা তাঁকে করে তুলেছে ঠাণ্ডা ও স্থির। ছোটখাট ত্রুটিও চোখে পড়ে তাঁর।

সিস্টার হাউডরিস তাঁকে বলেছেন, গত পাঁচ বছর আগে এক লোককে দেখেছেন একটা গাড়িতে। সঙ্গে ছিল এক তরুণী। তারা দু'জন গির্জার সিঁড়ির ধাপে একটা শিশুকে রেখে চলে যায়। আর কয়েক দিন আগে তাঁর এতিমখানা থেকে এক মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে সেই একই লোক।

এসব শুনে ভুরু কুঁচকালেন মাদার সুপিরিয়র। একের পর এক প্রশ্ন করলেন।

জবাব দিলেন সিস্টার হাউডরিস। তারপর তাঁকে বিদায় করে দিলেন মাদার সুপিরিয়র। মনে হয়েছিল তিনি সন্তুষ্ট নন।

আধঘণ্টা ধরে বাগানের কাছে চুপ করে বসে আছেন সিস্টার, হঠাৎ কানের কাছে শুকনো কাশি শুনে মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন।

চিনতে ভুল হলো না ফাদার পিয়েত্রো অ্যাব্রাটাকে। ইনি গোজোয় এতিমখানা চালান।

সিস্টার হাউডরিসের পাশের চেয়ারে বসলেন তিনি। কথা খুব কম বলেন। উপসাগরের দূরের নীলে চেয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'সিস্টার, সেই গাড়ির ওই লোক সম্পর্কে যা জানেন, তা বলুন।'

বড় করে দম নিয়ে শুরু করলেন সিস্টার অ্যানি হাউডরিস। মনে হলো, বুকের ওপর থেকে নেমে গেল মস্তবড় এক পাথর। তাঁর কথা বিশ্বাস করেছেন মাদার সুপিরিয়র।

চুরাশি

'ভয়ঙ্কর লম্পট এক যুবক এখন সন্তুষ্ট মনে টাসকানির পাহাড়ি এক মস্ত ভিলায় ঘুমিয়ে আছে,' বন্ধুদের সবার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছেন কর্নেল গুগলি, 'নাম তার রোমিও কোসেলি।'

নেপল্স্ শহর। মাত্র ভোর হচ্ছে।

প্রেযো ফিসো বোর্ডিং হাউস অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্টের ছোট ডাইনিং রুমের টেবিল ঘিরে চেয়ারে বসেছে ওরা। পশ্চিমা হাওয়ার তাড়া খেয়ে জানালার কাঁচে আছড়ে পড়ছে তুমুল বৃষ্টি।

নেপলসের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে কর্নেল গুগলি ভেবেছিলেন, জরুরি তথ্য দেবেন শুধু রানাকে। কিন্তু পথে নতুন করে বুঝলেন, যোগ্য লড়াকু কর্নেলিস ও কালাহান। আর রানার দলেই যোগ দিতে চাইছেন তিনি নিজে। রাতের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে ভবিষ্যতে দুঃস্বপ্ন দেখতে হতো, তা থেকে তাঁকে রক্ষা

করেছে দুই মার্সেনারি। তখনই ঠিক করলেন, সবাই জড় হওয়ার পর ওদের বলবেন, কী আছে নোট-বুকে। গোপন রাখবেন না একটা কথাও।

এখন টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছে সবাই। একটু পর পর কফি ও বিস্কিট পরিবেশন করছে জেনি। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ইংরেজি ভাষায় দু'চারটা মিষ্টি কথা বলে মিটিঙে বসে পড়েছেন কর্নেল। রানা ও জেনিকে বলে দিয়েছেন, এসব ঝামেলা শেষ হওয়ার পর সোজা তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে উঠছে জেনি। ভাল কোনও স্কুলে ভর্তি করে দেবেন তিনি ওকে। তবে চাইলে মাঝে মাঝে ছুটিতে দু'জন ঘুরে আসবেন গোজো দ্বীপ থেকে।

কঠিন যে-কোনও কাজের মতই যে-কারও দেহে ক্লান্তি এনে দেয় অধীর অপেক্ষা ও টেনশন। সবাই বড্ড পরিশ্রান্ত, কিন্তু কর্নেলের গম্ভীর চেহারা দেখে বুঝে গেছে, তিনি যা জানতে পেরেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু।

'দ্য ডায়মণ্ড রিঙের মূল মেরুদণ্ডের জোর ছিল রোমিও কোসেলির বাবা পিনো কোসেলি। তার বাবা মুসোলিনির আর্মির জেনারেল। ফাঁসি দেয়া হয় তাকে। তার ছেলে আবারও সত্তর সালে নাক উঁচু করল রোমান সমাজে। কয়েক বছরের ভেতর হয়ে উঠল বিশাল বড়লোক। চার বছর আগে মারা গেছে। তখন দ্য ডায়মণ্ড রিঙের সর্বোচ্চ নেতা হলো তার একমাত্র ছেলে রোমিও কোসেলি। এত কম বয়সে ইতালির সিকিউরিটি সার্ভিসেস-এর কমিটিতে পেয়ে গেছে ডিরেক্টর পদ। দেশের নামকরা সব ক্ষমতাশালী বড়লোক মন থেকে হিংসা করে তাকে, শ্রদ্ধাও করে কেউ কেউ।' সবার ওপর ঘুরে এল কর্নেলের চোখ। স্থির হলো রানার চোখে। 'গতকাল রাতে জেনারেল গামেল ব্যারেস্টের কাছ থেকে এসব শুনে যেমন খারাপ লেগেছে, তেমনি বিব্রতও হয়েছি। রোমিওর বাবা যে সাম্রাজ্য গড়ে দিয়ে গেছে, তা আরও বড় করে

তুলেছে রোমিও কোসেলি।

'বছরের পর বছর অন্যায় ঠেকাতে জীবনপাত করলাম, কিন্তু ছুঁতে পারব না সত্যিকারের এসব অপরাধীকে।' সবার ওপর দিয়ে ঘুরে আবারও রানার ওপর স্থির হলো কর্নেলের চোখ। কণ্ঠে প্রকাশ পেল রুদ্ধ আবেগ: 'দুঃখজনক কী জানো, যারা ওই দানব ধ্বংস করতে পারবে, তাদের মধ্যে রয়েছে মাত্র দু'জন ইতালিয়ান— রেমারিক ও ফুরেলা। নিজে আমি বলতে গেলে তেমন কোনও কাজে লাগাতে পারব না কারাবিনিয়ারিকে। দ্য ডায়মণ্ড রিঙের দেয়া টাকা খেয়ে বিক্রি হয়ে গেছে পুলিশ, মিলিটারি, সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স ও কারাবিনিয়ারির বহু পদস্থ লোক।'

বার্নাদো গুগলি থেমে যাওয়ায় কথা বলল না কেউ।

'আরও দুঃখের কথা: পুলিশ ও কারাবিনিয়ারির হাতে ছিল দ্য ডায়মণ্ড রিঙের পনেরো শ' লোকের নামের তালিকা, কিন্তু সবই হারিয়ে গেছে রহস্যজনকভাবে। যাদের দায়িত্বে ছিল ওই তালিকা, সাগরে পাওয়া গেছে তাদের লাশ। দুর্নীতি-পরায়ণ আট শ' জন বড় ব্যবসায়ীর তালিকা আছে আমাদের হাতে, কিন্তু চাইলেও নিশ্চিত হতে পারব না, ঠিক কারা দ্য ডায়মণ্ড রিঙের সদস্য। অবশ্য, জেনারেল ব্যারেস্টের কাছ থেকে জেনেছি, তার চেয়ে ক্ষমতাশালী দ্য ডায়মণ্ড রিঙের সদস্য চারজন কেবিনেট মিনিস্টার। এ ছাড়া, আটত্রিশজন পার্লামেণ্টারি ডেপুটি ও এক শ'র বেশি মিলিটারি ও ইন্টেলিজেন্স অফিসার জড়িত। জানতাম মাফিয়ার সঙ্গে দহরম-মহরম মস্ত ব্যাঙ্কার অর্নেল টুইনিসের। কিন্তু ক'দিন আগে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হয়েছে তাকে। ঈশ্বরের ব্যাঙ্কার বলা হতো যাকে, সেই মেসিল অ্যানো ছিল ভ্যাটিকান ব্যাঙ্কের কার্যক্রমে জড়িত, কিছু দিন আগে বাড়ির সিলিং ফ্যানের হুকে চাদর বেঁধে আত্মহত্যা করেছে সে। কী করে যেন হারিয়ে

গেছে তার ব্যাঙ্কের এক বিলিয়ন ডলার।'

বড় করে দম নিলেন কর্নেল গুগলি। 'গতরাতে যা জানলাম, তাতে রোমিও কোসেলি এবং তার আশপাশের মস্ত বড়লোক ব্যবসায়ীরা আগামী পাঁচ থেকে সাত বছরের ভেতর দখল করবে ইতালির রাজনৈতিক ক্ষমতা। মাফিয়া আর থাকবে না, এ দেশ থেকে উবে যাবে ভ্যাটিকান; গোপনে শয়তানের উপাসনা করতে হবে না, খোলাখুলি যা করার করবে দ্য ডায়মণ্ড রিং। কে ঠেকাবে তাদের? যথেষ্ট টাকা পেলে মুখ বন্ধ রাখবে সবাই।' শীতল হাসলেন গুগলি। 'কিন্তু, রানা, রামিনের কারণে মস্ত বড় সুযোগ পেয়ে গেছি। দুর্ভাগা এই দেশের ধার্মিক মানুষের চিরকালের শত্রু রোমিও কোসেলি বা তার একদল নরপিশাচকে হয়তো শেষ করতে পারব আমরা।'

পঁচাশি

বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশে ঝলমল করছে সূর্য। সবাই যে যার বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। কিন্তু টেরেসে হাঁটছে রানা ও রেমারিক। মাথা পরিষ্কার করতে চাইছে ওরা। কিছুক্ষণ পর রেমারিক বলল, 'যদি গুগলিকে ভাল করে না চিনতাম, যদি না জানতাম ওর আছে ক্ষুরধার একটা মগজ, তো নির্ঘাত ভাবতাম সে বদ্ধ উন্মাদ।'

মৃদু হাসল রানা। 'আমরা দু'জনই চিনি গুগলিকে। ওর মুখ

থেকে বেরোবে না একটা মিথ্যাও। জরুরি তথ্য পেয়েছে, কিন্তু দুঃখের কথা, কারাবিনিয়ারির বড় অফিসারদের সাহায্য নিয়ে খুনি ওই দলের বিরুদ্ধে লড়বে, সেই উপায় ওর নেই।'

'ঠিক,' ঘোঁৎ করে উঠল রেমারিক, 'বড় কোনও অফিসারকে মন থেকে বিশ্বাস করতে পারবে না। রোমিও কোসেলির দলে রয়েছে কারাবিনিয়ারির আরও চারজন জেনারেল। চার কেবিনেট মন্ত্রী...' শুকনো হাসল রেমারিক। 'শালার কপাল, ওই দলে আছে এক কার্ডিনাল আর দুই আর্চবিশপও! প্রথম সারির পাঁচ বিচারকও। গুগলি নালিশ করবে কার কাছে? তদন্ত করার অনুমতি নেবে কোথা থেকে? যখন বুঝল মরতেই হবে, মিথ্যা বলেনি জেনারেল গামেল ব্যারেস্টে। সাধারণত মরার আগে মিথ্যা বলে না কেউ। ওই সংগঠনের ছোট্ট একটা নাট বল্টু ছিল ব্যারেস্টে। এর বেশি কিছুই না।'

'তাই আসলে,' সায় দিল রানা, 'ওর করা ফিন্যানশিয়াল কেলেঙ্কারি আর সেক্সুয়াল অপরাধের কারণে গত ত্রিশ বছর ধরে ওকে ব্ল্যাকমেইল করছে দ্য ডায়মণ্ড রিং। অবশ্য, ওই গুপ্তসংঘ যেমন ব্যবহার করেছে তাকে, সে-ও তেমনি আদায় করেছে সুযোগ। নইলে হতে পারত না জেনারেল। স্বীকার করেছে, দ্য ডায়মণ্ড রিঙের পনেরো শ' লোকের নামের তালিকা সরিয়ে ফেলে কয়েক জেনারেল মিলে। যাদের দায়িত্বে ছিল ওই তালিকা, তাদের খুন করার পেছনে সে নিজেও ছিল।'

থমকে রেমারিকের দিকে তাকাল রানা। 'আমাদের কপাল ভাল, নিজের কানেকশন ব্যবহার করতে পারবে গুগলি। ওর বেশ কয়েকজন সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত অনুচর আছে। এ ছাড়া, ওর মা-র কানেকশনও কাজে আসবে। আগামী রোববার রাতে দ্য ডায়মণ্ড রিঙের বড় নেতাদের শেষ করে দেয়ার কাজে আমরা নামলে, সে সুযোগে নিজের কাজ গুছিয়ে নেবে গুগলিও। কাছেই থাকবে

কারাবিনিয়ারির জুনিয়র অফিসারের দুটো দল। আমরা যখন দ্য ডায়মণ্ড রিঙের বুকের ভেতর ঢুকে পড়ব, দূরে অপেক্ষা করবে তারা। দু'জন সৎ বিচারকের নামও বলেছে গুগলি। আগেই আবছাভাবে জানিয়ে দেয়া হবে, তাদের অনুমতি পেলে কারাবিনিয়ারি ওই সাইটে যাবে। গুগলির ছেলেরা যাওয়ার পনেরো মিনিট পর হাজির হবে তারা। প্রাইম মিনিস্টার বা ইন্টেলিজেন্সের কেউ ঠেকাতে পারবে না গুগলি বা ওই বিচারকদেরকে। আমরা সরে যাওয়ার পর সাইরেন বাজিয়ে ওখানে হাজির হবে কর্নেল গুগলির নেতৃত্বে কারাবিনিয়ারির ছেলেরা।'

তিক্ত হাসল রেমারিক। 'কী এক দেশ! ছয় ফুট নিচে কবরের ভেতর নড়েচড়ে শুচ্ছে জেনারেল গামেল ব্যারেস্টে!'

মৃদু হাসল রানা। 'প্রধানমন্ত্রী ম্যাসিমো যখন জানবেন দো গুচ্চি পরিবারের প্রধান এসবে জড়িত, তখন? ওই অভিজাত পরিবারই না এক করেছিল আজকের ইতালিকে?'

'ওরা না থাকলে দেখতে না আজকের ইতালিকে,' বলল রেমারিক, 'গত এক শ' বছর ধরে ইতালিয়ান সমাজের স্তম্ভ হয়ে আছে তারা। অথচ, রোমিও কোসেলির দলে যোগ দিয়েছে তাদের প্রধান কর্তা। সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার! আমার হতভম্ব হওয়ার কারণ, দ্য ডায়মণ্ড রিঙের সভা হচ্ছে দো গুচ্চির ব্যক্তিগত চ্যাপেলে। প্রধান হিসেবে যোগ দেবে সত্যিকারের এক ক্যাথোলিক বিশপ। গুগলি এসব হজম করে পাগল হয়ে যায়নি, এ-ই বেশি! আমারই তো মাথা ঘুরছে! অবাক কাণ্ড জানো, গুচ্চিরা সম্পর্কে মেডিসি পরিবারের আত্মীয়। কয়েক শতাব্দী আগে তাদের বংশ থেকেই এসেছে এক পোপ। অবশ্য তাঁর প্রতিযোগীকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে তারপর।'

'তাই?' তিক্ত হাসল রানা।

'হ্যাঁ,' বলল রেমারিক, 'কূট বুদ্ধির কোনও জেনারেলও মগজ থেকে বের করতে পারত না ওই কৌশল!'

'জায়গাটা আমরা চিনি,' বলল রানা, 'সময়ও জেনেছি। ওখানে কারা আসছে, তা-ও অজানা নয়। এখন নিশ্চিত হতে হবে, মাকে দিয়ে সঠিক জায়গায় অস্ত্র রাখাতে পারবে কি না গুগলি। সেক্ষেত্রে গুচ্চি ভিলায় ঢুকলেই দরকারী জিনিস হাতে পাবে রামিন। এদিকে প্রথম সুযোগে ওই ভিলার লাইব্রেরি থেকে ঘুরে আসব আমি। জরুরি হয়ে উঠেছে ওই ডায়েরি পাওয়া।'

ছিয়াশি

মাংসপেশি নাড়িয়ে আড়ষ্টতা দূর করতে চাইল হাকলবেরি। বামদিকে ভোরের আকাশে মুখ তুলেছে লাল ফুটবলের মত সূর্য। ওটার কারণে রক্তিম হয়ে গেছে কোমিনো চ্যানেল।

দূরে পেঁচার ডাক শুনল হাকলবেরি। বিনকিউলার তুলে ডানদিকে দেখল দূরে এক ঝাড় ক্যারব গাছ। ওদিকে কোনও পেঁচা নেই। কিন্তু ঝোপের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কালো পোশাক পরা এক লোক। পেরিয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর ঝোপঝাড়ে গিয়ে ঢুকল আরেক লোক।

চট্ করে হাতঘড়ি দেখল হাকলবেরি, সন্তুষ্ট। তার লোক নষ্ট করছে না একটা সেকেণ্ডও। এবার ঘুমাতে যাওয়ার সময়।

খামারবাড়ির ছাতে উঠে দাঁড়াল সে, গলায় ঝুলিয়ে নিল বিনকিউলার।

নিচে নাস্তা নিয়ে অপেক্ষা করছেন অনোরিয়া তাজা। পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল হাকলবেরি। তখনই দেখল, ধুলোময় রাস্তা ধরে নাচতে নাচতে উঠানে এসে থামল পুরনো এক তোবড়ানো ফোর্ড গাড়ি। ওটা থেকে নামলেন এক যাজক। বারান্দায় উঠে হাকলবেরিকে বললেন, 'পক্ষী-বিশারদ, দেখলেন কোনও পাখি?'

হেসে মাথা দোলাল কালা-পাহাড়। 'মৌসুমের আগেই চলে এসেছে কয়েকটা কেস্ট্রেল, দেখলাম কেঁচো বা ইঁদুর খুঁজছে।'

হাসি-হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলেন ফাদার, 'ভেতরে আছেন অনোরিয়া?'

'আছেন,' বলল হাকলবেরি। 'সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে এই বাড়ির সবাই।'

কিচেনে ব্যস্ত অনোরিয়া, ফাদারকে দেখে খুশি মনে স্বাগত জানালেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন হাকলবেরির সঙ্গে। শুভেচ্ছা বিনিময় শেষ হতেই গম্ভীর হয়ে গেল ফাদারের মুখ। অনোরিয়ার বাহু ধরে সরিয়ে নিলেন একটু দূরে। নিচু স্বরে মাল্টিয ভাষায় বলতে লাগলেন কী যেন। হাকলবেরি শুধু শুনতে পেল 'উমো' কথাটা। এক মগ কফি ঢেলে অপেক্ষা করল সে।

কিছুক্ষণ পর ফোন এল রানার।

ওকে শুধু বললেন অনোরিয়া, জরুরি ভিত্তিতে ওর সঙ্গে কথা বলতে চান ফাদার অ্যাব্রাটা।

একবারও বাধা না দিয়ে চুপচাপ ফাদারের কথা শুনল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'সিস্টার কি নিশ্চিত?'

পাঁচ মিনিট পর প্রেযো ফিসো বোর্ডিং হাউস অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্টের টেরেসে আবারও বেরিয়ে এল রানা, কথা বলল রেমারিকের

সঙ্গে। ওর বক্তব্য যেন ভয়ঙ্কর কোনও অ্যাসিড, আরও গনগনে করে তুলল ওদের মনের আগুন।

'আমরা এখন জানি, দ্য ডায়মণ্ড রিঙের সর্বোচ্চ নেতা টমের বাবা রোমিও কোসেলি!'

সাতাশি

জীবনে কখনও মা-র সঙ্গে বাড়তি কথা বলেননি কর্নেল বার্নাদো গুগলি। প্রচুর বিত্ত, মস্ত সম্পত্তি, ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্তা, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা ও আকাশ সমান গর্ব তাঁর মাকে তুলে নিয়ে গেছে অনেক ওপর পর্যায়ের সমাজে।

আর এ কারণেই মা-র মুখোমুখি হবেন ভেবেই বড় ভাইয়ের সাহায্য নিয়েছেন গুগলি। তাঁর ধারণা, বড় ভাই প্রফেসর ও সম্মানী লোক বলে, তাঁকে অনেক বেশি ভালবাসেন মা। ভাইকে পুরো একঘণ্টা ব্রিফ করেছেন তিনি। তারপর গম্ভীর চেহারা করে দু'জনে ঢুকে পড়লেন মা-র ড্রয়িং রুমে।

সত্তর বছর চলছে সেনোরা গুগলির। এমনই ঝুনঝুনা, পাকা বুদ্ধি তাঁর; টের পেলে লজ্জা ও হিংসায় নীল হয়ে যেত কূটনীতির গুরু ম্যাকিয়াভেলির অন্তর। বছর পঞ্চাশেক আগে এক প্রধানমন্ত্রী ও সেনোরা গুগলির বিষয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল একটা গুজব। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে গিয়ে বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোকের টাক হাতড়ে দেন তিনি, প্যান্টের সামনের অংশে চাপড় মেরে বলে বসেন, 'তুমি ওপরেও

যেমন বেয়াদব, নীচেও তেমনি ছোটলোক।'

এর ফলে পরের তিন বছর গুগলি পরিবারের সবাইকে বাস করতে হয়েছিল রোম থেকে দূরে গ্রামের প্রাসাদে।

দুই ছেলেকে বসতে দেখে চোখে মায়া আনতে চাইলেন ভদ্রমহিলা। সবসময় বাজে পেশা বেছে নেয়ার কারণে ছেলেদের ডেঁটে রাখেন, কিন্তু অন্তরে ভালবাসেন আর সব মা-র মতই।

সেটা ঠিকই টের পান দুই গুগলি। কিন্তু, এখন যে কথা বলতে এসেছেন বার্নাদো, সেটা মা কীভাবে নেবেন, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন তিনি। আসলে দুনিয়ার বেশিরভাগ লোককে বুঝতে ভুল হয় না তাঁর, কিন্তু মা কখন কী করবেন, তা বোঝা দায়।

চুপচাপ বসে কর্নেল বার্নাদো গুগলির কথা শুনলেন ওঁর মা। কখনও ছোট ভাইয়ের সাহায্যে এলেন বিখ্যাত সার্জন। পুরো আধঘণ্টা ধরে মাকে সব বুঝিয়ে বললেন দুই ভাই। মাঝে মাঝে মাথা দোলালেন তাঁদের মা। সব শুনে মাথা দুলিয়ে বললেন, 'আগেই জানতাম, যেদিন মা-র পেট থেকে পড়ে দুনিয়ায় দম নিল, তখন থেকেই একটা কলের পুতুল গামেল ব্যারেস্টে। তোদের বলতে দ্বিধা নেই, আরও বহু আছে এমন কলের পুতুল। ...কমবয়সে মরে গেল তোদের বাপ, কিন্তু ওকে কেন বিয়ে করেছিলাম জানিস? ও কারও পুতুল ছিল না।' ভালবাসা ভরা কণ্ঠে বললেন, 'এমন কী আমার পুতুলও ছিল না ও।'

হাসলেন দুই গুগলি।

প্রফেসর গুগলি বললেন, 'মাম্মি, আবছা মনে আছে বাবাকে। তিনি কখনও আপনার সঙ্গে গলা উঁচু করে কথা বলতেন না।'

'তার অন্য উপায় ছিল,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সেনোরা গুগলি। 'ঠিক আছে, এবার বল্, ওই অশুভ সভা ঠেকাতে কী করতে পারে

বুড়ি এক মহিলা?'

সামনে ঝুঁকে বললেন কর্নেল গুগলি, 'আগামী রবিবার রাতে দো গুচ্চি ভিলার প্রাইভেট চ্যাপেলে শয়তান পূজারীরা জড় হবে। সম্ভবত মানুষ বলি দেবে ওরা। সভা চালাবে বিশপ ল্যারেনযো। আমি এবার ব্যাখ্যা করে বলছি...'

তাঁর মা হাত তুলে বাধা দিলেন। 'কিছুই ব্যাখ্যা করতে হবে না তোকে। তিন বছর আগে ওর নীতিভ্রষ্ট বাবার কাছ থেকে অনেক সম্পত্তি আর টাকা পেয়েছে সে। আর এই তিন বছরে কচি মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গম বা ড্রাগসের সবই চিনে গেছে ছোকরা। ধর্মের লেজ ধরে রেখে গোপনে সাধনা করছে শয়তানের। গত কয়েক বছর আগে যখন পদমর্যাদা বাড়ল, তখনই বুঝেছি, পুরো ধর্ম ডুবিয়ে ছাড়বে ওই ছোকরা। এসব আমার কাছে পুরনো খবর। আমাকে কী করতে বলিস তোরা?'

'কাজটা সহজ,' বললেন কর্নেল। 'কিন্তু বিপজ্জনক।'

মাথা তুলে হাসলেন মাদাম গুগলি। 'হাহ্! আমার যা বয়স, কিছুই চমকে দেয় না। খুশি হব অদ্ভুত কিছু করতে পারলে। আমাকে কী করতে হবে?'

বড় ভাইয়ের দিকে তাকালেন কর্নেল। খেয়াল করলেন দ্বিধান্বিত হয়ে গেছেন সার্জন। আবারও মা-র দিকে ফিরলেন গুগলি। 'গামেল বলেছে, সার্চ করা হবে নতুন সবাইকে। ওই সভা হবে দো গুচ্চি ভিলায় রাত এগারোয়। তখন দেয়া হবে ড্রিঙ্ক আর পেস্ট্রি। তারপর সাড়ে এগারোটায় আলখেল্লা পরে তিন শ' ফুট হেঁটে গিয়ে সবাই ঢুকবে গুচ্চির ব্যক্তিগত চ্যাপেলে। শুরু হবে অশুভ যজ্ঞ। চারপাশে পাহারা দেবে দ্য ডায়মণ্ড রিঙের অন্তত বিশজন প্রহরী। সবাই দক্ষ সৈনিক।' মা-র দিকে তাকালেন তিনি। 'আগে কখনও বলেছি আমার এক বন্ধুর কথা? ওর নাম মাসুদ রানা।'

মাথা দোলালেন সেনোরা গুগলি। 'বলেছিস। ভবিষ্যতে ওর সঙ্গে দেখা হলে খুশি হব। ওর উচিত ছিল ষাট বছর আগে আমার সঙ্গে দেখা করা। তা হলে তোরা ওর ছেলে হতি।'

মুচকি হাসলেন দুই গুগলি।

মা-র ষোলো বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন তাঁদের বাবা।

'মাম, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, অশুভ সভায় আপাতত অপারেশন চালাতে পারবে না কারাবিনিয়ারি,' বললেন গুগলি।

'বুঝলাম,' বললেন তাঁর মা, 'ধারণা করছি, ওই কাজ শেষ করবে তোর বন্ধু ওই মাসুদ রানা।'

মাথা দোলালেন কর্নেল। 'সঙ্গে থাকবে দক্ষ টিম। এদিকে ওর ছোট ভাই ঢুকে পড়বে দ্য ডায়মণ্ড রিঙের বুকের ভেতর। ওই সভায় থাকবে সে। কিন্তু দো গুচ্চি ভিলায় সেই রাতে সার্চ করা হবে নতুন সবাইকে। চ্যাপেলের দিকে যাওয়ার সময় ওর কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকা খুব জরুরি । এ ছাড়া, চাই ছোট ট্র্যান্সমিটার। এখন কথা হচ্ছে...'

হাত তুলে বাধা দিলেন সেনোরা গুগলি। 'না, এবার যা বলার আমি বলছি। তুই চাস দো গুচ্চি ভিলায় অস্ত্র আর ট্র্যান্সমিটার বিশেষ কোনও জায়গায় থাকুক। তাতে আমি তো সমস্যা দেখছি না।'

হাসলেন সার্জন গুগলি। 'মামা, এটা কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক। আগে শুনে নাও বার্নাদোর-প্ল্যান।'

মাথা নেড়ে হাসলেন সেনোরা। 'যদি ওই কাজ করি, তা করব নিজের প্ল্যান মত। দো গুচ্চি ভিলায় ঢুকে পড়া আমার জন্যে কঠিন কিছু না। যাব আগামীকাল বিকেলে। আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে ওদের বংশের নামডাক। আমি দেখা করতে চাইলে খুব খুশি হবে। কাজেই ডাকবে কফি ও ড্রিঙ্কের জন্যে। আর ওদের মেয়েদের অশিক্ষিত, নিচু মনকে তৃপ্ত করার মত কিছু গুজব

শোনাব। নাম যাই থাক, গত এক শ’ বছরে নিজেদের এলাকায় আটকা পড়ে গেছে ওরা।’ হেসে ফেলে চোখ টিপলেন ছোট ছেলের উদ্দেশে। ‘আমার কাছ থেকে ফোন পেলে সমাজে গুরুত্ব পাবে তারা। তা ওই অশুভ সভার চেয়ে বেশি আনন্দ দেবে ওদেরকে।’ চোখ বুজে ফেললেন, তারপর বললেন, ‘মনে আছে ওদের ভিলা। যদিও বেশ কয়েক বছর আগে গেছি। ভিলার ভেতরে ডানদিকে ড্রেসিং রুম। আমার ভুল না হয়ে থাকলে, ওখানেই পোশাক পাল্টে নেবে সবাই।’

মা থামতেই বললেন কর্নেল, ‘ট্র্যান্সমিটার আর পিস্তল ওখানে রাখতে পারবে না তুমি?’

দয়া ও স্নেহ ভরা চোখে তাঁকে দেখলেন সেনোরা গুগলি। মনে হলো বলে উঠবেন: ‘আশা করি একদিন বড় হবি তুই!’ ঠোঁট থেকে হাসি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই খোঁচার সুরে বললেন, ‘বার্নাদো, দুটো ট্র্যান্সমিটার আর দুটো পিস্তল দিবি। রাখব আলাদা দুই জায়গায়। ড্রেসিং রুমে একটা করে। সেক্ষেত্রে দুটো সুযোগ পাবে রানার ভাই। আগামীকাল তোকে বলে দেব কোথায় রাখব ওগুলো।’

একটু লজ্জা পেয়ে বললেন কর্নেল গুগলি, ‘মাম, তুমি কী যে উপকার করলে আমার!’ উঠে দাঁড়াতে গেলেন তিনি।

বিরক্ত চেহারা করে মাথা নাড়লেন সেনোরা গুগলি। ‘চুপ করে বসে কথা শোন্, বার্নাদো! তুইও, কসাই!’ বড় ছেলেকে দেখে নিলেন। ‘কাজ গছিয়ে দিয়ে আমার কথা ভুলবি না তোরা! কুকুরের ছাও গামেল যা বলেছে, তা কাহিনির মাত্র একাংশ। তোরা ভাবিস আমি বুড়ি বেটি, কিন্তু ভাবতেও পারবি না, তোদের চেয়ে অনেক বেশি শুনি বা দেখি। বার্নাদো ওই সাপের গর্তে ঢুকলেই সব গোপন রাখার চেষ্টায় নামবে একদল ক্ষমতাশালী লোক। তখন কাজে আসবে আমার কানেকশন। তদন্ত করতে

কোন্ বিচারকের সাহায্য নিবি তুই, দারোয়ান?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিলেন কর্নেল গুগলি।

তাতে সন্তুষ্টির সঙ্গে মাথা দোলালেন মা। 'সৎ লোক। হাল ছাড়বে না। ওর বাবা মরেছে মাফিয়ার হাতে। মুসোলিনির হাতে দাদা। ঠিক লোককেই বেছে নিয়েছিস।' চকচক করছে মহিলার দু'চোখ। খুশি মনে বললেন, 'আরও কিছু কাজ করতে বলব তোকে।'

একবার বড় ভাইকে দেখে নিয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন কর্নেল। 'সেসব কী, মাম?'

'সব শেষ হলে আমার এখানে আনবি তোর ওই বন্ধু মাসুদ রানাকে। আপাতত আমার একটা নির্দেশ ওকে জানাবি। সবাইকে খুন করলেও যেন দ্য ডায়মণ্ড রিঙের বড় কোনও নেতাকে বাঁচিয়ে রাখে। আহত হোক, কিন্তু যেন বাঁচে। পরে তোর বা বিচারকের তদন্তের সময় কাজে আসবে। সহজ হবে নোংরার ঝুলি ঝাড়া।' কঠোর হয়ে গেল বৃদ্ধার কণ্ঠ: 'ওখানে প্রথম কাজ রানা বা ওর ভাইয়ের হওয়া উচিত, খুন করা ওই বিশপকে।'

'কেন, মামি?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন গুগলি।

কড়া সুরে বললেন তাঁর মা: 'বয়স হচ্ছে, কিছু তো শেখ্, বার্নাদো! খামোকা ভ্যাটিকানকে বিরক্ত করা উচিত নয় তোর!'

অষ্টাশি

প্রেযো ফিসো বোর্ডিং হাউস অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্ট ত্যাগ করে রোমের

উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে ওরা। শহরের ছোট কয়েকটা হোটেলে পৌঁছে গেছে রানা এজেন্সির অন্তত দশজন সাহসী, যোদ্ধা এজেন্ট। গগলের কাছ থেকে পেয়ে গেছে দরকারী সব অস্ত্র। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সাঙ্কেতিক বাংলায় নিজেদের প্ল্যান ছেলেদেরকে জানিয়ে দিয়েছে রানা।

সিম কর্নেলিস ও অসি কালাহান গেছে কালো এক গাড়ি নিয়ে। বিএমডাব্লিউ চালিয়ে পিছু নিয়েছে পেঁচা ফুলজেন্স ও পিটার লারসেন। তৃতীয় এক গাড়িতে রানা।

প্রথম গাড়ি রওনা হওয়ার আগে দলের সবার সঙ্গে আলিঙ্গন করেছে সিম ও অসি। বাদ পড়েনি রেমারিক, ফুরেলা ও জেনি। দুই মার্সেনারি বিদায় হওয়ায় বার-এর পেছনে চলে গেছে রেমারিক। দ্বিতীয় গাড়ি নিয়ে পেঁচা ও পিটার চলে যাওয়ার পর ফুরেলাকে আলিঙ্গন করেছে রানা, তারপর ঘুরে দেখেছে জেনিকে। নরম সুরে বলেছে, 'কাজ শেষ হলে আপাতত গুগলির অ্যাপার্টমেণ্টে উঠব। এক দিন পর আসবে রামিন।'

রানাকে জড়িয়ে ধরে অশ্রু লুকিয়ে বলেছে জেনি, 'আমার জন্যে চিন্তা করবেন না, মাসুদ ভাই, আর কখনও বোকামি করব না।'

জেনির মাথায় হাত বুলিয়ে এদিক ওদিক দেখেছে রানা। কোথাও নেই রেমারিক। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর দেখল ওকে। মুখ কালো হয়ে গেল ওর। রেমারিকের পরনে পুরনো জিন্স ও ফ্যাকাসে ডেনিম শার্ট। হাতে বড় ক্যানভাস ব্যাগ। ওই ব্যাগ চিনে ফেলল রানা। পুরনো জিনিস। বেশ কয়েক বছর আগে আফ্রিকার একের পর এক যুদ্ধে যোগ দিত রেমারিক ওটা হাতে।

বারকয়েক মাথা নেড়েছে রানা। তারপর বলেছে, 'না, রেমারিক। গুয়াতেমালায় যাওয়াই উচিত হয়নি তোমার। শপথ ভাঙা ঠিক নয়।'

মাথা নেড়েছে রেমারিকও ‘ভাল করেই জানো, পরিস্থিতি এমন হলে কী বলত জেসমিন।’ হাতের ব্যাগ দেখাল। ‘ভেতরে আমার পুরনো এসএমজি। আধুনিক কিছু না। কিন্তু নতুন করে অন্য কোনও অস্ত্র প্র্যাকটিস করার সময়ও নেই।’

‘বাদ দাও, রেমারিক,’ আবারও বলেছে রানা। ‘আমার সঙ্গে এমনিতেই ভাল একটা দল আছে।’

আবারও মাথা নেড়ে বলেছে রেমারিক, ‘ভাল ওরা, কিন্তু নিখুঁত নয়।’ ব্যাগ রেখে ফুরেলাকে আলিঙ্গন করল সে, তারপর গালে চুমু দিয়ে বলল, ‘জেনির দিকে খেয়াল রেখো, ফুরেলা। তোমার জানা আছে টাকা কোথায়। আগামীকাল রাতে উঠবে রেজিনা হোটেলের টপ ফ্লোরের সুইটে। আগেই বুক করা হয়েছে ওটা। সঙ্গে অস্ত্র রাখবে, ভুলেও বেরোবে না ওই সুইট ছেড়ে। পরে যোগাযোগ করব।’ জেনিকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু দিয়ে বলেছে, ‘একদম চিন্তা কোরো না। তোমার মাসুদ ভাই আর রামিন ভাইয়ার ওপর চোখ থাকবে আমার।’

শক্ত করে ওকে ধরেছে জেনি।

ওর কাঁধের ওপর দিয়ে রানাকে দেখে নিয়ে সহজ সুরে বলেছে রেমারিক, ‘ভুলে গেলে, আমি ইতালিয়ান?’

রোমের সেফ হাউসের লাউঞ্জে রানা ঢুকতেই চোখ তুলে ওকে দেখল দুর্ধর্ষ একদল যুবক। নানান দেশের তারা, কিন্তু সংখ্যায় বেশি বাঙালিরা। সবাই অবাক হয়েছে রানার সঙ্গে রেমারিককে দেখে। লড়াকু ইতালিয়ানের হাতে ওয়ারব্যাগ।

‘আমাদের দলে আরেকজন যোগ দিয়েছে,’ মন্তব্য করল রানা।

রানা এজেন্সির ছেলেরা চুপ করে আছে। কিন্তু সিম কর্নেলিস ও অসি কালাহানের চেহারায় সত্যিকারের বিস্ময়। উঠে দাঁড়িয়ে

হাসতে শুরু করল ওরা।

'সত্যিকারের ওস্তাদ হাজির!' বলল অসি, 'লেআউট নিয়ে আলাপ করছিলাম। সিম বলছিল, চ্যাপেলের পুবের টিলায় মেশিন-গানার থাকলে নিশ্চিন্ত থাকা যেত।' রানা এজেন্সির ছেলেদের দিকে তাকাল সে। 'সামনে দেখছ দুনিয়ার সেরা মেশিন-গানার। নিজের পিঠ বাঁচাবার চিন্তা থাকল না।'

রেমারিকের দিকে তাকালেন কর্নেল গুগলি। চোখে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। সামনে বেড়ে আলিঙ্গন করল দুই ইতালিয়ান।

শেষবারের মত হামলার প্ল্যানিং নিয়ে কথা হবে, তাই স্প্যানিশ স্টেপসের দামি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে গোপনে হাজির হয়েছে জ্যাঁ মউরোস। রানাকে জানিয়ে দিল, পারফেক্ট ফর্মে আছে রামিন। পরক্ষণে মুচকি হেসে বলল, 'অবশ্য গত কয়েক রাতের অক্লান্ত পরিশ্রমে একটু দুর্বল।'

বৃত্তাকার মস্ত টেবিল ঘিরে বসল সবাই। মাঝে রাখা হলো দো গুচ্চি ভিলা, ব্যক্তিগত চ্যাপেল ও চারপাশের স্কেল ড্রয়িং।

হলদেটে এক ছোট নোট-বুক সামনে রেখেছে পিটার। ওটার ভেতর মাকড়সার জালের মত হাতের লেখা। প্রথমে মুখ খুলল ডেনিশ পুলিশ অফিসার: 'জেনারেল গামেল ব্যারেস্টের কাছ থেকে পাওয়া সব তথ্য এখানে আছে। এ ছাড়া, আছে অন্য সূত্রে পাওয়া ও কর্নেলের মা-র তরফ থেকে পাওয়া তথ্য।' নিজের নোট-বুকে চোখ রাখল সে। 'প্রথম কথা, কর্নেল গুগলি জানিয়েছেন: পুলিশের প্যাথোলজিস্টের রিপোর্টে বলা হয়েছে: হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে জেনারেল গামেল ব্যারেস্টে, তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। কাজেই ধরে নিতে পারি, দ্য ডায়মণ্ড রিং ভাবতেও পারবে না, তাদের অশুভ সভায় সমস্যা তৈরি হতে পারে। এদিকে কর্নেলের মা রেখে এসেছেন দো গুচ্চি ভিলার দুই জায়গায় পিস্তল ও ট্র্যান্সমিটার।' মউরোসকে দেখাল

লারসেন। 'বলে দেয়া হয়েছে ওগুলো কোথায় আছে। এ তথ্য রামিনের কাছে পৌঁছে দেবে মউরোস। ওগুলো কোডেড ট্র্যান্সমিটার। রামিনের কাছ থেকে হামলার সিগনাল এলে কাজে নামব আমরা। টিঁট-টিঁট আওয়াজ তুলবে ট্র্যান্সমিটারের রিসিভার। তার আগেই নিরস্ত্র করা হবে কম্পাউণ্ডের চারপাশে প্রহরারত দ্য ডায়মণ্ড রিঙের লোকদের। তিন মাইল দূরে থাকবে কর্নেল গুগলির টিম। আমরা সরে যাওয়ার পর সিগনাল পাবে তাদের ট্র্যান্সসিভারের মাধ্যমে।' রানার দিকে তাকাল পিটার। 'এবার প্ল্যানের ব্যাপারে বলবে, রানা।'

রানার পাশেই বসে আছে রেমারিক। গভীর মনোযোগ দিল কাগজে দাগানো কম্পাউণ্ডে। পুরো একমিনিট ওটা দেখল রানাও, তারপর মাথা দোলাল। ল্যাগো দি বোলসেনার পাহাড়ি এলাকা থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে ওই ভিলা। চারপাশে ঘন জঙ্গলের মত ঝোপঝাড়, গাছপালা। মুখ খুলল রানা, 'রানা এজেন্সির ছেলেরা চোখ রেখেছিল। ওখানে গার্ডদের কাছে নাইট সাইট নেই। আমাদের আছে ট্রাইলক্স নাইট ভিশন। গোপনে ঢুকে পড়ব গ্রাউণ্ডে। সিম, অসি আর মউরোসের সঙ্গে থাকবে রানা এজেন্সির তিনজন করে ছেলে। ওদের কাজ হবে গার্ডদের চিহ্নিত করা এবং সুযোগ বুঝে ব্যবস্থা নেয়া। কোনও আওয়াজ চলবে না... গুলি তো একদম না। টিলার দিক কাভার করবে রেমারিক। প্রয়োজনে ওকে সাহায্য করবে পেঁচা। কালো সভা শুরু হওয়ার পর হামলা করব আমরা। চেষ্টা করব বলি দেয়ার আগ মুহূর্তে চ্যাপেলে ঢুকতে। রামিন সিগনাল দিলে প্রথম সুযোগেই গুলি করে ফেলে দেয়া হবে বিশপটাকে। তার আগে একবার ভিলার লাইব্রেরি থেকে ঘুরে আসব। আমাদের সঙ্গে থাকবে গ্রেনেড ও স্মল আর্মস্। বিশপ খুন হলেও অন্য কেউ অস্ত্র না বের করলে খুন করা হবে না। বাধ্য হলে শেষ করে দেয়া হবে গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তা ও

গিয়ারডিনি ক্যালভেসিওকে। রামিনের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। ওর হাতে ছেড়ে দেব রোমিও কোসেলিকে। কিন্তু তাকে শেষ করা হবে না। পরে তার পেট থেকে কথা বের করবে কারাবিনিয়ারি।'

পিটারকে একবার দেখে নিয়ে রানা এজেন্সির এজেন্ট আবিদ ও খোরশেদের দিকে তাকাল রানা। 'তোমরা দুটো মাইক্রোবাস নিয়ে ভিলা থেকে এক কিলোমিটার দূরে অপেক্ষা করবে। কর্নেল গুগলির টিম পৌঁছবার পাঁচ মিনিট আগে হাজির হবে চ্যাপেলের সামনে। ওই এলাকা থেকে তিন বা চার কিলোমিটার দূরে থাকবে চারটে প্রাইভেট গাড়ি। দেরি না করে সবাই ফিরব সেফ হাউসে। পরদিন ভোরে রওনা হব যে যার গন্তব্যে।'

'চ্যাপেলের ভেতর ওই দলের লোক গোলাগুলি আরম্ভ করলে কী করবে?' রানার দিকে তাকালেন কর্নেল।

দ্বিধাহীনভাবে বলল রানা, 'কারও হাতে অস্ত্র দেখলে ফেলে দেয়া হবে। চিন্তা কোরো না, রোমিও কোসেলিকে হাতে পাবে। ওটা নিশ্চিত করবে রামিন।'

'সেক্ষেত্রে আমার কোনও আপত্তি নেই,' বললেন গুগলি।

উননব্বই

খিলখিল করে হাসছে সিমোনা। ঘুমের সময়টা বাদ দিলে গত কয়েক দিন বেশিরভাগ সময় হেসে চলেছে। আনন্দে বা খুশিতে

যে হাসছে, তা ঠিক নয়। ওকে নিয়মিত দেয়া হচ্ছে ড্রাগসের বড়ি। দায়িত্ব মনে করে কাজটা করছে ওর নতুন বাবা-মা।

ঝাপসা চোখে দারুণ সুন্দর বাড়ি দেখছে সিমোনা।

সবসময় হাসছে ওর বাবা-মা।

মাঝে মাঝে ভাবতে গিয়ে ওর মনে হচ্ছে: হয়তো এত সুখী হয় সব বাচ্চাই! চিন্তা নেই, খিদে নেই, ব্যথা নেই, শুধু আকাশে ভেসে যাওয়া নানান রঙের মেঘের সঙ্গে।

রোববার বিকেলে নতুন মা বলল, দূরে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে ওরা। দারুণ মজা লাগবে ওর।

কথাটা শুনে খিলখিল করে হাসল সিমোনা।

রাত সাড়ে নয়টায় বেজে উঠল ডোরবেল। দরজা খুলল মউরোস।

ডানা-কাটা পরীর মত নাচতে নাচতে ভেতরে ঢুকল ক্যাথেরিনা ক্যাপরেস, হাতে লাল টুপি। হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার সেরা বুল শট আনো তো, মউরোস!'

টেলিভিশনে ফুটবল ম্যাচ দেখছিল রামিন, উঠে দাঁড়িয়ে জড়িয়ে ধরল যুবতীকে। ওর কানে কামড় দিয়ে ফিসফিস করে বলল ক্যাথেরিনা, 'আমি খুব খুশি তোমাকে পেয়ে।'

'কেন?'

'কারণ তুমি সত্যিকারের পুরুষ,' সঙ্গীর ঠোঁটে চুমু দিল সে।

পাল্টা চুমু দিয়ে খুশি হওয়ার ভঙ্গি করল রামিন। 'তাই?'

আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে টেলিভিশনের সামনে গিয়ে যন্ত্রটার সুইচ অফ করল ক্যাথেরিনা। ওর পরনে গোড়ালি পর্যন্ত কালো-নীল উলেন স্কার্ট। ওপরে রক্তের মত লাল হাই-নেক্‌ড্ কাশ্মিরী সোয়েটার। রামিনের মনে হলো না, নিচে কিছু পরেছে ওই মেয়ে।

ঘুরে ওকে দেখল যুবতী। মাথা সামান্য কাত করে খসখসে কণ্ঠে বলল, 'তুমি তো জানো, আসাদ, রোমে অনেক ফালতু

লোক আসে। মনে-প্রাণে সত্যিকারের ধনী যুবক কম। বেশিরভাগ কৌশলী প্রতারক। এমন ভান করে, তাদের টাকা আছে। তুমি তা নও। আজ বিকেলে আমাকে বলে দেয়া হয়েছে, রাতের সভায় যেন তোমাকে নিয়ে যাই। খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন ভদ্রলোক পরীক্ষা করে দেখেছেন তোমার ব্যাকগ্রাউণ্ড। ক্ষমতার অভাব নেই তাঁদের। এখন সন্তুষ্ট তাঁরা।'

বিরক্তির সুরে বলল রামিন, 'ও, তা হলে তোমরা অবাক হয়েছ যে আমি আসলে খাঁটি লোক?'

'অবাক হইনি,' বলল ক্যাথেরিনা, 'সন্তুষ্ট হয়েছি। শুনেছি ব্যাংকো দি রোমায় তোমার অ্যাকাউন্টে বিশ মিলিয়ন ডলার জমা রেখেছ। এখন জানি ওই টাকা এসেছে মিডল ইস্টের কোন্ ব্যাঙ্ক থেকে। এমন কী নামও বলতে পারব ওই ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের। অজানা নেই রোম ছেড়ে যাওয়ার পর লেখাপড়া করবে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে। এমন কী এ-ও জানি, তোমাকে পড়াবেন কোন্ কোন্ প্রফেসর।'

কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়েছে, এমন চেহারা করল রামিন। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'তা হলে আজ রাতের খেলা হয়তো সিরিয়াস কিছু। আবার এমনও হতে পারে, সত্যিই কিছুই হলো না, আসলে টাকা পাওয়ার জন্যে খেলা হচ্ছে আমার সঙ্গে।'

খুব গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল ক্যাথেরিনা ক্যাপরেস। 'ওটা কোনও খেলা নয়, আসাদ। গেলেই বুঝবে। এমন এক দৃশ্য, মনে গেঁথে থাকবে বাকি জীবন। হয়তো আর কখনও আগের মত হতে পারবে না।'

ড্রিঙ্ক নিয়ে এসেছে মউরোস। চোখে প্রশ্ন।

মাথা নাড়ল রামিন। ড্রিঙ্ক চাই না। ঘর ছেড়ে চলে গেল ফরাসি।

'আজ রাতে এখনও ড্রিঙ্ক করোনি, আসাদ?' জানতে চাইল

ক্যাথেরিনা।

'এখনও শুরু করিনি... পরে চালু করব।'

হাসল যুবতী। 'হ্যাঁ, পরে বহু কিছুই পাবে। পাগল হয়ে উঠবে আনন্দে। ভুলতে পারবে না বাকি জীবনেও।'

হাতঘড়ি দেখল রামিন। 'আমরা রওনা হব কখন?'

'দশ মিনিট পর,' বলল ক্যাথেরিনা। 'কিন্তু আগে দুটো কাজ করতে হবে।'

'সেগুলো কী?'

গ্লাস রেখে বলল মেয়েটা, 'আগে দাও পঁচিশ হাজার ডলার। তারপর খুলে ফেলো সমস্ত কাপড়।'

'টাকা না হয় দিলাম, কিন্তু পোশাক খুলতে হবে কেন?'

হেসে ফেলে কয়েক পা সামনে বেড়ে রামিনের ঠোঁটে চুমু দিল যুবতী। 'আগে ভালভাবে তোমাকে সার্চ করতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। আপত্তির কী আছে, ব্যথা তো লাগবে না, মজা লাগবে।'

টিটকারির বাঁকা হাসি হাসল রামিন। 'আপত্তি নেই আমার। আর টাকার কথা? বাকি অর্ধেক পাবে আগামীকাল।'

গম্ভীর হয়ে মাথা দুলিয়ে বলল ক্যাথেরিনা, 'তোমাকে বিশ্বাস করি। এটা আমার জন্যে ঝুঁকির, কারণ মনে হচ্ছে পড়ে যাচ্ছি তোমার প্রেমে।'

সন্দেহের চোখে মেয়েটাকে দেখল রামিন। প্যান্টের পকেট থেকে এনভেলপ বের করে বাড়িয়ে দিল। 'এই পঁচিশ হাজার।'

গুনে দেখল না ক্যাথেরিনা। সোয়েটার তুলে এনভেলপ দু'ভাঁজ করে রাখল স্কার্টের ওয়েস্টব্যাণ্ডে। মুচকি হাসল। 'এবার জন্মদিনের পোশাকে তোমাকে দেখতে চাই।'

আগে কখনও রামিনকে এত গভীর মনোযোগে সার্চ করেনি কেউ। পাকা কোনও পেশাদার ওই মেয়েকে বলে দিয়েছে, কী

করতে হবে। রামিনের পোশাকের প্রতিটি অংশ হাতড়ে দেখল ক্যাথেরিনা। বাদ পড়ল না সেলাই, ওয়েস্টব্যাণ্ড, কোটের বোতাম, আণ্ডারপ্যান্ট, জুতো ইত্যাদি। টেবিলে সোল ঠুকে কান পেতে শুনল সেই আওয়াজ।

রামিন ও রানা একবার ভেবেছিল ছোট কোনও ট্র্যান্সমিটার লুকিয়ে রাখবে কি না পোশাকে। ভাগ্যিস তা করেনি।

এবার রামিনের শরীর নিয়ে পড়ল ক্যাথেরিনা। প্রথমে হাঁ করিয়ে দেখে নিল মুখ। খেয়াল করে দেখল নতুন কোনও ফিলিং করা হয়েছে কি না। তারপর আঙুল ঢুকিয়ে দেখল দুই কান। কাজটা শেষ হলে রামিনকে বলল, যেন পা ফাঁক করে নিচু হয়ে দু'হাতে ধরে দুই বুড়ো আঙুল।

রামিন বুঝল এরপর কী আসছে। গুহ্যদ্বার হাতড়ে দেখল মেয়েটা। আশপাশও। সন্তুষ্ট হয়ে ওর মেরুদণ্ডে চুমু দিয়ে বলল, 'আসাদ, তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে পরিষ্কার পুরুষ।'

পাঁচ মিনিট পর রওনা হলো ওরা।

আগে কখনও ক্যাথেরিনাকে এই মার্সিডিয গাড়ি চালাতে দেখেনি রামিন। পেছনের সিটে বেঁটে এক কালচে চেহারার লোক। তার সঙ্গে ওকে পরিচয় করিয়ে দিল না ক্যাথেরিনা। রামিন বুঝে গেল, যাওয়ার পথে পুরো সময় ওর পিঠের দিকে তাক করা থাকবে পিস্তল।

রোমের কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে ওকে দেখল ক্যাথেরিনা। 'এবার বেঁধে দিতে হবে তোমার চোখ। বুঝতেই পারছ, এ ছাড়া উপায় নেই।'

'বুঝব না কেন,' বলল রামিন। পিছনের লোকটা নড়ে উঠতেই শুনল খসখস আওয়াজ। পরক্ষণে ওর চোখ ঢাকা পড়ল কালো সিল্কের স্কার্ফে।

নব্বই

ঘন কালো মেঘে ঢাকা পড়েছে এক ফালি রুপালি চাঁদ। ভিলা থেকে এক কিলোমিটার দূরে বড় গাছের এক জটলার ভেতর থামল ওরা। সবার পরনে কালো পোশাক, পায়ে রাবারের সোলের বুট। কালিতে চুবিয়ে শুকিয়ে নেয়া ক্যানভাস আর্মি ওয়েবিং। শরীরে ঝুলছে পাউচ। খুলি কামড়ে ধরা ক্যাপের নিচে ঢাকা পড়েছে চুল। অয়েন্টমেন্টের কারণে কুচকুচে কালো ভূতের মত হয়ে উঠেছে সবাই। এই পরিবেশে অভ্যস্ত। এসব ট্রেনিঙের ভেতর দিয়ে গেছে রানা এজেন্সির এজেন্টরাও। ফুলজেন্স ও পিটার ছাড়া অন্যরা মার্সেনারি, এক সময় ছিল আর্মিতে। সবার বুকের ওয়েবিঙে গ্রেনেড, কোমরের হোলস্টারে আগ্নেয়াস্ত্র, কাঁধে সাবমেশিন-গান। পাউচে বাড়তি ম্যাগাযিন। গলায় ঝোলানো ট্রাইলক্স নাইট ভিশন। অবশ্য পিটারের কাছে নালিশ করেছে পেঁচা: 'রানা আমাকে ইয়ারফোন আর রেকর্ডপ্লেয়ারও সঙ্গে রাখতে দিল না।'

এক সেকেণ্ড পর পিটার বুঝেছে, ওটা ছিল রসিকতা।

গাছের জটলার ভেতর বসে পড়েছে সবাই। ভিলার দিকে হাত তুলে ইশারা করল রানা। উঠে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে রওনা হয়ে গেল সিম কর্নেলিস, মিলিয়ে গেল আঁধারে। সবাই রওনা হওয়ার আগে রেকি করবে সে। পুরো পাঁচ বছর ছিল দক্ষিণ আফ্রিকান আর্মির দক্ষ স্কাউট। গোপনে চলে যেতে পারে বুনো হাতির দশ

ফুট কাছে। ওই একই কাজ করতে পারবে রানা, কিন্তু আপাতত দলের নেতা হিসেবে এখানে থাকা ওর জন্য জরুরি। হাতের ফ্ল্যাপ তুলে হাতঘড়ি দেখে নিল।

রাত সোয়া দশটা।

একেবারে শেষ সময়ে ভিলার কম্পাউণ্ডে ঢুকবে ওরা। পনেরো বা বিশ মিনিটের ভেতর নিরস্ত্র করবে গার্ডদেরকে।

পৌনে এগারোটায় ফিরল সিম কর্নেলিস। রানা ও রেমারিকের মাঝে বসে পড়ে ফিসফিস করে বলল, 'সব মিলে কমবেশি আঠারোজন। প্রায় সবার সঙ্গে মোবাইল ফোন ও রেডিও। অস্ত্র বলতে এসএমজি। কম্পাউণ্ডের দেয়াল শুকনো পাথরের। আট ফুট উঁচু। কোনও তার বা অ্যালার্ম নেই। ভিলা আর চ্যাপেলের পঞ্চাশ গজের মধ্যে গেছি। আমি থাকতেই এল সাতজন গেস্ট। চারজন মহিলা, তিনজন পুরুষ। বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে না ভিলা আর চ্যাপেলের মাঝে। কিন্তু যাওয়ার পথে এক্সটার্নাল ল্যাম্প আছে। দরকার হলে জ্বেলে নেবে। ওই দুই বাড়ির দরজার ওপরে জ্বলছে বাতি। উঁচু এক জানালা দিয়ে দেখেছি, আলো আছে চ্যাপেলেও। লাল বাতি। হয়তো ওই রঙের কাঁচের জন্যে লেগেছে ওরকম।'

সামনে ঝুঁকে রেমারিককে দেখল রানা। ঝিক করে উঠল ইতালিয়ানের সাদা দাঁত। নিচু স্বরে সবাইকে বলল রানা, 'দেয়ালের তিন দিক থেকে ভিলার দিকে যাবে। এক এক করে ঘুম পাড়িয়ে দেবে গার্ডদের।' আরেকবার হাতঘড়ি দেখল। 'পনেরো বা বিশ মিনিটের ভেতর নিরস্ত্র করবে ওদের। তারপর তৈরি থাকবে চ্যাপেলে যেতে। ততক্ষণে ভিলা থেকে ঘুরে আসব।' সিম কর্নেলিসের কাঁধে টোকা দিল রানা। 'রানা এজেন্সির ছেলেরা কাভার করবে ভিলা। আমার ফিরতে বড়জোর বিশ মিনিট। হাতে সময় থাকবে। তখন দরকার পড়লে পাল্টে

নেব প্ল্যান।'

দো গুচ্চি ভিলা থেকে তিন কিলোমিটার দূরে শাখা রাস্তায় গাড়ির ভেতর বসে আছেন কর্নেল বার্নাদো গুগলি। পেছনে আরও ছয়টা গাড়ি— তিনটা হার্ড-টপ জিপ, একটা প্রাইভেট গাড়ি, আর কালো দুটো আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার। শেষ দুটোয় আছে চব্বিশজন কারাবিনিয়ারি সৈনিক। কর্নেলের সেকেণ্ড অভ কমাণ্ড ক্যাপ্টেন প্যানক্রাযিয়ো নসিটো বসে আছে তাঁর পাশে। অধৈর্য হয়ে টোকা দিচ্ছে ডান হাঁটুতে।

'আমরা মুভ করছি না কেন, কর্নেল?' জানতে চাইল, 'এতক্ষণে গিন্নিকে নিয়ে ডিনারে বসে পড়েছে গুচ্চিদের কর্তা।'

চট্ করে একবার তাকে দেখে নিলেন কর্নেল গুগলি। ঠিক কী কারণে ওই ভিলায় তদন্ত করতে যাবেন, তা এখনও কাউকে বলেননি। ভাবলেন, ক্যাপ্টেন সম্পর্কে যা জেনেছেন, তা ঠিক হলে হয়। অত্যন্ত সৎ অফিসার। বুদ্ধিমানও। মুখ খুললেন গুগলি, 'আরও কিছু বিষয় নিয়ে ভাবছি, ক্যাপ্টেন। ওখানে সম্ভবত ব্যবসার কাগজপত্র নিয়ে বসেছে সে। আমরা যদি কলিং বেল বাজাই, আর তারা যদি ডিনারে থাকে; সে নিজে, তার স্ত্রী, বা ছেলে-মেয়েরা সময় পাবে দরকারী কাগজপত্র সরিয়ে ফেলতে। চাই যে যার বিছানায় যাক ওরা। ঘুমিয়ে পড়ুক। তারপর দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকব। গুচ্চি বুঝে ওঠার আগেই পৌঁছে যাব তার স্টাডি রুমে।'

'স্যর, বুঝবেন কী করে সে কখন ঘুমাবে?' জানতে চাইল ক্যাপ্টেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কর্নেল গুগলি। বোধহয় যথেষ্ট বুদ্ধিমান নয় ক্যাপ্টেন। 'আমাদের লোক নজর রাখছে ওই বাড়ির ওপর। রিপোর্ট করেছে, বাতি জ্বলছে শুধু নীচ তলায়। নীচের বাতি নিভে

যাওয়ার পর যখন জ্বলে উঠবে দোতলার বাতি, ওরা রেডিয়োতে জানিয়ে দেবে। আর তারপর যখন দোতলার বাতি নিভে যাবে, ধরে নিতে পারো ঘুমাতে গেছে তারা। তার আধঘণ্টা পর তাদের সদর দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকব আমরা।'

ক্যাপ্টেন অত বোকা নয়। জানতে চাইল, 'কিন্তু দোতলায় যদি একটা বাতি অনেক রাত পর্যন্ত জ্বলে? হয়তো ওই পরিবারের একজন ভুগছে ইনসমনিয়ায়... বই পড়ছে বা দেখছে পর্নো ভিডিয়ো?'

মুচকি হাসলেন কর্নেল। 'সেক্ষেত্রে রাত দুটোর পর যা-ই ঘটুক, ভেতরে ঢুকে পড়ব আমরা।' একবার দেখে নিলেন হাতঘড়ি। বুক পকেট হাতড়ে দেখলেন রানার দেয়া কালো, ছোট বাক্স। আগামী এক বা দেড় ঘণ্টার ভেতর টিঁট-টিঁট আওয়াজ তুলবে ওটা। তার অনেক আগেই ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হবে গুচ্চিদের। পালাতে পারবে না তাদের অতিথিরাও। ম্যাজিস্ট্রেট দু'জন চলে আসার পর, তাঁর কাজ হবে বেঁধে রাখা লোকগুলোকে কারাবিনিয়ারির হাজতখানায় নিয়ে যাওয়া।

একানব্বই

হাত ধরে নিয়ে চলেছে মেয়েটা। কয়েক পা যাওয়ার পর রামিন বুঝে গেল, জুতোর নিচে নুড়ি পাথর। কিছুক্ষণ হাঁটার পর শক্ত করে ওর হাত ধরল ক্যাথেরিনা। 'চার ধাপ উঠতে হবে।'

পায়ে সিঁড়ির ধাপ ঠেকতে উঠল রামিন। পরের তিন ধাপ সহজ হলো। পেরিয়ে এল একটা দরজা। পেছনে বন্ধ হয়ে গেল

কবাট।

'এবার চোখ থেকে স্কার্ফ খুলতে পারো।'

কালো সিল্কের কাপড় খুলে উজ্জ্বল আলোয় বারকয়েক চোখ পিটপিট করল রামিন।

ওরা দাঁড়িয়ে আছে বড় কোনও ভিলার হলওয়েতে। পায়ের নিচে পুরু কার্পেট। মাথার ওপর ঝাড়বাতি। দু'পাশের দেয়ালে পোর্ট্রেট। একটু দূরে খোলা দরজা। কথাবার্তার আওয়াজ আসছে ওদিক থেকে।

আবারও রামিনের হাত ধরল ক্যাথেরিনা, সামনে বেড়ে বলল, 'কেউ কারও নাম উচ্চারণ করবে না।' নিচু হয়ে গেল কণ্ঠ: 'খুব অবাক হবে... যখন দেখবে অশুভ অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন সত্যিকারের এক বিশপ।'

বিস্মিত বা হতভম্ব নয় রামিন। দুপুরে বিশপ ল্যারেনযোর বেশ কয়েকটা ছবি দেখেছে। ঠিকই চিনে ফেলবে ওই লোককে কালো ছাগলা দাড়ি, ঝোপের মত ভুরু আর কোঁকড়া চুল দেখে।

করিডোর ধরে এগিয়ে বামদিকে একটা দরজা দেখল রামিন। ওটা মেন্স ড্রেসিং রুম। ডানে সিঁড়ি। ওটা বেয়ে উঠলে সামনে পড়বে একের পর এক বেডরুম ও আরও ড্রেসিং রুম।

খোলা দরজা দিয়ে বামের ঘরে ঢুকে পড়ল ওরা। ভেতরে বেশ কয়েকজন। হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস। রামিন ও ক্যাথেরিনাকে দেখে ঘুরে তাকাল তারা। সাতজন পুরুষ, আটজন মহিলা। কেউ কেউ নড করল ক্যাথেরিনার উদ্দেশে। রামিনের সুদর্শন চেহারা ও সুঠাম দেহ দেখে প্রশংসা ফুটে উঠল মেয়েদের সতর্ক চোখে।

রুপালি ট্রে হাতে ওদের দিকে এল বয়স্ক বাটলার। তার কাছ থেকে দুই গ্লাস শ্যাম্পেন নিল রামিন ও ক্যাথেরিনা। মদ জিভে ঘুরিয়ে টের পেল রামিন, এই জিনিস অত্যন্ত দামি। অবাক হয়ে খেয়াল করল, পদমর্যাদা অনুযায়ী লাল গাউন পরেছে বিশপ

ল্যারেনযো। ওর চেয়েও দীর্ঘ সে। ওদিকে চেয়ে ভাবল রামিন, মাঝরাতের পর এই লোকের হৃৎপিণ্ডে বুলেট গেঁথে দিতে হবে। দেখল, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তা ও গিয়ারডিনি ক্যালভেসিও, কপালে ঘাম।

পুরুষদের পরনে দামি সুট, মহিলার পরনে দীর্ঘ স্কার্ট ও ব্লাউয। মহিলাদের ভেতর দু'জনের বয়স বিশের বেশি হবে না। অত্যন্ত সুন্দরী। আরও দু'জনের বয়স ত্রিশ হবে, অপরূপা। অন্য চারজন মধ্য বয়স্কা। তাদের একজন এখনও ধরে রেখেছে রূপ-যৌবন। অবশ্য, সে জন্য তাকে ব্যবহার করতে হয়েছে প্রচুর মেক-আপ। বিশপ, গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তা ও গিয়ারডিনি ক্যালভেসিও ছাড়া অন্য কাউকে চিনতে পারল না রামিন। অন্য দুই পুরুষ মধ্যবয়স্ক, মোটাসোটা।

চারপাশ দেখে ক্যাথেরিনাকে বলল রামিন, 'প্রাচীন আমলের গর্জাস স্টাইলে সাজানো ঘর। পুরো বাড়ি নিশ্চয়ই এভাবেই গোছানো? বাড়ির মালিক এখানে আছেন?'

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল ক্যাথেরিনা। 'এ ধরনের সভা হলে ছুটির দিনে তারা বেড়াতে যায়।' হাত ধরে রামিনকে নিয়ে বিশপের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'হ্যাণ্ডশেক করবে। আলাপ করতে পারো। কিন্তু সরাসরি কোনও প্রশ্ন করবে না। বিশ মিনিট পর পোশাক পাল্টে নেব আমরা, তারপর যাব চ্যাপেলে।'

বিশপ ল্যারেনযোর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল রামিন, আবারও বলল, সত্যিই এই ঘর দেখবার মত।

মাথা দুলিয়ে দেয়ালে ঝুলন্ত মস্তবড় এক ল্যাণ্ডস্কেপ ছবি দেখাল বিশপ। 'ক্যারাভাজ্জিও না। কিন্তু দাম কম নয়। আঁকা হয়েছিল এক শ' বছর আগে।' ক্যাথেরিনার দিকে চেয়ে ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে গলা নিচু করল, 'খুব খুশি হয়েছি তোমাকে এখানে দেখে। এই দুর্লভ অনুষ্ঠানে এমন সুন্দরী না এলে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়

না।' রামিনকে দেখাল। 'আর আমাদের এই নতুন সঙ্গীকে কাছে পাওয়ার জন্যে লোভী হয়ে উঠবে মহিলারা। বাদ পড়বে না পুরুষরাও।'

লোকটার কথা শুনে শিরশির করে উঠল রামিনের মেরুদণ্ড। মানুষ বলির পর বোধহয় শুরু হবে উভকামীদের যৌন উৎসব! পুরুষদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল। মোটা শুয়োরের মত গিয়ারডিনি ক্যালভেসিওর হাত থলথলে।

বাটলার সার্ভ করল পেস্ট্রি।

কিছুক্ষণের ভেতর রামিনের মনে হলো, ও উপস্থিত হয়েছে বিরক্তিকর কোনও ককটেল পার্টিতে। একটু পর পাশে থামল গিয়ারডিনি ক্যালভেসিও, ওর কনুই ধরে নিয়ে চলল পোশাক পাল্টে নেয়ার জন্য। ঘর ছেড়ে হলওয়েতে বেরিয়ে এল সবাই। বামে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল মহিলারা। তার আগে রামিনকে নিশ্চয়তা দেয়ার জন্য মিষ্টি করে হাসল ক্যাথেরিনা।

করিডোরের মাঝে গিয়ে ডানে একটা ঘরে ঢুকল পুরুষরা। বিশাল ঘরে দামেস্ক ওয়াল। নানান দিকে জরিদার কাপড়ে মোড়া সোফা। এক দিকের সেটিতে রাখা মাথার হুড সহ কালো আলখেল্লা। পেটের কাছে লুপে পরানো আছে বেল্ট। মেঝেতে নানান আকারের কালো স্যাণ্ডেল।

চারপাশ দেখে স্বস্তি পেল রামিন। একটু দূরেই দুটো দরজা। আগেই ওকে জানিয়ে দিয়েছে জ্যাঁ মউরোস, ওদিকে বাথরুম। ডানদিকের বাথরুমে আছে ওর দরকারী জিনিস।

দেরি না করে নির্লজ্জের মত পোশাক খুলছে গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তা ও গিয়ারডিনি ক্যালভেসিও। কয়েক সেকেণ্ডে হয়ে গেল ন্যাংটো ভাঁড়। বেলুনের মত ফোলা পেট গিয়ারডিনি ক্যালভেসিওর। কিন্তু নিজের শরীর ধসে যেতে দেয়নি গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তা। একটা আলখেল্লা তুলে রামিনের কাঁধে

ধরল। হাসছে। 'এটা ফিট হবে।'

কাপড় ছাড়তে হবে বুঝতে পেরে ঝটপট উদাম হলো রামিন। গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তার হাত থেকে পোশাক নিয়ে আদর করে রামিনের মাথা গলিয়ে পরিয়ে দিল ক্যালভেসিও। মেঝে প্রায় স্পর্শ করল ওটার নীচের অংশ।

'গুড ফিট,' হাসল রামিন, 'আমার দরজি খুব বেশি আপত্তি তুলবে না।'

'তোমার দরজি কে?' জানতে চাইল গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তা।

কড়া চোখে তাকে দেখল রামিন। 'আমাকে বলে দেয়া হয়েছে, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা বা জবাব দেয়া যাবে না। আমি কি ভুল শুনেছি?'

প্রশংসার দৃষ্টিতে ওকে দেখে নিল গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তা আর গিয়ারডিনি ক্যালভেসিও।

রামিন বুঝে গেল, এইমাত্র পাশ করেছে একটা পরীক্ষায়। পায়ের উপযুক্ত স্যাণ্ডেল পেয়ে সেটিতে বসল, আটকে নিল বাকল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'একবার ঘুরে আসতে হবে বাথরুম থেকে। চ্যাপেলে বোধহয় ওই জিনিস নেই।' ক্যালভেসিওর দিকে চেয়ে হাসল। 'অস্বীকার করব না, একটু নার্ভাস লাগছে।'

হাসল ক্যালভেসিও, দেখিয়ে দিল একটু দূরের দুই দরজা। আরেকটু হলে মন দমে যেত রামিনের। এইমাত্র ওই দুই দরজার দিকে রওনা হয়ে গেছে উলঙ্গ এক লোক। দ্রুত পায়ে তার পাশে পৌঁছে গেল রামিন, চাপা স্বরে বলল, 'কোনটা কোন্ জাতের জন্যে?'

কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'আমরা হলাম গিয়ে পুরুষ, একটা হলেই চলে।'

হাঁটার গতি বাড়াল রামিন, চট্ করে ঢুকে পড়ল ডানদিকের

দরজা দিয়ে। আগে কখনও এত বড় বাথরুম দেখেনি। এক দিকের দেয়াল ঘেঁষে চার পায়ার ওপর মস্ত এক এনামেল বাথটাব। পাশেই প্রকাণ্ড বেসিন। একটু দূরে টয়লেট ও তার পাশে বিডেট। আরেক দিকে দীর্ঘ ও উঁচু এক সাদা ওয়ারড্রোব। সোনালি রঙের পাতা কারুকাজ করা কাঠ। রামিন ভেবে পেল না, কীভাবে কর্নেল গুগলির মা অত ওপরে হাত তুললেন। তখনই দেখল, দেয়ালের পাশেই নড়বড়ে এক চেয়ার।

সরিয়ে এনে ওটার ওপর উঠল রামিন। পায়ের নিচে মড়মড় শব্দ তুলল পুরনো চেয়ার। সামনের দিকে পা রেখে ভারসাম্য বজায় রাখল। হাত খুঁজছে ওয়ারড্রোবের মাথার ওপর। কয়েক সেকেণ্ড পর হাতে লাগল শীতল ধাতু। অস্ত্র, দুই ইঞ্চি পুরু রাবার ব্যাণ্ড ও ছোট কালো ধাতব বাক্স পেড়ে নিয়ে নেমে পড়ল। মাত্র দশ সেকেণ্ডে কোমরে আটকে নিল রাবার ব্যাণ্ড। ওটার নিচে ঝুলতে লাগল কোল্ট ১৯১১ ও ট্র্যান্সমিটার।

দরকারী সবই পেয়ে গেছে, এবার চেয়ার আগের জায়গায় রেখে টয়লেটে ঢুকে হালকা হয়ে নিল।

বিরানব্বই

দূরে চেয়ে আছে রানা। নাইট গ্লাসের ভেতর দিয়ে মানুষগুলোকে হলদে ও অশুভ লাগছে। ভিলা থেকে বেরিয়ে চ্যাপেলের দিকে চলেছে সবাই। হুড সহ কালো আলখেল্লা পরনে সামনে হাঁটছে মহিলারা। পেছনে পুরুষরা। হুড পরা বলে চেনা গেল না

রামিনকে। কিন্তু তখনই দলের পেছনে একজন হাত দিল কোমরে। তিন সেকেণ্ড পর রানার ক্যানভাস্ পাউচের ভেতর তিনবার বেজে উঠল সিগনাল।

ওর পাশে শুয়ে আছে রেমারিক। ফিসফিস করে বলল, 'ভাল হয়েছে, রামিনের সঙ্গে এখন অস্ত্র আছে। আমরা হামলা করলেই লোকগুলো ধরে নিত, এই তরুণ ডেকে এনেছে শত্রু। জানি না তাদের কাছে অস্ত্র আছে কি না, কিন্তু অন্তত আত্মরক্ষার উপায় থাকল ওর।' নাইট গ্লাস তুলে ভিলার পেছনের কোনা দেখল সে। রানা এজেন্সির ছেলেদের নিয়ে ওদিকে চলে গেছে সিম কর্নেলিস, কালাহান ও মউরোস।

ভিলার দিকে চেয়ে আছে পেঁচা।

ওরা আছে তিন শ' গজ দূরে ঝোপের ভেতর।

কম্পাউণ্ডে ঢুকবার পর পেরিয়ে গেছে প্রায় বিশ মিনিট।

'কিছু দেখলে?' পেঁচার কাছে জিজ্ঞেস করল রেমারিক।

ঘোঁৎ করে উঠল ফুলজেন্স। 'শালারা আমাকে সঙ্গে নিল না। দেখব কী! বিশ মিনিটের বেশি হয়েছে, কারও কোনও সাড়া নেই। ঘুরে চলে গেল ভিলার ওদিকে।'

'বিপদে পড়ল না তো,' রেমারিকের কণ্ঠে দুশ্চিন্তা।

আশ্বস্ত করবে ভাবল রানা, কিন্তু তখনই ওর পাশের জমিতে ধুপ আওয়াজ শুনল। পেটে ভর দিয়ে শুয়ে পড়েছে সিম কর্নেলিস। বড় করে দম নিচ্ছে। নিচু স্বরে বলল, 'কাজ প্রায় শেষ। টুলে বসে ভিলা আর গ্যারাজের দরজা পাহারা দেয়ার কথা এক গার্ডের, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছিল। গলা ফাঁক করে দিলেও বুঝত না কিছু। আমি শুধু ওর মাথায় পিস্তলের মাঝারি একটা টোকা দিয়েছি। পাশের ঝোপে ঘুমাচ্ছে এখন।'

'তুমি এলে কোন্দিক থেকে?' ফিসফিস করল ফুলজেন্স।

'যেদিক দিয়ে গেছি, সেদিক দিয়েই ফিরেছি,' বলল সিম।

‘যাহ্, মিথ্যা কথা!’ বলল ফরাসি মস্তান। ‘সর্বক্ষণ ওদিকে চোখ ছিল আমার।’

চাপা হাসল কর্নেলিস। ‘পেঁচা, মাথায় গেঁথে রাখো, তোমার প্যান্ট খুলে নিলেও টের পাবে না।’ রানার দিকে তাকাল। ‘এতক্ষণে ঘুম পাড়িয়ে দেয়ার কথা বেশিরভাগ গার্ডকে। সত্যিকারের কাজের তোমার ছেলেরা। এবার যেতে পারো।’

উঠে দাঁড়িয়ে ঝোপঝাড় ও বড় গাছের আড়াল নিয়ে রওনা হলো রানা, মাত্র তিন মিনিটে পৌঁছল ভিলার সদর দরজায়। করিডোরে ঢুকে পৌঁছে গেল শেষ মাথায়। আসবার সময় দু'পাশের ঘরে উঁকি দিয়েছে, ওগুলো লাইব্রেরি নয়। ডানদিকের দরজা খোলা, বাতি জ্বলছে ভেতরে। ঢুকল। ক্যাণ্টারায়া ঠিকই লিখেছিল। মস্ত বড় ঘর আসলেই লাইব্রেরি। এদিক ওদিক না দেখে দরজা বরাবর পেছনের দেয়ালের কাছে চলে গেল রানা। বুকশেলফে চোখ রেখে খুঁজতে লাগল। নানান বই। ওর দরকার একটা ডায়েরি।

মনোযোগ দিয়ে বই ঘাঁটছে রানা, হঠাৎ টোকা পড়ল কাঁধে। খুব নরম সুরে বলে উঠল কেউ, ‘স্যর, আপনি এখনও চ্যাপেলে যাননি?’

ধরা পড়েছে বুঝে ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। তখনই শুনল আঁৎকে উঠে বলল লোকটা: ‘আরিব্বাপরে, গেছি!’

এক লাফে পিছিয়ে গেছে বয়স্ক লোকটা। পরনে বাটলারের পোশাক। গভীর রাতে কুচকুচে কালো রানাকে ভূতের মত দেখে ভীষণ ভয় তার চোখে। সেই ভয় দূর করে দিল রানা, সামনে বেড়ে মাপা হাতে পিস্তলের বাঁট নামিয়ে আনল তার মাথার তালুর ওপর।

‘ওরেহ্!’ বলেই কাত হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল বাটলার। আর নড়াচড়া নেই। ওই ঘুম ভাঙবে কমপক্ষে তিনঘণ্টা পর

কারাবিনিয়ারি জেলখানায়।

ফিরে আবারও বুকশেল্‌ফ্‌ হাতড়াতে লাগল রানা। চার মিনিট পর পেয়ে গেল যা খুঁজছে। সাইড পাউচে ছোট ওই ডায়েরি রেখে বেরিয়ে এল লাইব্রেরি থেকে। পরের পাঁচ মিনিটে ফিরল কর্নেলিস, পেঁচা ও রেমারিকের পাশে।

নাইট ভিশনের মাধ্যমে চ্যাপেল দেখছে সবাই। হাতের ইশারা করল রানা। 'সিম, ছেলেরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

মাথা দোলাল কর্নেলিস। 'হ্যাঁ। চ্যাপেলের পেছনে দরজা আছে। ভেতরে অ্যান্টি রুম। তুমি ঢুকে পড়লে ওই পেছনের দরজা কাভার করব।'

'মউরোস ওটা করবে,' মন্তব্য করল রেমারিক।

'আরও গার্ড থাকলে তাকে বা তাদের ঠাণ্ডা করতে কাজ করব রানা এজেন্সির ছেলেরা, কালাহান আর আমি,' বলল কর্নেলিস। 'মনে করি না ঝামেলা হবে। বাইরে থেকে ঘিরে ফেলব চ্যাপেল।'

'সিমের সঙ্গে যাও, পেঁচা,' বলল রানা, 'চ্যাপেলে শুধু ঢুকব রেমারিক আর আমি।'

'পেছনে কাভার দেবে না কেউ?' অবাক হলো পেঁচা।

রানা কিছু বলার আগেই বলল কর্নেলিস, 'দরকার পড়বে না। গার্ড থেকে থাকলেও দু'একজন। অন্যরা পড়ে আছে জ্ঞান হারিয়ে ঝোপের ভেতর।'

মাথা দুলিয়ে আবারও নাইট গ্লাসের ভেতর দিয়ে চ্যাপেল দেখল রেমারিক। ফিসফিস করে রানাকে বলল, 'এবার রামিনের ডাকের জন্যে অপেক্ষা?'

'তাই,' বলল রানা, 'আর বড়জোর বিশ মিনিট পর সিগনাল দেবে। তখন চ্যাপেলে ঢুকব আমরা।'

তিরানব্বই

নিজের বেঞ্চ থেকে চট্ করে পাশের সারিতে রামিনকে দেখল ক্যাথেরিনা ক্যাপরেস। মোমবাতির কাঁপা আলোয় সুদর্শন তরুণকে দারুণ দেখাচ্ছে। যদিও পাথরের মত করে রেখেছে মুখ। ভয় ও আপত্তির কারণেই বোধহয় এমন লাগছে ওকে দেখতে, ভাবল ক্যাথেরিন। না, তা-ও নয়, ভুল ভেবেছে সে। রাগে গনগন করছে আসাদের দুই চোখ। চেয়ে আছে মঞ্চে রাখা এক খাটিয়ার দিকে। ওটা কালো সিল্ক দিয়ে ঘেরা। খাটিয়ার ওপর শুয়ে আছে উলঙ্গ এক রূপসী কিশোরী মেয়ে। কোঁকড়ানো সোনালি চুল কান ও গালে। খুব নিষ্পাপ লাগছে বাচ্চাটাকে। বুজে আছে চোখ। কালো সিল্কের ফিতা দিয়ে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে খাটিয়ার সঙ্গে।

ওটা কিশোরীর লাশ, ভেবেছিল রামিন। তারপর দেখল খুব ধীরে উঠছে-নামছে বুক। মাথার পাশেই কালো একটা বড় কর্ক। ওটার ভেতর গেঁথে রাখা হয়েছে সোনালি বাঁটের ছোরা। অর্ধবৃত্ত তৈরি করেছে জ্বলন্ত সব কালো মোমবাতি। বেদির এক পাশে বিশপ ল্যারেনযো। লালের বদলে পরে নিয়েছে কালো একটা আলখেল্লা। ছাগলা দাড়ির ওপরে নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে দুই চোখ। মাথার একটু ওপরে অদৃশ্য কোনও সুতলি থেকে ঝুলছে কালো এক উল্টো ক্রুশ। বেদির দু'দিকে কালো আলখেল্লা পরা দু'জন দাঁড়িয়ে— একজন পুরুষ, অপরজন নারী। আগে ভিলার ভেতর

তাদেরকে দেখেনি রামিন। আন্দাজ করল, তারা সিমোনার নতুন বাবা-মা। বেদিতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে অভিষিক্ত যুবক। আজ সে পাবে স্বয়ং শয়তানের তরফ থেকে পৃথিবী ভরা ভালবাসা।

চারপাশ দেখল রামিন। বুঝে গেল, এই সংগঠন কাজে ত্রুটি রাখে না। এমন পরিবেশ তৈরি করেছে, মনে হচ্ছে সত্যি যেন হাজির হবে শয়তান। দেয়ালের ওপরের দিকে স্পিকার থেকে আসছে গ্রেগোরিয়ান মন্ত্র। গভীর গলা, ছন্দময়, মনে হচ্ছে সৃষ্টি করবে নেশা। বাতাসে ভাসছে দামি আগরবাতির সুবাস। গোপন কিছু ফ্যান ওটা ছড়িয়ে দিচ্ছে চ্যাপেলে। নামকরা কোনও ফিল্ম ডিরেক্টরের বাবারও সাধ্য নেই এভাবে তৈরি করবে নারকীয় পরিবেশ।

নড়ে উঠল বিশপের কেঁচোর মত লালচে দু'ঠোঁট, গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলতে লাগল শয়তান প্রভুর প্রশংসা। তার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করছে সবাই। পুরো মনোযোগ বেদির ওপর।

ঘুরে পেছনের দরজা দেখল রামিন। ওটাই চ্যাপেলে ঢুকবার প্রধান দরজা। আবারও দেখল সামনের দিকে। মস্ত এক টেবিলে কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা বুফের মত একের পর এক খাবারের ডিশ। ওদিক থেকে পাকা ফলের গন্ধ আসছে। আম, কলা, আপেল, কমলা— কী নেই! পাশেই আছে ধূসর ক্যাভিয়ার, কাঁচা শুয়োর, গরু, ভেড়া ও হরিণের মাংস। রক্তের গন্ধ আসছে। পাশেই কয়েক জগ লাল ওয়াইন। কোনও বাসন বা চামচ নেই। রামিন বুঝে গেল, বলির কাজ শেষ হলে উলঙ্গ হয়ে রাক্ষসের মত খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এরা। তার আগে নিহত মেয়েটার রক্ত মাখবে দেহে। আর খাবার শেষ করে ওই নোংরা দেহে মিলিত হবে একে অপরের সঙ্গে। বেদির বামে তিনজন পুরুষ। গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তা ও গিয়ারডিনি ক্যালভেসিওকে

চিনতে পারল ও। অন্যজন এক যুবক। গুগলির কাছ থেকে জেনে ওই লোকের বর্ণনা দিয়েছে মউরোস। চক-চক করছে যুবকের দু'চোখ। দ্য ডায়মণ্ড রিঙের সর্বোচ্চ নেতা। একবার রামিনকে দেখে নিল লোকটা, নিষ্ঠুর দৃষ্টি।

চারপাশের লোকগুলোকে দেখল রামিন। আজ পশু বলি হবে না এখানে। ঠাণ্ডা পরিবেশেও দরদর করে ঘামছে সবাই। বিশাল কিছু পাবে সে জন্য একটু হাঁ করে রেখেছে মুখ। চোখে কীসের এক নেশা। বোধহয় নরবলির জন্য অপেক্ষা করছে দীর্ঘ দিন, নিজেরাই হয়ে উঠেছে অশুভ সব হিংস্র জানোয়ার।

আবারও মন্ত্র আওড়াতে লাগল বিশপ। হাতের ইশারা করল অভিষিক্ত যুবকের দিকে। দেখিয়ে দিল সোনালি বাঁটের ছোরা। ল্যারেনযোর কথার অর্থ বুঝতে পারল না রামিন, কিন্তু আঁচ করল, সে বলছে ল্যাটিন ভাষায়। তখনই বুঝে গেল ও, আর দেরি করা ঠিক হবে না। কোমরে ট্র্যান্সমিটারের বাটনে টিপ দিল তিনবার।

এদিকে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে লাগল মাতাল অভিষিক্ত যুবক। কয়েক পা বেড়ে দেখল উলঙ্গ কিশোরীকে।

বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল রামিন। কমপিউটারের চেয়েও দ্রুত চলছে মগজ। এতক্ষণে চ্যাপেলের খুব কাছে পৌঁছে গেছেন মাসুদ ভাই। রানা এজেন্সির ছেলেদের সাহায্য নিয়ে গার্ডদের নিরস্ত্র করে বাইরে অপেক্ষা করছে সিম কর্নেলিস, কালাহান, মউরোস ও ফুলজেন্স। গোটা কম্পাউণ্ডে চোখ রেখেছে তারা। গাড়ি নিয়ে দূরে অপেক্ষা করছে রানা এজেন্সির দু'জন এজেন্ট ও পিটার। কাজ শেষ হলেই তুলে নিয়ে যাবে ওদেরকে।

নোংরা চেহারার লম্পট যুবক হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ছোরার দিকে। কর্ক থেকে হ্যাঁচকা টানে ওটা খুলে দুই হাতে তুলে ধরল মাথার ওপর। একবার দেখে নিল কিশোরীর হৃৎপিণ্ড কোথায়।

পবিত্র ধর্মগ্রন্থের শ্লোক উল্টো করে পড়ছে বিশপ। চোখ পড়ে আছে বাচ্চা মেয়েটার বুকে।

সবার ওপর থেকে ঘুরে এল রামিনের চোখ। সবাই মুগ্ধ চোখে দেখছে বেদি ও খাটিয়ায় শোয়া মেয়েটাকে।

আলখেল্লার ফিতা টেনে খুলল রামিন, হাত চলে গেল কোমরে। ঝটকা দিয়ে বের করল ভারী কোল্ট পিস্তল।

মাথার ওপর ছোরা তুলেছে যুবক। টেরও পেল না মাথার পেছনে বুলেট ঢুকেছে বলে খুন হয়ে গেছে সে। বিকট আওয়াজ তুলেছে সাইলেন্সারহীন পিস্তল। হোঁচট খেয়ে কিশোরীর ওপর পড়ল লাশ। রক্তে ভিজে গেল অচেতন মেয়েটা। আর তখনই বিশপের মুখ বিস্ফোরিত হলো দুটো বুলেটের আঘাতে।

ওই গুলি দুটো করেছে রানা ও রেমারিক।

ঝটকা দিয়ে অস্ত্র বের করেছে গ্যালিলিও জিয়োরোল্লি লাফাত্তা ও গিয়ারডিনি ক্যালভেসিও। কিন্তু ব্রাশ ফায়ারে ছিঁড়েখুঁড়ে গেল তাদের বুক।

হাউ-মাউ করে উঠল অন্যরা। গলা ফাটিয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়ছে মহিলারা। পিস্তল দেখা যাচ্ছে কয়েকজন পুরুষের হাতে

দুই সারি বেঞ্চের মাঝ দিয়ে দৌড়ে সামনে বাড়ল রামিন। চিৎকার করে ইতালিয়ান ভাষায় বলল, 'নড়বে না কেউ! খবরদার! নড়লে খুন হয়ে যাবে!' এর বেশি জানা নেই ওর ইতালিয়ান ভাষা।

পিস্তল তাক করল দু'জন লোক রামিনের দিকে। কিন্তু গুলি শুরু করার আগেই ছিটকে পড়ল বুকে গুলি খেয়ে। সবার মাথার ওপর দিয়ে গেল এক রাশ এসএমজি বুলেট।

রামিনকে কাভার দিচ্ছে রানা ও রেমারিক।

কিছুই পাত্তা না দিয়ে খপ্ করে রোমিও কোসেলিকে জড়িয়ে ধরল রামিন। পরক্ষণে ল্যাং মেরে ফেলে দিল মেঝেতে। আর

কোনও দিকে খেয়াল নেই, ব্যস্ত হয়ে উঠল নিজের কাজে।

ওদিকে দরজার দিকে ছুট দিয়েছে নিরস্ত্র মহিলা ও পুরুষরা, পালাতে চায় জান হাতে নিয়ে।

চুরানব্বই

রামিন রেযার সিগনাল পাওয়ার পর দেরি করেনি রানার দলের কেউ। মাত্র তিনজন গার্ড তখনও কম্পাউণ্ডে যার যার জায়গায় পাহারা দিচ্ছিল, তারা মরল কয়েকজনের এসএমজির ব্রাশ ফায়ারে। কোনও শত্রু বাধা দেবে না বুঝে কর্নেলিসের পিছু নিয়ে রানা এজেন্সির ছেলেরা ছুট দিল চ্যাপেলের দিকে। ঘিরে ফেলবে ওই চ্যাপেল, পালাতে দেবে না কাউকে।

কয়েকজন লোক ও মহিলা ছিটকে বেরিয়ে এসেছে চ্যাপেল থেকে। ঝেড়ে দৌড় দিল ভিলার দিকে। একবার পোশাক পাল্টে নিতে পারলে গাড়ি নিয়ে উধাও হবে।

কিন্তু ত্রিশ ফুট যাওয়ার আগেই অস্ত্রের মুখে থামতে হলো তাদেরকে। বাঁধা হলো হাত-পা, ফেলে রাখা হলো নুড়ি পাথরের রাস্তার ওপর। পরে তাদের পেট থেকে সব টেনে বের করবে কারাবিনিয়ারি।

রানার দলের যারা বাইরে পাহারা দিচ্ছে, তাদের ভেতর প্রথমে চ্যাপেলে ঢুকল কর্নেলিস। বেদির কাছে যাওয়ার পর খুব গম্ভীর হয়ে গেল ওর মুখ।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রানা-রেমারিক। কোনও অনুভূতির

ছাপ নেই মুখে।

বেদির কাছের মেঝেতে পড়ে আছে রোমিও কোসেলি।

এইমাত্র তার ওপর নিজের কাজ শেষ করেছে রামিন।

দ্য ডায়মণ্ড রিঙের সর্বোচ্চ নেতার মুখ থেকে বেরোচ্ছে করুণ, দুর্বল গোঙানি, সেই সঙ্গে লাল রঙের ফেনা। মাপা হাতে মেরে চুরচুর করে দেয়া হয়েছে সুদর্শন ইতালিয়ান যুবকের হাত-পা, মেরুদণ্ড ও পাঁজরের হাড়। কোনও নার্ভ নষ্ট করা হয়নি। বাঁচবে সে, কিন্তু আর কোনদিনও সোজা হয়ে হাঁটতে পারবে না, বাকি জীবন নির্ভর করবে মানুষের দয়ার ওপর। হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়ার পর তার পেট থেকে দরকারী সব খবর বের করবে কারাবিনিয়ারি।

দশ মিনিট পর গাড়ি পৌঁছুতেই দো গুচ্চি ভিলা থেকে বেরিয়ে গেল রানার দলের সবাই। কয়েক কিলোমিটার দূরে আরেকবার গাড়ি পাল্টে পৌঁছবে সেফ হাউসে।

তার অনেক আগেই অশুভ ওই ভিলায় হানা দেবেন কর্নেল বার্নাদো গুগলি।

পঁচানব্বই

পড়ছে উদাস করে দেয়া ঝিরিঝিরি বৃষ্টি।

মাঝরাত।

ঢাকা শহরের ধানমণ্ডি, গুলশান, বনানী ও ডিওএইচএসের কয়েক জায়গায় হঠাৎ করেই চলে গেল বিদ্যুৎ।

বিসিআই-এর দক্ষ একদল এজেন্টের নেতৃত্বে, সামরিক বাহিনী, র‍্যাব ও পুলিশের একদল সৎ অফিসার ব্যস্ত হয়ে উঠল।

বিশেষ কিছু বাড়িতে রেইড দিল তারা। ধরা পড়ল বড় কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ও ধনী ব্যবসায়ীর একদল উচ্ছৃঙ্খল ছেলে-মেয়ে। তাদের বেদম পিট্টি দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হলো ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কারা পৌঁছে দিল তাদের, জানতে পারল না মেডিকেল কর্তৃপক্ষ।

অভিজাত এলাকার ওসব বাড়িতে ছিল ড্রাগ্স্ অ্যাডিক্ট কিছু কিশোরী মেয়ে। ওদেরকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো কোথায় যেন। সঠিক সময়ে তুলে দেয়া হবে বাবা-মা-র হাতে।

এসব এলাকার মস্তান হিসেবে পরিচিত কয়েকজনকে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো কোথায় যেন। তারা আর কখনও দেখবে না সূর্যের আলো। ভয়ঙ্করভাবে পিটিয়ে চিরকালের জন্যে পঙ্গু করে দেয়া হলো বিলাসবহুল বাড়িগুলোর মালিক ও কর্মচারীদের। পুরো অপারেশন চালাতে বিসিআই-এর লাগল মাত্র এক ঘণ্টা।

ভূতের মত উধাও হলো অদ্ভুত ওই দলের সবাই।

একইভাবে অপারেশন চালানো হয়েছে বাংলাদেশের বড় কয়েকটি শহর ও পর্যটন নগরীতে। যারা এসব কাজে জড়িত, তাদের কারও পরনে কোনও ইউনিফর্ম ছিল না। তারা যে কারা, তা বুঝতে পারেনি এলাকাবাসী।

হামলা হয়েছে মাসুদ রানার কাছ থেকে পাওয়া ডায়েরির তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীর প্রায় সব দেশে। আগামী কয়েক বছরে মাজা সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না দ্য ডায়মণ্ড রিং।

বাংলাদেশে দ্য ডায়মণ্ড রিঙের বড় নেতাদের কপালে যা ঘটল, আফ্রিকা, আমেরিকা ও ইউরোপে মোটামুটি একই অবস্থা হলো ওই দলের লোকগুলোর। প্রায় প্রতিটি সিক্রেট সার্ভিসের কাছে বিসিআই থেকে পাঠানো হয়েছিল দরকারী সব তথ্য।

যেসব তথ্য এত কাজে এল সিআইএ-র, তাতে নিজ থেকে ফোন করে বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানকে ধন্যবাদ দিল সিআইএ চিফ। জানাল, আসলে একদল ভ্রান্ত পথের লোকের কথায় মাসুদ রানাকে ভুল বুঝেছিল সে। দ্য ডায়মণ্ড রিঙের বিষয়ে এসব তথ্য পেয়ে ভেঙে গেছে তার ভুল। সে কৃতজ্ঞ বিসিআই এজেন্ট এম.আর.নাইন-এর কাছে। ভবিষ্যতে কোনও সহায়তা লাগলে যেন বিসিআই থেকে যোগাযোগ করা হয় তার সঙ্গে।

জবাবে শুধু বলেছেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান, 'মনে হয় না আমাদের ছেলেরা নিজের কাজ নিজেরা করতে পারবে না। তবুও, কথাটা বলেছেন, সে জন্য অনেক ধন্যবাদ।'

নীচতলার দরজা খুলে যেতেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল সুসি গোল্ডা।

কে এল এত রাতে?

লোকটা ঢুকেছে কিচেনে।

টাফি কী করছে?

কিচেনে ঢুকল সুসি, পরক্ষণে চমকে গেল ক্লান্ত রানাকে দেখে। 'রানা, কী হয়েছে? যাও, ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

'একটু পর,' বলল রানা।

'রামিন কই?'

'ও ঠিক আছে।'

'সকালে শুনব, আগে বিশ্রাম দরকার তোমার।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা, 'সকালে তোমার দেখা পাব ব্রেকফাস্টের সময়?'

হাসল স্নেহময়ী মহিলা। 'পাবে। আমিই তৈরি করব তোমার জন্যে ব্রেকফাস্ট।'

চার ঘণ্টা ঘুমিয়ে উঠে ফ্রেশ হয়ে নিচে নেমে রানা দেখল ব্যস্ত

সুসি। মাত্র তিন মিনিট পর ওর সামনে রাখল চারটে ভাজা ডিম, গরুর মাংস, ভাজা আলু, সেদ্ধ টমেটো ও খাসির কলিজা।

বাসন ভরা খাবার শেষ করার পর এক মগ কফি নিল রানা। প্রথমবারের মত মুখ খুলল, 'প্রথম থেকে শুনতে চাও?'

'অবশ্যই,' রানার সামনে বসল সুসি।

সব শুনতে প্রায় একঘণ্টা লাগল। একবারও বাধা দিল না। বিস্তারিতভাবে জানল, কোমর ভেঙে সর্বনাশ করে দেয়া হয়েছে দ্য ডায়মণ্ড রিঙের।

রানার কথা শেষ হওয়ার পর বলল সুসি, 'আমি অবশ্য কালো যজ্ঞের ব্যাপারে সবই পড়েছি খবরের কাগজে। নড়ে চড়ে বসেছে গোটা ইউরোপ। আমার মন অন্য কারণে খারাপ। তিন দিন পর এলে তুমি।' এবার জানতে চাইল সুসি, 'কেমন কাজ এগোচ্ছে কর্নেল গুগলির?'

মৃদু হাসল রানা। 'শীঘ্রি ওকে জেনারেল করে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু কোনও দিনও ভুলবে না ও কোসিমা পাধানিকে। ব্যস্ত থাকতে হবে ওকে। কাজের অভাবও হবে না।'

'আর বেদির ওপরের ওই মেয়ের কী হলো?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'গুগলির মা ওর দেখভাল করবেন ঠিক করেছেন। মেয়েটাকে ভদ্রস্থ করে পাঠিয়ে দেবেন তাঁর বড় ছেলের বাড়িতে। দশ বছর হলো ভদ্রলোকের সন্তান হয় না।'

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা দোলাল সুসি গোল্ডা। 'শুনলাম বাড়ি ফিরেছে সিম কর্নেলিস। নতুন কোনও খবর পাইনি।'

'ভাল আছে। যদিও গতরাতে মাতাল ছিল।'

'কালাহান আর মউরোস?' জানতে চাইল সুসি।

'কাজ নেই, তাই উঠেছে গুগলির অ্যাপার্টমেন্টে। ওখানেই আছে জেনি। ওকে বেয়াড়া করে দিচ্ছে ওই দুই বোকা লোক। গুগলির উচিত জেনিকে শাসনে রাখা।'

‘ওই ডেনিশ পুলিশ আর ফুলজেন্স?’

চকচক করে উঠল রানার চোখ। ‘আছে কোপেনহেগেনে। পুলিশ ফোর্স থেকে অবসর নিয়েছে পিটার। ওরা দু’জন প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলছে।’

‘ওই পিটারটাকে পছন্দ করি,’ হাসল সুসি। ‘ওকে বোলো, যখন খুশি আমার বাড়িতে অতিথি হতে পারবে। পেঁচাও।’

‘জানিয়ে দেব।’

‘রামিনের কী খবর?’

‘ওটাই তো আমার সমস্যা,’ কফিতে চুমুক দিল রানা।

‘ঝামেলা কখনও তোমাকে ছাড়ল না,’ বলল সুসি। ‘এবার কী হয়েছে?’

চুপ করে থাকল রানা।

‘রামিন এখন কোথায়?’ চিন্তিত সুরে জানতে চাইল সুসি।

‘জার্মানিতে। ওয়েইসব্যাডেন নামের এক ছোট শহরে।’

‘করছে কী ছেলেটা?’

‘বলে গেছে, খুন করে আসবে জেনির সৎ-বাপকে।’

‘তোমার হাতে তৈরি রামিন,’ বলল সুসি, ‘তোমারই বোঝার কথা ওকে। আর সত্যি যদি দুনিয়ার শয়তান ওই লোককে মেরেই ফেলে ও, তাতে কী যাবে আসবে পৃথিবীর?’

‘আমাদের কাজ বিচারকের মত শাস্তি দেয়া নয়,’ বলল রানা। ‘কেউ ক্ষতি করলে তখন পাল্টা কিছু করি। ও সেটা বুঝতে চাইছে না।’

‘বেয়াদবি করেনি তো?’ জানতে চাইল সুসি।

‘না, সুযোগই রাখেনি। ইতালি থেকে বেরিয়ে সোজা জার্মানিতে। ফোনে বলেছে, জরুরি কাজ শেষ করেই ফিরবে, আমি যেন চিন্তা না করি। তারপর রেখে দিয়েছে ফোন।’

‘তারপর থেকে যোগাযোগ নেই?’

'পরশু দিন গেছে। তারপর আর কোনও কথা হয়নি।'

সদর দরজায় বেজে উঠল ঘণ্টি। বাইরের করিডোরে বিড়বিড় করতে করতে দরজার দিকে চলল টাফি।

দু'মিনিট পর কিচেনে ঢুকল রামিন রেযা। ঝুঁকে আলিঙ্গন করল সুসিকে। তারপর বসে পড়ল রানার উল্টো দিকের চেয়ারে। ওর জন্য নাস্তা তৈরি করতে চুলোর কাছে গেল সুসি।

রানার চোখে চোখ রেখেও আবারও নিজের হাতের দিকে তাকাল রামিন। 'মাসুদ ভাই, ঠিক কাজ করলাম কি না, জানি না।'

'কী করেছ?' জানতে চাইল রানা।

বিব্রত মনে হলো রামিনকে। 'ছোট একটা বোমা রেখেছিলাম জেনির সৎ-বাবার গাড়িতে। নতুন বিএমডাব্লিউ নিয়ে আকাশে ঘুরতে যাক ব্যাটা। তিন শ' ফুট দূরেই ছিলাম রিমোট কণ্ট্রোল হাতে। তখনই মনে হলো, খামোকা খুন করার আমি কে? মনে পড়ল জেনির প্রতি কী করেছে। কিন্তু আবারও গিয়ে বোমা সরিয়ে ফেললাম। তারপর গভীর রাতে হাজির হলাম জেনির ডাইনী মা আর ওর সৎ-বাবার বেডরুমে।' চুপ হয়ে গেল রামিন।

'তারপর?' কফিতে চুমুক দিল রানা।

ছাতের দিকে তাকাল রামিন। 'মহিলা বিকট নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিল। তার স্বামীকে কী শাস্তি দেব ভেবে পেলাম না।'

'আচ্ছা?'

'হ্যাঁ, তখন আবারও বেরিয়ে এলাম। বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিলাম তার নতুন বিএমডাব্লিউ গাড়ি। মনে হলো বউয়ের চেয়ে ওটাকে বেশি ভালবাসত। ইনশ্যুরেন্স কোম্পানি সহজে ওর কথা মানবে না। ধরে নিতে পারি, ফেরত পাবে না চারআনা পয়সাও।'

মুচকি মুচকি হাসছে সুসি। রানার চোখে তাকাল।

বাঙালি গুপ্তচরের চোখে কৌতুক। 'হুম, বুঝলাম। সারাজীবন

আফসোস করবে, সত্যিই নতুন একটা গাড়ি ছিল তার!’

চোখ তুলে রানার চোখ দেখল রামিন। মাসুদ ভাইয়ের চোখে নিখাদ আনন্দের হাসি।

কয়েক সেকেণ্ড পর হো-হো করে হেসে ফেলল ওরা দু’জন। সেই হাসিতে যোগ দিল সুসি গোল্ডা।

(সমাপ্ত)

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা দিয়ে বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

মোঃ শাওন হোসেন রাজু
হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। মোবা: ০১৭১৭-৯৮২০২৩।

পাতকিনী!

সেই কতদিন আগে পড়েছিলাম মাসুদ রানা সিরিজের টানটান উত্তেজনায় ভরপুর বই: *কালনাগিনী*। এতদিন পর আবার দেখা পেলাম আরেক কালনাগিনীর—*পাতকিনী* বইয়ের মাঝে।

একের পর এক অ্যাকশনে ভরপুর বইয়ের মাঝে হঠাৎ একটু ভিন্নতার স্বাদ দিলেন আমার কাজীদা, পাতকিনী উপহার দিয়ে। একটু-একটু করে পরিণতির দিকে এগিয়ে গিয়ে শেষে তুলকালাম কমাণ্ডো যুদ্ধ। তাও মাত্র কয়েক মিনিটের। এতেই চমকে গেছি। বুঝেছি, রানার সঙ্গে পথ চলব, কিন্তু ভুলেও ল্যাং মারার চেষ্টা করব না। উঁহুঁ, ভাববও না।

রানার জয় হোক।

পাতকিনীর জন্য প্রিয় কাজীদাকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেব, তা ভেবে পাচ্ছি না। নতুন বই পেলে আবার একটি চিঠি লিখব।

❋ চিঠি পেলে আমিও ধন্যবাদ দেব।

বিপুল কুমার রায়, মোবা: ০১৭৩৬-২৬৬৩৮১
১২৯০ ও. আর. নিজাম রোড, মেহেদীবাগ, চট্টগ্রাম।

কাজীদা,

ভাল বই লেখকদের প্রতি আমার একটা বিশেষ শ্রদ্ধা রয়েছে। কারণ,

বই এমন এক শিল্প যা ছাড়া মানবমনের বিশুদ্ধ বিকাশ সম্ভব নয়। পাঠক হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা বলে যারা বই পড়তে শেখে না তারা শিল্পিত জীবনের কিছুই শেখে না। তবে বই পড়লেই সার্থক পাঠকের দাবি রাখা যায় না। বই লেখাটা যেমন একটা সৃজনশীল শিল্প ঠিক তেমনি বই পড়াটাও একটা শিল্প। সব ভাল পাঠক সব ভাল বই থেকে শিক্ষণীয় কিছু না-ও পেতে পারে। তবে সেটাই ভাল বই, যে বই থেকে একজন পাঠক একটু হলেও শিক্ষণীয় কিছু একটা খুঁজে পায়।

❋ শিখলাম।

অনিক রায়, মোবা: ০১৮১২-৯২৫৭৭৬

মেরুন সান কলেজ, আই. এস. সি. (২য় বর্ষ)।

শ্রদ্ধেয় কাজীদা,

প্রথমে পৃথিবীর সবচেয়ে বিনম্র শ্রদ্ধাটি গ্রহণ করুন। আপনার সব বই আমার খুবই ভাল লেগেছে। *অগ্নিপুরুষ, হ্যাকার, ব্ল্যাক স্পাইডার* ইত্যাদি বই পড়ার পর নিজেকে খুবই অপরাধী মনে হলো। কারণ আপনি আমাদেরকে এত সুন্দর সুন্দর বই উপহার দিয়েছেন অথচ আমি আপনাকে কোনও ধন্যবাদ জানাইনি। কাজীদা, আপনার কাছে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। প্রথমটি হচ্ছে, আপনি মাসুদ রানা ১৯৬৬ সালের কোন্ মাসে প্রথম প্রকাশ করেন? দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আপনি অগ্নিপুরুষে রানার মৃত্যু কেন ঘটিয়েছেন?

কাজীদা, মাসুদ রানার প্রথম দিকের বইগুলো রিপ্রিন্ট করলে আমার মত অনেকে খুবই খুশি হবে। মাসুদ রানার ভক্তদের সাথে ফ্রেণ্ডশিপ করতে চাই।

সবশেষে আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করে শেষ করছি।

❋ প্রথম মাসুদ রানা কি '৬৬ সালে বেরিয়েছিল? অগ্নিপুরুষে রানার মৃত্যু হয়নি—শেষটুকু আবার ভাল করে পড়ে দেখুন। আশা করি বন্ধু পেয়ে যাবেন। ধীরে ধীরে সবই রিপ্রিন্ট হচ্ছে। ধন্যবাদ।

সুকর্ণ আহমেদ

রুম নং-৫১৪, স্যর এ. এফ. রহমান হল, ঢা. বি., ঢাকা।

ভাল লাগা এবং ভালবাসাকে ঘিরে আবর্তিত হয় সুখ। আর এই সুখের তালাশে মানুষ ঘুরে বেড়ায় কাছ থেকে দূরে, দূর থেকে দূরান্তে। আমি তেমনি একজন। মাসুদ রানা সিরিজ পড়তে ভাল লাগে। পড়ে অনুভব করি সুখের ছোঁয়া। *ড্রাগ লর্ড* চমৎকার একটি বই, যার পাতায়-পাতায় রয়েছে রহস্য এবং বিপদের হাতছানি। বইটি উপহার দেবার জন্য আপনাকে এবং সেবার সবাইকে কাক ডাকা ভোরের শুভেচ্ছা।

❋ ধন্যবাদ।

প্রকাশিত হয়েছে মাসুদ রানা

পাশবিক
প্রথম খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন

অসুস্থ রানা ভাবতেও পারেনি, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাবে এই জটিল ষড়যন্ত্রের জালে। যে হারিয়ে গেছে দশ হাজার বছর আগে, নতুন করে আবারও কি ফিরল সেই দানব? নির্মমভাবে খুন করছে সৈনিক, বিজ্ঞানী ও তাদের সহকারীদের। ইউ.এস. আর্মির অনুরোধে ভয়ঙ্কর বেপরোয়া ওই নৃশংস জানোয়ারের পিছু নিল রানা, সঙ্গে দক্ষ ক'জন সশস্ত্র যোদ্ধা। কিন্তু হাড়ে হাড়ে বুঝল ওরা, বৃথা ওসব আধুনিক অস্ত্র! অনায়াসেই আলাস্কার তুষারাচ্ছন্ন অরণ্য-পর্বতে ওদেরকে হত্যা করছে ওটা! ধাওয়া খেয়ে পালাতে লাগল ওরা। তারপর আঁধার গিরিখাদে আহত রানার মুখোমুখি হলো ওই নিষ্ঠুর পশু! অন্তরের গভীরে রানা বুঝে নিল, আর কোনও উপায় নেই!

পাশবিক
দ্বিতীয় খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা জানতে চাইছে, সিআইএ-র কর্মকর্তা ডক্টর ডেভিড গ্রেবারের রহস্যময় ওই ল্যাবে কী আছে। ওদিকে ওরা জানে, ভয়ঙ্কর হিংস্র, রক্ত-পিশাচ ওই দানব আসছে ধেয়ে। গলা শুকিয়ে গেছে সবার। কেউ জানে না, একশ' জনেরও বেশি সশস্ত্র সৈনিক ওটাকে ঠেকাতে পারবে কি না। ...প্রাণ বাঁচাতে চলল ওদের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি! আবারও কি রাতের আঁধারে শুরু হবে নিষ্ঠুর গণহত্যা, ভিজে যাবে মাটি অসংখ্য মানুষের তাজা রক্তে? ওই রাক্ষস-বধ করতে এবং সিআইএ-র কুটিল পরিকল্পনা ঠেকাতে গিয়ে শেষে মস্ত ঝুঁকি নিল রানা—দানবের মুখোমুখি হবে বলে চলে গেল আদিম যুগের বিশাল এক উত্তপ্ত মৃত্যু-গুহায়!

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০